
স্বয়ম্ভু সেনের প্রথম রহস্যকাহিনি
অভিষেক চট্টোপাধ্যায়
ইপাব
ম্যাও
সত্য ঘটনা অনুপ্রাণিত

স্বয়ম্ভু সেনের প্রথম রহস্য কাহিনি

অভিষেক চট্টোপাধ্যায়

ম্যাও

সত্য ঘটনা অনুপ্রাণিত

শহরে সিরিয়াল কিলিং! অপরাধী একটি বিড়াল। একটি নির্মম সত্য ঘটনা অবলম্বনে সম্পূর্ণ লৌকিক রহস্যকাহিনি।

BOOK LOOK PUBLISHING www.booklookonline.com
9 788195 889365
Rs. 450.00

অরুণা, দিয়া, সুস্মিতা, মৃত্তিকা.... এই ফোর মাস্কেটিয়ার্সের সঙ্গে দুজন ফাউ ছিল প্রিয়াংশু আর তমাল। সময়ের চোরাপথে জীবনের জটিল সমীকরণে এরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিল।

পরিণাম ভয়ানক বীভৎস মৃত্যু! সেই যমদূতের সংকেত বয়ে আনত একটি বিড়ালের ডাক। কিন্তু কেন? কেসটা নিজেই হাতে নিল লালবাজারের তরুণ গোয়েন্দা স্বয়ম্ভু সেন। সঙ্গে যোগ্য শিবাঙ্গী বসু। গোয়েন্দাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তাঁরই সামনে খুন হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। এমনকি খুনের ভিডিয়োও পাঠিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে ঠিক কীভাবে খুন করা হয়েছে। কিন্তু বিড়ালের ডাকের সঙ্গে এই নরহত্যার সম্পর্ক কী? এই কেসের সমাধান করতে না পারলে স্বয়ম্ভুকে বেছে হবে স্বেচ্ছাসাজা, যাবজ্জীবন অথবা ফাঁসি। স্বয়ম্ভু কীভাবে রহস্যের ঝুলি থেকে আসল বিড়ালটাকে খুঁজে বের করবে? কীভাবেই বা বন্ধ হবে শহরজুড়ে রক্তের হোলিখেলা?

978-81-958893-6-5

ম্যাও

অভিষেক চট্টোপাধ্যায়

Book Look PUBLISHING

Myao
By Avishek Chattopadhyay

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০২৩
গ্রন্থস্বত্ব লেখক
প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু মন্ডল
অলঙ্করণ স্মৃতীশ মন্ডল
লেআউট ঋতাক্ষর

প্রকাশক Book Look Publishing
ঠিকানা ২/১৮ মহাজাতি নগর, বিরাটি,
কলকাতা-৭০০০৫১
ওয়েবসাইট www.booklookonline.com
যোগাযোগ 8017544015
ই-মেইল booklook8017@gmail.com
ISBN 978-81-958893-6-5

যাঁরা জীবন পণ করেছেন অপরাধ নিশ্চিহ্ন করে অপরাধীদের উপযুক্ত
শাস্তি দেবার ও তাদের সঠিক পথ প্রদর্শনের...

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় খাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।



রহস্যের আগে...

সাল ২০২০। সম্ভবত মে মাস। নেশার ঘোরে মুঠোফোনের ওপর আঙুল বোলাতে বোলাতে একটা ভিডিয়ো এল। থমকে গেল আঙুলগুলো। চোখের ওপর নাচতে লাগল কতগুলো প্রাণীপিশাচ। মাতালের মতো খলখলে প্রাণঘাতী হাসি তাদের। কান মাথা গরম হয়ে উঠছে। তবু ভিডিওটাকে চোখের সামনে থেকে সরাতে পারছি না। পৈশাচিক কর্মকাণ্ড আমায় যেন সর্বনাশের নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে নিমেষের মধ্যে। এমনিতেই সর্বনাশের একটা অমোঘ আকর্ষণ থাকে। আর ঠিক কতটা নামলে নরকের দ্বার খুলে যাবে সেই উদগ্র বাসনাতেই প্রস্তরমূর্তি হয়ে বসে রইলাম। পিশাচগুলোর পিপাসা মিটল। আমি তখন কাঁপছি। রাতে ঘুম হল না। এমনও হয়?

কী হয়েছিল সেদিন? কী দেখেছিলাম আমি? নাহ! সেটা বললে এই কাহিনির রহস্য বেরিয়ে আসবে অনায়াসেই। নিজের হাতে সেই সর্বনাশ করি কী করে? ভেবেছিলাম এই নরক দর্শনের কথা মনেই রাখব না। কিন্তু বুক লুক পাবলিশিং - এর অন্যতম কর্ণধার প্রীতম যখন আমায় উপন্যাস লেখার কথা বলল তখনই কেন যে সেদিন ঘটে যাওয়া ভয়ানক দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল জানি না। আমি জীবনে কখনও গোয়েন্দা উপন্যাস লিখিনি। অথচ মনের মধ্যে সাধ ছিল ষোলো আনা। ঠিক করলাম, একবার চেষ্টা করেই দেখি। ওই সত্য ঘটনাকে হাতিয়ার করেই কোমর বেঁধে নেমে পড়লাম। বাংলা সাহিত্যে শয়ে শয়ে গোয়েন্দার মতোই জন্ম নিল আমার মানস গোয়েন্দা স্বয়ম্ভু সেন ও তার সহকারী শিবাঙ্গী বসু। গোয়েন্দাদের দলে ভিড় বাড়ল আবারও। তা হোক। সমাজে অপরাধও তো কম হচ্ছে না। যদিও জানি না আমার এই কাহিনি আদৌ সাহিত্য পদবাচ্য হল কিনা! বা আদৌ স্বয়ম্ভু প্রকৃত গোয়েন্দা হয়ে উঠতে পারল কিনা। বিচার পাঠকদের হাতে। তাঁরা যা রায় দেবেন সেটাই মাথা পেতে নেব।

এই উপন্যাস আমি লিখলেও বেশ কিছু মানুষের অবদান ছাড়া এই লেখা সম্পূর্ণ করা কোনওভাবেই সম্ভব হত না। প্রথমজন হলেন ডাক্তার ও সুলেখক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। প্রতি মুহূর্তে তাঁকে যে পরিমাণ জ্বালিয়েছি তাতে অন্য কেউ হলে আমার সঙ্গে সম্পর্কই ছিন্ন করে দিত। দ্বিতীয়জন হল আমার পুলিশবন্ধু উজ্জ্বল। ওর সাহায্য এই কাহিনিতে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় ও চতুর্থজন অনুজপ্রতিম দুই লেখক সায়ন পড়িয়া ও অভিষেক দত্ত। এঁদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাই বুক লুক পাবলিশিং পরিবার ও প্রকাশকদ্বয় রোহন সাহা ও প্রীতম দাসকে। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এত নিখুঁতভাবে ভাবতে ও কাজ করতে খুব কম মানুষকেই দেখেছি। প্রচ্ছদশিল্পী কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল ও বইয়ের পাতায় যে চমৎকার অঙ্কন গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছে, তার জন্য শিল্পী স্মৃতীশ মণ্ডলের কথা আলাদা করে বলাই বাহুল্য। অসাধারণ কাজ হয়েছে।

এবার যদি পাঠককুল সমগ্র বইটিকে সাদরে গ্রহণ করেন তাহলেই সকলের কাজ সার্থক হবে।

১

বুনো গন্ধ বুকে জড়িয়ে সবেমাত্র জেগে উঠছে বনজ সকালটা। কয়েকটা মোরগের ডাক আর জঙ্গুলে ঝিঁঝিঁগুলোর সমবেত কনসার্ট ছাড়া কোনও শব্দ থাকার কথা নয়। কিন্তু আজ পাওয়া গেল। এক মহিলা কণ্ঠের উচ্চকিত আহ্বান, 'আলোওওওওক, এ আলোওওওওক। কাঁহা গয়ে রে? আজা বেটা। আলোওওওওক!' খানিকটা বাধ্য হয়েই চোখ কচলাতে কচলাতে গ্রিন জাঙ্গল রিসর্টের ম্যানেজার বেরিয়ে এল। ভুরুর মাঝে এক রাশ বিরক্তি। গায়ের চাদরটা এক ঝাপটায় ডান কাঁধে ছুড়ে গলা তুলল, 'আরে এ রামাইয়া! পাগল হয়ে গেলি নাকি? অভি ভি ট্যুরিস্ট লোগ সো রহে হ্যায় অউর তু...'। কথা শেষ করতে না দিয়েই বিহারী বউটা বলে উঠল, 'দেখো না সুখেনদা, কাল শাম সে আলোক ঘর মে নেহি আয়ে। কব সে ঢুন্ড রাহা হুঁ! কৌন জানে কিসকে ঘর মে ছুপ কর ব্যাঠে হ্যায় বদমাশ।'

-কারও ঘরে থাকলে এতক্ষণে রিসর্টে হুজ্জোত বেঁধে যেত। সেটা যখন হয়নি তখন নিশ্চিন্ত থাক আশেপাশে কোথাও আছে। এখন ঘর যা। সময় মতো চলে আসিস।

-উস দিনভি ইয়েহি বোলে থে না আপলোগ। আলোক আশপাশ আছে!

সবে শীতার্ত কুয়াশা আর জঙ্গলের অন্ধকার ভেদ করে কয়েকটা আলোর রেখা এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ছিল। ঠিক তখনই রামাইয়ার গলাটা গুমরে ওঠা মেঘের মতো গুমগুম করে উঠল। তামাটে মুখে কাজল ঘষা চোখ দুটো কোন আশঙ্কা নিয়ে তাকিয়ে আছে সেটা বেশ ভালোই বুঝল সুখেন। ভিতর থেকে একটু যেন গুটিয়েই নিল নিজেকে। সুখেনের কোনও জবাবের অপেক্ষা না করেই রামাইয়া ফিরসে গলা তোলে, 'আলোওওওওক, এ আলোওওওওক, কাঁহা গয়ে রে। আজা আজা।' এরপরেও বেশ কিছুক্ষণ রিসোর্টের চারপাশে রামাইয়ার স্বর ভেসে বেড়াতে লাগল। সুখেনের বিরক্ত লাগলেও রামাইয়াকে আর কিছু বলতে পারল না। শুধু প্রমাদ গুণল এই বোধহয় কোনও ট্যুরিস্ট বেরিয়ে এসে ম্যানেজারকে গাল পাড়তে শুরু করবে। গত পরশুই তো যা ক্যাচাল করল মেয়েগুলো! গ্যাঁটের কড়ি খসিয়ে ঘরভাড়া দিয়ে কেই বা সকাল সকাল এমন উৎপাত সহ্য করবে ঘুরতে এসে? রামাইয়ার সুর করে ডাকটা এক সময় রাস্তা পেরিয়ে পাশের জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সুখেন।

যত সময় পেরোচ্ছে ততই রামাইয়ার মুখের ওপর দুশ্চিন্তার ভাঁজগুলো আরও গভীর হয়ে পড়ছে। চোখটা এবার ছলছল করে উঠছে। রামাইয়ার পায়ের চাপে ঝরা পাতাগুলো কঁকিয়ে উঠতে থাকে। জঙ্গলের ঝিঁঝিঁগুলো এখন যেন রামাইয়াকে ঘিরে ধরে কোনও আসন্ন সর্বনাশের খোল করতাল বাজিয়ে চলেছে। সহ্য হচ্ছে না তার। বুঝতে পারছে না ঠিক কত দূর যাবে। লাটাগুড়ির এত বড় জঙ্গলের মধ্যে যদি সে কোনওভাবে দুষ্টুমি করতে করতে ঢুকে গিয়ে থাকে তাহলে তো সর্বনাশ। সারা রাত ঘরে ফেরেনি। আশেপাশের যে কটা বাড়ি ছিল সব খুঁজেছে। কিন্তু আলোক কোত্থাও যায়নি। জঙ্গলের বেশি ভিতরে যেতে হল না রামাইয়াকে। এপাশে ওপাশে, গাছ-আগাছার আড়ালে উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও এক জায়গায় আটকে গেল। রামাইয়া খুব সন্তর্পণে দুটো পা এগিয়ে গেল। তারপরেই সারা জঙ্গল কেঁপে উঠল রামাইয়ার ভয়ার্ত আর্তনাদে। আগাছার ওপরেই লুটিয়ে পড়ল সে। শরীর, মস্তিস্ক বা চেতনা তাকে কাঁদবার সুযোগটুকুও দিল না।

-আপনাদের আজকের রান্নাটা কিন্তু মোটেই আগের দুদিনের মতো হল না।

থুতু দিয়ে কড়কড়ে নোটগুলো গুণতে গুণতে থমকে গেল সুখেন। চোখ তুলে রিসেপশনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার দিকে এক পলক চাইল। তারপর মুখটা কাঁচুমাচু করে বলল, 'আসলে ম্যাডাম যে মেয়েটি আমাদের মেন রান্নাটা করে সে আজ আসেনি। সকাল থেকে ফোনটাও তুলছে না।'

-এসব বাজে এক্সকিউজ। আপনাদের এত বড় হোটেল। এত এক্সপেনসিভ ঘর। সেখানে একজন মাত্র কুক? তার তো শরীর খারাপ হতেই পারে। আর কোনও ভালো অপশন রাখবেন

না তা বলে?

তিনদিন আগে চারটে মেয়ের যে দলটা এসেছে তাদের মধ্যে এই মেয়েটা সবচেয়ে বেশি উচ্চুঙ্গা। মুখে যেন খই ফুটছে। বাকিগুলোও যে লক্ষ্মীমন্ত সেটা বলা যায় না। তবে বাচালতায় এর চেয়ে কম। ফস ফস করে আবার সিগারেটও টানে। সুখেন গলা তুলে রান্নাঘরের দিকে মুখ করে বলে উঠল, 'এই বাপন রামাইয়াকে ফোন করেছিলি আর?' রান্নাঘর থেকেই উত্তর এল, 'করেছিলাম। বেজে গেল।'

-দয়াকে কল করে জিজ্ঞেস কর। ওর বউ এল না কেন? এভাবে হলে তো লোক পাল্টাতে হবে। ওদের জন্য আমায় কেন কথা শুনতে হবে?

গলায় বেশ ঝাঁঝ নিয়ে কথাগুলো বলল সুখেন। মেয়েটির কানে কানে তার আরেক বন্ধু ফিসফিস করে বলল, 'ঝিকে মেরে বউকে শেখাল।' ঘাড়ের কাছে ঝুলতে থাকে ঝ্যাঁটার মতো চুলগুলো ঝাঁকিয়ে অভিযোগকারিণী বলে উঠল, 'ছেঁড়া গেছে।'

-এই নিন ম্যাডাম, চারশো টাকা কম নিলাম 1

সুখেন ব্যালেন্সটা মেয়েটির হাতে ধরাতে ধরাতে বলল। মেয়েটি অবাক, 'কেন? ডিসকাউন্ট?' দাঁত ছাড়িয়ে সুখেন সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল, 'আজকের খাবারটা আপনাদের কমপ্লিমেন্টারি। যে খাবার ভালোই লাগেনি সে খাবারের দাম কেন দিতে যাবেন।' খাটো চুলো মেয়েটার অহং-এ আঘাত লাগল কী? মনে তো হয় না। পাশের মেয়েটার ঠোঁটে হালকা হাসি। হঠাৎ লাভ হওয়ায় চোখ দুটোতে বেশ একটা চকচকে ভাব। সুখেন বলল, 'তবে ম্যাডাম, এরপর এলে অবশ্যই আমাদের এখানে উঠবেন। আর কথা দিচ্ছি, তখন আর কোনও অসুবিধে হবে না।'

-শিওর। থ্যাংক ইউ। চলি।

-আসুন ম্যাডাম। আবার আসবেন।

মেয়েগুলো টেবিল থেকে ব্যাগগুলো তুলতে গেল। দূরে আরেকটা টেবিলে বসে এক মনে খেয়ে চলা ছেলেটি জ্যাকেটের হুডিটাকে মাথায় তুলে দিল। আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা বাড়ছে জঙ্গলের রাজত্বে। রিসেপশনে সুখেনের কাছে রান্নাঘর থেকে একটা ছেলে বেরিয়ে এসে জানাল, দয়া লাটাগুড়িতে নেই। রাজাভাতখাওয়া গেছে কী একটা কাজে। মেয়েগুলো হেলতে-দুলতে, নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। গাড়ি ছাড়ার শব্দ হল। সুখেন বলল, 'একবার কাউকে রামাইয়ার বাড়ি পাঠাতো। দ্যাখ গিয়ে ছেলের শোকে আবার মুচ্ছো গেল কিনা! যত জ্বালা আমার।'

ম্যাও... মিউ... ম্যাও... মিউ...

সেই কখন থেকে দরজার সামনে ঘুরঘুর করছে আর ডেকে চলেছে। একটার গায়ের রং ধবধবে সাদা। আরেকটা সাদার ওপর কালো ছোপ। দুটো চোখের চারপাশে কালো গোল ছাপ থাকায় এটাকে দেখতে অনেকটা পাণ্ডা-পাণ্ডা লাগে। তাই রামাইয়ার বর দয়া ভালোবেসে এটার নাম দিয়েছে পাণ্ডা। আর এটার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ধবধবে সাদা বিড়ালটার নাম গণ্ডা৷ তা এই পাণ্ডা আর গণ্ডা মিলে অনেকক্ষণ ধরে তাদের মালকিনকে ডেকে চলেছে। বাড়ির পোষ্য বলে একটু শিক্ষা আছে এদের। খিদে পেলে ডাকে৷ রান্নাঘরে চোরের মতো ঢুকে ভাতটা, মাছটা খেয়ে নেয় না। কিন্তু সেটাই বা কতক্ষণ? মানুষের খিদে পেলেই সে পাগল হয়ে শিক্ষাদীক্ষা ভুলতে বসে৷ আর এরা তো মার্জার প্রজাতি। নাহ, খিদের জ্বালা আর সহ্য করতে না পেরে গণ্ডা আর পাণ্ডা মিলে ঘরের বন্ধ দরজায় ক্যাম্বিস বলের মতো মাথা দিয়ে গুঁতোয়। কে জানে, মালকিন হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। যা যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা যা হল তাতে বিড়াল দুটি একটু ব্যোমকেই গেল। গুঁতো মারতেই বন্ধ দরজাটা শব্দ করে কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে গেল। ও মা! দরজা বন্ধ করেনি। ভেজিয়ে রেখেছে। গণ্ডা একবার পাণ্ডার দিকে চেয়ে পিটপিট করে হাসে। তারপর দুটোয় মিলে দরজা ঠেলে অন্ধকার ঘরটায় ঢুকে পড়ে। উফফ! মালকিনের বলিহারি। ঘরের জানলাগুলো পর্যন্ত ঠেসে বন্ধ করে রেখেছে। নইলে

জানলা গলে দিব্যি ভিতরে ঢোকা যেত। তুলতুলে শরীর দিয়ে পাণ্ডা একটু জোরেই দরজায় ধাক্কা দেয়। কপাট হাট হতেই বাইরের রোদ্দুর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। আবার ম্যাও... মিউ... ডাকে দুজনে। কারও ঘরে ঢোকার আগে একটু নক করে ঢুকতে হয়। তাই এই ম্যাও... মিউ... প্রহসন। গুটিগুটি পায়ে ঢুকে আসে গণ্ডা আর পাণ্ডা। দুজনে ভাবতেই পারেনি ঘরে ঢুকেই এমন মোক্ষম একটা চমক লাগবে তাদের। দৃশ্যটা দেখেই পাণ্ডা-গণ্ডা একেবারে থ। ম্যাও মিউ করে ডাকতেও ভুলে গেল তারা। দেখেছ কাণ্ড! এদ্দিন ধরে এই বাড়িতে চারবেলা গিলছে, ঘুমোচ্ছে, খেলে বেড়াচ্ছে। অথচ তাদের মালকিন যে এমন একখানা দুর্দান্ত জাদু জানে সেটাই জানত না! দড়িতে শুকোতে দেওয়া ভিজে জামাকাপড়ের মতো নিজেকে কেমন শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে দেখো!

২

আজকাল আর তমালকে একদম সহ্য করতে পারছে না অরুণা। প্রতিদিন প্রতি মূহুর্তে অশান্তি, মারপিট করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আজ তমাল রাস্তার জুতো খুলে ছুড়ে মেরেছে অরুণাকে। একদিন এই ছেলেটার গলায় মালা দেবার জন্যেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল সে। সবে তো চার বছর। এর মধ্যেই দাম্পত্যের তিক্ততা চরমে পৌঁছেছে। এখন আর এক ঘরেও থাকে না ওরা। বেডরুমে বেহেড মাতাল হয়ে এলোমেলো হাতপা মেলে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে তমাল। আর পাশের ঘরের সোফায় হাঁটু মুড়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে অরুণা। ডিনারটাও করেনি। এমন সময় মোবাইলটা বেজে ওঠে। খুব বিরক্তি নিয়ে চোখ খুলে ফোনের দিকে তাকায়। এত রাতে আননোন নম্বর! মনের মধ্যে চেনা কু-ডাকটা ছলনার সুরে ডেকে ওঠে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফোনটা ধরে অরুণা। কিন্তু হ্যালো বলার পরেও যথারীতি উল্টোদিকে কারুর কোনও গলা নেই। গত সাতদিন ধরে আননোন নম্বরের ফোন এলেই এইভাবে শুরু হচ্ছে। এরপরে ও ঠিক কী শুনতে চলেছে সেটাও বুঝে ফেলে। অরুণার এমনিতেই মাথা গরম হয়ে আছে। তার মধ্যে এই ছেনালিপনা আর নিতে পারছে না। খেঁকিয়ে উঠল অরুণা, 'কথা না বললেও আমি খুব ভালো করে জানি তুই কে। কেন এই অসভ্যতাগুলো করছিস সুস?' পরক্ষণেই উলটোদিক থেকে একটা বেড়ালের ডাক ভেসে এল, 'ম্যাও।' এটাই হয়ে চলেছে গত সাতদিন ধরে। আরও ক্ষেপে গেল অরুণা, 'জানোয়ারপনা করিস না সুস্মিতা।' এরপরে ফোনের ওপারের বেড়ালটা আরও চড়া গলায় বিচ্ছিরিভাবে কেঁদে উঠল। কিন্তু কারও কোনও গলার আওয়াজ পাওয়া গেল না। ফোনটা কেটে গেল। আজকেও অরুণা রিং ব্যাক করে শুনল এক মহিলা সুরেলা গলায় বলছে, 'দিজ নাম্বার ডাজ নট এগজিস্ট।' এবারও অবাক হল না অরুণা। এটাই হচ্ছে। নাহ! ও যত চুপ করে থাকবে তত এই অসভ্যতামো বাড়তে থাকবে। কন্ট্যাক্ট লিস্ট থেকে খুঁজে বের করল একটা নম্বর।

সবেমাত্র প্রিয়াংশুর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছিল সুস্মিতা। বিছানার পাশেই টেবিল ল্যাম্পের নিয়ন হলুদ আলোয় দুজনের অর্ধ উলঙ্গ শরীরে উষ্ণতার সঞ্চার হচ্ছিল তিরতির করে। ঠিক তখনই গোঁ গোঁ শব্দে মোবাইলটা টেবিল ল্যাম্পের পায়ের কাছে কেঁপে উঠল। এমন একান্ত নির্জন মুহূর্তে চুমুর শব্দ আর শীৎকারের ধ্বনি ছাড়া তৃতীয় কোনও শব্দ বড়ই বিরক্তিকর। তবু প্রিয়াংশুর ঠোঁট থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ফোনটা তুলল সুস্মিতা। 'হ্যালো'। ওপার থেকে সপাটে একটা চাবুক যেন আছড়ে পড়ল সুস্মিতার কানে। 'এমন ন্যাকামো করছিস যেন বুঝতেই পারছিস না কে ফোন করেছে! এবার প্রিয়াংশুর বাহুপাশ থেকে নিজেকে পুরোপুরি ছাড়িয়ে নিল সুস্মিতা। প্রিয়াংশুর বিরক্তই লাগল। সুস্মিতা ভুরু কুঁচকে বলে উঠল, 'প্রথমে সত্যিই বুঝতে পারিনি। তবে গলাটা আর কথা বলার ধরণ শুনে বুঝতে পারলাম। এইরকম মাঝরাতে অসভ্যের মতো তুই ছাড়া আর কে কথা বলবে?"

-অসভ্যতামি তো তুই শুরু করেছিস লাস্ট সাতদিন ধরে।

-মানে?

-রাত হলেই নম্বর পালটে পালটে ফোন করছিস। কথাও বলছিস না। উলটে বেড়ালের ডাক শুনিয়ে রেখে দিচ্ছিস। ভেবেছিস এইভাবে আমাকে ব্ল্যাকমেল করবি।

-এই এই ওয়েট ওয়েট।

অরুণার কথা শুনে যতটা আশ্চর্য হল ঠিক ততটাই গলা চড়াল সুস্মিতা। 'তুই কি এক্কেবারে উন্মাদ হয়ে গেলি? ক পেগ ঢেলেছিস পেটে?'

-ফালতু কথা বলবি না সুস।

-ফালতু আমি বলছি না তুই? মাঝরাতে ফোন করে কীসব আনশান বকছিস? এতকাল তো কোনও কন্ট্যাক্ট রাখিসনি। আজ হঠাৎ চুলকুনি জাগল কেন তোর?

পাশ থেকে প্রিয়াংশু ইশারায় জানতে চায় কে ফোন করেছে এত রাতে? উত্তর পায় না। অরুণা দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, "তুই চুলকোবি আর আমার চুলকুনি জাগলেই দোষ?'

-কী চুলকেছি তোকে?

-দিয়া আমায় সব বলেছে। তুই একটা বেড়াল পুষেছিস, তাই না?

-তো?

-প্রতিরাতে অন্য নম্বর থেকে ফোন করে কেন বেড়ালের ডাক শোনাস আমায় সেকি আমি জানি না ভেবেছিস? ভুলে যাস না সুস, চিৎ হয়ে শুয়ে ওপর দিকে থুতু ছুড়লে সেটা নিজের গায়ে এসেই পড়ে।

-অরুণা, তোকে একটা সাজেশন দিই? তুই প্লিজ একজন ভালো সাইকোলজিস্টকে দেখা। ইমিডিয়েটলি। কারণ তোর এখন যা মেন্টাল স্টেট তাতে এরকম পাগল-পাগল লাগাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে....

- কী... কী মেন্টাল স্টেট আমার?

সুস্মিতাকে থামিয়ে দিয়েই অরুণা আবার তড়পে উঠল। সুস্মিতা ক্ষেপল না। ওদিকে অরুণার নাম শুনে প্রিয়াংশু আরও সজাগ হয়ে কান বাড়াল। শান্ত হয়ে সুস্মিতা বলল, 'তর্পণার কথা জেনে ফেলেছিস তো? কে বলল, তোর বরই না অন্য কেউ?''

-মানে?

-তর্পণাকে এখনও চিনিস না তুই?

এবার অরুণার গলা গুমগুম করে বাজল, 'তুই... তুই কী করে...?'

-আমার বুটিকে আসে। অনেকদিন ধরে। একদিন তর্পণা তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে এসেছিল। সেদিনই বহুদিন বাদে দেখলাম তমালকে। বেচারা এমন ঘাবড়ে গেছে কী বলব। ভাবতেই পারেনি তর্পণার চেনা সুস্মিতা আর তমালের পরিচিত সুস একই ব্যক্তি। প্রথমে বেশ খুশিই হয়েছিলাম জানিস। কপালের কী খেলা ভাব একবার। আমার না ভীষণ ইচ্ছে করছিল একবার তোকে ফোন করে জিজ্ঞেস করি, কী রে অরুণা, কেমন আছিস? তারপরে ভাবলাম, থাক, আমি তো ভালো আছি। বেকার তোর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে কেন দেব! আমি তো জানি এই মুহূর্তে তুই কেমন থাকতে পারিস। বরের পরকীয়া কোন স্ত্রী আর মেনে নিতে পারে বল?

এই সময় সুস্মিতার পায়ের কাছে সাদা ধবধবে নাদুসনুদুস বেড়ালটা এসে একবার মিউ করে ডেকে ওঠে। এক হাতে তাকে কোলে তুলে নেয় সুস্মিতা। অন্য হাতে মোবাইল ধরা। পাশ থেকে এক রাশ বিরক্তি উগরে দিয়ে প্রিয়াংশু ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে, 'রাখ না ফোনটা।' সুস্মিতা এবার কড়া গলায় বলে, 'তুই এখন সুস্থ নেই। ফোনটা রেখে ঘুমো। বিছানায় আমার জন্য প্রিয়াংশু ওয়েট করছে রে। আর শোন, আমি না সব ভুলে গেছি। সব মানে সব। গুড নাইট।' আর কোনও প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করে ফোনটা কেটে সুইচড অফ করে দেয়। তারপর কোলে চড়ে থাকা বেড়ালটার মাথায় হাত বুলিয়ে একটা চুমু খায় সুস্মিতা। মাটিতে নামিয়ে দিতেই বেড়ালটাও গুটিগুটি পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

অরুণা সোফায় বসেই জ্বলতে থাকে। কাঁদতে থাকে। সুস্মিতা যদি নাই হবে তাহলে কে প্রতি রাতে ফোন করে ওকে? কেন বেড়ালের ডাক শোনায় অরুণাকে? কী বলতে চায়? নাকি কিছু ইঙ্গিত করছে? ফোন নম্বরটাই বা মুহূর্তের মধ্যে অস্তিত্বহীন হয়ে যায় কীভাবে? একজন লোকই করছে নাকি আরও কেউ আছে তার পিছনে? সুস্মিতা তো জাস্ট ইগনোর করে গেল। আচ্ছা, তমালের এক্সট্রা ম্যারেটালের পিছনে সুস্মিতার প্রতিশোধ নেই তো? পুরনো রাগটা সুস্মিতা ভুলতে পারছে না। আজ তাই ইচ্ছে করেই ওর জন্য প্রিয়াংশুর বিছানায় ওয়েট করার কথা শোনাল। সত্যি পাগল-পাগল লাগছে অরুণার। ফোনটা ছুড়ে ফেলে দিল। সোফার ওপরেই দুবার ড্রপ খেয়ে ফোনটা মাটিতে পড়তে গিয়েও পড়ল না। একেবারে কোণার কাছে মোবাইলটার অর্ধেক শরীর ঝুলে রইল।

৩

শ্রাবণ মাসের আকাশটা ভীষণ ছিঁচকাদুনে। ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা একভাবে হয়ে চলেছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এমনভাবে গর্জাল যেন বিকেল থেকে কোলকাতাকে খুঁজতে হলে ডুবুরি নামাতে হবে। কোথায় কী? এ যেন আরও জ্বালা। চারপাশে কেমন একটা প্যাচপ্যাচে ভাব। বেরোতে হলে ছাতা বা রেনকোট নিয়েই বেরোতে হবে। বর্ষার আকাশটাকে একদম বিশ্বাস করা যায় না। উত্তর কোলকাতার সুরি-লেন বেশ বনেদি জায়গা। বেনারসের মতো সরু গলিগুলো সাপের মতো এঁকেবেঁকে এলাকাটাকে ঘিরে রেখেছে। কত পুরনো বাড়ির বারান্দাগুলো হাড়গোড় বের করে একশো বছরের বৃদ্ধের মতো ঝুলে রয়েছে। এখানে পঞ্চাশ বছরের মুদিখানার পাশাপাশি হাল আমলের দোকানও হয়েছে কয়েকটা। দক্ষিণ কোলকাতার মতো উত্তরেও ইতিউতি গজিয়ে উঠেছে শনি মন্দির। সুরি-লেনের গলির মুখে এমন একখানা মন্দিরেই পুজো করেন পঞ্চান্ন পেরোতে চলা লোকটা। গালভর্তি দাড়ি, চোখের তলায় কালি, নাকের নীচের কাঁচা-পাকা গোঁফটা ওপরের ঠোঁট পর্যন্ত নেমে এসেছে। পাতলা চেহারা। লম্বা, তবে অনটন আর জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝার কারণে পিঠের মেরুদণ্ডটা কাঁধের কাছাকাছি আসতেই একটু বেঁকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বোধহয়। মাথার চুলেও বেশ পাক ধরেছে। এসবের কারণেই বয়সে বড়রাও ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে বেশ সমীহ করে আপনি-আজ্ঞে সম্বোধনে কথা বলে। স্বভাবে ধীরস্থির। কিন্তু দায়িত্বে অটল। ঝড়-জল-বৃষ্টি কোনও কিছুই পুরোহিতমশাইকে আটকাতে পারে না। আশেপাশের লোকজন এনাকে মিশ্রঠাকুর বলেই জানেন। ডাকেও এই নামে। কারণ লোকটার পদবি মিশ্র। কিন্তু নামটা যে কী তা এই তল্লাটে কেউ জানেন না। বলা ভালো খোঁজ রাখার প্রয়োজন হয়নি কখনও।

আজও মিশ্রঠাকুরের হাতে গ্রহরাজ আর দক্ষিণাকালীর আরতি-প্রদীপ ঘুরে চলেছে। সামনের রাস্তাটা বেশ খালি। একটানা বৃষ্টির জন্য লোকজন বিশেষ বেরোয়নি। কেবল সকালে যাঁরা অফিসে গিয়েছিলেন তাঁরা ফিরছেন একে একে। চেনার উপায় নেই কাউকেই। কারও মাথা ছাতায় ঢাকা বলে স্ট্রিট লাইটের আলো পড়েনি মুখে আবার কেউ বা আপাদমস্তক বর্ষাতি ঢেকে ভেজা রাস্তায় সাবধানে পা ফেলে এগোচ্ছেন।

গলির মুখের উল্টোদিকের ফুটে স্ট্রিট লাইটের আলোটা পেরিয়ে খানিকটা অন্ধকারে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। সাদা রঙের ক্যাব। মিশ্রঠাকুর হাতে ধরা পিতলের ঘণ্টিটা আরতির শেষে কাঁসার থালার ওপর রাখলেন। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। অন্যান্য শনিবারগুলো এই সময় মন্দিরের দোরে বেশ কয়েজনের পেন্নাম জমা পড়ে। কিন্তু আজ একজন মহিলাই এসেছিলেন। মিশ্রঠাকুর কুশি করে চরণামৃত মহিলার হাতে দিতেই সামনে চোখ আটকে যায়। ছাতা মাথায় এক মহিলা এগিয়ে আসছে। নীল রঙের স্লিভলেস টপ আর হাল্কা রঙের জিন্স। প্রথমে বুঝতে না পারলেও কাছে আসতেই চশমার পুরু কাচের মধ্যে দিয়ে মেয়েটিকে চিনতে পারেন মিশ্রঠাকুর। হালকা হেসে কুশি করে একটু চরণামৃত এগিয়ে দেন তার দিকে। ছাতা মাথায় ধরা অবস্থাতেই মেয়েটা বলে ওঠে, 'না ঠাকুরমশাই। ওসবের আর কোনও প্রয়োজন নেই আমার।' ঠাকুরমশাইয়ের মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল। পাশের মহিলাটি চলে যেতে গিয়েও থমকে গেলেন। এ আবার কেমনধারা কথা! ঠাকুরের চরণামৃত প্রত্যাখ্যান করছে! যত সব বড়লোকের দেমাকি বউ! মুখ বেঁকিয়ে নিজের রাস্তায় এগিয়ে গেলেন মহিলাটি।

-ঠাকুরের চরণামৃত ফেরাতে নেই মা।

-কী হবে ঠাকুর মেনে? আমার কোন প্রবলেমটা সলভ করেছেন তিনি? যেমন আপনার ঠাকুর, তেমনি আপনি। আস্ত ঢপবাজ।

কথাটা শুনেই মিশ্র ঠাকুরের গা-টা চিড়বিড় করে উঠল। এমন করে সরাসরি অপমান আজ অব্দি কেউ করেনি মিশ্রঠাকুরকে। 'এসব কী বলছ অরুণা? কী হয়েছে?' অবাক হয়ে বললেন মিশ্রঠাকুর। বেশ অনেকদিনের আলাপ অরুণার সঙ্গে। প্রতি শনিবার এই মন্দিরে এসে প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে যায়। দেবদ্বিজে বেশ ভক্তি আছে বলেই জানতেন মিশ্রঠাকুর।

কিন্তু অরুণার আজকের কথাগুলো এক নিমেষে সেই বিশ্বাস ভেঙে দিল। বৃষ্টিটা বাড়ল একটু। রাস্তার দিক থেকেই কারও একটা গলা শোনা গেল। বেশ রাগত স্বরেই কোনও অজ্ঞাত পরিচয়ের নাম জিজ্ঞেস করছেন 'এই কে রে? কে?'। বর্ষার অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে নির্ঘাত কোনও চ্যাংড়া ছোড়া রকে বসে আড্ডা মারতে মারতে কারও পিছনে লেগেছে। উত্তর কোলকাতায় এ দৃশ্য হামেশাই নজরে পড়ে। অরুণা দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, 'আপনিই তো বলেছিলেন মিশ্রঠাকুর আমার সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। কদিন অপেক্ষা কর। গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান ঠিক নেই। সাত তারিখের পর তুমি শান্তি পাবে। আর যে শয়তানি করছে সে জব্দ হবে। আজ তেইশ তারিখ আমার জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এত বড় সাহস, আমাকে খুন করার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে। শয়তান দুশ্চরিত্র একটা। বাড়িতে বউ রেখে বাইরে অন্য মেয়ের সঙ্গে...।' একটানা বলতে বলতে একটু থামল অরুণা। তারপর কেঁপে ওঠা গলাটা ঝেড়ে আবার বলল, 'যে শয়তানি করছে, সে করেই চলেছে। আর যার কোনও দোষ নেই সেই আমাকে আজ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। আমি তো শূন্যই থেকে গেলাম ঠাকুরমশাই। আপনার কথা তো কিচ্ছু ফলল না। এই আপনি লোকের ভাগ্য বলতে পারেন? আপনি একটা ভণ্ড।'

অরুণার মাথার ঠিক নেই। রাগে থরথর করে কাঁপছে। এত অপমানের পরেও মধ্য বয়স পেরিয়ে চলা পুরোহিত নিজেকে শান্ত রাখেন। স্থির রেখে বলেন, 'আমি কোনও দিন কাউকে বলিনি মা যে আমি লোকের ভাগ্য বলতে পারি। তোমাদের মতোই কিছু মানুষ এই কথা ছড়িয়েছে। হয়তো কোনওদিন কাউকে কিছু বলেছিলাম। সেটা ফলে গিয়েছিল। তারপর যাকে যা বলেছি সেগুলোও হয়েছে। তাই লোকে বলে মিশ্রঠাকুর ভাগ্য বলতে পারে।' সলজ্জ ভঙ্গিতে দুপাশে ঘাড় নাড়েন। তারপর বলেন, 'আমি কেউ না অরুণা। সবই আমার গ্রহরাজ। সেই কাল। সেই সব পাপপুণ্যের হিসেব কষে কড়ায়গণ্ডায় শোধ দেন। তোমার সুবিচার পাওয়ার সময় সত্যিই হয়েছে মা। কিন্তু তুমি তো অপেক্ষাই করলে না। আমি বলেছি সাত তারিখের পর। কিন্তু কোনদিন সেটা তো নির্দিষ্ট করে কিছু বলিনি।'

-হ্যাঁ জানি৷ সেফ সাইডে খেলেছেন। আপনি আপনার বুজরুকি নিয়ে থাকুন। আমি চললাম। আর দয়া করে আমার মত আর কোনও মেয়েকে মিথ্যে আশ্বাস দেবেন না। চলি।

আর একটাও কথা না বলে উল্টোমুখো হয়ে রাস্তা পেরিয়ে সেই সাদা ক্যাবে উঠে গেল অরুণা। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবটা স্টার্ট দিল। হুশ করে রাস্তার জমা জলে ঝড় তুলে ছুটে গেল গাড়িটা। বিষন্ন মুখে মিশ্রঠাকুর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে করুণ চোখে শনি দেবতার মূর্তির দিকে তাকালেন।

সুরি-লেনের বেশ খানিকটা ভিতরে বহু পুরনো একটা বাড়ি। মোটা দেয়াল থেকে নখ-দাঁত বার করে গলি-রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে আদ্যিকালের বাড়িটা। শ্যাওলা রঙের মোটা কাঠের দরজা। পুজো সেরে ঝমঝমে বৃষ্টি ঠেলে প্রায় দেড়ঘণ্টা পর বাড়ি ফিরলেন মিশ্রঠাকুর। পুজোর শেষে পাড়ার কয়েকজনের বয়স্ক মানুষের সঙ্গে আড্ডা মেরে ঠাকুরমশাই বাড়ি ফেরেন। কিন্তু বেয়াড়া বৃষ্টিটা আজ সব ভেস্তে দিল। পুজো শেষে এমন জোরে বৃষ্টি এল যে মন্দির থেকে বেরোতেই পারলেন না। একটু ধরতে কালো বড় ছাতাটা মাথার ওপর মেলে ধরে ধীর পায়ে বাড়ি ফিরলেন। পকেট থেকে একটা মোটাসোটা চাবি বের করে দরজার কাছে দাঁড়াতেই একটু যেন থমকে গেলেন। ভুরুটা কুঁচকে গেল। তালা খোলা। কী যেন ভাবলেন। চশমার পুরু কাচের মধ্যে দিয়ে কালো ভ্রমরের মতো চোখদুটো দুবার পিটপিট করল। তারপর ভারী দরজাটা এক হাতে ঠেলে খুলে ফেললেন। ভিতরের মুমূর্ষু অন্ধকারটা যেন বাইরের আলো পড়তেই নড়ে উঠল। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে ভালো করে খিল তুলে দিলেন। মিশকালো প্যাসেজটা অবলীলায় পেরিয়ে ঘরের দিকে উঠে এলেন। পুরোনো খিলানগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলেন একটা ঘর থেকে হলুদ আলোর ছিটে ছেঁড়া রোদের মতো এসে পড়েছে। সেই আলোতেই অনবরত পায়চারি করা একটা মানুষের ছায়া পড়ছে। হঠাৎ যেন কীসের তাড়া পড়ল ঠাকুরমশাইয়ের। দ্রুত পায়ে ওই আবছা অন্ধকার

হাতড়ে পৌঁছে গেলেন ঘরের সামনে। দেখলেন পায়চারি করতে থাকা ছায়াটা স্থির হয়ে গেল।

-কাজের প্রথম দিন কেমন হল?

মিশ্রঠাকুর প্রশ্ন করলেন। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকা গলদঘর্ম লোকটা উত্তর দিল, 'ভালো।'

'বাজার করেছ?' আবার প্রশ্ন করলেন ঠাকুরমশাই। লোকটি জবাব দিল, ‘রান্নাঘরে।’ ঠাকুরমশাই কাঁধের ওপর থেকে নামাবলিটা তক্তপোশের ওপর রাখলেন। কাঁধের ঝোলাটা দেয়ালের হুকে ঝুলিয়ে দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে মিশ্রঠাকুর বললেন, 'আমি রান্না চাপাচ্ছি।'

-আমি একটু ড্রাম প্র্যাকটিস করব।

-ওই করো। বুড়ো হাড়ে আমি খেটে মরি আর তুমি মাঝ রাত্তিরে ড্রাম পেটাও। যদি আশেপাশের বাড়ি থেকে আপত্তি জানায়?

-বড় ভুলভাল জিনিস ভাবো মামা। পুরোনো বাড়ি। এই মোটা দেয়াল। কারও কানে গেলে তো জানাবে। পাশের দুটো বাড়ি তো ভূতের বাড়ি হয়ে বন্ধ পড়ে আছে। উল্টোদিকের বাড়ির লোকও শুনতে পাবে না। বর্ষায় দরজা-জানলা সব বন্ধ।

মিশ্রঠাকুর হাত উল্টোলেন। হাসিতে ভাগ্নেটির ঠোঁট চওড়া হল।

৪

মাংসের খিচুড়িটা জব্বর পরিপাক হয়েছে। গন্ধেই পেটের ভেতরের চনমনানি দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ বেড়ে গেছে। ভোর রাত কি তারও কিছু আগে থেকে বৃষ্টিটা জমিয়ে এসেছে। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্বয়ম্ভুর মনে হয়েছে আজ সে নিজে হাতে মাংসের খিচুড়ি রাঁধবে। হাঁড়ির ওপর মুখটাকে ঝুঁকিয়ে চোখ বুজে আরাম করে একবার নাক টানল। তারপরেই পরম তৃপ্তি নিয়ে ‘আআআআআহ' বলে জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিল।

কলিং বেল বাজল। দরজা খুলতেই আদ্যন্ত ভিজে সপসপে রেনকোট গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিবাঙ্গী। স্বয়ম্ভু অবাক হয়ে বলল, ‘এ কী! তুমি?’’

-সরুন সরুন। আগে ঢুকতে দিন।

স্বয়ম্ভু সরে আসতেই শিবাঙ্গী তরতরিয়ে ঢুকে এল। দরজার একপাশে জুতো খুলল। তারপর রেনকোট খুলতেই খেয়াল করল স্বয়ম্ভু কেমন যেন ভ্যাবলার মতো চেয়ে আছে তার দিকে। ‘কী দেখছেন স্যার?' বৃষ্টির ঝাপটায় মুখের দুপাশের কয়েকটা চুল গালে কপালে লেপ্টে আছে। গায়ে নীলের ওপর সাদা দিয়ে কাজ করা প্রিন্টেড টপ। নীচে কালো রঙের পালাজো। শিবাঙ্গীর প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল স্বয়ম্ভু। বলল, 'তুমি হঠাৎ?'

-বা রে! জেঠিমাই তো নেমন্তন্ন করলেন।

-মা?

আকাশ থেকে পড়ল স্বয়ম্ভু।

-হ্যাঁ আমি।

দুজনের কথার মাঝে ঢুকে পড়লেন সুচিত্রা। বিধবা মানুষ। আটপৌরে সবুজ রঙের নকশা করা ঘিয়ে রঙের শাড়ি। মাথার কাচা চুলের মাঝে যেখানে সেখানে উঁকি দিয়েছে পক্ককেশের সারি। ‘তুই সকালে যখন মাংস আনতে গেলি তখনই শিবাঙ্গীকে বললাম, আজ তোমার স্যার মাংসের খিচুড়ি রাঁধবে। খাবে যদি চলে এসো।' স্বয়ম্ভু হাত উলটে শিবাঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘বাহ! আর তুমিও অমনি ড্যাং ড্যাং করতে করতে খেতে চলে এলে?' স্বয়ম্ভুর মুখে এমন চাঁচাছোলা কথা শুনতে শুনতে অভ্যেস হয়ে গেছে শিবাঙ্গীর। অন্য কেউ হলে পত্রপাঠ উল্টোমুখো হয়ে বিদেয় হত। কিন্তু শিবাঙ্গী এর ঠিক উল্টোটাই করল। রুমাল দিয়ে মুখের ওপর জমে থাকা বৃষ্টির জল মুছতে মুছতে বলল, 'কী করব স্যার? এমন আদর করে নেমন্তন্ন করলে কী আর সেটা ফেলা যায়?’

-গালাগাল দিয়ে ডাকলেও তুমি আসতে শিবাঙ্গী।

বলেই ঘরের দিকে হাঁটা দিল স্বয়ম্ভু। সুচিত্রা ভুরু দুটো এক জায়গায় জড়ো করে বলল, 'জীবনে অনেক গোয়েন্দা দেখেছি ভোলা, তোর মত এমন অসভ্যতামি কাউকে করতে দেখিনি। অতিথিকে কেউ এইভাবে আপ্যায়ন করে?' মায়ের ভোলা অমনি বিদ্যুতের ফলার মতো ঘুরে তাকাল। কড়কড় করে বলে উঠল, 'আর কতবার বলব তোমায়, যেখানে সেখানে আমায় ভোলা বলে ডাকবে না?'

-নয় তো কী স্বয়ম্ভু সেন বলে ডাকব?

-হ্যাঁ তাই ডাকবে। আর শিবাঙ্গী আর অতিথি নেই মা। প্লিজ। এই আদিখ্যেতা করা বন্ধ কর। আর যেন কী বললে? তুমি অনেক গোয়েন্দা দেখেছ? তারা কারা?' সুচিত্রা দেবীও কম যান না। শিবাঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, ‘কেন? ফেলুদা, ব্যোমকেশ, কিরীটি এরা কী গোয়েন্দা নয়?'

-এদের তুমি চর্মচক্ষে দেখেছ?

-ওই হল। পড়েছি। সিনেমাতেও দেখেছি। সত্যজিৎ রায় তো আর ঢপ দিয়ে গল্প লেখেননি। সিনেমাও বানাননি। বসো তো শিবাঙ্গী।

স্বয়ম্ভু যেতে গিয়েও থমকে বলে উঠল, ‘সেটা তুমি না বললেও ও বসবে। এরপর খানিকটা মুখ ভেংচিয়েই স্বয়ম্ভু শিবাঙ্গীকে বলল, ‘ভালো করে বোসো মা। আমি খাবার বেড়ে আনছি।' বাধ সাধলেন সুচিত্রা দেবী। ‘দাঁড়া, আগেই খিচুড়ি দিবি কী? একটু জল মিষ্টি দিই

আগে।' গলাটা কার্টুনের মতো সরু করে চোখ কপালে তুলল স্বয়ম্ভু, 'আবার জল মিষ্টিও? ভগবান!' চোখ উল্টিয়ে মুখ ঘুরিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। শিবাঙ্গী ফিকফিক হাসছে।

মোবাইলটা বেজে উঠতেই শিবাঙ্গীকে বসতে বলে ঘরে চলে গেলেন সুচিত্রা। বিছানায় রেখে এসেছে বোধহয়। শিবাঙ্গী সোফায় বসেই আরও একটু ভালো করে ভেজা হাত, গলা, মুখ সব মুছল। হঠাৎ ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন সুচিত্রা দেবী। 'ও ভোলাআআআআ, ভোলা রেএএএএ সব্বোনাশ হয়ে গেছে।' আচমকা পরিবেশটা পালটে যেতেই সটান সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শিবাঙ্গী। 'কী হয়েছে জেঠিমা?' হাতে ফোন ধরেই ছেলেকে ডেকে চলেছেন। ভোলাও দৌড়ে এল, 'কী হল আবার?'' সুচিত্রা দেবী কাঁপছেন। স্বয়ম্ভু স্পষ্ট বুঝল। জিজ্ঞেস করল 'কে ফোন করেছিল?'

-সুমিত্রা।

কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন সুচিত্রা। স্বয়ম্ভু বলল, 'মেজ মাসির আবার কী হল?'

-অরুণাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

-উফফ মা! তুমি সামান্য ব্যাপারে এমন কর যে...!

নিজের মাসতুতো বোনের নিরুদ্দেশের খবর পেয়েও স্বয়ম্ভুর এমন নির্লিপ্ততা দেখে টলে গেলেন সুচিত্রা দেবী। 'কী বলছিস ভোলা? তোর ছোট বোন। ওকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

-এটা কোনও নতুন ব্যাপার নয়। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েই তো তমালকে বিয়ে করেছিল, ভুলে গেলে?

শিবাঙ্গী এবার বেশ অস্বস্তিতে পড়ল। যতই হোক, তার সিনিয়রের ফ্যামিলির সিক্রেট এইভাবে তার সামনে বেরিয়ে আসাটা লজ্জাজনক।

-সে যাই হোক। ওর কোনও ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না। ফোনটাও সুইচড অফ। তুই ওকে খুঁজে দে ভোলা। সুমিত্রা হাউহাউ করে কাঁদছে।

সুচিত্রা বাচ্চাদের মতো নাছোড়। 'আশ্চর্য তো! এ কী গেরস্থের গোরু হারিয়ে গেছে নাকি? তুই খুঁজে দে ভোলা! একটা আদ্দামড়া বিবাহিতা মেয়ে স্বেচ্ছায় কোথাও চলে গেছে। কিডন্যাপ তো হয়নি। সেটা হলে তাও খুঁজে দেখার ব্যবস্থা করা যেত।'

-কিডন্যাপ যে হয়নি সেটা কী শিওর হয়ে বলতে পারেন?

শিবাঙ্গীর কথাটা মগজে গিয়ে ঘা দিল স্বয়ম্ভুর। তবু জুনিয়রের কাছে চট করে নরম হওয়া যাবে না। তাই কপট রাগেই বলে উঠল স্বয়ম্ভু, 'তুমি আর সাঁকো নেড়ো না তো।'

- সরি।

চুপসে গেল শিবাঙ্গী। কিন্তু তেড়ে উঠলেন সুচিত্রা দেবী, 'কেন বলবে না ও? শিবাঙ্গী তো ঠিক কথাই বলেছে। কত আশা নিয়ে তোর মাসি ফোন করল। কী লাভ হল তোকে আমার গোয়েন্দা বানিয়ে যদি ঘরের কাজেই না লাগবি? শিবাঙ্গী মা, তুমি অন্য গোয়েন্দা দেখো। আমি পয়সা দেব।' শিবাঙ্গী বেচারি ভড়কে ভ। এমন একটা সিরিয়াস মুহূর্তেও হাসি পাচ্ছে, অথচ হাসতেও পারছে না। এদিকে স্বয়ম্ভু ব্যোমভোলে হয়ে শুধু মায়ের কীর্তি দেখতে থাকল। মা নাকি তাকে গোয়েন্দা বানিয়েছে বাড়ির বেয়াড়া মেয়ে হারিয়ে গেলে যাতে খুঁজে পায়, সেই আশায়! পৃথিবীটা এখনও যে কেন দুভাগ হয়ে গেল না!

মায়ের হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিয়ে কল করল স্বয়ম্ভু। উল্টোদিক থেকে এক মহিলার গলা। শুনেই বোঝা গেল কান্নাকাটি করছে। অত্যন্ত বিষন্ন সর্দি ধরা গলায় মহিলা বললেন, 'হ্যাঁ দিদি বল।'

-আমি ইসে... ইয়ে বলছি।

আড়চোখে শিবাঙ্গীর দিকে চেয়ে নিজের নামটা উচ্চারণ করতে গিয়েও করল না। 'ও ভোলা? বল বাবা। শুনেছিস তো সব। কিছু একটা কর বাবা।' বলেই কাঁদতে শুরু করলেন সুমিত্রা।

-মাসি কান্নাকাটি কোরো না। ঠিক কী কী হয়েছে সব আমায় খুলে বলো। তোমরা কখন জানলে যে অরুণা মিসিং?

-সকাল থেকেই অরুণাকে ফোনে পাচ্ছি না। বাধ্য হয়ে তমালকে ফোন করলাম। দু-তিনবার বেজে গেল। তারপর যখন ধরল বুঝলাম যে তিনি ঘুমোচ্ছিলেন।

জামাইকে খামোকা 'তিনি' বলে সম্বোধন করাটা স্বয়ম্ভুর কানে বাজল। সুমিত্রা বলে চললেন, 'জিজ্ঞেস করলাম অরুণা কোথায়? শুনে তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। বলল মানে? সে তো কাল রাতে আপনাদের কাছেই গেছে। আমি তো অবাক। আমাদের কাছে মেয়ে আসেনি। শুনে সে হাই তুলে বলল তাহলে দেখুন কোনও বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠেছে।'

-অদ্ভুত! তমালের বউ কোথায় গেছে সেটা ও জানে না?

-ওটাই তো কথা। আমিও এটাই বললাম। তার উত্তরে কী বলল জানিস?

-কী?

-বলল, কাল রাতে নাকি চূড়ান্ত ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে অরুণা নিজেই বেরিয়ে গেছে। তমাল ভেবেছে আমাদের কাছে এসেছে।

- পৌঁছল কিনা খোঁজ নেবে না?

-কেন নেবে বল? এখন তো আমার মেয়েটাকে ঘাড় থেকে নামাতে পারলেই বাঁচে।

-সে কী! কেন?

সুমিত্রা এবার একটু থিতিয়ে গেলেন। গলা নামিয়ে বললেন, "ওদের মধ্যে আজকাল ভীষণ অশান্তি চলছিল। অরুণা প্রথমে কিছু বলতে চায়নি আমায়। ফোন করলেই দেখি এড়িয়ে যায়। একদিন আমি জোর করে ওদের বাড়ি গিয়ে মেয়েকে চেপে ধরতেই বলে ফেলল। কোন একটা মেয়েকে জড়িয়ে ওদের মধ্যে অশান্তি চলছে। এই শেষ ছয় মাসে ওদের সম্পর্কটা তলানিতে এসে ঠেকেছে।'

-তমালকে থানায় মিসিং ডায়েরি করতে বলো।

-সে গুড়ে বালি। কথা শুনে তো মনে হল না বউকে খোঁজার কোনও ইচ্ছে আছে বলে। তোর মেসো গেছে।

-মেসোর মিসিং ডায়েরি করে কী হবে? যোধপুর পার্ক থেকে তো আর মিসিং হয়নি। হয়েছে তো শিয়ালদা থেকে। ওখানকার থানায় মিসিং ডায়েরি করতে হবে।

-তমাল তো করছে না। খালি বলছে নিজের ইচ্ছেয় গেছে, নিজের ইচ্ছেয় ফিরবে। তাই তোর মেসোকে পাঠালাম।

-বেশ। চিন্তা কোরো না। আমি দেখছি।

ফোনটা কেটে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে স্বয়ম্ভু। একটু চিন্তিত দেখায় তাকে। -এনিথিং সিরিয়াস স্যার?

প্রশ্নটা শিবাঙ্গী করল।

-মাংসের খিচুড়িটা আমার আর খাওয়া হল না। এখুনি বেরোতে হবে। তুমি এক কাজ কর শিবাঙ্গী, তুমি এখানে থাকো। খিচুড়ি খাও। মায়ের সঙ্গে একটু গল্পটল্প করে ফিরে যেও।

-সরি স্যার, আমি যখন আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট তখন আপনাকে ছায়ার মতো ফলো করা আমার কর্তব্য। মাংসের খিচুড়িটা না হয় অন্যদিন হবে।

-না না শিবাঙ্গী। তোমার আজ ছুটি তো। তুমি বরং...

-আপনারও তো আজ ছুটি। তবে আপনি যদি এই কাজে আমার ভরসা না করেন তাহলে অন্য কথা।

স্বয়ম্ভুর উত্তর আসার আগেই সুচিত্রা বলে উঠলেন, 'ইসস ছি ছি! মেয়েটাকে বড় মুখ করে খেতে ডাকলাম। এক কাজ কর না ভোলা, তোরা খেয়ে তারপর বেরো।'

-সময় নেই মা। তাছাড়া রাতে তো ফিরবই। তখন খাব। সঙ্গে করে শিবাঙ্গীকেও নিয়ে আসব। তুমি খেয়ে ফ্রিজে তুলে রেখো।

শিবাঙ্গীও সুচিত্রাকে দুঃখ করতে বারণ করল। সুচিত্রা বললেন, 'কী হল না হল জানাস আমায় তোরা। আমি কিন্তু টেনশনে থাকব।'

৫

শিয়ালদায় তমালের বাড়ির সামনে আসতেই স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী বুঝে যায় পুলিশ এসে গেছে। পুলিশের গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে সাদা রঙের গেট খুলে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে যায় দুজনে। পুলিশের প্রহরী বাধা দেওয়াতে কার্ড দেখায় স্বয়ম্ভু। স্যালুট ঠুকে ছেড়ে দেয়। বসার ঘরেই সকলে উপস্থিত। সুমিত্রা দেবীর স্বামী উৎকণ্ঠিত মুখে উঠে দাঁড়ায় স্বয়ম্ভুকে দেখে। পুলিশ ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে, ‘আপনি কে?' কার্ড শো করে পরিচয় দেয় স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্ভু সেন। কোলকাতা পুলিশ, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট আর ইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর শিবাঙ্গী বসু।' কর্তব্যের খাতিরে পুলিশ অফিসার স্যালুট ঠুকলেন বটে সঙ্গে তার বিস্ময়টিও প্রকাশ করলেন, 'মিসিং ডায়েরিতে ডিটেকটিভ!'

-আসলে আমি এখনও অফিসিয়ালি আসিনি। যে মিসিং হয়েছে সে আমার মাসতুতো বোন।

উত্তরটা দিয়েই স্বয়ম্ভু পালটা প্রশ্ন করল, ‘আপনি কোন থানা?’

-লেক পুলিশ স্টেশন। আসলে মিস্টার দত্ত আমাদের কাছেই ডায়েরি করেন এবং এনাদের সম্পর্কের ব্যাপারেও সবটা বলেন। এফ আই আর করেননি। তবে ভীষণভাবে রিকোয়েস্ট করেন আমরা যেন এখুনি ওনার জামাই মিস্টার তমাল ব্যানার্জিকে জেরা করি। সব শুনে আমাদেরও সেরকমই মনে হয়। তাই ওনাকে নিয়েই চলে আসি।

তমালের মুখের অজস্র বিরক্তির বলিরেখা। পাখার নীচে বসেও ঘামছে। এর মধ্যে স্বয়ম্ভুর মেসো হঠাৎ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, ‘আমি বলছি ভোলা, তুই দেখে নিস.....

-মেসো মেসো মেসো। আমি দেখছি। তুমি চুপ করে বোসো।

মেসোকে কেন যে থামিয়ে দিল স্বয়ম্ভু সেন সে এখানে আর কেউ বুঝুক না বুঝুক শিবাঙ্গী ভালোই বুঝল। মেসো আবার গলা তুললেন, 'তমালই আমার মেয়েকে সরিয়ে দিয়েছে, আমি নিশ্চিত।'

-হ্যাঁ আমার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। আপনার মেয়েকে নিয়ে থাকলেই আমার দিন কাটবে।

পুলিশের সামনেই শ্বশুরকে খেঁকিয়ে উঠল তমাল।

-ঠিকই বলেছ তমাল...

স্বয়ম্ভু বলতে শুরু করল, 'শুধুমাত্র বউকে নিয়ে কী আর দিন কাটানো যায়?' ইঙ্গিতটা সরাসরি তমালের মস্তিষ্কে ঘা দিল। ‘মানে? কী বলতে চাইছ?” -ওই তুমি যা বললে। আমিও তাইই বললাম। যাক গে, মিস্টার পাড়িয়া অরুণার ছবি এখুনি সবকটা থানায় পাঠিয়ে দিন। যেখান থেকে পারেন খুঁজে বের করুন।

পরিচয় ছিল না। অথচ একবারে নাম ধরে ডেকে ওঠায় প্রথমটা একটু ব্যোমকেই গেলেন পুলিশ অফিসার। তারপরেই খেয়াল হল ইউনিফর্মের সঙ্গেই সাঁটানো আছে তার নামখানি। অবাক হওয়ার ঘোর কাটিয়ে উত্তর দিলেন দিব্যেন্দু পাড়িয়া, 'অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

-ভেরি গুড।

বলতে বলতে চেয়ারে বসে পড়ল স্বয়ম্ভু। দেখাদেখি সবাই যে যার জায়গা নিল। ‘আচ্ছা তমাল, ব্যাপারটা এবার খুলে বল তো।'

-কী বলব?

সপাটে এমন উত্তরের পরেই ভুরু তুলে স্বয়ম্ভু বলল, ‘সে কী! তোমার বউকে পাওয়া যাচ্ছে না, মানে বিয়ে করা বউকে। আর তোমার কিচ্ছু বলার নেই?'

এবারও গোয়েন্দা শ্যালকের খোঁচাটা বুঝতে পেরেও হজম করে নিল তমাল।

আমার যা বলার সবটাই বলেছি। এদের কাছ থেকে শুনে নাও।'

-আমি তোমার মুখ থেকে আবার শুনতে চাই। বেশি ভ্যানতাড়া না মেরে বলে ফেলো।

-ও নিজের ইচ্ছেয় এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

-কেন?

-ওর পোষাচ্ছিল না আমার সাথে।

-কেন?

-ও আমার সঙ্গে সুখী হতে পারছিল না।

স্বয়ম্ভু এবার মুখটা বড় হাঁ করে খুলে বলল, 'ক্যাআআআনোওও?'

-আমার সব কিছুই ওর অসহ্য লাগছিল। আমি যাই বলি তাতেই ওর আপত্তি। ও যা বলবে সেটাই আমায় শুনতে হবে। পায়ে পা দিয়ে অশান্তি করত।

-অরুণা তো তোমায় ভালোবেসে বিয়ে করছিল। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে। এতটাই গভীর প্রেম ছিল তোমাদের। যতদূর জানি তুমিই ওকে বলেছিলে এক বস্ত্রে বেরিয়ে আসতে। তাই তো?

-হুম।

-তাহলে হঠাৎ কী এমন ঘটল, কবে ঘটল যে ওর তোমাকে অসহ্য লাগতে শুরু করল? নাকি তোমার ওকে অসহ্য লাগতে শুরু করেছিল?

-ব্যাপারটা দু-তরফেই। আমার আর বাড়ি ফিরতেই ভালো লাগত না। যদিও বা ফিরি ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই অরুণার প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কোথায় ছিলে? কেন ছিলে? কার সঙ্গে ছিলে?

-কার সঙ্গে ছিলে?

তমালের মুখ থেকে কথাটা খাবলে তুলেই যেন ওরই দিকে ছুড়ে দিল স্বয়ম্ভু। বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল তমাল। 'কা...কার সাথে থাকব?''

-সেটা তো তুমি বলবে।

মেসো তড়পে উঠল, 'মেয়েটার নাম বল নিজে মুখে।'

-কীসের মেয়ে। যতসব ফালতু কথা।

-দেখো তমাল, তুমি যদি নিজের মুখে কিছু স্বীকার না কর ইটস ফাইন। আমাদের আরও হাজার তরিখা আছে পেট থেকে কথা বের করার। মেসো, তুমি এক কাজ কর। তুমি অফিসিয়ালি এফ আই আর লঞ্চ কর। যাতে পুলিশ ওকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর আমি দেখছি। এমনিও সম্পর্কে তমাল আমাদের জামাই। তাই জামাই আদরে এক বিন্দু ত্রুটি রাখব না।

তমাল ক্ষেপে গেল। 'যা খুশি করে নাও তোমরা। আমার যা বলার বলে দিয়েছি। যে নিজে থেকে চলে যায় তার কোনও দায় আমার নয়।'

-সেটা তো প্রমাণ সাপেক্ষ তমাল। অরুণা নিজে থেকে গেছে নাকি তুমি তাকে বাধ্য করেছ বেরিয়ে যেতে! নাকি নিজে হাতে তাকে....

কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেল স্বয়ম্ভু। মেসো কেমন যেন অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

-তমালের মোবাইলটা নিয়েছেন তো পাড়িয়াবাবু?

জিজ্ঞেস করল স্বয়ম্ভু।

-আজ্ঞে না স্যার।

-মানে... মোবাইল কী হবে?

পুলিশ আর স্বয়ম্ভুর কথার মাঝে বলে উঠল তমাল। স্বয়ম্ভু পাড়িয়াকে বলল, 'আগে ওটা নিন। সব কল লিস্ট চেক করুন।'

ঠিক এই সময় দিব্যেন্দু পাড়িয়ার মোবাইল বেজে ওঠে। 'হ্যাঁ কিরণময় বলো।' এরপর কয়েক পলকের বিরতি। দিব্যেন্দু চমকে উঠলেন, 'হোয়াট?... কোথায়?... আচ্ছা। আসছি আমরা।' ফোন কাটার সময়টুকুও দিলেন না স্বয়ম্ভুর মেসো। প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন করলেন, 'কী কিছু জানা গেল স্যার? অরুণার কোনও খবর এল? পাওয়া গেছে ওকে?' পাড়িয়ার মুখ থমথম করছে। কী বলবেন বা আদৌ এখানে বলা ঠিক হবে কিনা এসবই ভাবছেন বোধহয়। তমাল কপালের ঘামটা মুছে নিয়ে ঢোঁক গিলল। স্বয়ম্ভু জিজ্ঞেস করল, 'কী

হল মিস্টার পাড়িয়া? কার ফোন?

-স্যার একটু বাইরে আসবেন?

-শিওর।

স্বয়ম্ভু জায়গা ছেড়ে উঠতেই মেসো বলে উঠলেন, 'আমি... আমি শুনব। আমার মেয়ের কোনও খবর? লুকোবেন না প্লিজ।'

-মেসো তুমি বোসো। আমরা কথা বলেই জানাচ্ছি।

-না না না। ভোলা কিছু লুকোসনি তোরা। এই টেনশন আমি কিন্তু নিতে পারছি না।

মেসোর পীড়াপিড়িতেই স্বয়ম্ভু বলল যা বলার এখানেই বলতে। পাড়িয়া গলা ঝেড়ে বললেন, 'পার্ক সার্কাসের রেললাইনের ধারে এক মহিলার বড়ি পাওয়া গেছে। মুখটা অরুণা দেবীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।' নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেল সকলে। টলে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন অরুণার বাবা পুলকেশ দত্ত। স্বয়ম্ভু ধরতে গেল মেসোকে। তমাল নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে। শিবাঙ্গী নিশ্চুপ। পাড়িয়া বললেন, 'ছবির সঙ্গে মিললেও বডি আইডেনটিফাই করতে হবে স্যার।' আকস্মিক আঘাতে কিছুক্ষণের জন্য স্বয়ম্ভুও হারিয়ে গিয়েছিল কোথাও। অফিসারের কথায় শুধু একবার 'উঁ? হুঁ!' বলে চুপ করে গেল।

পুলিশ পৌঁছোবার আগেই মিডিয়া খবর পেয়ে গেছে যে রেললাইনের ধারে একটা লাশ পাওয়া গেছে। মৌমাছির ঝাঁকের মতো ঘটনাস্থলের চারপাশে ভনভন করছে তারা। হন্তদন্ত হয়ে গাড়ি থেকে নামল স্বয়ম্ভু সেন শিবাঙ্গী বসু, দিব্যেন্দু পাড়িয়া, সঙ্গে অরুণার বাবা। স্পটে ঢোকার আগে মেসোকে বাধা দিয়ে স্বয়ম্ভু বলল, 'তুমি গাড়িতেই থাকো মেসো। আমি আইডেনটিফাই করছি।' পুলকেশ রাজি হননি। শান্ত গলায় বলেছিলেন, 'আমি সব সহ্য করত পারব। আমায় নিয়ে ভাবিস না।' অনেক কষ্ট করে চোখের জল ধরে রেখেছেন। কান্নাটাও গলার কাছে এসে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে। কিন্তু পুলকেশ বেরোতে দিচ্ছেন না। স্পটে আসতেই মাঝারি উচ্চতার মাঝ বয়স পেরনো লোকটাকে দেখে হাত মেলালো স্বয়ম্ভু। গাড়িতে আসতে আসতে ও নিজেই ফোন করে ডেকেছে। লোকটার নাকের নীচে মোটা গোঁফ, থুতনির ডানদিকে কালো রঙের বড় তিল। তামাটে গায়ের রং। মাথায় ঠাস কাঁচাপাকা চুল। অবশ্য সাদা রংটা এখন বার্গেন্ডির আনুকূল্যে লালচে বর্ণ ধারণ করেছে। কাঁধ থেকে পায়ের নীচ পর্যন্ত একদম সমান মাপ। গায়ের মাংস কোথাও কোনও খাঁজের সৃষ্টি হতে দেয়নি। বরং সামনের দিকে শরীরের অতিরিক্ত চর্বিগুলো ঝুলে পড়েছে। যত দিন যাচ্ছে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের ডক্টর তুহিনশুভ্র দাশগুপ্তর কোমরের বেল্টটা ছোটো হয়ে যাচ্ছে। তুহিনের সঙ্গে তার দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট রোহিত আর সাত্যকি এসেছে। দুজনেরই বয়স আঠাশ থেকে তিরিশের মধ্যে।

-দেখেছেন আপনি?

স্বয়ম্ভু প্রশ্ন করল। ডক্টর তুহিন জবাব দিলেন, 'হুম।' -কী দিয়ে?

পুলিশ জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে। সেদিকে যেতে যেতেই দুজনের মধ্যে কথা চালাচালি চলছে। তুহিন বললেন, 'নো ডাউট মার্ডার। তবে অদ্ভুত।'

-কীরকম?

-তুমি দেখো আগে। তারপর বলছি।

আশেপাশে অজস্র লোকের ভিড়। লাশটা যেদিকে পাওয়া গেছে তার উলটোপাশেই সারে সারে বস্তি। মাঝে রেলের ট্র্যাক। বেশ ঘন আগাছার জঙ্গল দেখেই লাশটাকে ডাম্প করা হয়েছে। চট করে কারও চোখে যাতে না পড়ে। তার ওপর বৃষ্টি। তাই সকাল থেকে এ পথে লোক যাতায়াত খুব একটা নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বডিটা এখান থেকে সরাতে হবে। ঘেরাটোপ পেরিয়ে স্বয়ম্ভু এগিয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করলেন পুলকেশ ও শিবাঙ্গী। মৃতদেহের মুখের ওপর থেকে সাদা চাদর সরে যেতেই নিমেষের নিস্তব্ধতা। মুখের চারপাশে চাপ চাপ রক্তের দাগ। গলার কাছটার হাড় বেরিয়ে কীরকম যেন চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। অরুণার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে কপালের দিকে উঠে রয়েছে।

ভয়ে! আতঙ্কে! নাকি পাহাড়প্রমাণ সন্তান শোকে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন পুলকেশ। মাটিতে বসে পড়েন। স্বয়ম্ভু তুলে ধরার চেষ্টা করে। শিবাঙ্গী হেল্প করে। পুলকেশের কণ্ঠ ঠেলে বুকফাটা হাহাকার শব্দ করে ওঠে, 'এই দিন দেখার জন্যেই কি মেয়েটাকে বড় করে তুলেছিলাম? হা ঈশ্বর! তুমি কি নেই?' এই সুযোগে চূড়ান্ত টিআরপি-র আশায় এক সাংবাদিক ক্যামেরা ঘাড়ে নিয়ে সবে রেকর্ড করতে শুরু করেছিলেন। স্বয়ম্ভুর ধমক খেয়ে পালিয়ে বাঁচে। সঙ্গে যে দুজন পুলিশ কনস্টেবল ছিলেন তাঁদের স্বয়ম্ভু বলল, 'মেসোকে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসান। জল দিন। আর দেখবেন কোনও মিডিয়া যেন কাছে ঘেঁষতে না পারে।' কথামতোই কাজ হল। শিবাঙ্গীর চোখ ছলছল করে ওঠে। ওর এই এক প্রবলেম। কারও চোখে জল দেখলেই কোথা থেকে যেন ওর বুকেও শোকের জোয়ার আসে। তুহিনের নির্দেশে রোহিত আর সাত্যকি আশেপাশের জায়গা দেখতে শুরু করেছে। পুলকেশ চলে যেতে স্বয়ম্ভু মৃত অরুণার মুখের দিকে চায়। সে এমনিতে বেশ শক্ত মনের ছেলে। যে বিভাগে ও কাজ করে সেখানে আবেগের কোনও জায়গা নেই। তবু কেন যে ওর চোখটাও কড়কড় করছে আজ। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অরুণার পরিচয় ছিল বাচাল মেয়ে বলেই। স্বয়ম্ভুও যে ওকে খুব একটা পছন্দ করত তেমনটা নয়। তবু ছোট বোন তো। বছরে একটিবার ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিতে অরুণাই সবার আগে ছুটে আসত। এই বছর থেকে দুটো ভুরুর মাঝের জায়গাটা খালিই থাকবে স্বয়ম্ভুর। কারণ অন্যান্য বোনেরা বাইরে থাকে বলে ভিডিও কলে ফোঁটা দেয়। কপাল পর্যন্ত পৌঁছোয় না।

-স্বয়ম্ভু...

ডক্টর তুহিন ডাকলেন পাশ থেকে। অরুণার রক্তাক্ত মুখের দিকে চেয়ে স্মৃতির জগতে হারিয়ে গিয়েও ফিরে এল স্বয়ম্ভু। তুহিন কিছু বলার আগেই স্বয়ম্ভু বলল, 'বডিটা কাটাপুকুরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।' আর তাকিয়ে থাকতে পারল না। তুহিনের দিকে চেয়ে বলল, 'গলার কাছটা খেয়াল করেছেন? মুখ দিয়ে প্রচুর রক্ত বেরিয়েছে।

-শুধু গলার কাছে বলে নয়। ভিক্টিমের পেট, বুক ভেঙে কেউ পিষে দিয়েছে।

নৃশংসতার বর্ণনায় চোখ ছোট হয়ে এল স্বয়ম্ভুর। যতই ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে কাজ করুক বয়স তো মাত্র চৌত্রিশ। জীবনের কতটুকুই বা দেখেছে? সত্যি বলতে এর আগে যে কটা কেস স্বয়ম্ভু তদন্ত করেছে সেখানে এতটা নৃশংসতার মুখোমুখি হতে হয়নি। হল তো হল নিজের ছোট বোনকে দিয়েই শুরু হল জীবনের ভয়ানক যাত্রা। মনের যখনই কোনও ভাবনা এসে ভিড় করে



তখনই কথা বলতে গেলে চোখ ছোট হয়ে যায় স্বয়ম্ভুর। সেভাবেই জিজ্ঞেস করে, 'গাড়ি তো নয়।' তুহিন দুপাশে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'নাহ!' অরুণার মৃতদেহটা নিয়ে চলে গেল। কনস্টেবলরা চিৎকার করে লোকজনের ভিড় হালকা করতে থাকল। আশপাশটা ভালো করে দেখতে শুরু করল স্বয়ম্ভু আর তুহিন। কথা চলতে থাকল। তুহিনশুভ্র বললেন, 'এমনকী ধারালো কিছু দিয়ে মারা হয়েছে বলে মনে হল না। যদিও বডির একটা পার্টে ধারালো কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন আছে।'

-কোথায়?

-পায়ে।

-পায়ে?

চারপাশে অজস্র নোংরার মাঝে চোখ চালাতে চালাতে অবাক হয়ে বলে উঠল স্বয়ম্ভু। ডক্টর বললেন, 'পায়ের আঙুলগুলো কেটে দিয়েছে।' -কী?

-হ্যাঁ।

মাথায় কিছুই ঢুকছে না স্বয়ম্ভুর। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা জায়গায় চোখ আটকে যায়। ডক্টর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু স্বয়ম্ভু তার আগেই নিচু হয়ে ঝোপের মধ্যে থেকে একটা কাগজ হাতে তুলে নেয়। ভিজে মণ্ড পাকিয়ে গেছে। ডক্টর ভুরু কুঁচকে ভালো করে দেখতে চেষ্টা করেন। স্বয়ম্ভুর উচ্চতা ডক্টরের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশি বলে ঘাড় উঁচু করে দেখতে থাকেন তুহিনশুভ্র। জিজ্ঞেস করেন, 'এটা কী স্বয়ম্ভু?' খুব যত্ন করে কাগজের ভাঁজ খুলতে খুলতে স্বয়ম্ভু বলল, 'এই ঝোপেই কী পড়েছিল লাশটা?'

-হ্যাঁ। এই তো ঝোপের পাতাতেও রক্তের দাগ লেগে। কিন্তু এটা কীসের পাতা?

-ভিজে যা অবস্থা তাতে একটা বইয়ের পাতা বলেই মনে হচ্ছে। -বই?

-ঠিক বই নয়। এ ফোর সাইজের একটা পেপার যাতে টাইপ করা কোনও উপন্যাস কিম্বা গল্পের একটা অংশ।

এইটুকু সময়ের মধ্যেই স্বয়ম্ভু সেনের তীক্ষ্ণ নজর বেশ কিছুটা পড়ে নিয়েছে লেখার।

-অ। এটা বোধহয় আমাদের এভিডেন্স নয়। এমনিই কত কাগজ পড়ে আছে দেখো না।

তুহিনশুভ্র বললেন। কথাটা শুনেই টপাটপ আরও বেশ কিছু কাগজ কুড়িয়ে ভালো করে দেখতে লাগল স্বয়ম্ভু। আশেপাশে বাতিল প্যাকেট, আধখাওয়া খাবার, স্যানিটারি ন্যাপকিন, কন্ডোম, ভাঙা বাক্স কী পড়ে নেই! এরই মধ্যে যে কটা কাগজ পাচ্ছে সব তুলে দেখছে আর ফেলে দিচ্ছে। তুহিনশুভ্র এবার বেশ অবাক হলেন। 'কিছু বুঝতে পারছ নাকি?'

স্বয়ম্ভু বলল, 'কিছুই বুঝছি না।

-তাহলে নোংরা পাতাটা ধরে রেখেছ কেন? ফেলে দাও।

-ফেলেই দিতাম। যদি না পাতার নীচে এক বিন্দু লাল রং লেগে থাকত৷ ফরেন্সিক এক্সপার্ট তুহিনশুভ্র এবার বেশ চোখ পাকিয়ে কাগজটা দেখলেন। 'লাশের সঙ্গেই ছিল না নিশ্চয়ই। থাকলে তো রক্তে মাখামাখি থাকত।'

-কাটাপুকুর চলুন তুহিনদা। একটু ভালো করে দেখতে হবে বডি ... অরুণাকে৷

কথার মাঝে থেমে যাওয়ার মানেটা বুঝলেন ডক্টর তুহিনশুভ্র।

অন্ধকার হিমশীতল ঘরে একটা চড়া আলোর নীচে বিবস্ত্র ক্ষতবিক্ষত অরুণাকে শোয়ানো আছে। চোখে দেখা যাচ্ছে না। কোমরের ওপর থেকে বুক পর্যন্ত থেঁতলে গেছে। রক্ত মাংসে মাখামাখি। উরু থেকে বড় বড় কালশিটে। চামড়ার আড়ালে বেশ অনেক কটা হাড় যে গুঁড়িয়ে এধার ওধার হয়ে রয়েছে তা ওপর থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

-সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় ভিক্টিমের পা।

তুহিন বললেন। দুজনেই অরুণার পায়ের কাছে গিয়ে দেখলেন, দুটো পায়ের পাতা থেকেই চারটে করে আঙুল যত্ন করে কেটে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ডান পায়ের পাতার নীচে চোখ থমকে গেল। স্বয়ম্ভু নৃশংসতায় স্তম্ভিত হয়ে বলে, 'পায়ের আঙুল কেটেছে কেন? তাও

আবার চারটে!' -প্রথম চারটে।

তুহিনশুভ্র বললেন। 'কারণ ভিক্টিমের পায়ের আঙুলের শেপটা ভি শেপের ছিল। বেশিরভাগ মানুষেরই যেরকম থাকে। এমন কোনও কিছু দিয়ে কাটা হয়েছে যাতে একবার ঘা দিতেই প্রথম চারটে আঙুল কেটে যায়। পায়ের কড়ে আঙুল সবচেয়ে ছোট। সেটাকে কাটতে হলে আরও একবার কোপ বসাতে হত একটু কোণাকুণি করে। কিন্তু খুনি সেটা করেনি। আর ভিক্টিমের পায়েও একাধিকবার আঘাতের চিহ্ন পাচ্ছি না।'

-ছুরি নয়!

-সেটা অসম্ভব।

-তাহলে কী? এত ধারালো কোন অস্ত্র যে এক কোপে প্রথম চারটে আঙুল সুনিপুনভাবে উপড়ে গেল?

তুহিন মাথা চুলকে নিলেন। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে একটু ভেবে বললেন, 'পরীক্ষা সাপেক্ষ। ভাবতে হবে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রক্তমাখা পায়ের দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে নতুন করে ভুরুটা কুঁচকে গেল স্বয়ম্ভুর। 'ডান পায়ে এটা কীসের চিহ্ন?'' উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল সে। এতক্ষণ ঘন রক্তের আড়ালে ঢাকা ছিল বলে চট করে চোখে পড়েনি।

-তাই তো। আঙুলের দিকে তাকাতে গিয়ে এটা ওভার লুক করেছি। বললেন তুহিনশুভ্র। স্বয়ম্ভু বলল, 'ঠিক যেন দুটো পাতার মতো আঁকা। তাই না?'

-হুম।

-কিন্তু সেটাও কমপ্লিট নয়। দুটো পাতারই নীচের অংশটুকু নেই। -দুটো পাতার মুখও দুদিকে কোণাকুণি নির্দেশ করছে।

-এটা ছুরি জাতীয় কিছু দিয়ে আঁকাই মনে হচ্ছে।

-এটা তো কোনও সংকেত। খুনি সংকেত দিচ্ছে! কাকে?

শিবাঙ্গী এতক্ষণ চুপ করে অবজার্ভ করছিল। এবার সে বলল, 'স্যার আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে।' স্বয়ম্ভু জানতে চাইল, 'কী মনে হচ্ছে?'' -এসব ক্ষেত্রে খুনি পুলিশকে চালাকি করে পরের খুন সম্পর্কে সংকেত দেয়।

-সিরিয়াল কিলিং?

-মে বি। পাতার ছবি এঁকেছে খুনি। তার মানে পরে ও যাকে খুন করবে তার সাথে নিশ্চয়ই গাছের কোনও সম্পর্ক আছে।

স্বয়ম্ভু মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিল। বলল, 'যা খুশি থাকুক। অরুণাকে কেন মারল? তাও আবার এইভাবে?' তুহিনশুভ্র বললেন, 'তোমার বোন কি কারও পথের কাঁটা ছিল?' স্বয়ম্ভুর মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। তালেগোলে তমালের কথাটা তো ভুলেই গিয়েছিল। ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও থমকে গেল স্বয়ম্ভু। তড়িৎ গতিতে পিছনে ফিরে প্রশ্ন করল, 'পায়ের আঙুলগুলো কোথায় গেল?'

-স্পটে তো কিছুই পাওয়া যায়নি। ওই কাগজ ছাড়া।

তুহিন বললেন।

-ওই কাগজটা আর অরুণার ফরেন্সিক রিপোর্ট যত তাড়াতাড়ি পারেন রেডি করুন তুহিনদা।

-আমি কালকের মধ্যেই ট্রাই করছি স্বয়ম্ভু।

বেরোতে গিয়ে আবারও আটকে গেল। শিবাঙ্গীর দিকে ফিরে স্বয়ম্ভু বলল, ''ও হো, শিবাঙ্গী, সারাদিন মাকে কিছুই জানানো হয়নি। যদি অসুবিধে না হয় তুমি প্লিজ একবার চলে যাবে? আমি এদিকটা দেখে নিচ্ছি।'

-স্যার স্পটে গিয়ে সবকিছু জানার পর আমি তখনই জেঠিমার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই সময় আপনার মাসির সঙ্গে থাকাটা খুব জরুরি তাই জেঠিমাকে আপনার মাসির বাড়িতেই পাঠিয়ে দিয়েছি। চিন্তা করবেন না।

এত ঝামেলার মধ্যেও স্যারের মায়ের কথা ভোলেনি মেয়েটা। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এক চিলতে হাসি শিবাঙ্গীকে না ফিরিয়ে দিলে বড্ড অপরাধ হবে স্বয়ম্ভুর। অপরাধটা করল না সে।

৬

মাথা ভর্তি ম্যাগি-ম্যাগি চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে। বাঁদিকের ভুরুতে ছোট্ট একটা সিলভার রিং। প্লাক করা আই ব্রো। চোখের ওপর ডার্ক শেডের আই শ্যাডো। কাজলে ঘেরা চোখ। কালো মণিটা চোখের ওপরের পাতা থেকে আধখানা চাঁদের মতো নেমে আছে। এক কথায় যাকে ঢুলুঢুলু চোখ বলে সেইরকম। নাকের মাঝে সিলভার নোজ রিং। ঠোঁটে কালচে সবুজ রঙের লিপস্টিক। ক্যাফের আলোয় মাঝেমাঝেই কালো লাগছে। হাসলে দু-গালে টোল পড়ে। ডান কানের লতি থেকে চারখানা দুল ধার ঘেঁষে ওপরের দিকে উঠেছে। ঠোঁট বেঁকিয়ে চক চক করে চুইংগাম চিবিয়ে চলেছে দিয়া । গায়ে গামছা প্রিন্টের স্লিভলেস জামাটা একেবারে হাঁটু পর্যন্ত নেমেছে। হাঁটুর পর থেকে ফর্সা মোম পলিশ করা পা দুটো রিভলবিং চেয়ারের রড ছুঁয়ে নেমে এসেছে। বাঁ পায়ের হাঁটুটা সামান্য পিছনে মোড়া। পায়ে লম্বা হিল দেওয়া জুতো। হাল ফ্যাশনের দুবলা চেহারা। সপ্তাহে তিনদিন দিয়া তার সাধের ক্যাফেতে আসে। রবিবারটা একটু বেশি ভিড় থাকে। তাই সেদিনটা ও আসেই। সারা সপ্তাহের হিসেবটাও সেদিন দেখে নেয়। বাকি দুদিন সপ্তাহের মধ্যে সুবিধে মত ম্যানেজ করে নেয়।

-এই শুভায়...

পাশেই ট্রেতে খাবার সাজিয়ে চলা ছেলেটিকে ডাকল দিয়া।

-হ্যাঁ ম্যাডাম?

ছেলেটি এগিয়ে আসতে দিয়া হিসেবের ফাইলে রাখা একটা প্রিন্ট আউট দেখিয়ে বলে, ‘এখানে গ্লাসের দামটা কীসের জন্য?' ছেলেটি জানায়, দুদিন আগে এক কাপল এসেছিল তাদের বাচ্চাকে নিয়ে। সেই বাচ্চাটি খেলতে খেলতে একটা গ্লাস ভেঙে ফেলে। কাস্টমার সেই দামটাই দিয়েছে। এর ফাঁকেই একজন কাস্টমার এসে পাশের মেয়েটিকে ক্যাশ পেমেন্ট করে। শুভায়ু হিসেব বুঝিয়ে ফিরে যায়। ঠিক তখনই দিয়া শুনতে পায় একটা ডাক। সামনে দাঁড়িয়ে কে যেন চাপাস্বরে ডাকল। চোখ তুলে তাকাতেই অবাক হয়ে যায় সে। ‘হোয়াট আ সারপ্রাইজ! পথ ভুলে এলি নাকি?”

সুস্মিতা এসেছে। মাথার চুল তেমন করে গুছিয়ে বাঁধা নেই। মনে হচ্ছে দৌড়ে কোনওরকমে এসে হাজির হয়েছে। শাড়ি পরেছে। কিন্তু সুস্মিতা যা গোছানো মেয়ে তাতে তার শাড়ির আঁচল এলোমেলো হয়ে থাকাটা একটু অস্বাভাবিক। সুস্মিতার নিজের বুটিক আছে। আর সেটা যথেষ্ট নাম করা। এছাড়া আজকাল মেকওভারের ক্লাসও করাচ্ছে আলাদা করে। সেরকমই শুনেছিল দিয়া। কিন্তু সুস্মিতা দিয়ার কথার পরেও চুপ করে আছে। কীরকম যেন থমথমে ভাব সারা মুখে। ‘কিছু হয়েছে?' এবার সুস্মিতা চাপাস্বরে বলল, “শুনিসনি কিছু?'

-কী?

ক্যাফের এক কোণে একটা টেবিলে গিয়ে বসে দুই বন্ধু। হ্যাঁ, এরা দুজন বন্ধুই ছিল। সুস্মিতা নিজের মোবাইলে চট করে একটা লিঙ্ক খুলে দেখায় দিয়াকে। একটা নামী নিউজ পোর্টালে বেরিয়েছে অরুণার খুনের খবরটা। হেলান দিয়ে বসেছিল দিয়া। পড়ামাত্রই মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল তার। দিয়ার চোখে আতঙ্ক। অস্ফুটে বলল, ‘হাউস ইট পসেবল?”

-অরুণা আমায় দুদিন আগেই কল করেছিল। তখন প্রায় মাঝরাত।

-অরুণা তোকে ফোন করেছে?

-হ্যাঁ।

-বাট ও তো তোর সঙ্গে কথাই বলত না।

-ওর বিয়ের পর এই প্রথম আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করল।

-কী বলেছিল?

-আমায় ব্লেম করছিল। আমি নাকি ওকে ফোন করে বেড়ালের ডাক শুনিয়ে ব্ল্যাকমেল করছি। তুই নাকি বলেছিস আমি বেড়াল পুষেছি।

-হ্যাঁ। বলেছি। তোদের কম্পাউন্ডেই থাকেন ঋতজা নন্দী। আমার পরিচিত। একদিন কথায় কথায় তোর বুটিকের প্রশংসা করছিল। তখনই তোর কথা ওঠাতে ও বলে তুই একটা

বেড়াল পুষেছিস। সেটা নিয়ে তোর আশেপাশের কয়েকজন আপত্তিও করেছে। এইসব। তারপরেই অরুণা আমায় কল করেছিল ওর ওই রহস্যময় ফোনের ব্যাপারে। আমি এমনি ইয়ার্কি মেরে বলেছিলাম যে দ্যাখ হয়তো সুস্মিতা তোর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করতে চাইছে। নিজে কথা বলতে পারছে না বলে ওর বেড়ালকে দিয়ে বলাচ্ছে।

সুস্মিতা চোখ ঘুরিয়ে কপালে হাত দিয়ে বসল। তারপর হালকা রাগ উগরে দিয়ে বলে উঠল, 'আর এই জন্য ওর ধারণা হয়েছে আমি নাকি ব্ল্যাকমেল করছি ওকে।

-তুই যদি না হোস তাহলে কে ওকে ফোন করত?

-আমি কী করে জানব?

চাপাস্বরে খিঁচিয়ে উঠল। দিয়া বিড়বিড় করল, 'যে ফোন করত তাহলে সেই কী খুন...!' সুস্মিতার দুচোখে উপচে উঠল ভয়। 'যদি তাই হয় তাহলে সে বেড়ালের ডাক শোনাবে কেন?' শব্দগুলো উচ্চারণ করতেই দিয়া আর সুস্মিতা একে ওপরের দিকে পাথুরে স্থির দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল। ধীরে ধীরে দুজনের চোখই কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। কিন্তু কেউই কাউকে কিছু বলল না। কেবল নীরবে চেয়ে রইল। কয়েক পলকের বিরতিতে খানিকটা কষ্ট করেই হেসে ফেলল দিয়া। বলা ভালো, ইচ্ছে করেই হাসির ভান করল। বুকের ওপর যে ভয়ের পাথর চেপেছে তাকে এভাবেই হালকা করতে বলে উঠল, 'আমরা না সুস পাগল হয়ে যাচ্ছি বোধহয় জানিস! একটা সামান্য, নিতাআআআন্ত ক্ষুদ্র একটা ব্যাপারকে আমরাই অনেকটা বড় করে দেখে নিজেরা ভয় পাচ্ছি।' সুস্মিতার আশ্চর্য লাগল। ব্যাপারটা এতটাই কি গুরুত্বহীন দিয়ার কাছে? দিয়া বলল, 'তবে এই ভয়টা একটা ভালো কাজ করল, এতদিন বাদে তোকে আবার আমার কাছে নিয়ে এল।'

-আমি একদম ইয়ার্কির মুডে নেই বিশ্বাস কর। অরুণা যদি আর কাউকে বলে থাকে যে ও আমায় ফোন করেছে এবং আমার কাছে বেড়াল আছে। তাহলে তো পুলিশ এবার আমায় নিয়ে টানাটানি করবে।

-তুই না সেই একই রয়ে গেলি। ওপর ওপর ডোন্ট কেয়ার ভাব। যেন কত ইন্টালিজেন্ট, শার্প। এদিকে ভেতরে, আস্ত বাল।

সুস্মিতার ভয়ার্ত মুখে চিলতে অভিমান চলকে উঠল। যেন মৌন থেকে দিয়ার কথাকেই সমর্থন করল।

-পৃথিবীতে কী আর কারও বেড়াল নেই? তুই একাই বেড়াল পুষিষ ? নাকি অরুণার সঙ্গে যার যার সম্পর্ক আছে তাদের প্রত্যেকে তুই চিনিস? তাছাড়া, তমালের সঙ্গে রিলেশনটা ইদানিং বেশ খারাপই যাচ্ছিল। যদি কিছু করার হয় তাহলে...

-না।

বেশ জোরালো গলায় প্রতিবাদ করে উঠল সুস্মিতা। 'তমাল কিছুতেই এ কাজ করতে পারে না।' দিয়ার ঢুলুঢুলু চোখদুটো বিস্ময়ে জ্বলজ্বল করে ওঠে, 'বাআআআবা! এখনও?'

-দ্যাখ দিয়া, কে কীরকম মানুষ আমি খুব ভালো করে জানি। আর তাছাড়া এটা হওয়ারই ছিল। সব জায়গায় পরের ধনে পোদ্দারিটা চলে না। দিয়া বুঝতে পারে সুস্মিতার এই উষ্মার কারণ। সুস্মিতার হাতের ওপর হাত রেখে শান্ত করে দিয়া। বলে, 'একবার মৃত্তিকাকে জানাই।'

-ওর ছোট বাচ্চা। বেকার টেনশন দিয়ে লাভ নেই। খবরটা তো সব জায়গায় দেখাচ্ছে। ও নিশ্চয়ই জানতে পারবে। আননেসেসারি বেড়ালের কথাটা বলে আর...

দিয়া ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। সুস্মিতা ঠিকই বলেছে।

এত রাতেও বুড়োগুলোর চায়ে চুমুক দেবার ধরণ দেখলে বোঝাই যায় না রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। ঠোঁটের ভিতর চা টানার সুড়ুৎ সুড়ুৎ শব্দে বেশ রাত অব্দি গমগম করে সুরিলেন ও আশেপাশের গলিগুলো। আজ বিকেলের পর থেকে বৃষ্টি হয়নি বলে আয়োজনটা আরও জমাটি। তার ওপর চায়ের সঙ্গে গোপালের চপ। ওফ! ভরা শ্রাবণের সন্ধে জমে ক্ষীর।

এই আসরের নিত্যসঙ্গী মিশ্র পুরোহিত। পুজো সেরে মন্দির থেকে ফেরার পথে এই আড্ডায় আসা চাই-ই তার। কোনওদিন যদি পাশ কাটিয়ে কাজের বাহানায় চলে যেতে চায়, দাস আর গাঙ্গুলি তাকে টেনে বসাবেই। আজকের আসরে চায়ে-চপে মুখ ভরিয়ে এক ষাটোর্ধ্ব বললেন, 'ব্যাপার কী বল তো ভটচায?'

-কীসের কী ব্যাপার?

ভটচাযও ভুরু বেঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন। বৃদ্ধ বললেন, 'অলিতে গলিতে মামাদের উৎপাত হচ্ছে কেন?' এমন হেঁয়ালি ভরা কথা হজম করতে একটু সময়ই লেগে গেল।

'মামাদের উৎপাত মানে? কী বলছ খোলসা করে বল তো গাঙ্গুলি।'

-আরে বাবা পাশের গলিতেই আজ সকাল থেকে মুহুর্মুহু পুলিশ আসছে দেখছ না?

আসরে উপস্থিত সবাই এবার বেশ অ্যাটেনশন মোড়ে। এদের মধ্যেই আরেক বয়স্ক বললেন, 'ঠিক বলেছ মহিম, আমিও দেখলুম। বিকেলে ওই বিমল না তমাল কী যেন নাম গো ছেলেটার, তাকে তুলে নিয়ে গেল। আরে ওই বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ির ছেলেটা। মাথার ওপর খোঁচা খোঁচা চুল। গোঁফ নেই এদিকে থুতনির কাছে রামছাগলের মতো দুগাছি দাড়ি ঝুলছে।' -তমাল ব্যানার্জি!

বিড়বিড় করলেন মিশ্র পুরোহিত। গাঙ্গুলি বললেন, 'আপনি কিছু জানেন নাকি মিশ্রঠাকুর? ও বাড়ির বউ তো নাকি আপনার মন্দিরে আসা যাওয়া করত।'

-হ্যাঁ কালকেই তো এসেছিল। ওদের স্বামী-স্ত্রীর কিছু সমস্যা চলছে। সে নিয়েই মুষড়ে থাকত মেয়েটা।

-অ। তাই বলো। তার মানে নিগঘাত স্বামীর নামে পুলিশে নালিশ করেছে বউটা। এসে বরটাকে তুলে নিয়ে গেছে।

-ওইটে তোমার ভাগ্নে না মিশ্রঠাকুর?

দাসবাবুর কথায় মিশ্র একটু হকচকিয়েই গেলেন। গলির মাথার দিকে চাইতে দেখলেন সত্যিই মিশ্রঠাকুরের ভাগ্নে আসছে। কেমন যেন হন্তদন্ত হয়েই এদিক পানে আসছে। দাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ গো, ও কী চাকরি করে কোথাও?'

-হ্যাঁ। চাকরি না করলে এই পুজো করে কী আর সংসার চলে?

-তা কোথায় করে?

কান এঁটো করা হাসি হেসে মিশ্র বললেন, 'তেমন কিছু না। ওই কলেজস্ট্রিটের একটা দোকানে।'

-অ। তা ভালো।

মিশ্র উঠে পড়লেন। গলা তুলে ডাকলেন, 'এই তিরু....।' মুখ তুলে তাকাল ভাগ্নে। এগিয়ে এসে বলল, 'তুমি এখনও বাড়ি যাওনি?' মিশ্র বললেন, 'না। এই যাব। কিন্তু তুই এমন হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছিস কেন? বৃষ্টিতে পিছল হয়ে আছে চারদিক। কোথায় পড়বি পা হড়কে

-তোমরা শোনোনি কিছু?

--কী শুনব?

পাশ থেকে এই একই কথা আরেক বৃদ্ধও বললেন। তিরু বলল, 'পাশে গলির তমাল ব্যানার্জিকে আজ বিকেলে পুলিশে ধরেছে। ওর বউটা নাকি খুন হয়েছে।'

-হ্যাঁঃ!

শব্দটা সকলের মুখ থেকে একসঙ্গে বেরোল। তিরু আরও বলল, 'আজ ভোরে নাকি পার্ক সার্কাসের রেল লাইনের ধার থেকে বডি পাওয়া গেছে। টিভিতে তো দুপুর থেকেই দেখাচ্ছে।'

-কী বলছিস রে?

গাঙ্গুলি চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন। দাস বললেন, ''আমাদের তো সবসময় সিরিয়ালই চলছে। জানব আর কী করে?' মিশ্র টলে গেলেন। সবাই ধর ধর করে রকে বসাল। দাস বললেন, ''ও মিশ্র কী হল তোমার? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?' মিশ্রঠাকুর চোখ বুজে একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বললেন, 'আমি বউটাকে বড় মুখ করে বলেছিলাম, ঠাকুর তোমার সব কষ্ট

দূর করে দেবেন। শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভাবতে পারিনি মেয়েটাকেই পৃথিবী থেকে দূর করে দেবেন। উফফফফ! ঠাকুর, এ তোমার কী বিচার?'

-মামা, তুমি আর এসব ভেবো না তো। বাড়ি চলো। ওঠো। এসব ভেবে তোমার প্রেশার বাড়লে দেখবে কে শুনি? চলো চলো।

তিরু তার মামাকে ধরে অতি সাবধানে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকল।

রাত ন'টা বেজে গেছে। শিবাঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে লেক থানায় এল স্বয়ম্ভু। যোধপুর পার্ক এই থানার আন্ডারেই পড়ে। অফিসার দিব্যেন্দু পাড়িয়া অপেক্ষা করছিলেন। 'তমালকে আনা হয়েছে?' ঢুকেই প্রশ্ন ছুড়ে দিল স্বয়ম্ভু।

-হ্যাঁ স্যার। ইন্টারোগেশন রুমে।

-সিসিটিভির কী খবর?

-পার্ক সার্কাসের রেল লাইনের ধারে কোনও সিসিটিভি নেই স্যার।

-বাহ দারুণ। আর শিয়ালদায় অরুণার বাড়ির চত্বরে?

পাড়িয়া একটু আমতা-আমতা করে বললেন, 'আসলে স্যার ওনার বাড়িটা তো গলির মধ্যে। ওখানে সিসিটিভি নেই। রাস্তায় আছে। সেখানে সারাদিনে যে কটা গাড়ি ওই গলির মধ্যে ঢুকেছে এবং বেরিয়েছে সেগুলো ট্রেস করার চেষ্টা চলছে স্যার। দুটো ট্রেস করা গেছে। কিন্তু সেই গাড়ির ড্রাইভারের বক্তব্য এবং কার বুকিং ডিটেইলস চেক করে দেখা গেছে একজন মেল প্যাসেঞ্জার আর অন্যজন ফ্যামিলি নিয়ে বেরিয়েছে। যদিও কার বুকিংটা দুজন পুরুষ মানুষই করেছিলেন। শুধুমাত্র একজন ড্রাইভারের কোনও ট্রেস নেই আপাতত। খোঁজ চলছে।

-ট্রেস নেই মানে?

-ওই গাড়ির ড্রাইভারের মোবাইল পাওয়া যায়নি। গাড়ির নম্বর দিয়ে ড্রাইভারের ফোন নম্বর বের করা হয়েছে। বাট স্যার মৌলালির আশেপাশে দেখাচ্ছে ওর লাস্ট লোকেশন। তারপরেই ফোনটা বোধহয় বন্ধ হয়ে যায়। আর কোনও ট্রেস নেই।

স্বয়ম্ভু তার ক্লিন শেভ গালে একবার হাত বুলিয়ে কী যেন ভাবল। সেই ফাঁকে পাড়িয়াকে প্রশ্ন করল শিবাঙ্গী, 'আপনারা ওই অঞ্চলের আর কোনও সিসিটিভির ফুটেজ চেক করেছেন? মানে আশেপাশের আর কোনও গলি বা রাস্তার?'

-না আর কোনও গলির করিনি কারণ পাশের গলিগুলোতেও সিসিটিভি নেই। যা আছে গলির মোড়ে, রাস্তার ওপর। আর তাছাড়া যে গাড়িটার ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না সেটা গলি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠে মৌলালির দিকেই গেছে।

আবারও শিবাঙ্গী প্রশ্ন করল, 'বাই দ্য ওয়ে, ভিক্টিমের ফোনের কোনও ট্রেস পাওয়া গেছে?'

-না। সেটাও রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের কাছে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে।

-রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড!

অবাক হয়ে রাস্তার নামটা আওড়াল স্বয়ম্ভু।

-হ্যাঁ স্যার।

-ধরে নিচ্ছি অরুণা বাপের বাড়ি মানে যোধপুর পার্ক আসার জন্য গাড়িতে উঠেছিল। তাহলে তো সেটা মৌলালি থেকে বাঁদিকে। আর মৌলালি থেকে ডানদিকে বেঁকে গেলে রফি কিদ ...

বাকি কথাগুলো স্বয়ম্ভুর মনের মধ্যে তালগোল পাকাতে থাকল। -স্যার, অরুণা কি অন্য কোথাও যেতে পারে?

শিবাঙ্গী প্রশ্ন করে।

-সেটা যদি যায়ও তাহলে তো ফোন বন্ধ হবার কথা নয়। ওদিকে যাবেই বা কেন? তার মানে যা ঘটার সেটা এই মৌলালি চত্বর থেকে রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের মধ্যেই ঘটেছে। এদিকে লাশ পাওয়া গেল পার্ক সার্কাস রেললাইনের ধারে। আচ্ছা ওই নম্বরের

গাড়িটা শিয়ালদা থেকে পার্ক সার্কাস যাবার পথে কোনও জায়গায় পাওয়া যায়নি?

-স্যার, গাড়িটা সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ শিয়ালদায় দেখা গেছে। তারপর রাত আটটা এগারো মিনিটের পর লোকেশন ট্রেস করা যাচ্ছে না। কারণ তখন ফোন সুইচড অফ। এরপর থেকে গাড়িটার কোনও ট্রেস নেই। অ্যাপ ক্যাব কোম্পানির সঙ্গেও কন্ট্যাক্ট করেছি। বাট তাদের কাছেও এটা ধোঁয়াশা ড্রাইভারও কোনও যোগাযোগ করেনি। তাই সেই গাড়িটাকে যদি পার্ক সার্কাসের দিকে গেছে কিনা ট্রেস করতেই হয় তাহলে শিয়ালদা থেকে যে যে রাস্তা দিয়ে ওদিকে যাওয়া যেতে পারে সেদিকের প্রত্যেকটা সিসিটিভি চেক করতে হবে সন্ধে থেকে রাতের টাইম পর্যন্ত। সেটা স্যার খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মত অবস্থা। যথেষ্ট টাইম টেকিং। তার ওপর বৃষ্টি। ঝাপসা ছবি। তাছাড়া অনেক জায়গায় সিসিটিভি আছে কিন্তু কাজ করে না।

একদমই ভুল কথা বলেনি দিব্যেন্দু পাড়িয়া। স্বয়ম্ভু শুধু চিন্তান্বিত হতে একবার হুম বলল। তারপরেই বলল, ‘পাড়িয়াবাবু, আপনি এদের কল রেকর্ডিং আনার ব্যবস্থা করুন।' টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাস। যদিও বা সিসিটিভির হ্যাপা কাটানো গেল, এ আবার আরেক ঝামেলা ঘাড়ে চাপল। ধুস শালা। মনে মনে আওড়ালেন পাড়িয়া। বেশ চাপ খেয়ে বললেন, ‘বেশ চাপের স্যার। তাও ট্রাই করছি।'

-আমাদের লাইফটাই চাপের দিব্যেন্দুবাবু। কাজটা করতেই হবে। সবার আগে এদের কল লিস্ট জোগাড় করে কালকের মধ্যে আমাকে দিন।

-শিওর স্যার।

-আর শুনুন, যে যে ফুটেজগুলো পেয়েছেন সেগুলোর একটা কপি আমায় দেবার ব্যবস্থা করুন।

-ওকে স্যার। এখুনি দিচ্ছি।

-ও হো ভালো কথা, তমালের ফোন থেকে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল?

-একটা বিশেষ নম্বর থেকে প্রতিদিন ফোন আসত, যেত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাও হয়েছে। স্পেশালি রাতের দিকে বেশি কথা হত।

-নম্বরটা কার?

-তর্পণা মিত্র নামের এক মহিলার। একজন ফ্লোরিস্ট। দেশপ্রিয় পার্কে ওনার নিজের দোকানও আছে।

-ফ্লোরিস্ট।

এই শব্দটা শিবাঙ্গী আর স্বয়ম্ভু দুজনে একসঙ্গে উচ্চারণ করল। পাড়িয়াবাবু একটু থমকেই গেলেন। ‘কী হল স্যার? চেনেন এনাকে?”

-এখনও না। তবে কাল ঠিক চিনে নেব। এখন চলুন জামাই আদরের ব্যবস্থা করি।

তমাল আর স্বয়ম্ভুর মধ্যে মাত্র এক টেবিলের দূরত্ব। পাশে আলোআঁধারের মাঝে দুহাত পিছনে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিবাঙ্গী। দু-মিনিট কাটতে চলেছে স্বয়ম্ভু এসে চেয়ারে বসেছে। এর মধ্যে একটা প্রশ্নও করেনি তমালকে। তমালও টুঁ শব্দটিও মুখ থেকে বের করেনি। শুধু বিপুল অস্বস্তিতে পিটপিট করে চোখ তুলে দেখছে। তার গোয়েন্দা শ্যালকটি ঠিক কী করতে চাইছে বুঝতে পারছে না। এর মধ্যেই দুবার ঘাম মুছে নিয়েছে তমাল। কেউ কিচ্ছু বলছে না। ইন্টারোগেশন রুমটা যেন একটু বেশিরকম থমথমে। বাধ্য হয়ে তমালই মুখ খোলে, ‘আমি অরুণাকে মারিনি। বিশ্বাস কর ভোলাদা।' এতক্ষণের নীরব স্থির মূর্তিভাব এক নিমেষে চুরমার হয়ে যায় এই ভোলাদা নাম শুনে। একেবারে থুথু ছেটাবার মতো করে বলে ওঠে স্বয়ম্ভু, ‘এই শাট আপ। তোমার মুখ থেকে এই, এই নাম আমি শুনতে চাই না। আমি শুধু ভাবছি আমার কপালটার কথা। তোমার ভালো কোনও জ্যোতিষী জানা আছে তমাল? জানো? বলো না। আমি দেখাব। এসবে বিশ্বাস নেই আমার। কিন্তু তাও দেখাতে চাই। তোমার বউকে কে এইভাবে ব্রুটালি মার্ডার করল সেটা তো জানো না। অ্যাটলিস্ট একটা জ্যোতিষীর সন্ধান তো দাও। এক সময় যাকে বাড়িতে ডেকে পরম আদরে জামাইষষ্ঠীর ভুঁড়িভোজ করিয়েছিলাম আজ সেই জামাই কিনা তার স্ত্রীয়ের খুনের সন্দেহভাজন হয়ে আমার সামনে ইন্টারোগেশন

রুমে বসে আছে। এই দিনটা আমায় কেন দেখতে হল? কোন পাপে? আমি জানতে চাই। আমায় একটা জ্যোতিষীর সন্ধান দাও তমাল।' এই সময় ঠিক কী বলা উচিত? উত্তরটা কী দেবে? নাকি চুপ থাকবে? চুপ থাকলে রুলের বাড়ি যে পড়বে না তার গ্যারান্টি কোথায়? তাই কতকটা ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠল তমাল, 'আমিও বিশ্বাস করি না। তবে...'।

-তবে?

ভুরু বেঁকিয়ে মুখটাকে এগিয়ে আনল স্বয়ম্ভু।

-অরুণা একজনকে চিনত। ও যেত তার কাছে।

-অরুণা! জ্যোতিষীর কাছে যেত?

রীতিমতো আকাশ থেকে পড়ার মতই তথ্য পেল স্বয়ম্ভু। তমাল ওপর নীচে ঘাড় নাড়ল। 'সুরি-লেনের মোড়ে একটা বড় শনি মন্দির আছে। তার যে পুরোহিত সে নাকি এসব ওই হাত-ফাত দেখে বলতে পারে। আমাকে ও বলেছিল নিয়ে যাবে। আমি রাজি হইনি। ও প্রতি শনিবার সেখানে যেত।

-গপ্পো দিচ্ছ শালা? ও সরি, তুমি কেন শালা হবে? আমি তো তোমার শালা। যে মেয়েটা কোনওদিন দুর্গাপুজোর অঞ্জলিই দিল না, ঢপের চপ বলে উড়িয়ে দিত। সে নাকি প্রতি শনিবার শনি মন্দিরে গিয়ে হাত দেখাত?

-বিশ্বাস না হলে খোঁজ নাও। অরুণা শেষের দিকে পালটে গিয়েছিল। কীসব ব্রতটত করতেও শুরু করেছিল।

-কেন?

তমাল চুপ। স্বয়ম্ভু আবার অত্যধিক ঠান্ডা গলায় বলে, "চুপ করে থেকো না তমাল। তোমার বউ, যে কিনা আমারও ছোট বোন সে এখনও কয়েকটা বেওয়ারিশ লাশের মধ্যে ঠান্ডা ঘরে শুয়ে অপেক্ষা করছে বিচারের বলোওওও।' 1

-বাচ্চার জন্য। অরুণা মা হতে চেয়েছিল।

বুকের ভিতরে শৈত্যপ্রবাহ চলছিল স্বয়ম্ভুর। হঠাৎ উষ্ণতায় কিছুটা বরফ যেন গলে যায়। একটা বাচাল মেয়ে, যে সব সময় উড়ে উড়ে বেড়াত। সংসারে মন ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে মস্তি, পার্টি এমনকি মদ্যপান করে বেহেড মাতাল হয়েও বাড়ি ফিরেছিল দু-তিনবার। মাসি-মেসো স্বয়ম্ভুর মাকে ফোন করে মেয়ের নামে বদনাম পর্যন্ত করেছে। বিয়ের দেড় বছর কাটার পরেও যে বাচ্চা নেবার নাম শুনলে মুখ ব্যাঁকাত সেই মেয়ে কিনা মা হতে চেয়েছিল? এই আবেগ, অনুভূতি কবে কীভাবে অরুণার মধ্যে সঞ্চারিত হল? অরুণা কি তবে সত্যিই পাল্টাচ্ছিল?

-প্রবলেম ছিল কিছু?

-জানি না। বলেছিলাম ডাক্তারের কাছে চলো। ও যেন কোথা থেকে জানতে পেরেছিল ওই পুরোহিতের কথা। সে বলেছিল অরুণার সব দুঃখ চলে যাবে। ও মাও হতে পারবে। শুধু একটু অপেক্ষা করতে হবে। ও সেই অপেক্ষাটাই করছিল। আমি বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। আজ এই চরণামৃত খাওয়াচ্ছে, পরের সপ্তাহে ঠাকুরের সিন্নি খাওয়াচ্ছে। যত সব রাবিশ।

–আর ঠিক সেই সময়েই তোমাদের দূরত্বের সুযোগ নিয়ে প্রবেশ করলেন তর্পণা মিত্র। তাই তো?

তমাল চমকে উঠল।

-বাবা! চমকে উঠলে যে জামাই! ভেবেছিলে ডুবে ডুবে জল খাবে আর কেউ কিছু বুঝতে পারবে না? বলো...।

-তর্পণার সঙ্গে আমার অনেকদিনের আলাপ।

-কীভাবে?

-ফেসবুকে।

-আলাপের কারণ?

-সবার আগে ও-ই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট...

-ও-ই... বাহ! তারপর?

স্বয়ম্ভু 'ও' সম্বোধনটার ওপর চাপ দেওয়ায় খানিক থেমে গেল তমাল। চোখ নামিয়ে তুতলিয়ে বলল, 'তর্পণাই নানান ফুলের ছবি পাঠাত। পোস্ট করত। মাঝেমধ্যে আমি লাইক করতাম। একদিন মেসেঞ্জারে আমায় একটা ইনভিটেশন পাঠাল। দেখলাম, দেশপ্রিয় পার্কে ও একটা ফুলের দোকান করেছে। সেটারই ইনগ্রেশন হবে। অনেকবার করে লিখল আমি যেন অবশ্যই আসি ফ্যামিলি নিয়ে। কিন্তু আমি যেতে পারিনি। তার কিছুদিন পরেই আমাদের অ্যানিভার্সারি ছিল। সেদিন সকালে হঠাৎ একজন ডেলিভারি বয় এসে দুর্দান্ত একটা ফুলের বোকে দিয়ে গেল। আমার নামেই এসেছিল। কার্ডে লেখা ছিল, ইনগ্রেশনে তো এলেন না তাই আমার পক্ষ থেকে আপনাদের বিবাহবার্ষিকীতে ছোট্ট একটা উপহার। নাম ছিল না। কিন্তু আমি বুঝে গিয়েছিলাম। অরুণা নামটা জানতে পারার পর ব্যাপারটা খুব একটা ভালো চোখে দেখেনি। একজন অপরিচিতা মেয়ে সে আমাদের হঠাৎ গিফট পাঠাবে এটা অবিশ্বাস্য। অরুণা ভাবতে শুরু করে মেয়েটির সঙ্গে আমার বহুদিনের আলাপ। আমি লুকিয়ে যাচ্ছি। নইলে বাড়ির ঠিকানা জানবে কেমন করে?'

-তুমি দিয়েছিলে?

-না। কোনওদিন তর্পণা ঠিকানা চায়ওনি। পরে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন বলেছিল আমার এক কলিগের কাছ থেকে চুপি চুপি অ্যাড্রেসটা 'জেনেছে।

-তোমার কলিগ?

স্বয়ম্ভুর কপালে গভীর ভাঁজ।

-হ্যাঁ। আসলে আমাদের এক কলিগের ফেয়ার ওয়েলে তর্পণার দোকান থেকে একটা ফ্লাওয়ার বোকে অর্ডার করেছিলাম। অর্ডারটা প্রিয়মের নম্বর থেকেই হয়েছিল। পরে প্রিয়মের থেকে জেনেছি ব্যাপারটা সত্যি। তর্পণা আমাদের সারপ্রাইজ দিতেই ওর কাছ থেকে আমার অ্যাড্রেস জেনেছিল। তাছাড়া এটা ওদের দোকানের একটা প্রোমোশনাল প্ল্যান। আরও অনেকের কাছেই এরকম সারপ্রাইজ গিফট গেছে বলে শুনেছি।

-তারাও কি তোমার পরিচিত?

-না।

-তাহলে বুঝলে কী করে কথাটা সত্যি? বিল বা রিসিপ্ট কিছু দেখিয়েছে?

দুপাশে ঘাড় নাড়ল তমাল। স্বয়ম্ভু হাসল। 'একটা মেয়ে তোমাকে পটাতে চাইল আর তুমিও অমনি পটে গেলে।'

-প্রত্যেকদিন যদি তোমার কানের গোড়ায় কেউ বলতে থাকে তর্পণার সঙ্গে তুমি প্রেম করো, ওর সঙ্গে তোমার প্রেমের সম্পর্ক, তুমি ওর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রেখে চলছ আর নিজের বউকে ঠকাচ্ছ। রোজ রোজ এই নিয়ে অশান্তি, কান্নাকাটি। অথচ সত্যিই সেরকম কিছু নেই তাহলে তোমার কীরকম ফিলিংস হবে বলো তো?

-ও আচ্ছা। তার মানে অরুণা বারবার তোমার কানের কাছে তর্পণার সঙ্গে প্রেম, তর্পণার সঙ্গে প্রেম বলে গজগজ করেছে, অশান্তি করেছে বলে বিরক্ত হয়ে তুমি ওর সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করেছ? তাহলে কেউ যদি তোমার কানের কাছে বারবার কাঁদুনি গেয়ে, অশান্তি করে বলে যে তোমার বউকে সরিয়ে দাও, তোমার বউকে মেরে ফেলো তাহলে তুমি সেটাই করবে!

চিৎকার করে ওঠে তমাল, 'না না মিথ্যে কথা। আমি অরুণাকে মারিনি। সমানভাবে গলা তুলে স্বয়ম্ভু বলে উঠল, 'কিন্তু তুমি তো সেরকমই বলছ তমাল!'

-এটা তুমি এইভাবে ইন্টারপ্রেট করছ।

-বেশ তো। তাহলে আসল কথাটা বলো।

কে খুন করল?

-আমি জানি না। বিশ্বাস কর আমি জানি না। হ্যাঁ, এটা সত্যি আজ তর্পণার জন্য আমার

একটা সফট কর্নার আছে। কিন্তু তাই বলে অরুণাকে....! একটা সময় আমি সত্যিই ওকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম ভোলাদা।

-এই শাট আপ। বলেছি না, এই নামটা তোমার মুখে মানায় না।

-সরি। বাট আমি খুন করিনি। বিলিভ মি।

-শিবাঙ্গী।

-স্যার।

-একবার পাড়িয়াকে ডাকো তো।

-এখুনি ডাকছি।

শিবাঙ্গী বেরিয়ে যেতেই তমালের দিকে কঠিন লাল চোখে চেয়ে স্বয়ম্ভু বলে, ‘তমাল, তদন্ত শুরু হয়ে গেছে। আর সেটা আমিই করছি। অফিসিয়ালি। এই অঘটনটা তুমি যদি সত্যিই ঘটাও তাহলে বেশিদিন বাইরে থাকবে না। যাবার আগে নিজের ফোনটা নিয়ে নেবে।' অনেকক্ষণ একটা শ্বাস আটকে বসেছিল তমাল। এবার সেটা ছাড়ল। পাড়িয়াকে নিয়ে ঢুকে এল শিবাঙ্গী। ‘স্যার ডাকছিলেন?' পাড়িয়ার প্রশ্নে উঠে দাঁড়াল স্বয়ম্ভু। 'হ্যাঁ। তমালকে আপাতত ছেড়ে দিন। আর ওর ফোনটাও দিয়ে দিন।'

-ছেড়ে দেব?

পাড়িয়া অবাক হয়ে বললেন। 'হ্যাঁ দেবেন।' গোয়েন্দার হুকুমের ওপর প্রশ্ন তোলায় একটু ক্ষুণ্ণই হয়েই উত্তরটা দিল স্বয়ম্ভু। বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নেড়ে ‘ওকে স্যার' বললেন পাড়িয়া। ঠোঁটের কোণায় হাসিটা রেখে বুঝিয়ে দিলেন যে গোয়েন্দার আত্মীয়কে যে ধরে রাখা যাবে না সেটা তিনি জানতেন। স্বয়ম্ভু বুঝে ফেলল পাড়িয়ার মনের কথা। কিন্তু কিছু বলল না। যাবার আগে তমালকে বলল স্বয়ম্ভু, ‘তদন্ত চলাকালীন স্টেশন লিভ করবে 'না।'

-অরুণাকে কখন...?

লজ্জায় আর প্রশ্নটা পুরো করতে পারল না তমাল। স্বয়ম্ভুও মাথা নেড়ে উত্তর দিল, ‘তোমার হাতে আমরা কেউই অরুণাকে হ্যান্ডওভার করব না। কাল সকালে যোধপুর পার্কের বাড়িতে পাঠানো হবে। সেখানে এসো।' মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল তমাল। শিবাঙ্গীকে প্রশ্ন করল স্বয়ম্ভু, ‘কী মনে হল শিবাঙ্গী?' একটু ভেবে জবাব দিল, ‘সম্পর্ক খারাপ হতেই পারে। কিন্তু তাই বলে এই লোকের পক্ষে খুন করাটা...' মুখের নেতিবাচক অভিব্যক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে তমালের পক্ষে খুন সম্ভব নয়। ‘তবে...' আরও বলল শিবাঙ্গী, ‘তর্পণা করাতেই পারে। মানে চান্স আছে। সে কেমন মেয়ে এখনও আমরা জানি না। তবে আরও একটা ব্যাপার খটকা লাগছে স্যার।'

-পায়ের নীচে পাতার চিহ্ন!

-হ্যাঁ স্যার।

-দেখো তর্পণা যদি ডেঞ্জারাস কোনও খুনি হয় মানে যারা মানুষ মেরে পুলিশকে চ্যালেঞ্জ জানায়, আমায় ধরে দেখা শালা পারিস কিনা, এমন হলে সে পাতা আঁকতেই পারে নিজের পরিচয়ের সংকেত হিসেবে। কিন্তু, সে সম্ভাবনা নিতান্তই কম। কারণ ও খুব ভালো করেই জানে তমালের কাছ থেকে বা অরুণার আগের বলা কথা থেকে ওর নামটাই সবার আগে উঠে আসবে।

কথার ধরতাইটা শিবাঙ্গীই ধরল। ‘তো সেক্ষেত্রে এমন কেউ মেরেছে যে তর্পণাকে ফাঁসাতে চাইছে!”

-হুম! কিন্তু অরুণাকে মেরে তর্পণাকে ফাঁসাতে চাইবে কে? এদের সাথে তার সম্পর্কই বা কী?

-পুরনো কোনও বন্ধু!

-বন্ধু না শত্রু?

-একটা মানুষের গোপন থেকে গোপনতম তথ্য জানতে হলে আগে বন্ধু হতে হয়।

স্বয়ম্ভু ঠোঁট বেঁকিয়ে আড়চোখে চেয়ে হাসল। বলল, 'আমার সঙ্গে থেকে থেকে বুদ্ধিটা

বেশ খুলেছে দেখছি।' শিবাঙ্গীও অমনি কপট অভিমানে বলে বসল, 'তবুও তো মাংসের খিচুড়ি খেতে আমায় ডাকেন না।' চোখ পাকায় স্বয়ম্ভু। বলে, 'চলো তোমায় বাড়িতে নামিয়ে দিচ্ছি।' শিবাঙ্গী বলল, 'দরকার হবে না স্যার। আমি চলে যেতে পারব।'

-আমি জানি। তবু আমিই পৌঁছে দেব। নেমন্তন্ন না করার পাপটা যদি একটু হলেও কমে। চলো।

বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়েও এমন করে রসিকতা করার গুণটা বেশ ভালো লাগে শিবাঙ্গীর। আর একটিও কথা না বাড়িয়ে গুটিগুটি স্বয়ম্ভুকে অনুসরণ করল শিবাঙ্গী।

বাড়িতে ফিরে ঘুমোতে পারল না স্বয়ম্ভু। সুচিত্রা দেবীর সঙ্গে ফোনে এক চোট কথা বলে মাসি-মেসোর অবস্থা জানতে চাইল। তারপর স্নান সেরে আবার ল্যাপটপ খুলে বসল। থানা থেকে দেওয়া পেনড্রাইভটা লাগাল। সিসিটিভি ফুটেজগুলো চালিয়ে ভালো করে দেখতে থাকল। গাড়িটা শিয়ালদার গলি থেকে বেরিয়ে ডানদিকে টার্ন নিল। কিছুটা যেতেই সিসিটিভির নাগালের বাইরে চলে গেল। ভিডিয়ো ফুটেজটা খানিকক্ষণ আগুপিছু করে, জুম করে ভালোভাবে দেখতে থাকল। তারপর বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে ল্যাপটপের স্ক্রিনটা নামিয়ে দিল। ফোনটা হাতে তুলে কল করল। 'এত রাতে ফোন করার জন্য এক্সট্রিমলি সরি দিব্যেন্দুবাবু।' ফোনের ওপার থেকে বিনয়ের সঙ্গে উত্তর এল, 'না না স্যার, নো প্রবলেম, প্লিজ বলুন।' একটা সময়ে বয়সে বড় ব্যক্তির থেকে স্যার সম্বোধনটা শুনতে বেশ অস্বস্তি হত। এখন স্বয়ম্ভুর অভ্যেস হয়ে গেছে। 'আপনি কালকেই মৌলালি চত্বর থেকে রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড হয়ে গাড়িটা কোনদিকে গেছে তার সিসিটিভি ফুটেজগুলো জোগাড় করুন। যদি গলির ভেতর ঢুকে পড়ে তাহলে নাও পেতে পারেন। দেখুন কতটা পান?'

-ওকে স্যার।

-ও হো শুনুন, মৌলালি নয়। শিয়ালদা থেকে মেন রোডের ওপর যে কটা সিসিটিভি আছে সবকটার ফুটেজ আমার চাই।

-ওকে স্যার।

ফোনটা কেটে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল স্বয়ম্ভু। সারাদিনের ধকলের পর বিছানায় পিঠটা দিতেই শরীরের পেশিগুলো যেন সমস্বরে 'আআআআহহহ!' বলে শ্বাস ছাড়ল। ঠিক তখনই আবার মোবাইলটা বেজে উঠল। শিবাঙ্গী কলিং। এত রাতে শিবাঙ্গীর ফোন! 'হ্যাঁ বলো।' ফোনের ওপার থেকে শিবাঙ্গী বলল, 'সরি স্যার এত রাতে ডিস্টার্ব করছি।'

-ও ডিস্টার্ব করতে ফোন করেছ? তাহলে গুড নাইট! কাল কথা হবে।

-না না স্যার শুনুন।

-বলছি তো বলো।

-ওই ড্রাইভারের ট্রেস পাওয়া গেছে।

-কোন ড্রাইভার?

-ওই যার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।

স্বয়ম্ভু তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসে। 'কীভাবে? কোথায়?'

-আজ বিকেলে কবরডাঙ্গা থেকে গাড়ি আর ড্রাইভারকে উদ্ধার করা হয়।

-ও বাবা! সে তো সাউথ I

-হ্যাঁ স্যার। শুধু তাই না, সকাল থেকে গাড়িটাকে একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকাল লোক গাড়ির কাচের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে ড্রাইভার সামনের সিটের নীচে গুটিয়ে পড়ে আছে। ভয় পেয়ে লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। সেখান থেকে লোকটাকে উদ্ধার করে পুলিশই বাঙুর হসপিটালে ভর্তি করে। খুবই খারাপ অবস্থা। জ্ঞান ফেরেনি।

-এক সেকেন্ড শিবাঙ্গী। সামনের সিটের নীচে লোকটা পড়েছিল?

-হ্যাঁ সেরকমই তো বলল ওর বাড়ির লোক।

-তুমি বাড়িতেও যোগাযোগ করেছিলে?

-হ্যাঁ স্যার। আসলে আমার এক বন্ধু ওই ক্যাব কোম্পানিতে কাজ করে। গাড়ির নম্বর

দিয়ে আমি ওকে বলে রেখেছিলাম। কোনও খবর পেলেই জানাবি। ও আমায় আধঘণ্টা আগে ফোন করে বলল পুলিশ নাকি ড্রাইভারের ফোন খুঁজে না পেয়ে কোম্পানিকে জানিয়েছিল। গাড়ি থেকে ড্রাইভারের লাইসেন্স, আই কার্ড সব পেয়েছে। পুলিশ ওর বাড়িতে লোক পাঠিয়ে জানিয়েছে ওর হাসপাতালে ভরতি হওয়ার কথা। ওর বউয়ের নম্বরও নিয়েছে। সেখানে ফোন করেই সব জানলাম।

-ব্যাপারটা কীভাবে হল কিছু জানা গেছে?

-না স্যার। লোকটার খুব খারাপ অবস্থা। সম্ভবত অনেক বেশি পরিমাণে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করা হয়েছিল।

-হুম। সেটা একবার নয়, দুবার তো দিয়েছেই। তিনবারও হতে পারে নইলে এতক্ষণ ধরে অজ্ঞান হয়ে থাকার কথা নয়। লোকটা যে বেঁচে আছে এই অনেক। এক কাজ করবে শিবাঙ্গী, কাল সকালেই তুমি বাঙ্গুরে চলে যেও। নিজে দেখো। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে জানাও আমায়। যদি বোঝো লোকটিকে অন্য কোনও ভালো হাসপাতালে ট্রান্সফার করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবে। ড্রাইভারকে বাঁচাতেই হবে। একমাত্র ওই আমাদের বলতে পারে ঠিক কী ঘটেছিল!

-ইয়েস স্যার।

-আমায় কাল একটু শ্মশানে যেতে হবে।

-ওকে স্যার।

-আর শোনো, তুমি অফিসে যা বলো, বলো। পার্সোনালি ফোন করে সব সময় স্যার স্যার কোরো না তো। এদিকে মাংসের খিচুড়ি খেতে চলে আসছে ওদিকে আবার স্যার স্যার করে মাথা খাচ্ছে। স্বয়ম্ভুদা বলবে৷

-দাদা!

স্বয়ম্ভু স্পষ্ট দেখতে পেল শিবাঙ্গীর ভুরুতে বিকট একটা ভাঁজ পড়েছে। মুখে অপছন্দের অভিব্যক্তি। ‘পছন্দ হল না?

-না না স্যার, সরি, স্বয়ম্ভুদা।

-টাটা গুড নাইট।

ফোনটা কেটে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল ঠিকই কিন্তু স্বয়ম্ভুর চোখে ঘুম এল না। অজস্র প্রশ্ন ক্রমাগত পাক খেতে খেতে এক প্রবল ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে।

৭

স্বয়ম্ভু ভাবতেও পারেনি সোমবারের সকালটা এমন ফুলেলা শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু হবে। বাড়িতে মা নেই। বাইরের গেটের তালাটা আজ তাই স্বয়ম্ভুকেই খুলতে হবে। হাই তুলতে তুলতে দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরের দরজাটা খুলল। এগোতে গিয়েই পায়ে কী যেন ঠেকে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে এক তোড়া নানান রঙিন ফুলের বোকে। সঙ্গে গোলাপি রঙের চকচকে র‍্যাপারে মোড়া একটা মাঝারি বাক্স। হকচকিয়ে যায় স্বয়ম্ভু। তার জীবনে এমন সারপ্রাইজ দেবার মানুষ আপাতত নেই। তার ওপর সবেমাত্র কাল থেকে একটা খুনের তদন্তে জড়িয়ে পড়েছে সে। তাই মনের ভিতর থেকে কুডাকটাই বেশি করে শুনতে পেল। প্রথমেই অজানিত উপহার টপকে বাইরে এসে দাঁড়াল। আজ বেশ ভোরে উঠেছে সে। অরুণার বডি আনতে হবে। তারপর শ্মশানে যাবে। আলো ফুটলেও রোদ ওঠার সময় হয়নি। আজ আর সেটা উঠবে বলেও মনে হয় না। আকাশের মুখ বেশ ভার। বাইরের গেটের কাছে গিয়ে এপাশ ওপাশ ভালো করে দেখল। বাইরের গেটে তালা দেওয়া। সেটা টপকে ভিতরের দরজার কাছে কে রেখে গেল এমন উপহার? কাউকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে এল। হাত দেবে কি দেবে না ভেবেও ফুলের বোকেটা হাতে তুলে বাক্সটা তুলতে গেল। তখনই প্রথম চমকটা লাগল। বাক্সটা বেশ হালকা। কানের কাছে দুয়েকবার নাড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করল কী আছে। খড়খড় খটখট করে কিছু হালকা জিনিস নড়েচড়ে শব্দ করে উঠল। ঘরে এল স্বয়ম্ভু। ফুলের তোড়ার নীচে একটা কার্ড। সেখানে দোকানের নাম, হেভেন অফ ফ্লাওয়ারস। ঠিক তার নীচেই ছোট্ট ছোট্ট করে ইংলিশে লেখা ওনারের নাম, তর্পণা মিত্র। ভুরু দুটো কাছাকাছি চলে এল স্বয়ম্ভুর। এটাকে ঠিক কীভাবে দেখবে সে? মেঘ না চাইতেই জল? নাকি নতুন কোনও বিপদের সংকেত? স্বয়ম্ভুর আজকের প্রথম কাজই ছিল অরুণার শেষকৃত্য সেরে তর্পণার দোকানে ঢুঁ মারার। কিন্তু তার আগেই ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে এমন উপহার এসে পৌঁছল! তাও আবার তর্পণারই দোকান থেকে? ছোট্ট কার্ডটা খুলতেই লাল স্কেচ পেন দিয়ে ইংলিশে লেখা, বেস্ট অফ লাক। স্বয়ম্ভু বুঝল, খুনি সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে তাকে। অরুণার বডিটা এখনও ছাই হয়ে যায়নি। তাই কাকভোরে এই রসিকতায় স্বয়ম্ভু সেনের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। চোখ গেল উপহারের বাক্সের দিকে। কী আছে এতে? অপেক্ষা না করেই খুব সাবধানে র‍্যাপারটা খুলে ফেলল। একটা সাধারণ সাদা বাক্স। ঢাকনাটা খুলতেই এক গলা বমি উঠে এল স্বয়ম্ভুর। বিচ্ছিরি পচা গন্ধ নাকের ওপর ঝাপটা মারল। বাক্সটার মধ্যে এলোমেলো ছড়িয়ে আছে কারও পায়ের কাটা চারটে আঙুল। ক্ষয়ে আসা নেলপলিশ ইঙ্গিত করছে এটা কোনও মেয়ের পা। কোন মেয়ের পা সেটা বুঝতে একবিন্দু অসুবিধে হল না স্বয়ম্ভুর। রাতের খাবার পিত্তি সমেত উঠে এল বেসিনে। মুখের মধ্যে জলের ঝাপটা দিতে থাকে স্বয়ম্ভু। একচল্লিশ ইঞ্চি ছাতিটা রাগে ঘন ঘন ফুলে উঠছে। বেসিনের ওপর হাত রেখে সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইল স্বয়ম্ভু।

টেবিলের ওপর রাখা মোবাইলটা বাজছে। একবার বেজে কেটে গেল। স্বয়ম্ভু বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করে দেয়। মোবাইলটা আবার বাজে।

-হ্যাঁ তুহিনদা বলুন।

ফরেনসিক এক্সপার্ট ডক্টর তুহিনশুভ্র দাশগুপ্ত ফোন করেছেন। 'সরি স্বয়ম্ভু, ভোরবেলা বিরক্ত করছি।'

-বলুন।

-এমন মার্ডার আমি জন্মে দেখিনি।

-মানে?

-খুনি ভিক্টিমের হাত-পা দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছে। সেটা হাতের কবজি আর পায়ের গোছের কালশিটে দেখে যে কেউ বলে দেবে। তবে এরও আগে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করেছে।

-সেটাই স্বাভাবিক। গাড়ির ড্রাইভারও এই ক্লোরফর্মের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে

মরণাপন্ন হয়ে বাঙ্গুরে ভর্তি।

-কোন গাড়ি?

-যেটার ট্রেস পাওয়া যাচ্ছিল না। কাল রাতে শিবাঙ্গী জানায় সেটা পাওয়া গেছে।

ড্রাইভারের পুরো ঘটনাটা তুহিনকে জানায় স্বয়ম্ভু। 'যাই হোক, এবার আপনি বলুন।' তুহিনশুভ্র গলা ঝেড়ে বলতে শুরু করেন, 'হ্যাঁ বলছি। এরপর খুনি যেটা করেছে ভিক্টিমকে জুতোর বাড়ি মেরেছে।

-হোয়াট?

-তবে আর বলছি কী? কিন্তু খুনি এখানেও অদ্ভুত পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। সারা গায়ে আঘাতের যা প্রমাণ পেয়েছি তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে খুনি জুতো পরে ভিক্টিমের বড়ির ওপর একাধিকবার লাফিয়েছে। মানে বডির ওপর দাঁড়িয়ে জোড়া পায়ে লাফালে যে এফেক্ট হয় সেটা এবং অজস্রবার লাথিও মেরেছে। বুকের রিবসগুলো ভেঙে ঢুকে গেছে। এর মধ্যে দুটো রিবস ভেঙে ফুসফুসে ঢুকেছে। অ্যাটেলেক্টেসিস হয়েই সম্ভবত মৃত্যুটা হয়েছে। কিন্তু তারও আগে আততায়ী পেটের ওপর আঘাত করেছে। ছুঁচলো জিনিস দিয়ে প্রচণ্ড জোরে বারংবার আঘাতের ফলে পেটের প্রচুর জায়গায় মাসল রাপচার হয়েছে। বেশকিছু আর্টারি ছিঁড়েছে। ইউরিনারি ব্লাডার রাপচার হয়েছে তলপেটে লাফানোর ফলে। পেট, বুকের হাড় যেভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, মাংস যেভাবে থেঁতলেছে তাতে ভিক্টিমের বড়ির ওপর উঠে জোড়া পায়ে লাফানোর সম্ভাবনাই বেশি। এরই মাঝে কোনও এক সময়ে ধারালো কিছু দিয়ে দু-পায়ের চারটে করে আঙুল কেটে দিয়েছে। গলাও ছাড়েনি। তার ওপরও লাফিয়েছে। তাতে ট্রাকিয়া আর ফ্যারিংস দুটোই ভেঙে গেছে। মানে তোমার...

- শ্বাসনালী আর খাদ্যনালী।

মানেটা তুহিনশুভ্রকে স্বয়ম্ভুই বলে দিল। তুহিন বললেন, ''কারেক্ট কারেক্ট। এক্ষেত্রে গলার ওপর দুবারের বেশি লাফিয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ আমার অ্যাসাম্পশন বলছে মেয়েটির মৃত্যুর পরেও তার ওপর পাগলের মতো অত্যাচার চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

স্বয়ম্ভু দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজে এতক্ষণ সব শুনছিল। শেষ কথাটা শোনার পর কানের কাছ থেকে ফোনটা একবার সরিয়ে আবার কানে দিয়ে শোনে তুহিন বলে চলেছেন, 'স্বয়ম্ভু শুনতে পাচ্ছ?''

-এত রাগ কার?

কথাটা স্বগতোক্তির মতই শোনাল স্বয়ম্ভুর মুখে। উত্তর দিলেন তুহিনশুভ্র, 'আমার মনে হয় খুনি কোনও মেয়ে।'

-এ কথা কেন বলছেন?

-ভিক্টিমের সারা শরীরে যে জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে তাতে বহু জায়গায় ছুঁচলো কিছু দিয়ে গর্ত হয়ে যাবার চিহ্ন আছে।

-মানে স্টিলেটো টাইপ।

-এক্সাক্টলি।

-এমনও তো হতে পারে, জুতোটা অরুণারই ছিল।

-অরুণা!

হঠাৎ করে নামটা এসে পড়াতে একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন ডক্টর তুহিনশুভ্র। তারপরেই খেয়াল হল ভিক্টিম সম্পর্কে স্বয়ম্ভুর বোন। 'ও আচ্ছা। না, জুতোটা অরুণার নয় কারণ ওর যা পায়ের মাপ তাতে ছয় নম্বর জুতো হওয়ারই কথা। কিন্তু জুতোর ছাপ সাত কিংবা আটের কম হবে না। যদিও এক্ষেত্রে আমি ভুল হতেই পারি। কারণ শরীরটা অক্ষত থাকলে তাও সঠিক মাপটা পাওয়া যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে তো...।'

-সাত বা আট মানে তো বেশ লম্বা। তার মানে তার ওজনও খানিকটা বেশিই হবে।

-আমার অভিজ্ঞতা বলছে এক্ষেত্রে খুনির ওজন অবশ্যই পঁয়ষট্টির ওপরে। নইলে এর চেয়ে হালকা হলে খুন করবার জন্য অন্তত এক থেকে দেড় ঘণ্টা টানা প্রচণ্ড জোরে লাফিয়ে

যেতে হবে। সেক্ষেত্রে খুনির অবস্থাও শোচনীয় হয়ে যাবে।

-যদি মেয়ে হয় সেরকম কেউ...

স্বয়ম্ভু ভাবতে ভাবতেই তুহিন বলেন, 'আরও একটা ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে খুনি মেয়ে।'

-কী দেখে?

-এই কেসে রেপ হয়নি।

-সব পুরুষ খুনি তো রেপিস্ট নাও হতে পারে তুহিনদা।

-নিশ্চয়ই সেটা হতে পারে। তবে আমার অভিজ্ঞতা বলছে তার রেশিওটা অনেক কম। একজন পুরুষ একজন মেয়েকে কিডন্যাপ করে ব্রুটালি মার্ডার যখন করবেই তখন তার কামনা চরিতার্থ করবে না সেটা একটু এক্সেপশনাল।

-পুরোনো কোনও শত্রুতা।

বিড়বিড় করল স্বয়ম্ভু। কিন্তু কথাগুলো ঠিক মতো তুহিনের কানে পৌঁছল না।

-অ্যাঁ সরি?

-বলছি ধর্ষণের অভিসন্ধি যখন ছিলই না তখন গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যেত। কিন্তু তা করেনি। এতটাই চরম সেই প্রতিহিংসার আগুন যে পা দিয়ে থেঁতলে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঙুল কেটে তড়পে তড়পে একটু একটু করে মেরেছে। খুনি চেয়েছে অরুণা যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে মারা যায়। ঠিক যেভাবে অরুণা কাউকে...

বলতে বলতে থেমে গেল স্বয়ম্ভু। তুহিন বললেন, 'তুমি এরকম কোনও ঘটনা জানো?

-না দাদা, জানলে তো হয়েই যেত।

-আমি ভাবছি, কাটা আঙুলগুলো নিয়ে খুনি কী করবে?

বেশ চিন্তান্বিত গলায় ডাক্তার কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে রকেটের মতো জ্বলন্ত উত্তর ধেয়ে গেল স্বয়ম্ভুর দিক থেকে, 'শুভেচ্ছাবার্তা পাঠাবে।'

- অ্যাঁ?

-হ্যাঁ। আজ সকালে উঠেই পেয়েছি।

-কী পেয়েছ?

তুহিনের গলায় প্রচণ্ড উত্তেজনা। স্বয়ম্ভু এখন নির্লিপ্ত। উত্তর দিল, 'এক তোড়া ফুল, বেস্ট অফ লাক লেখা একটা কার্ড আর একটা বাক্সবন্দী অরুণার একটা পায়ের চারটে আঙুল।'

-হোয়াট দ্য... কী বলছ স্বয়ম্ভু? আঙুলগুলো এখন...

-আমার বাড়ির টেবিলে।

হঠাৎ মাথার মধ্যে বিদ্যুতের ঝলকের মতো একটা প্রশ্ন খেলে যায় স্বয়ম্ভুর। খুনি তাকে চারটে আঙুল পাঠিয়েছে। তাহলে বাকি চারটে কোথায়? কার কাছে? শিবাঙ্গী? সেও তো এই তদন্তের একটা অংশ।

তুহিনের ফোন রেখেই শিবাঙ্গীকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে সে কোনও এমন উপহার পেয়েছে কিনা। শিবাঙ্গী তো অবাক। বিছানা ছেড়ে উঠে সেও ঘরের দোরে, বাইরের রাস্তায়, জানলায় ভালো করে দেখে কোত্থাও কিছু নেই। স্বয়ম্ভুর চিন্তা আরও বেড়ে যায়। রহস্যের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে আবার কী একটা মনে পড়াতে তুহিনশুভ্রকে ফোন করে স্বয়ম্ভু, —ওই কাগজটা সম্পর্কে কিছু বললেন না তো?"

-এ হে, দেখেছ সত্যিই এবার আমার বয়স হচ্ছে। ওই কাগজে ভিক্টিমের রক্তই লেগে আছে।

-আন্দাজ করেছিলাম। শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না রক্তাক্ত লাশের সঙ্গে একটা কাগজ এল অথচ কাগজে লাগল মাত্র এক বিন্দু রক্ত। কীভাবে?

-তুমি কী শিওর স্বয়ম্ভু ওটা লাশের সঙ্গেই এসেছে?

-উঁ? না শিওর নই তবে সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারছি না। কারণ ওইখানে এই রকম আর একটা কাগজও পড়ে ছিল না। ঠিক আছে তুহিনদা এখন রাখি।

অরুণাকে এবার আগুনের মধ্যে ঠেলে দিতে হবে। মেয়ের মাথায় হাত রেখে পুলকেশ কাঁদছে হাউহাউ করে। মেয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার পর দু-বছর কোনও সম্পর্ক রাখেনি। পরে সুমিত্রা দেবীর পীড়াপীড়িতে নতুন করে যোগাযোগ তৈরি হয়। এখন হয়তো আফশোস হচ্ছে তার। মনে মনে ক্ষমা চাইছে মেয়ের কাছে। স্বয়ম্ভু কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। কিন্তু সেও আর সহ্য করতে পারছে না। চোখটা অন্যদিকে ঘোরাতেই একজনের ওপর গিয়ে চোখটা আটকে গেল। আত্মীয়স্বজনের থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে একভাবে মৃতা স্ত্রীর দিকে চেয়ে আছে তমাল। স্বয়ম্ভু এগিয়ে গেল। শ্যালককে দেখেই চোখটা সরিয়ে নামিয়ে নিল। স্বয়ম্ভু কাছে গিয়ে বলল, 'অরুণা চলে যাচ্ছে। একবারও যাবে না?' তমাল নির্বাক।

-আজ না হয় ভালোবাসো না। একদিন তো বাসতে। সেই অধিকারেই.... কথা শেষ করতে না দিয়েই তমাল বলে উঠল, 'এইভাবে অরুণাকে আমি দেখতে পারব না। তার চেয়ে দূর থেকেই... ।' কেঁদে ফেলল তমাল। মুখ নামিয়ে ঘাড় গুঁজে কেঁদে চলেছে। স্বয়ম্ভুর ভীষণ ইচ্ছে করছিল কিছু প্রশ্ন করতে। কিন্তু পারল না। গোয়েন্দার মনও সায় দিল না। শ্মশানের বাইরের দিকে চোখ পড়তেই দেখল খানিকটা দ্রুত পা চালিয়ে শিবাঙ্গী আসছে। একটু অবাকই হল। স্বয়ম্ভুও এগিয়ে গেল শিবাঙ্গীর দিকে। ওর তো বাঙ্গুর হাসপাতালে যাবার কথা ছিল। তাহলে শ্মশানে!

-কী ব্যাপার শিবাঙ্গী? তুমি যাওনি?

শিবাঙ্গী হাঁফাচ্ছে। 'হ্যাঁ স্যার। বাঙ্গুর থেকেই আসছি।'

-কী খবর?

-খুবই বাজে খবর।

-বেঁচে নেই তো?

-আমি সকাল আটটা নাগাদ পৌঁছোই। গিয়ে দেখি ড্রাইভারের স্ত্রী বুক চাপড়ে কাঁদছে। ডাক্তার বললেন, পনেরো মিনিট আগেই মারা গেছে।

হাতের পাখি উড়ে যাওয়ায় ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ল স্বয়ম্ভু। হাত মুঠো করে বাতাসের গায়ে আঘাত করল। 'মারা যাবার আগে কিছু বলেছিল? জিজ্ঞেস করেছ?'

-করেছি স্যার। কিচ্ছু বলেনি। বলার মতো অবস্থাতেই ছিল না। মাল্টি অর্গান ফেইলিওর।

বলেই চাপাস্বরে শিবাঙ্গী জানাল, 'স্যার, অরুণাকে...'।

স্বয়ম্ভু পিছনে তাকাল। কোলাপসেবল খুলে চুল্লির কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অরুণাকে। পুলকেশের দিকে দৌড়ে গেল স্বয়ম্ভু। ভেঙে পড়া মানুষটাকে সামলাতে হবে।

৮

কোন সুদূরে ঘন কালো মেঘ ঘনিয়েছে। চোখের মণিদুটো সেইদিকেই স্থির হয়ে আটকে আছে। মেঘের কুণ্ডলীটা কি এর মধ্যেই ধেয়ে আসছে সুস্মিতার দিকে?

-সুস হল?

প্রিয়াংশুর গলাতে চটক ভাঙল সুস্মিতার। পাঁউরুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে সুস্মিতা। এখন প্রেমিকের ডাকে যে বিপত্তিটা ঘটার ছিল সেটাই ঘটে গেল। ধারালো ছুরিটা পাঁউরুটির গায়ে না ঘষে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ওপর ঘষে দিল। 'আহ' করে উঠল সুস্মিতা। 'কী হল?' বলে প্রিয়াংশু তাকাল। বুড়ো আঙুল দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। 'উফফফ, আজকাল কী যে হয়েছে তোর! কতবার বলেছি তোকে একটা বাটার নাইফ অর্ডার দে।' প্রিয়াংশু রক্তাক্ত আঙুলটা দেখেই ওয়াল ক্যাবিনেটের দিকে ছুটল ওষুধের বাক্সটা আনতে। 'কাজের সময় মন কোথায় থাকে?' কথার ওপর দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দে ড্রয়ারটা খুলে গেল। সুস্মিতা বুড়ো আঙুল চুষে চলেছে। প্রিয়াংশু সবে ওষুধের বাক্সটা নিয়ে এসে টেবিলে রেখেছে অমনি কলিং বেলটা বেজে উঠল। 'ধুত্তেরি, এই তাড়াহুড়োর সময় কে আবার এল?' ঠকাস করে টেবিলে মেডিসিন বক্সটা রেখেই দরজা খুলতে ছুটল প্রিয়াংশু।

পাঁউরুটির ওপর কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়েছে দেখে সুস্মিতার মুখটা একটু ব্যাজার হয়ে গেল। সরিয়ে রাখল সেটা। পায়ের কাছে মোটাসোটা বেড়ালটা বসে দুবার মিউ মিউ করে ডেকে উঠল। সকরুণ দৃষ্টিতে বেড়ালটার দিকে চাইল সুস্মিতা। খিদে পেয়েছে বোধহয়। তারপর নিজেই ওষুধের বাক্স খোলার চেষ্টা করল। ওদিকে দরজা খুলতেই একটি ছেলের গলা, 'সুস্মিতা মুখার্জি?'

-হ্যাঁ।

-পার্সেল আছে।

প্রিয়াংশু দ্রুততার সঙ্গে সই করে নিয়ে নিল। দরজা বন্ধ করে টেবিলে পার্সেলটা রাখতে রাখতে প্রিয়াংশু দৌড়ে এল, 'আরে দাঁড়া আমি করে দিচ্ছি।'

-তোর লেট হয়ে যাবে খেয়ে নে। আমি করতে পারব।

-হ্যাঁ তার নমুনা তো দেখতেই পাচ্ছি। তোর একটা পার্সেল এসেছে? -কে পাঠাল?

-নিশ্চয়ই কিছু অর্ডার করেছিলি।

আবার মিউ মিউ ডাক। প্রিয়াংশু জিজ্ঞেস করল, 'ওকে খেতে দিসনি? ডাকছে খালি।' কথাগুলো কানে গেল কি সুস্মিতার? না বোধহয়। আপন মনে বলে উঠল, 'অর্ডার!' মগজের ভিতরে তল্লাশি শুরু করল সুস্মিতা। প্রিয়াংশু বলল, 'আসলে এত অর্ডার করিস মনে থাকে না। এমনি এমনি আমার অ্যাকাউন্ট খালি হয়?'

-শাট আপ। আমি যা করি নিজের রোজগারে। আমার বুটিক খুব একটা খারাপ চলে না প্রিয়াংশু!

-তাহলে আমার পয়সাগুলো যাচ্ছে কোথায় বল তো?

সুস্মিতার আঙুলে ব্যান্ডেড লাগাতে লাগাতে কথার পিঠে কথা বলেই চলেছে প্রিয়াংশু। তবে সুস্মিতার গলা এবারে একটু অন্যরকম শোনাল, 'কোথায় যাচ্ছে সেটা কি আমায় বলে দিতে হবে?'

চুপ করে গেল প্রিয়াংশু। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। চাপাস্বরে বলল, 'দায়টা কি তোদেরও নয়?' চোখ পাকিয়ে 'আচ্ছাআআআআ!' বলে বিস্ময় প্রকাশ করল সুস্মিতা। 'এটা আমাদের দায়? আমরা কেউ তোকে বলেছিলাম এই ঘটনাটা ঘটাতে? কথায় বলে পাপ বাপকেও ছাড়ে না।'

-থাক না। সাত সকালে আমার এসব ভাল্লাগছে না।

ওষুধের বাক্সটা বন্ধ করে ড্রয়ারের দিকে এগিয়ে যায় প্রিয়াংশু। সুস্মিতার চোখে আবারও ঘন মেঘের ধূর্জটি। প্রিয়াংশুর থেকে বেশি কালিবর্ণ হল সুস্মিতার মুখ।

-কী ভাবছিস আবার?

-অরুণাকে কে মারল প্রিয়াংশু?

প্রিয়াংশু স্তম্ভিত। ‘কেনই বা মারল? কে ফোন করে বেড়ালের ডাক শোনাল?' আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে সুস্মিতার চোখে চোখ পড়তেই প্রিয়াংশু থমকে গেল। এ কী! সুস্মিতা এইভাবে প্রিয়াংশুর দিকে কেন তাকিয়ে আছে?

ম্যাওওওওও...!

গড়িয়াহাটের নাগরিক কোলাহলের বাইরে হেভেন অফ ফ্লাওয়ারস। মেন রোড থেকে একটু ঢুকে ফুলের সম্ভার সাজিয়ে বসেছে তর্পণা মিত্র। স্বয়ম্ভুর গাড়িটা দোকানের সামনে এসে থামল। ক্রেতা নেই। কেবল একজন সাজগোজ করা মহিলা কিছু নতুন ফুল সাজাচ্ছেন। সঙ্গে একটি অল্প বয়সী মেয়ে মহিলাটিকে হেল্প করছে। শিবাঙ্গীকে নিয়ে এগিয়ে এল স্বয়ম্ভু। মহিলাটি কাজ করতে করতে বাইরের দিকে তাকাতেই একটু থমকে গেলেন। ছোট মেয়েটিকে কী যেন বললেন। তারপর নিজেই হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। স্বয়ম্ভু সবে তার আই কার্ড বের করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই মহিলাটি বলে উঠলেন, ‘কার্ড দেখাবার প্রয়োজন নেই।' শুরুতেই চমকে দিলেন মহিলাটি। ছোট মেয়েটি দোকানের বাইরে বেরিয়ে গেল। মহিলা বললেন, ‘স্বয়ম্ভু সেন, গোয়েন্দা লালবাজার।' স্বয়ম্ভু অবাক হয়ে একবার দৃষ্টি বিনিময় করল শিবাঙ্গীর সঙ্গে। শিবাঙ্গীও আড়চোখে স্বয়ম্ভুর দিকে তাকাল। ‘তবে ম্যাডামের নামটা আমার জানা নেই।' মহিলাটি বললেন।

-শিবাঙ্গী বসু। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর। লালবাজার। শিবাঙ্গী আত্মপরিচয় দিল।

মহিলাটি হাত জোড় করে বললেন, ‘নমস্কার। প্লিজ আসুন।' দোকানে ঢুকতে ঢুকতেই চারপাশে চোখ চালিয়ে বলে উঠল, 'আপনি নিশ্চয়ই মিস তর্পণা মিত্র?’'

-হ্যাঁ।

-তমাল তাহলে সবই বলেছে?

একটু থমকে গেলেন তর্পণা। উত্তর দিলেন না। বললেন, 'বসুন আপনারা।' মহিলাটি বেশ এলিগেন্ট দেখতে। পরিপাটি করে শাড়ি পরেছেন। কাঁধ ছাপানো সটান চুল। পিঠের কাছে ইউ শেপ। যাকে বলে চাবুক ফিগার, তর্পণা সেরকমই। ঠোঁটের নীচে বাঁদিকের থুতনিতে একটা তিল। গালদুটো ঢলঢলে। চোখদুটো বড় বড়। ভুরুর মাঝে কালো টিপ, মাঝারি মাপের। গলার সরু চেনটা ছোট্ট লকেট সমেত বুকের বিভাজিকা পর্যন্ত নেমেছে নদীর ঢেউয়ের মতো নকশা করে আঁচল উঠে গেছে তারই একটু নীচ দিয়ে। স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গীর সামনে পায়ের ওপর পা তুলে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে তর্পণা। শিবাঙ্গী এক ঝলক ঝাঁ চকচকে তর্পণার পায়ের দিকে দেখে নেয়। একটু হতাশই হয়। স্টিলেটো নয়। সামান্য হিল আছে। তর্পণার উচ্চতা খুব বেশি হলে পাঁচ সাড়ে পাঁচ মতো।

-ঘটনাটা ঘটার পর থেকে তমাল আমার ফোনই তুলছে না।

প্রশ্ন করার কিছুক্ষণ পরে উত্তর আসায় স্বয়ম্ভু একটু মুচকি হাসল। বলল, ‘‘তাহলে কী করে জানলেন যে আমরা এখানে আসব?’’

-বলতে পারেন আমার সিক্সথ সেন্স।

-কেন?

-শুরু থেকেই আমার আর তমালের ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে প্রবলেম ছিল অরুণার।

-তা সত্ত্বেও এগিয়ে গেলেন?

তর্পণা স্বয়ম্ভুর চোখের দিকে একবার চাইল। তারপর বলল, 'আমি এগোইনি। তমালই তার লাইফ নিয়ে ডিস্টার্বড ছিল। ক্রমশ ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছিল। আমার এখানে আসা শুরু করল। আমি বুঝতে পারতাম ও ভেতর থেকে ভেঙে পড়ছে। আমি গল্প করে, হাসি-ঠাট্টা করে ওকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম। ওর খুব ভালো লাগত। তমাল একটা খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল তখন।

-আর অমনি আপনি সেই খড়কুটোটা হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপ রইলেন তর্পণা। এই সময়েই স্বয়ম্ভুর ফোনে কিছু একটা আসে। চোখ নামিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে স্ক্রোল করে দেখে নেয় কয়েক ঝলক। তারপর বলে, 'চুপ করে গেলেন যে।'

-আমার কিছু বলার নেই স্বয়ম্ভুবাবু। হ্যাঁ, আমি সেই খড়কুটো হলাম। কারণ মানুষটাকে দেখে আমার খুব খারাপ লাগত। একটা সময়ে ওর বাঁচার ইচ্ছেটাই চলে গেছিল। আমি তমালকে বাঁচিয়ে রেখেছি।

-তমালকে বাঁচাতে গিয়ে অরুণাকে মেরে ফেললেন তো!

ধাক্কা লাগে তর্পণার। পরক্ষণেই আলগা চালে একটা হাসি ছুড়ে বলেন, 'আমি অরুণাকে মেরেছি? তাও আবার ওইভাবে?''

-কীভাবে?

-সারা কোলকাতা শহর জানে অরুণাকে কীভাবে ব্রুটালি মার্ডার করা হয়েছে।

কথাটা ঠিক। স্বয়ম্ভু মনে মনে বেশ কয়েকটা কাঁচা খিস্তি ছুড়ে দিল মিডিয়াগুলোর উদ্দেশে।

-কে খুন করল বলুন তো?

স্বয়ম্ভু এমনভাবে প্রশ্ন করল যেন তর্পণা কোনও একটা উত্তর কোলকাতাইয়া রকে বসে তার সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে খোশগল্প করছে। তর্পণা অবাক হয়ে বলল, 'সেটা আমি কী করে জানব? আপনার কী মনে হয়, আমি খুন করেছি?''

-জানি না। জিজ্ঞেস করছি।

-আপনি গোয়েন্দা হয়ে যেটা জানেন না, সেটা আমি সামান্য ফ্লোরিস্ট হয়ে জানব?

-আসলে ফুলেই তো কাঁটা থাকে তর্পণা ম্যাডাম।

-বেশ। তাহলে আমায় অ্যারেস্ট করুন। আর কী বলব বলুন।

-হুমম। আচ্ছা আপনার এই ফুলের দোকান কদ্দিনের?

দুম করে প্রসঙ্গ পালটে যাওয়ায় হকচকিয়ে গেলেন তর্পণা। আমতা- আমতা করে ভেবে বললেন, 'এই তো বছর আড়াই হল।'

-বাড়িতে কে কে আছে আপনার?

-কেউ নেই।

-একা থাকেন?

-হুম। ছোটবেলাতেই বাবা মারা গিয়েছিল। আর এই কোভিডে মা চলে গেল। তারপরেই দোকানটা খুললাম।

-বিয়ে করবেন না?

এবার থমকে গেলেন তর্পণা। একটু ভেবে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'বোধহয় না।'

-কেন?

-থাক না স্বয়ম্ভুবাবু, আমি বিয়ে করব কিনা সেটা নিশ্চয়ই এই কেসের সঙ্গে জড়িত নয়।

-তাই কী?

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে একটু গরম বিরক্তি সুরেই বললেন তর্পণা, 'বললাম তো, তাহলে আমায় অ্যারেস্ট করুন।'

স্বয়ম্ভু আবারও একটা পিত্তি জ্বলানো হাসি হাসল। টুং করে মোবাইলে শব্দ হল। স্বয়ম্ভু মোবাইলটা বের করতে করতে খুব গাছাড়া ভাব নিয়েই বলল, 'বাই দ্য ওয়ে, আপনার পাঠানো উপহারটা খুব ভালো ছিল তর্পণা।'

ভুরুজোড়ার মাঝে কালো টিপটার নীচের চামড়া কুঁচকে গেল। তর্পণা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমার পাঠানো উপহার মানে?' মোবাইল থেকে মুখ তুলল স্বয়ম্ভু। সন্দিগ্ধ চোখে বিস্ময় নিয়ে সেও পালটা প্রশ্ন করল, 'সেকি আজ সকালে আপনি আমায় উপহার পাঠালেন ভুলে গেলেন?'

-সরি, আমি কোনও উপহার পাঠাইনি। তাছাড়া আপনার বাড়ির ঠিকানা তো আমি জানিই না। আমি কী করে...?

-আমি তো একবারও বলিনি যে আমার বাড়িতে উপহারটা এসেছে। আপনি জানলেন কী করে?

মুহূর্তের মধ্যে তর্পণার মুখে মেঘ জমল যেন। উত্তর দিতে গিয়ে হোঁচট খেলেন, 'না মানে, লোকে তো বাড়িতেই সাধারণত এসব গিফট-টিফট পাঠায় তাই...।'

কথার খেই ধরে বলে উঠল স্বয়ম্ভু, 'বিশেষ করে আপনার প্রোমোশনাল প্ল্যানগুলো এরকমই হয়। একজনের বাড়ির অ্যাড্রেস আরেকজনের থেকে জেনে সারপ্রাইজ গিফট পাঠিয়ে দেন। তাই না মিস তর্পণা?' ফ্লোরিস্ট ম্যাডামের নামটা একটু রহস্য করেই বলল স্বয়ম্ভু। এবার তর্পণার গলায় মেঘ ডাকল, 'দেখুন স্বয়ম্ভুবাবু, আমি সত্যিই আপনাকে কোনওরকম গিফট পাঠাইনি।' পকেট থেকে ফুলের সঙ্গে পাওয়া কার্ডটা স্বয়ম্ভু বাড়িয়ে দিল, 'দেখুন তো, এটা আপনার দোকানেরই তো।' তর্পণা দেখে সম্মতি জানাতে এক মিনিটও সময় নিল না। বলল, 'আমার দোকান থেকে অনেকেই ফুল কেনেন। এটা কে কিনে আপনাকে দিয়েছে সে আমি কেমন করে জানব?'

-কাস্টমারদের লিস্ট থাকে তো? শিবাঙ্গী প্রশ্ন করল। তর্পণা বললেন, 'লিস্ট বলতে ক্যাশ মেমো। আপনারা চাইলে দেখতে পারেন।'

-তাতেই বা কী লাভ? কার্ডে সেন্ডারের নাম তো আর লেখা নেই। স্বয়ম্ভু বলল। অমনি তর্পণা বললেন, 'দ্রু। তাছাড়া আমাদের কাছে তাদেরই ঠিকানা থাকে যারা অনলাইনে কিছু বুক করেন। এসে কিনে নিয়ে গেলে সেটাও থাকে না।' মেঘ কেটে তর্পণার গলার এবার বেশ স্বাভাবিক স্বর ফিরে এসেছে। দুম করে শিবাঙ্গী বলল, 'স্যার, আমার মনে হয় লাস্ট তিনদিনে কে কে কীভাবে অনলাইনে এবং অফলাইনে ফুল কিনেছেন তাদের ক্যাশ মেমো, ঠিকানা সবকিছু আমাদের কাছে থাকা দরকার।' স্বয়ম্ভূ আবার কিছু চেক করছিল মোবাইলে। চেক করতে করতেই বলল, 'বেশ তো। নিয়ে নাও।' তর্পণার ভুরুতে আবার ভাঁজ পড়ে। নজর এড়ায় না শিবাঙ্গীর।

এই সময় দোকানের কম বয়সী মেয়েটি ঢুকে আসে। দুহাতে ধরা একটা প্লেট। তাতে দুটো প্যাটিস, দুটো কেক আর দুটো কোল্ডড্রিংস। মেয়েটির গায়ে ফুল ফুল ছাপের লং স্কার্ট। গায়ের রংটা হালকা চাপা। ঢেউ খেলানো মোটা গোছের চুল। ডানদিকে সিঁথি। বিনুনি বাঁধা। পা-টা খেয়াল করল শিবাঙ্গী। তার পায়েও নরমাল ফ্ল্যাট জুতো। আকারেও ছোট। কারণ মেয়েটির উচ্চতা বেশি নয়। তর্পণা খাবার অফার করায় স্বয়ম্ভু বলল, 'মাফ করবেন। আমরা কেউ কিচ্ছু খেতে পারব না।

-জানি। ডিউটিতে থাকলে কিছু অফার করা যায় না। কিন্তু তমালের শ্যালক আর তার বন্ধুকে তো অফার করতেই পারি, তাই না?

তর্পণার কথার প্যাঁচে মনে মনে হাসে স্বয়ম্ভু। অজান্তেই শিবাঙ্গীর একটা ভুরু কিঞ্চিৎ ওপরের দিকে উঠে যায়। 'সরি তর্পণা, আপাতত আপনার আতিথেয়তা গ্রহণ করতে পারলাম না। আপনি যদি আমাদের ডকুমেন্টসগুলো হ্যান্ডওভার করেন বেটার হয়।'

-শিওর।

তর্পণা নিজেই কম্পিউটারে বসে। স্বয়ম্ভু ভিতরে কাজ করতে থাকা মেয়েটির দিকে তাকায়। শ্যেনদৃষ্টিতে ভালো করে দোকানটা ছানবিন করতে থাকে। এর মধ্যে কম বয়সী মেয়েটি দু-তিনবার আড়চোখে স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গীকে দেখে নিয়েছে। কিন্তু স্বয়ম্ভু দেখেছে কিনা বোঝা গেল না। 'কী নাম তোমার?' কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে স্বয়ম্ভু হঠাৎই প্রশ্ন ছুড়ে দিল মেয়েটির উদ্দেশে। তর্পণার আঙুলগুলো থেমে গেলে। কম বয়সী মেয়েটি ঘাবড়ে গিয়ে বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। শিবাঙ্গী বলল, 'হ্যাঁ তোমাকেই জিজ্ঞেস করছেন, কী নাম?' মেয়েটি অসহায়ের মতো তর্পণার দিকে তাকায়। উত্তরটা তর্পণা দেন, 'ও কথা বলতে পারে না।' স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী দুজনেই একটু থমকে যায়। 'ওহ সরি' স্বয়ম্ভু বলে।

-ওর নাম নন্দিনী।

-পুরো নাম?

-নন্দিনী মণ্ডল।

শিবাঙ্গী প্রশ্ন করে, 'স্কুলে যায় না?' তর্পণা দুপাশে ঘাড় নেড়ে না বলেন। 'তবে অক্ষরজ্ঞান আছে। কাস্টমারদের দেওয়া টাকা-পয়সা একদম পাই টু পাই হিসেব করে রাখে।'

-দেখে তো তেরো-চোদ্দ বছরের মনে হচ্ছে। অ্যাডাল্ট হয়নি। তাকে দিয়ে খাটাচ্ছেন? শিশুশ্রম দণ্ডণীয় অপরাধ কিন্তু।

তর্পণা তার রিভলবিং চেয়ার ঘুরিয়ে স্বয়ম্ভুর চোখে চোখ রেখে বলেন, 'তার থেকেও বড় অপরাধ মানুষের না খেতে পাওয়াটা। সক্ষম মানুষের কাজ না পাওয়াটা। ভালোমানুষি আর সরলতার সুযোগ নিয়ে অসহায় মানুষগুলোর সঙ্গে জোচ্চুরি করাটা। সে জায়গায় আমি তো একটা মেয়েকে কাজ দিয়েছি। চারবেলা খেতে দিচ্ছি। থাকতে দিচ্ছি। এটা যদি অপরাধ হয় তাহলে এমন অপরাধ আমি শতবার করব।'

এতগুলো কথার মধ্যে থেকে স্বয়ম্ভুর একটা জায়গায় কানে বাজল। পালটা প্রশ্ন করল স্বয়ম্ভু, 'থাকতে দিয়েছি মানে? ও কী এই দোকানেই থাকে?'

-দোকানে থাকবে কেন? আমার ফ্ল্যাটেই থাকে। আমার সঙ্গে।

-একটু আগে যে বললেন আপনি একাই থাকেন।

তর্পণা কম্পিউটারের দিকে চেয়েই বলেন, 'একা মানে আমার নিজের বলতে কেউ নেই সেটাই বোঝাতে চেয়েছি।'

শিবাঙ্গী জানতে চায়, 'কিন্তু একে পেলেন কোথা থেকে?'

-আমি একটা কাজে মেদিনীপুর গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই পেয়েছি। ওর মা, বাবা কেউ নেই। মামার কাছে মানুষ। মামিটা অত্যাচারী। ঠিক মত খেতেও দিত না। ওই যা হয় আর কী! মেয়েটার মুখটা দেখে এত খারাপ লেগেছিল আমি ওর মামার কাছ থেকে ওকে নিয়ে আসি। সেই থেকে আমার কাছে। মামার বাড়ি যাবার নামটাও করে না।

শেষ কথাগুলো বলতে গিয়ে তর্পণার ঠোঁটে বেশ একটা গর্বের হাসি চলকে উঠল। স্বয়ম্ভুরও মনটা ভিজে উঠল মেয়েটির জন্য। হাজারটা রঙিন ফুলের ভিড়ে কেমন চুপটি করে বসে আছে নন্দিনী। ফুলের মতোই নীরব।

সব ডকুমেন্টস নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় স্বয়ম্ভু হাসিমুখে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'থ্যাংক ইউ মিস তর্পণা। আবার হয়তো দেখা হবে।' এক গাল হাসি নিয়ে তর্পণা বললেন, 'যখনই দরকার লাগবে নির্দ্বিধায় বলবেন। আমার সামর্থ্য মতো নিশ্চয়ই হেল্প করব। শুধু দেখবেন, অরুণা যেন সঠিক বিচার পায়। আমার সঙ্গে তার যাই থাকুক না কেন, এমন নৃশংস যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু সে ডিসার্ভ করে না।

-কে যে কী ডিসার্ভ করে সেটা তো সময়ই বলবে। আর হ্যাঁ, গোয়েন্দাদের মিথ্যে কথাটা বলবেন না।

মুখের হাসিটা মেলাতে শুরু করল তর্পণার। শিবাঙ্গীও অবাক হয়ে স্বয়ম্ভুর দিকে তাকাল। রহস্যে ঘেরা হাসি মুখে ফুটে উঠলেই স্বয়ম্ভুর চোখদুটো ছোট হয়ে যায়। এখনও তাই হল। সে বলল, 'গতকালই তমালের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে। তবে ফোন নম্বরটা আলাদা। ওটা বোধহয় আপনাদের স্পেশ্যাল নম্বর তাই না? মাঝখান থেকে হল কি জানেন? আপনাকে শুধু সন্দেহের তালিকায় আর রাখা গেল না। হাইলি সাসপিশিয়াস লিস্টে নিজে থেকেই ঢুকে পড়লেন। আসি কেমন। আবার দেখা হবে।'

কথাগুলো ঘোর বর্ষার বাজের মতোই কড়কড় করে হেভেন অফ ফ্লাওয়ার্স-এর ভিতর বাজিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী। চোখ তুলে তাকাবে না নামিয়ে নেবে সেটা ঠিক বুঝতে পারলেন না তর্পণা। দোকানের বাইরে নতুন কাপড় পরানো মডেলের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

৯

-উফফফ যা খিদে পেয়েছিল না? চোখের সামনে থেকে তর্পণার দেওয়া কেক আর প্যাটিসগুলো ফেরাচ্ছি আর ওদিকে পেটের মধ্যে ছুঁচোটা কষে লাথি মারছে।

চপাত চপাত করে কচুরি আর ছোলার ডাল খেয়ে হাত ধুয়ে নিল স্বয়ম্ভু। সিনিয়ারের ছ'খানা কচুরি সাঁটানো দেখে শিবাঙ্গী হেসে মরে। যদিও মনে মনে, সামনাসামনি কি আর হাসা যায়? দোকানে আরেক খদ্দের বাইক ছুটিয়ে এসে কচুরি আর ছোলার ডালের অর্ডার দিল। এক গাল চাপা দাড়ি, মুখে নীল মাস্ক। চোখে সানগ্লাস। শিবাঙ্গী লোকটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে বলল, ‘চাহিদা দেখেছেন?'

-তার চেয়েও দেখার বিষয় হল আমরা কেউ মাস্ক পরিনি। কিন্তু এই ছেলেটি এখনও সেটা মেইনটেইন করছে। গুড। ভেরি গুড। শিবাঙ্গী এখনও কচুরি আর ছোলার ডালেই ডুবে আছে। ‘এদের রান্নাটা কিন্তু জবর।' বলল শিবাঙ্গী।

-এ দোকানের সন্ধান দিলে কে?

-এইখানেই তো আমার স্কুল ছিল। মায়ের সঙ্গে আসতাম। এ কি আজকের দোকান নাকি? বহুকাল!

-হ্যাঁ, মেঘে মেঘে বেলা তো আর কম হল না।

শিবাঙ্গীর ভুরুতে ধনুকের টঙ্কার। মুখ ধুয়ে একটা সিগারেট ধরাল স্বয়ম্ভু। শিবাঙ্গী বলল, ‘সেই। মেয়েদের বয়স ভোলাদার চেয়ে বেটার আর কে জানবে?' এক মুখ ধোঁয়া নিয়ে হাসতে গিয়ে খকখক করে কেশে ফেলল স্বয়ম্ভু। শিবাঙ্গী পড়ল বেজায় অস্বস্তিতে। নিমেষের মধ্যে অন্তত বার দশেক ‘সরি' বলা হয়ে গেল। সস্নেহে চাপড়ে দিল স্বয়ম্ভুর পিঠে। সেই দেখে স্বয়ম্ভুর হাসি থামার বদলে বেড়ে গেল আরও। ‘এত হাসির কী বললাম আপনাকে?' শিবাঙ্গী কপট রাগ দেখাল। হাসতে হাসতে স্বয়ম্ভু বলল, ‘একে তো সিনিয়ারের ডাক নাম ধরে ফাজলামো মারছ। তার ওপর পিঠের ওপর চটাস চটাস করে খানকতক চাঁটিয়ে দিলে! এ কী মাংসের খিচুড়ি না খেতে পাওয়ার রাগ?' লজ্জায় লাল হয়ে উঠল শিবাঙ্গী। ‘এ বাবা! বেশি জোরে পড়ে গেছে?' আবারও খানকতক ‘সরি’। হাসতে হাসতে স্বয়ম্ভু আবারও সিগারেটে একটা সুখটান দিল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হঠাৎই একটি বিশেষ দিকে আটকে গেল চোখটা। সেই মাস্ক পরা ছেলেটির কচুরি খেতে গিয়ে বেশ গরম লেগেছে মুখে। হু হা করছে। কিন্তু চিবিয়ে যাচ্ছে। এক গাল ঠাস দাড়ি, গোঁফ। চোখে কালো চশমা। শিবাঙ্গী স্বয়ম্ভুকে খেয়াল করে বলে, ‘চেনেন না কি স্যার?’’

-উঁ? নাহ!

অন্যমনস্ক লাগল স্বয়ম্ভুকে। ‘চলো, একটু অফিস যেতে হবে।' শিবাঙ্গীকে নিয়ে গাড়িতে চেপে বেরিয়ে গেল স্বয়ম্ভু। যেতে যেতে কী যেন মনে হওয়াতে স্বয়ম্ভু প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা শিবাঙ্গী।’

-হ্যাঁ স্যার?

-তুমি কখনও ছদ্মবেশে রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটাচলা করেছ?

-ছদ্মবেশে! উমমম না, সেরকম প্রয়োজন তো কিছু হয়নি।

-মানুষ কখন ছদ্মবেশে রাস্তায় বেরোয়?

কেন?

-মানে ছদ্মবেশটা কীরকম তার ওপর ডিপেন্ড করছে। কেউ ধরুন নাটকের শো করে বেরিয়েছে। মেক আপ তোলার সময় পায়নি। বা কেউ যদি নাচের মেক আপ করে রাস্তায় বেরোয়।

-না না, সেটা তো আর ছদ্মবেশ নয়। সেখানে মানুষটাকে স্পষ্ট দেখা যাবে। কিন্তু এমন সাজ যেখানে তোমায় চেনা যাবে না।

-তাহলে তো হয় নাটক বা অ্যাক্টিং রিলেটেড কিছু বা কোনও দুষ্কৃতি অন্য বেশ ধরে রাস্তায় বেরোয়। সাধারণ মানুষ খামোকা ছদ্মবেশ কেন নেবে?

-হুম।

-কিন্তু কেন? হঠাৎ এই প্রশ্ন?

-ওই যে ছেলেটি কচুরি খাচ্ছিল, ওর দাড়িটা নকল ছিল।'

-অ্যাঁ? তাই?

-সম্ভবত গোঁফটাও। গরম কচুরি খেয়ে হু হা করতে করতে পাশ থেকে একটু খুলে এসেছিল।

শিবাঙ্গী ভাবল। 'এত সকালে নাটকের শো! -জীবনটাই তো একটা নাটক শিবাঙ্গী!

গাড়িটা লালবাজারের দিকে ছুটল।

সুস্মিতার বুটিক রবিবার বাদে সারাদিনই খোলা থাকে। দুপুরের দিকটা বেশিরভাগ সময়েই ফাঁকা থাকে। বুটিকের দুজন মহিলা কর্মচারী নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরেই নানান বিষয় নিয়ে কলকল করছিল। কথায় কথায় সেটা কীভাবে যেন অরুণার খুনের বিষয়ে চলে আসে। মোবাইলেই হরবখত নিউজ ফিড আসছে। ওদের সব কথাই কানে যাচ্ছে সুস্মিতার। যত শুনছে বুকের ভেতর তত জাঁকিয়ে বসছে ভয়। কেন? উত্তর নেই সুস্মিতার কাছে। এই সময়ে এক লট নতুন শাড়ি ঢুকল দোকানে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সুস্মিতা। যাক, এখন আর এই বিচ্ছিরি বিষয়টা নিয়ে কেউ কথা বলবে না। সবাই ব্যস্ত হয়ে গেল শাড়ির হিসেব মেলাতে। কিন্তু ঝামেলা কী আর পিছু ছাড়ে? বুটিকের মধ্যে যখন নিচু গলায় হিসেবের কড়ি গোনা চলছে, নতুন কাপড়ের বান্ডিলের ঝপ ঝপ শব্দ হচ্ছে, প্যাকেটের কচমচ আওয়াজ উঠছে ঠিক তখনই কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে এলেন মহিলা। সুস্মিতার চোখ পড়তেই মহিলাটি হাসলেন। সুস্মিতা হালকা করে ভুরু কুঁচকে বড় একটা শ্বাস ছাড়ল।

-আমায় দেখেই ভুরুতে ভাঁজ পড়ে গেল তো?

হাসি আর মিছরির ছুরি একসঙ্গে কীভাবে ছড়াতে ও চালাতে হয় সেটা তর্পণা জানেন।

-আরে তর্পণা ম্যাডাম। আসুন আসুন। খুব ভালো সময়ে এসেছেন।

দোকানের একটি মেয়ে বলে উঠল। পাল্টা আদরমাখা প্রশ্ন ছুড়ে দিল তর্পণা, 'কেমন আছ মীনাক্ষী?' মেয়েটি হাসিমুখে ঘাড় নাড়ল। গা জ্বলে উঠল সুস্মিতার। মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি। কাস্টমারের প্রতি মালিকের দরদের চেয়ে কর্মচারীর পিরিত বেশি।

-শাড়িগুলো গুণতে ভুল হয়ে যাবে মীনাক্ষী। কাজে মন দাও।

-হ্যাঁ ম্যাডাম।

সুস্মিতার উষ্মাকে পাত্তাও দিলেন না তর্পণা। বরং ইচ্ছে করেই প্রশ্ন করলেন মীনাক্ষীকে, 'কীসের ভালো সময় বলছিলে মীনাক্ষী?'

মীনাক্ষী এবার একটু ইতস্তত করে বলল, 'এই সবে নতুন লটের এতগুলো শাড়ি এল। আপনাকে কিন্তু দারুণ মানাবে ম্যাডাম।'

-উনি মনে হয় না শাড়ি নেবেন মীনাক্ষী। আগের দুবারে কিছু নিয়েছেন বলে তো মনে পড়ছে না।

মীনাক্ষী আর তর্পণার কথার মাঝে ইচ্ছে করেই নিজের কথাগুলোকে গুঁজে দিল সুস্মিতা।

-দেখেছ মীনাক্ষী, সুস্মিতা আমার ওপর কেমন রাগ করেছে। আচ্ছা বেশ, একটা কাজ কর তো তোমাদের যেটা ইচ্ছে, যেটা তোমাদের মনে হবে আমায় ভালো মানাবে সেরকম একটা শাড়ি আমার জন্য প্যাক করে রাখো।

-আচ্ছা ম্যাডাম।

সুস্মিতা আড়চোখে মীনাক্ষীর দিকে তাকাল। মীনাক্ষী আর কোনও কথা না বাড়িয়ে সরাসরি সুস্মিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কি এবার ভেতরের ঘরে যেতে পারি সুস্মিতা?' সুস্মিতার সামনে খোলা হিসেবের খাতাটা মীনাক্ষীর হাতে ধরিয়ে চুপচাপ ভিতরের ঘরে ঢুকে গেল। মেয়েগুলোর দিকে 'আসছি' বলে তর্পণাও ভিতরে ঢুকে গেলেন।

বুটিকের বড় ঘরটার পিছনে একদম ছোট্ট একটা ঘর আছে। দেয়ালে সার দিয়ে সাজানো হরেক রঙের শাড়ি ছোট্ট ঘরটাকে আলো করে রেখেছে।

-আমার কাছে কেন আসো তর্পণা?

-কোথায় যাব বলো? প্রিয়াংশুর অফিসে?

কিচ্ছুক্ষণ তর্পণার মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে হেসে ফেলল সুস্মিতা। বলল, 'ফুলের দোকানটা আসলে তোমার আই ওয়াশ। আসল ব্যবসা ব্ল্যাকমেল।'

-চিৎ হয়ে শুয়ে ওপর দিকে থুতু ছুড়লে সেটা নিজের গায়েই পড়ে, জানো তো?

মুখটা শুকিয়ে গেল সুস্মিতার। তর্পণা আরও বললেন, 'লাগামহীন জীবনের অন্ধকারগুলো সকলের সামনে এসে পড়লে কী খুব ভালো হবে সুস্মিতা? সদ্য সদ্য আবার অরুণা খুন হয়েছে।' মুখের সামনে হাত ঝাঁকিয়ে সুস্মিতা বলে উঠল, 'চুপ কর তর্পণা। অরুণার কথা তোমার মুখে মানায় না। আমরা কী আর জানি না অরুণাকে কে মেরেছে? তোমার ভাগ্য ভালো আমি মুখ খুলছি না।' তর্পণার মুখ পাংশু বর্ণ। 'কে মেরেছে? বলো। মুখ খোলো না সুস্মিতা। আমি কি বারণ করেছি?' কোনও আঘাতই তর্পণার গায়ে লাগছে না। বরং সেটা ঘুরে সুস্মিতার দিকেই ফিরে আসছে। 'আমি জানি সুস্মিতা, তোমার বুক ফাটলেও মুখ ফুটবে না। কারণ তুমি খুব ভালো করেই জানো সেটা হলে আরও অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে। লোকে জেনে যাবে অরুণা কেন ফোনে বেড়ালের ডাক শুনেছে।' বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বাঘিনীর মত চোখ তুলে তাকায় সুস্মিতা। তর্পণা চেয়ার ছেড়ে উঠে কাচের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। একটু থেমে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, 'আজ আমার কাছে স্বয়ম্ভু সেন এসেছিলেন। গোয়েন্দা লালবাজার। অনেক প্রশ্ন করলেন। অনেক। সবকিছুর উত্তর দিয়েছি আমি। আবার আসবেন বলেছেন।'

হাসলেন তর্পণা। নাকি একটা ধারালো ছুরি সজোরে সুস্মিতার দিকে নিক্ষেপ করে পলকে বেরিয়ে গেলেন! বুকের ভেতর থেকে এক দলা কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। কাঁপা হাতে নিজের মোবাইলটা টেবিল থেকে তুলে নিল। নম্বর ডায়াল করল। উল্টোদিক থেকে ফোনটা রিসিভ হতেই চোখে মুখে অসম্ভব ক্রুরতা ঠিকরে বেরিয়ে এল সুস্মিতার।

-স্যার, অরুণার কল লিস্টে শেষ সাতদিনে আননোন নম্বর থেকে একটা করে কল এসেছে রাত এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে এবং এই সাতটি নম্বরই আলাদা আলাদা।

-নম্বরগুলো চেক করেছ?

-হ্যাঁ স্যার। ডাজ নট এগজিস্ট।

লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে মুখোমুখি বসে স্বয়ম্ভুকে নম্বরের হালহদিশ দিচ্ছে শিবাঙ্গী। স্বয়ম্ভু বেশ অবাক হল নম্বরগুলো অস্তিত্বহীন শুনে। শিবাঙ্গী জানাল, এই বিশেষ নম্বরগুলো থেকে মাত্র একবার করেই কল হয়েছে। তারপরে সেটা ডেস্ট্রয় করে দেওয়া হয়েছে। স্বয়ম্ভু বলল, 'সেটা তো কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নম্বর থেকে হলে সেরকম হয়। এখনকার ওই- অনলাইন ডেলিভারি করে এরকম তো কত কোম্পানি আছে, তারা এমন নম্বর পায়। '

-একদমই স্যার। তবে স্যার নম্বরের যা প্যাটার্ন দেখছি তাতে বোঝা যাচ্ছে এটা কোনও অ্যাপের মাধ্যমে করা হয়েছে। এবং ফোন করার পরেই হয়তো সেই অ্যাপ এবং অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে দিচ্ছে। তাই সেটা ডাজ নট এগজিস্ট বলছে।

- দেখি।

হাত বাড়িয়ে কল লিস্টটা নিল স্বয়ম্ভু। ভালো করে দেখে বলল, ''হুম। সাইবার ক্রাইমে দাও।'

-দিয়েছি স্যার। ওরা ওপর ওপর চেক করে বলল এটা কোনও একটা অ্যাপ নয়। অনেকরকমের অ্যাপ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ প্রত্যেকটার স্টার্টিং নম্বর আলাদা। কারও প্লাস ডবল সেভেন, আবার কারও প্লাস ডবল নাইন। তবে রিপিট আছে। অপরাধী আজকে যে অ্যাপ ব্যবহার করছে সেটা আবার চারদিন পরে গিয়ে ইউজ করছে।

-আইপিগুলো নিশ্চয়ই এক হবে।

-সেটা পরীক্ষাসাপেক্ষ।

-জায়গাগুলো ট্র্যাক করা যাবে নিশ্চয়ই? মানে কোথা থেকে ফোন এসেছে?

শিবাঙ্গী একটু ভেবে বলল, 'সিম ইউজ করলে তো পাওয়া যেতই। কিন্তু এক্ষেত্রে ঠিক কতটা কী পাওয়া যাবে সেটা আইপি ট্র্যাক করলে বোঝা যাবে।

-শালা এই টেকনোলজি যত বাড়ছে আমাদের বাঁশও তত বাড়ছে।

-স্যার, একবার তমালকে ফোন করে দেখবেন। অরুণা এরকম কোনও রহস্যময় ফোনের ব্যাপারে কিছু বলেছে কিনা।

-কারেক্ট।

সঙ্গে সঙ্গে তমালকে ফোন করে স্বয়ম্ভু। 'কী করছ?' উল্টোদিক থেকে টিভির আওয়াজের সঙ্গে জবাব আসে, 'নিউজ দেখছি। সবাই তো আমাকেই অপরাধী বানিয়ে ফেলেছে।'

-স্ত্রী মারা গেলে স্বামীকে আর স্বামী মারা গেলে স্ত্রীয়ের প্রেমিককেই প্রথম সন্দেহটা করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রী মারা গেলে স্বামীর প্রেমিকাকে সন্দেহ করা হয়। এসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তুমি আমায় একটা কথা বলো তো তমাল।

-বলো।

-অরুণা কখনও তোমায় কোনও ফোন কলের কথা বলেছে? মানে আননোন নম্বর থেকে কোনও কল এসেছে বা কিছু?

-ওর সাথে শেষ পনেরো কুড়িদিন ধরে ঝগড়া ছাড়া কোনও নরমাল কথা হয়নি আমার।

-বাহ! কী সুন্দর!

-কারও যদি আমায় দেখলেই মনে হয় আমি অফিস না করে ফষ্টিনষ্টি করে আসছি তাহলে নরমাল কথা হওয়ার জায়গা কি থাকে ভোলাদা?

ব্যস, দিল নরম জায়গায় খুঁচিয়ে। নিমেষের মধ্যে স্বয়ম্ভুর মুখ থেকে বুদ্ধিমত্তার সকল ছাপ সরে গেল। কে যেন করলা সেদ্ধ করে সারা মুখে 'মাখিয়ে দিল। স্বয়ম্ভুই কথাটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি এক কাজ কর অরুণার যত বন্ধুবান্ধবের নম্বর আছে তাদের নাম সমেত সেন্ড কর তো। সেটা আছে তো নাকি সেটাও ...!'

-না। সেরকম কারও নম্বর আমার কাছে নেই। তবে যতদূর জানি, ওদের চারজন বন্ধুর একটা গ্রুপ ছিল।

-তাদের নাম কী? কারও ফোন নম্বর নেই তোমার কাছে?

-একজনের আছে। সুস্মিতা। গড়িয়াহাটে বুটিক আছে। আমি নম্বরটা পাঠাচ্ছি।

-আর বাকিরা?

-বাকিদের মধ্যে একজনের নাম দিয়া। দেশপ্রিয় পার্কে ক্যাফে আছে। আরেকজন স্বস্তিকা না মৃত্তিকা কী যেন নাম। ওর কোনও খোঁজ আমি জানি না।

-এদের মধ্যে কী গভীর বন্ধুত্ব ছিল?

-একসঙ্গে কলেজে পড়ত। ঘুরতে যেত। পার্টি করত। অরুণার বিয়ের পর কী একটা কারণে ওদের মধ্যে সম্পর্কটা একটু লুজ হয়ে যায়।

-কী কারণ?

-উম...আম... আমি ঠিক জানি না।

-বাবা! একটা না বলতে এত হোঁচট খেলে?

-আসলে ওদের ব্যাপারে আমি কোনওদিনই ঢুকিনি।

-বেশ। তুমি অস্মিতার নম্বরটা পাঠাও।

-সুস্মিতা।

-ওই হ্যাঁ, সুস্মিতা।

-ওকে।

ফোনটা রাখতে রাখতেই শিবাঙ্গীকে প্রশ্ন করে, 'পাড়িয়া কি সিসিটিভি ফুটেজগুলো পাঠাল?'

-না। আমি একবার কল করছি।

-এখনও করনি? শিগগিরি কর।

নানারকম রাজনৈতিক খবরের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে অরুণার খুনের খবর। শুধু একটা ব্যাপার জিইয়ে রেখেছে মিডিয়াগুলো। মাত্র একটা খুন হল আর সেটা নিয়েই গোয়েন্দা দপ্তর মাঠে নেমে পড়ল? যতই সেটা নৃশংস হোক না কেন, এমন তো রোজ কত হচ্ছে। যদিও এই খুনের ধরণ আর পাঁচটা খুনের থেকে অনেকটাই আলাদা। তাই কী গোয়েন্দাদের এত মাথা ব্যথা?

-ত্রিদিব, বিলটা কর।

পাশ থেকে আরেক কর্মচারী প্রায় খিঁচিয়ে উঠল। সম্বিত ফিরে সামনে তাকাতেই তিরু দেখল চারটে প্যাকেট হাতে কাস্টমার দাঁড়িয়ে। ত্রিদিব ওরফে তিরু হাত চালাল কাজে। অন্য কাস্টমারদের শাড়ি দেখাতে দেখাতে আরেক কর্মচারী টিপ্পনী কাটল, 'ত্রিদিবের পাশের পাড়ায় খুন হয়েছে না, ওর ওপরেই লালবাজার দায়িত্ব দিয়েছে তো খুনিকে ধরার।' ত্রিদিব বিলে মালপত্রের হিসেব লিখছিল। চোখ তুলে লোকটার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল। ত্রিদিব কাস্টমারের উদ্দেশে বলল, 'চার হাজার ছশো সাতষট্টি টাকা।' কাস্টমার বলল, 'আবার সাতষট্টি কেন দাদা? ওটা বাদ দিন।

-না দাদা, ফিক্সড প্রাইজ। কিছু করার নেই।

-কার্ডে হবে?

ত্রিদিবের কানে গেল না কথাটা। ওর চোখদুটো আবারও কোনও একটা দিকে আটকে গেছে। এদিকে সামনে দাঁড়ানো কাস্টমার তার প্রশ্নটা আবার রিপিট করতেই কার্ড মেশিনটা বাড়িয়ে দিল। টাকা মিটিয়ে চলে যেতেই আরেকজন মুখের সামনে এসে হাজির।

-কতবার করে বললাম গড়িয়াহাট চলো। তা নয়, সেই কলেজস্ট্রিট। কথাগুলো পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্বামীর উদ্দেশে বলে দোকানদারকে একটা বেগুনি রঙের জামদানি দেখিয়ে বলল, 'ওইটা বেগুনিটা একটু দেখান না।' গালের চাপ দাড়ির মধ্যে আঙুল চালিয়ে ঘষঘষ করে গালটা চুলকে নিয়ে দীপায়ন বলল, 'মৃত্তিকা তুমি পারও। সেই থেকে একই কথা।'

আবারও গলা চেপে স্বামীকে উত্তর দিল মৃত্তিকা, 'বলব না তো কী? একটা মাত্র মেয়ের অন্নপ্রাশন। এরপর তো আর এমন হবে না।'

দোকানের লোকটা বেগুনি রঙের শাড়িটা মুখের সামনে মেলে ধরল। ভ্যাপসা গরম। তার ওপরে এই শ্রাবণ মাসেও শাড়ির দোকানে লোকের অভাব নেই। রুমাল দিয়ে গলা আর কপালের ঘাম মুছে দীপায়ন বলল, 'শুধুমাত্র কার্ড অর্ডার দিতে এইখানে আসার কোনও মানে আছে? তার চেয়ে শাড়ি-ফাড়িও কিনে নাও।' বলেই চোখের রিমলেস চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে কাচটা মুছতে থাকল।

-এত তাড়াতাড়ি কার্ডটা অর্ডার দেবার তো কোনও দরকার ছিল না দীপায়ন।

-কী বলছ? আর দু' সপ্তাহও নেই।

-বাড়ির কাছেই তো। যেকোনও দিন এসে অর্ডার দেওয়া যেত। তোমার বেশি তাড়া। উঠল বাই তো কলেজস্ট্রিট যাই। সত্যি করে বল না, তোমার বই কেনার ছিল তাই একেবারে কাজ সারছ।

বরবাবাজিকে ছোট্ট মত কামড় দিয়ে ঠোঁট কুঁচকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কর্মচারীটিকে বলল মৃত্তিকা, না দাদা, খোলটা ভাল্লাগছে না। সুতোগুলো উঠে যাবে।'

-কী বলছেন বউদি? এমন সুক্ষ্ম কাজ। আপনি নিশ্চিন্তে নিয়ে যান।

-মটকা সিল্ক নেই আপনাদের?

লোকটা একটু গম্ভীর হয়ে উল্টোদিকের টেবিলটা দেখিয়ে দিল। গলা তুলে বলল, 'এই ভজু, এনাদের মটকা দেখাত।'

কাউন্টার একটু ফাঁকা হতেই মোবাইলে নিউজ পোর্টালগুলো ঘাঁটতে থাকে তিরু। পাশের

লোকটি আড়চোখে দেখে আবার বলে ওঠে, ‘তোর কী হয়েছে বল তো ত্রিদিব? খালি খবর দেখছিস কেন? খুনটা কী তুই করেছিস নাকি?' ত্রিদিব বিদ্যুৎ গতিতে চারপাশে চোখ চালিয়ে চাপাস্বরে বলে ওঠে, ‘আহ! সিধুদা। এসব কথা এইভাবে বোলো না। কে কোথা থেকে শুনে পক করে কাকে লাগিয়ে দেবে। এমনিতেই টেনশনে আছি আমি।'

-কেন? তোর পাশের পাড়ায় খুন হয়েছে বলে তোর টেনশনের কী আছে? খুনিকে দেখেছিস তুই?

-উফফফ! তা কেন? তবে যে খুন হয়েছে তাকে চিনি।

-সে তো হতেই পারে।

-চিন্তা আমার মামাকে নিয়ে। সারাদিন একলা থাকে। মামা যে মন্দিরে পুজো করে সেই মন্দিরে ওই অরুণা আসত।

-কে অরুণা?

-যে খুন হয়েছে।

-অ।

-মামার সঙ্গে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল।

-তাতে কী? তোর মামা কি কিছু জানেন এ ব্যাপারে?

-না গো। তবে শুনছি নাকি অরুণার চেনাজানা সবাইকে পুলিশ জেরা করবে।

-সেটা তো স্বাভাবিক

-সেই জন্যেই তো ভয়। মামার যে খুব বেশি বয়স তা নয়। তবে এর মধ্যেই প্রেশার, সুগার সব ধরেছে। রাতে এমনিই ঘুমের ওষুধ ছাড়া ঘুম হয় না। তার ওপর দুদিন ধরে দিনরাত কানের কাছে গজগজ করছে, ও তিরু পুলিশ এলে কী হবে রে? আমি কী বলব? এত মন্দির থাকতে আমার মন্দিরেই আসতে হল মেয়েটাকে। খাচ্ছে না পর্যন্ত জানো।

লোকটি মুখটা নিচু করে বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়ল। ঠিক সেই সময়েই কাউন্টারে এল মৃত্তিকা আর দীপায়ন। তিরু হাত বাড়িয়ে পাঁচটা প্যাকেট নিল। বিল করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এদিকে দীপায়ন মৃত্তিকার কানে কানে বলল, 'ওই তরকারি না ফুলকপি কী একটা শাড়ি নিলে সেটা সত্যিই পড়বে তুমি?' ভুরু কুঁচকে মৃত্তিকা বলল, 'ওটা ফুলকারি।'

-যথেষ্ট ভারী। তোমার মত।

-শাট আপ।

-তুমি সত্যি পরবে?

-তা নয় তো কী অন্নপ্রাশনে মেয়েকে পরাব?

চোখ উলটে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল দীপায়ন।

‘কেন বলো তো?' মৃত্তিকা সন্দেহের চোখে প্রশ্ন করল।

-ওয়েটটা মেপেছ?

-উনসত্তর থেকে ছেষট্টিতে নামিয়েছি। মেয়ের অন্নপ্রাশনে আরও দুকেজি লস করব। এমনি এমনি ডায়েটেশিয়ানের কাছে যাচ্ছি নাকি?

-হলেই ভালো।

-আমাকে না দেখে নিজের ভুঁড়িটা দেখো।

দীপায়ন আর কোনও উত্তরই দিল না। ভুঁড়ি হয়েছে তো কী? দীপায়নকে বরাবরই দেখতে ভালো। কলেজে মহিলা প্রফেসররা সুযোগ পেলেই কথা বলতে আসে বলে অন্যান্য পুরুষ প্রফেসররা মাঝেমধ্যেই ঠারেঠোরে কথা শোনায়। মাথায় ঠাস চুল। তায় আবার ঢেউ খেলেছে। মুখটা কিঞ্চিৎ লম্বা ধাঁচের। ঠোঁটদুটো সরু। দেখলে মনে হয় ঠোঁট টিপে আদর করতে আসছে। বাঁ চোখের নীচের দিকে ছোট মত একটা আঁচিল। সরাসরি বিল কাউন্টারের ছেলেটিকে দীপায়ন বলল সে কার্ডে পে করবে। তিরু ঘাড় নাড়ল। কিন্তু কিছুতেই কার্ড কাজ করল না। ‘আপনি ইউপিআইতেও পে করতে পারেন স্যার।' সেটাও নেটওয়ার্ক ফেল। বেশ ফাঁপরে পড়ল মৃত্তিকা আর দীপায়ন। একটু চড়া সুরেই দীপায়ন বলল, ‘আপনাদের কোনও

কিছুই কাজ করে না?’ তিরু বলল, ‘স্যার এইমাত্র চারজন কার্ডে আর ইউপিআইতে পে করে গেলেন। কোনওভাবে হয়তো আপনারটা হচ্ছে না। ম্যাডামের ইউপিআই আছে কী?' মৃত্তিকা দীপায়নকে বলল, ‘আমি পে করে দিচ্ছি। তুমি আমায় দিয়ে দেবে কিন্তু।'

-উফফফ মৃত্তিকা!

চোখ পাকিয়ে হাসল দীপায়ন। মৃত্তিকাও আহ্লাদি মুখে চাইল। এবার পেমেন্ট হল। ফোন নম্বরটা তিরু রিপিট করতেই মৃত্তিকা কনফার্ম করল। বিল কেটে প্যাকেটের মধ্যে দিয়ে হাসিমুখে তিরু বলল, 'আবার আসবেন ম্যাডাম।' প্রত্যুত্তরে মৃত্তিকাও হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল। চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ দীপায়ন ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা এখানে ভালো কার্ডের দোকান কোনটা বলতে পারেন? মানে এখানে আছে তো অনেকই। তবু বেটার কোনটা হবে...'।

-বিয়ের কার্ড ছাপাবেন?

তিরুর পাশে বসে থাকা লোকটি জিজ্ঞেস করল। দীপায়ন বলল, 'না, অন্নপ্রাশনের।'

-এই দোকান থেকে বেরিয়ে ডানদিকে যান। চারটে দোকান পরেই একটা গলি। সারি সারি কার্ডের দোকান আছে। প্রথম থেকে দুটো ছেড়ে তিন নম্বর দোকানে যাবেন। ওরা খুব ভালো কোয়ালিটি দেয়, দামও দেখবেন রিজনেবল।

-থ্যাংক ইউ।

দীপায়ন দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ত্রিদিব পাশের লোকটিকে ডেকে বলল বিল কাউন্টারটা একটু সামলাতে। কেড়ে আঙুল তুলে দেখাল। লোকটিও বলল, ‘একে তো এলি দেরি করে। তার ওপর ঘনঘন বাথরুম। যা, তাড়াতাড়ি আসবি।' ত্রিদিবও তড়াক করে লাফ মেরে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। বাথরুমটা পাশের গলিতেই।

১০

সারাদিন ভীষণ গুমোট করে ছিল। এখন রাতের দিকে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। কোথাও বৃষ্টি হয়েছে মনে হয়।

'কখন আসছ?' অ্যাপার্টমেন্টের লনে দাঁড়িয়েই প্রিয়াংশুকে ফোন করল সুস্মিতা। ফোনের ওপাশ থেকে উত্তর এল, 'সবে বেরোলাম।'

-মানে আজকেও রাত।

-সকালে বললাম তো বস এসেছে।

-কখন?

-দুপুরে। অবশ্য তখন তো মাথায় আগুন জ্বলছে তোমার। শুনতে পাওনি তাই।

-আজ আমার মাথায় জ্বলেছে। দুদিন বাদে ঘরে জ্বলবে। যখন ওই মহিলা পুলিশের কাছে গিয়ে সব বলবে।

-সুস প্লিজ, সারাদিন প্রচুর চাপ গেছে। আর নিতে পারছি না। আর হ্যাঁ, এ মাসে অন্তত আর আগুন জ্বলার চান্স নেই I

লনের পাশের ঠাণ্ডা বাতাসটা সুস্মিতার দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে উঠল। 'রাখছি। তাড়াতাড়ি এস।' ফোনটা কেটে বয়ে চলা হাওয়ায় মুখটাকে মেলে ধরল। আকাশের দিকে তাকাল। একটাও তারা নেই। মিশকালো আকাশ। কেবল গগনচুম্বি অট্টালিকার সারি আলোর মালায় সেজে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কীসের আশায়? নাকি লোভে? অট্টালিকার সারা গায়ে মৌচাকের মতো খোপ। সেই খোপে নানা ধরনের মন বাস করে। কোনও খোপে আলো জ্বলছে। আবার কোথাও অন্ধকার। একেকটা খোপে একেকটা গল্প। প্রতিদিন বয়ে চলেছে নিজের মতো করে। মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল সুস্মিতা।

দরজা খুলে বন্ধ ঘরে ঢুকতেই আধো-অন্ধকারে দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। বুকে হাত রেখে চমকে উঠল সুস্মিতা। তারপরে চোখটা সয়ে আসতে বুঝল তার আদরের পুষি আজ খাবার টেবিলের ওপর উঠে বসে রয়েছে। পটাস করে আলোটা জ্বালিয়ে দিতেই ম্যাও করে ডেকে উঠল বেড়ালটা। নাক টানল। কেমন একটা বাজে গন্ধ বেরোচ্ছে। বন্ধ ছিল বলে কী? দরজাটা খোলাই রাখল। এপাশ ওপাশ চোখ চালাতেই দেখল ডাইনিংয়ের এক কোণে মাছ-ভাত ছড়ানো। সম্পূর্ণটা বাবুর মুখে রোচেনি। 'কালকেও খাবার নষ্ট করেছিস। আজকেও। দ্যাখ, কাল তোকে খেতেই দেব না।' কপট রাগে বেড়ালটাকে বকে দিল সুস্মিতা। সে আবার ডাকল ম্যাওওওও। এইবার সুস্মিতার নজরে পড়ল আসল জিনিসটা। সকালে তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে ভুলেই গেছে। টেবিলেই পড়ে আছে পার্সেলটা। পুষি তার পাশে গিয়েই ঘন ঘন ডাকছে। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এসে পার্সেলটা হাতে তুলে নিল। ভেবেছিল ভার থাকবে বুঝি। তুলতে গিয়ে বুঝল এক্কেবারেই হালকা একটা বাক্স। উলটে পালটে দেখতে গিয়ে ভিতর থেকে খড়খড় করে কিছু জিনিসের ওলটপালট হবার শব্দ এল। পুষি ভীষণ এক্সাইটেড। বিচ্ছিরি গন্ধটা থেকে থেকেই ঝাপটা মারছে। কী আছে বাক্সতে সেটা দেখে খাবারের জায়গাটা পরিস্কার করবে।

খুলে ফেলল র‍্যাপার। একটা সাদা বাক্স বেরিয়ে এল। কোথাও কিছু লেখা নেই। একটু অবাকই হল সুস্মিতা। বাইরে লিফট খোলার শব্দ হল। পাশের ফ্ল্যাটের বউটা অফিস থেকে ফিরল। হিল খটখটিয়ে সবে নিজের ঘরের দিকে এগোতে যাবে অমনি গলা চিরে কে যেন আর্ত চিৎকার করে উঠল এক ঝটকায় পিছন ফিরে তাকাল পাশের ফ্ল্যাটের মহিলাটি। সুস্মিতাদের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখে দৌড়ে গেল।

স্বয়ম্ভু সেনের কাছে সবেমাত্র পৌঁছেছে সিসিটিভির ফুটেজ। শিবাঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে সেগুলো দেখার জন্য নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে যেখানে সব ফুটেজ বড় স্ক্রিনে দেখা যাবে সেই রুমের দিকে এগোচ্ছিল স্বয়ম্ভু। মাঝপথে ফোনটা এল। দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকা স্বয়ম্ভু থমকে গেল। ফোনে কাকে যেন বলল, 'আমরা এখুনি আসছি।' ফোনটা রেখেই শিবাঙ্গীকে

বলল, 'চলো আমাদের এক্ষুনি বেরোতে হবে।' বলেই হাঁক দিল, ‘তপওওওওন, গাড়ি বের কর।'

-চেতলা। সাউথ এন্ড হাইটস।

-কেন স্যার?

শিবাঙ্গী প্রশ্ন করল।

-খুনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছে। তপনও বুঝল ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস। ঝটিতি ছুটল গাড়ির দিকে।

ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সুস্মিতা। নিজের বিছানায় কুঁকড়ে বসে আছে। পাশে বসে প্রিয়াংশু সুস্মিতার মাথায় হাত বোলাচ্ছে। স্থানীয় থানার পুলিশ ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকে এদিক ওদিক দেখছে। চিৎকার শুনে যে বউটা ছুটে এসেছিল সেও ঘরের চেয়ারে বসে। ওদিকে লিফট থেকে বেরিয়ে সোজা ফ্ল্যাটে ঢুকে এল স্বয়ম্ভু ও শিবাঙ্গী। ঘরের মধ্যে তখনও ফ্ল্যাশের আলো ঝলসে উঠছে। ‘এ কী এত ভিড় কেন? হালকা করুন প্লিজ।' ঢুকতে ঢুকতে হুকুম ছুড়ে দিল স্বয়ম্ভু। ঘরে ঢুকতেই একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এলেন, ‘আসুন স্যার, আমিই আপনাকে ফোন করেছিলাম।'

-শশাঙ্ক মুখার্জি?

নামটা উচ্চারণ করেই চোখ চালিয়ে দিল পুলিশ অফিসারের বুকে জ্বলজ্বল করছে নাম। ‘আপনাকে খবর দিল কে?'

-পাশের ফ্ল্যাটের এক মহিলা। সুস্মিতা দেবীর চিৎকার শুনে উনিই ছুটে আসেন।

স্বয়ম্ভু মাটির দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যায়। একটা সাদা বাক্স ঢাকনা খুলে মাটিতে পড়ে আছে। এক মহিলার পায়ের তিনটে আঙুল পাশে ছড়িয়ে আছে। আর একটা আঙুল এখনও বাক্সের মধ্যে। নাকের কাছে আঙুল ঘষে মুখটা ব্যাজার করল স্বয়ম্ভু।

-এটা তো বাঁ পায়ের। তার মানে ডান পা-টাই....

শিবাঙ্গীর কথায় স্বয়ম্ভু ঘাড় নাড়ল।

-নমস্কার। আমি স্বয়ম্ভু সেন। গোয়েন্দা লালবাজার।

শিবাঙ্গীও নিজের পরিচয় দিল। এতক্ষণ মুখ গুঁজে বসেছিল সুস্মিতা। এবার চোখ তুলে তাকায়। প্রিয়াংশুর মুখটা পাংশু বর্ণ। ‘বসুন প্লিজ।' প্রিয়াংশুকে ‘ইটস ওকে' বলতে গিয়েই একটু থমকালো স্বয়ম্ভু। ঘরের হলদে আলোয় প্রিয়াংশুর মুখটা আরও একটু ভালো করে দেখার জন্য এগিয়ে গেল সে। পরিচয় জিজ্ঞেস করতে নাম বলল প্রিয়াংশু বড়াল।

-সুস্মিতা দেবীর হাজব্যান্ড?

প্রতিবেশীর দিকে একবার তাকিয়ে প্রিয়াংশু বলল, 'না আমরা বিয়ে করিনি।'

-অ। লিভ ইন?

-হুম।

-কত বছর?

-তিন

-আচ্ছা। আপনাকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে মিস্টার প্রিয়াংশু।

গোয়েন্দা প্রিয়াংশুকে চেনে শুনে পাশের ফ্ল্যাটের মহিলাটি অবাক হয়ে তাকাল। সুস্মিতাও বিস্ময় নিয়ে সকলের মুখ দেখে নিল। চোখের কাজল গলে গালে লেপে গেছে।

যাক গে, একই দেখতে তো কত লোকই থাকে, তাই না?

কেউ উত্তর খুঁজে পেল না। স্বয়ম্ভু প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা সুস্মিতা দেবী, এই পার্সেলটা আপনার কাছে কখন আসে?' উত্তরটা প্রিয়াংশু দেয়। যা যা ঘটেছে সবটাই বলে। পাশের ফ্ল্যাটের মহিলাটি বলেন, ‘স্যার, আমার খুব ভয় করছে।'

-কেন আপনার ভয়ের কী হল? আপনার ফ্ল্যাটে তো আর...

বলতে বলতেই কী একটা ভেবে বলল স্বয়ম্ভু, ‘ও, আপনি জড়িয়ে পড়লেন সেটা ভাবছেন?'

-আসলে একা থাকি তো। আমার হাজব্যান্ড নিউ জার্সিতে থাকে। পাশের ফ্ল্যাটেই এমন একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড!

-অরুণা বলে কাউকে চেনেন আপনি?

-অরুণা?

নামটা বিড়বিড় করলেন মহিলাটি। সুস্মিতা আর প্রিয়াংশু একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিল। ঢোঁক গিলল। মহিলাটি বলল, 'না না, এ নামের কাউকে চিনি না।

-তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। বাই দ্য ওয়ে, আপনার নামটা?

-কমলিনী। কমলিনী ব্যানার্জি।

-বাহ! চমৎকার নাম। আচ্ছা, আপনার কোনও ডাকনাম আছে?

মহিলাটি এবার ভড়কে ভ। শিবাঙ্গীর ভুরুটাও কুঁচকে আসে। কমলিনী বলেন, 'হ্যাঁ মানে সে তো অনেকগুলো।' স্বয়ম্ভু সটান মহিলাটির দিকে ঘুরে গেল, 'তাই নাকি! কীরকম?' স্যার এটা কী করছেন? কেনই বা জিজ্ঞেস করছেন? কিছু কি সন্দেহ করছেন? পুরো বিষয়টি শিবাঙ্গীর মাথার দশ হাত ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সুস্মিতা আর প্রিয়াংশুও কিচ্ছু বুঝছে না এই গোয়েন্দা ঠিক কী করতে চাইছেন! কমলিনী বলেন, 'মা ডাকত কমল বলে। বাবা আমায় রাগিয়ে দেবার জন্য কোমলি বলে। হাজব্যান্ড ডাকে....' একটু থামলেন। ভীত মুখে লজ্জা ফুটিয়ে বললেন, 'ক্যামেলিয়া।' এক গাল হেসে স্বয়ম্ভু বলে ওঠে, 'একটা মানুষের এতগুলো সুন্দর ডাকনাম? আপনি ভাগ্যবান। মায়ের কী হয়েছিল?''

-ক্যান্স...

বলতে গিয়েও মহিলা হোঁচট খেলেন। 'আপনি কী করে জানলেন?'' আবারও হেসে স্বয়ম্ভু বলল, 'ওই যে বললেন, কমল বলে ডাকত। বাকিদের ক্ষেত্রে কিন্তু ডাকে শব্দটা বললেন।' একটা বোকা বোকা হাসি ফুটে উঠল কমলিনীর মুখে। 'আপনি আসুন। কোনও ভয় নেই আপনার।

-থ্যাংক ইউ। আসি রে সুস্মিতা।

সুস্মিতা ঘাড় নাড়ল। খটখট করে পায়ে শব্দ হতেই স্বয়ম্ভু কমলিনীর পায়ের দিকে নজর করল। 'আপনার কত নম্বর জুতো?' কমলিনী যেতে গিয়েও চমকে উঠল। 'আমাকে বললেন?'

-হ্যাঁ, কত নম্বর জুতো পরেন আপনি?

-কেন বলুন তো?

-গোয়েন্দা প্রশ্ন করে। আর অন্যরা উত্তর দেয়।

স্বয়ম্ভূ হঠাৎই কঠিন। কমলিনী একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দিলেন, 'সাত নম্বর।'

-থ্যাংক ইউ আসুন।

হাত জোড় করে হেসে বলল স্বয়ম্ভু। কমলিনী চলে যেতেই বিছানায় বসে পড়ে স্বয়ম্ভু। শিবাঙ্গী খাটের পাশের চেয়ারটায় বসে। সুস্মিতার দিকে সরাসরি তাকিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় স্বয়ম্ভু, 'আপনি চেনেন তো সুস্মিতা দেবী?' সুস্মিতার গলায় স্বর নেই। শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কাকে চেনার কথা বলছে?

-অরুণা ব্যানার্জিকে, স্বয়ম্ভু বলল। চোখের কোল কুঁচকে এল সুস্মিতার। 'বন্ধু

-কীরকম?

-ভা-ভালো বন্ধুই ছিলাম।

-ছিলাম?

-এখন তো ও আর নেই।

-ও মানে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আপনাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল?

সুস্মিতা প্রিয়াংশুর দিকে তাকাল। স্বয়ম্ভু ফস করে বলে উঠল, 'সুস্মিতা দেবী এখন কিন্তু এই মুখ চাওয়াচাওয়ি করার সময় নেই। আশা করি বুঝতে পারছেন?' চাপা স্বরে সুস্মিতা

বলল, 'অরুণার বিয়ের আগে পর্যন্ত আমাদের বন্ধুত্ব ছিল। মানে ভালোই ছিল। একসঙ্গে ঘুরতেও গেছি। কিন্তু ওর বিয়ের ছয়মাস আগে থেকে আর আমি কোনও সম্পর্ক রাখিনি অরুণার সঙ্গে। অরুণাও রাখতে চায়নি।'

-কেন?

-বন্ধু হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল অরুণা। আমার কাছ থেকে আমার ভালোবাসাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী দুজনেই বিস্মিত হয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে নেয়। স্বয়ম্ভু বলে, 'এর মানে?'

-তমাল আমার প্রথম প্রেম।

প্রিয়াংশু মুখ ফিরিয়ে নেয় দেয়ালের দিকে। স্বয়ম্ভূ আকাশ থেকে পড়ে। জিজ্ঞেস করে, 'তমালের সঙ্গে আলাপ হয় কোথায়? কলেজে?'

-না না। ও আমার সঙ্গে কোচিংয়ে পড়ত। একদিন আমরা ঠিক করি ড্রিংকাসে যাব।

-বারেও যেতেন?

স্বয়ম্ভুর প্রশ্নের সুরে যে এক সমুদ্র বিস্ময় জমেছিল সেটা বুঝল সুস্মিতা। জলে ভারী হয়ে থাকা চোখদুটো দুবার পিটপিট করে বলে, 'মাঝে মাঝে ওখানেই তমালের সঙ্গে অরুণার আলাপ করিয়ে দিই। সেদিন অরুণা আর তমাল দুজনেই মদ খেয়ে আউট হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই খেয়াল করি তমাল আমাকে কেমন যেন এড়িয়ে যাচ্ছে। অরুণাও আর আগের মতো আমাদের সঙ্গে মিশছে না। ছোটখাট ব্যাপারে তমাল খালি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে শুরু করে। আমি খুব আপসেট হয়ে পড়ি। মৃত্তিকা আমায় প্রথম বলেছিল, ওরা প্রেম করছে।'

-মৃত্তিকা কে?

শিবাঙ্গী প্রশ্ন করে।

-আমাদের চারবন্ধুর একটা গ্রুপ ছিল। আমি, অরুণা, দিয়া আর মৃত্তিকা। -আপনার তো বুটিক?

-হ্যাঁ।

-দিয়ার ক্যাফে আছে দেশপ্রিয় পার্কে। রাইট?

-হ্যাঁ।

-আর মৃত্তিকা?

প্রশ্নগুলো পরপর করে গেল স্বয়ম্ভু। 'মৃত্তিকা হাউজ ওয়াইফ। ওর হাজব্যান্ডের নাম দীপায়ন। সিটি কলেজের প্রফেসর।' সুস্মিতা বলল। স্বয়ম্ভু পায়ের ওপর পা তুলে বসল। বলল, 'তারপর? মৃত্তিকা আপনাকে জানাল যে তমাল আর অরুণা প্রেম করছে।'

-আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু ওদের দুজনকেই একদিন হাতেনাতে ধরে ফেলি। ব্রেক আপ করে দেয় তমাল। অরুণাকে বিয়ে করে। সেই থেকে আমি আর অরুণার সঙ্গে যোগাযোগ রাখিনি।

-তারপর আপনি যখন শুনলেন আপনার বিশ্বাসঘাতিনী বন্ধু সুখেই সংসার করছে তখন তার সংসার ভাঙার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। লেলিয়ে দিলেন তর্পণা মিত্রকে। যে কিনা আপনার বুটিকেই শাড়ি কিনতে আসেন।

-হোয়াট? কী বলছেন আপনি? ওই মেয়েকে আমি... কক্ষনও না।

শিবাঙ্গীও টলে গেল স্বয়ম্ভুর কথা শুনে। কোথায় তর্পণা, কোথায় সুস্মিতা। সুস্মিতা যে তর্পণাকে চেনে সেটাই বা জানল কী করে স্বয়ম্ভু?

-ওই মেয়েকে? মানে আপনি তো খুব ভালো করেই চেনেন তর্পণাকে, তাই তো?

-হ্যাঁ, ওকে চিনব না কেন? শাড়ি কিনতে আসে।

প্রিয়াংশু ক্রমশ গুটিয়ে যাচ্ছে। ঘরে এসি চলছে তাও ঘামছে সে। 'ঠাণ্ডাটা একটু বাড়িয়ে দিন প্রিয়াংশুবাবু। এখনিই এত ঘামলে পরে ঘামার সময় তো শুকিয়ে যাবেন।'

- মা... মানে?

-অমন তোতলাচ্ছেন কেন? আমি তো সাধারণ কথাই বললাম। আপনার স্ত্রী অবশ্য, থুড়ি থুড়ি, আপনার সঙ্গিনী অবশ্য অসাধারণ প্ল্যান ছকে একটি কাজ করেছেন। বিশ্বাসঘাতিনী বন্ধুকে খুন করে তর্পণার দোকান থেকে ফুলের তোড়া কিনে আমার বাড়িতে পাঠিয়েছেন। সঙ্গে আবার সেই বন্ধুর ডান পা থেকে কাটা চারটে আঙুল ভালো করে গিফট প্যাক করে উপহার দিয়েছেন।

-আপনি কীসব বলছেন স্বয়ম্ভুবাবু?

প্রিয়াংশু গলা চড়াল।

-একদম ঠিক বলছি।

সুস্মিতা কী বলবে বুঝতে না পেরে অনেক কিছু বলার জন্য হাঁ করে রইল।

-শুধু তাইই না, উনি ভাবতেও পারেননি মাত্র একটা খুন গোয়েন্দা বিভাগের হাতে পৌঁছে যাবে। যেই দেখেছেন কান টানলেই মাথা চলে আসবে অমনি নিজেকে সেফ সাইডে রাখার জন্য অরুণার বাঁ পায়ের আঙুলগুলো নিজের বাড়িতে ছড়িয়ে এই নাটক। যাতে পুলিশের নজর সুস্মিতার ওপর থেকে ঘুরে অন্যদিকে চলে যায়।

সুস্মিতা চিৎকার করে উঠল, 'মিথ্যে কথাআআআআ, এ সব মিথ্যে!

-সব সত্যি সেটা আপনিও জানেন সুস্মিতা।

স্বয়ম্ভু একেবারে সুস্মিতার ঘাড়ে চেপে বসেছে। সে যত বলছে আর সুস্মিতার ছটফটানি তত বাড়ছে। স্থানীয় থানার পুলিশ নির্বিকার হয়ে সব দেখে চলেছেন আর থেকে থেকে চোখ কপালে তুলছেন। ঘরটা বেশ থমথমে হয়েছিল। কিন্তু কোথা থেকে যে স্বয়ম্ভু এমন একখানা ঝড় তুলল সেটা দেখে শিবাঙ্গীও হতবাক। সুস্মিতা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে উঠল, 'আমি তর্পণাকে লেলিয়ে দিইনি। বিলিভ মি। ওকে আমি সহ্যও করতে পারি না।'

-কাস্টমারকে সহ্য করতে পারেন না?

ঝট করে প্রশ্ন করল স্বয়ম্ভু। অমনি প্রিয়াংশু ব্যাপারটা হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে সুস্মিতাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল, 'কী পাগলের মতো বলছিস? স্যার, ওর মাথার ঠিক নেই। কী বলতে কী বলছে ও নিজেই জানে না। আমি বলছি ও খুন করেনি। করতে পারে না।

-পাগলের মতো উনি কী বলছেন? তর্পণাকে যদি উনি লেলিয়ে নাই থাকেন তাহলে কেন সুস্মিতা তাকে সহ্য করতে পারেন না? বলুন বলুন।

ভীষণ বড় একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে সুস্মিতা। খেয়াল হতেই পরিস্থিতি সামলাতে বলল, 'বড্ড বেশি ন্যাকা। দোকানে এসে এমন করে যেন আমার কর্মচারীগুলো আমার নয়, ওর। ওই ওদের মাইনে দেয়।'

-এই জন্য সহ্য হয় না?

-হ্যাঁ।

বেশ জোরের সঙ্গে বলল সুস্মিতা। 'আমার জায়গায় অন্য কেউ এসে খবরদারি করবে সেটা আমি সহ্য করতে পারি না।'

-আমিও তো সেটাই বলছি। অরুণাও আপনার জায়গা নিয়েছিল। তাই তাকে সহ্য করতে পারলেন না। সরিয়ে দিলেন।

সুস্মিতা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। খোলা চুলে দুহাতের আঙুলগুলো চালিয়ে দিয়ে পলকের জন্য চুপ করে রইল। তারপর বলে উঠল, ''মারা যাবার দুদিন আগে অরুণা আমায় ফোন করেছিল।' চাপা মেঘের মতো স্বরে কথাগুলো বাজল স্বয়ম্ভুর কানে। 'কী?' কানটা আরও একটু বেশি বাড়িয়ে দিল সুস্মিতার দিকে। 'হুম' বলে মাথা তুলল সুস্মিতা। চোখদুটো লাল। নাক টানল দুবার। বলল, 'দীর্ঘ চার বছর পর ওর ফোন এল।'

-কখন করেছিল?

-কত হবে? রাত সাড়ে এগারোটা কী তারও পরে।

-কী বলেছিল?

-ওকে কেউ একজন ফোন করছে কদিন ধরেই।

-কে?

-আননোন নম্বর।

গিটারে ঝংকার তুলল দিয়া। গলা ছাড়ল, 'আমার হাত বান্ধিবি, পা বান্ধিবি, মন বান্ধিবি কেমনে? আমার চোখ বান্ধিবি, মুখ বান্ধিবি, পরান বান্ধিবি কেমনে?' সামনের ছোট্ট টেবিলে সাজানো মদের গ্লাস। পাশেই বসে আছে কিয়ারা। হট প্যান্টের নীচে লম্বা ফর্সা পা-দুটো লম্বা করে ছড়ানো। টপটা কোমর পর্যন্ত নামেনি। নাভির কাছটা দেখা যাচ্ছে। গলায় একটা লম্বা চেন বুক ছুঁয়ে পেটের দিকে নেমে এসেছে। এক হাতে হুইস্কি, আরেক হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। দিয়ার গানের তালে মাথা নাড়ছে আর চোখ বুজে সিলিংয়ের দিকে ধোঁয়া ছাড়ছে। গানের মাঝে ফোনটা ঝনঝনিয়ে বেজে উঠল। মাঝপথে থেমে গেল গান। দিয়ারও নেশা হয়েছে। চোখ টেনে দেখার চেষ্টা করল স্ক্রিনে ভেসে ওঠা নামটা। নাহ, কোনও নাম তো নেই। এত রাতে আননোন নম্বর!

-এত রাতে কে রে?

কিয়ারা প্রশ্ন করল। 'জানি না বাঁড়া। হ্যালো।... হ্যালোওওও!' ওপারে নীরবতা। 'কে বলছেন?' কেউ বলছে না। 'ধুস শালা' বলে সবে ফোনটা নামিয়ে রাখতে যাবে অমনি ওপার থেকে 'ম্যাওওওও'। কান থেকে সরাতে গিয়েও মোবাইলটা কানে ঠেকাল দিয়া। আবারও বেড়ালের ডাক।

-হ্যালো।

দিয়ার গলায় সন্দেহ। কিন্তু আবারও 'ম্যাও' ডাক। নেশাটা কেটে গেল এক ঝটকায়। সুস্মিতার কথাগুলো মাথার মধ্যে নতুন করে ঝংকার দিয়ে উঠল। 'এই শালা, কে বে তুই?' বেড়ালটা এবার যেন একটা করুণ আর্তনাদে একটু চিৎকার করেই উঠল। দিয়াও ক্ষেপে গেল। কেঁপে উঠল গলা। তবু ঝাঁঝিয়ে খিস্তি দিয়ে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল, 'এই শালা খানকির ব্যাটা, বিচিতে দম থাকলে সামনে এসে কথা বল। ফোন করে বেড়ালের মতো ম্যাও ম্যাও করছিস কেন?' পাশে বসে কিয়ারারও নেশা প্রায় ছুটে যায়। 'কে ফোন করেছে? দিয়া?'' কিয়ারা হাতের সিগারেটটা অ্যাশ ট্রেতে ঘষে নিভিয়ে দিল। আরও কিছু খিস্তি ছুড়তে গিয়েও চমকে উঠল। এবার বেড়ালের ডাকের সঙ্গে শোনা যাচ্ছে একটা মেয়ের গলার গান। উল্লাস করে গাইছে, 'আজ না ছোড়ঙ্গা তুঝে দম দমা দম।' একটু গাইতে না গাইতেই ফোনটা কেটে গেল।

- হ্যা... হ্যালো। হ্যালো!

দিয়ার চোখ লাল। বিস্ফারিত। মোবাইল ধরা হাতটা আপনা থেকেকেই কান থেকে নেমে আসে।

-এই দিয়া, কী হয়েছে? কে ফোন করেছিল?

কিয়ারা জিজ্ঞেস করল। নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে দিয়া বলল, 'আননোন নম্বর। কেউ কথা বলল না।'

-দেখি ফোনটা দে তো। কোন শালা হারামিপনা করছে...

কিয়ারা কল ব্যাক করতেই যেটা শুনতে পেল, সেটাই দিয়া নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল, 'দিস নম্বর ডাজ নট এগজিস্ট।' কিয়ারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দিয়ার দিকে তাকাল। দিয়া কী করে জানল যে ফোনটা আর পাওয়া যাবে না?

-বেড়ালের ডাক!

নিজেই কথাটা আওড়াল স্বয়ম্ভু। তারপর একটু চিন্তা করল। বলল, 'লোকে ফোন করে হুমকি দেয়। কিন্তু এ বেড়ালের ডাক শোনাল?' সুস্মিতা ঘাড় নাড়ল। শিবাঙ্গী বলল, 'ম্যাডাম, এটাও কিন্তু আপনার দিকেই যাচ্ছে ঘুরেফিরে। আপনার তো বেড়াল আছে দেখলাম।'

-তো?

-শুধু এটাই নয়, ঢোকার সময় দেখলাম জুতোর র‍্যাকে একটা হিল তোলা জুতো রাখা. যার মাপ আট। ওটা আপনারই তো?

-হ্যাঁ আমার। তাতে কী? আরে আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না আপনারা আমাকে বাঁচাতে এসেছেন না ফাঁসাতে?

ভয় ঝেড়ে সুস্মিতা এবার ক্ষেপে উঠেছে। স্বয়ম্ভূ গম্ভীর হয়ে বলল, 'অপরাধীকে ধরতে এসেছি।'

-আমরা কেউ অপরাধী নই শম্ভুবাবু।

চড়াক করে মাথাটা ধরে গেল স্বয়ম্ভুর। সিনিয়রের মুখের ভাব দেখে শিবাঙ্গীই নামবিভ্রাটটা তৎক্ষণাৎ শুধরে দিল।

স্বয়ম্ভু প্রশ্ন করল, 'প্রিয়াংশুবাবুর সঙ্গে কোথায় আলাপ?' উত্তরটা যে সুস্মিতার কাছ থেকেই আশা করছে সেটা পরিষ্কার। তবু উত্তরটা প্রিয়াংশুই দিল, 'আমরা একই কলেজে পড়তাম।'

স্বয়ম্ভু বলল, 'তার মানে আপনিও এদের গ্রুপটাকে চিনতেন?" -হুম।

-আপনার নিশ্চয়ই সুস্মিতাকে আগে থেকেই ভালো লাগত?

-হ্যাঁ। আমি সে কথা জানিয়েও ছিলাম। কিন্তু ও তখন তমালের প্রেমিকা। আমাকে পাত্তাও দেয়নি।

-তার মানে অরুণা আপনার জন্য লক্ষ্মী। আর সুস্মিতার জন্য অলক্ষ্মী। একজনের ভালোবাসা গেল। আরেকজন ভালোবাসা ফিরে পেল। বাবা! পুরো সিনেমা।

সুস্মিতা আর প্রিয়াংশু একে অপরের দিকে চায়। স্বয়ম্ভু বলে, 'এই যে আঙুলগুলো উপহার পেলেন, কার পায়ের নিশ্চয়ই বুঝেছেন?' সুস্মিতা কেঁদে ফেলল। প্রিয়াংশু বলল, 'কিছু একটা করুন স্যার। আমাদের প্রচণ্ড ভয় করছে।'

-যে ডেলিভারি করতে এসেছিল তাকে আপনারা দেখেছেন তো? -প্রিয়াংশু দেখেছে। সুস্মিতা বলল।

-কীরকম দেখতে? শিবাঙ্গীর ভুরুতে ধনুকের ছিলা।

-চোখে সানগ্লাস আর মুখে মাস্ক ছিল। সেরকমভাবে খুব একটা খেয়াল করিনি। কারণ তখন সুস্মিতার আঙুল কেটে গেছিল। সবে ফাস্ট এড করতে যাব তখনই বেল বাজে। কোনওরকমে পার্সেল নিয়ে সাইন করে দরজা বন্ধ করে দিই।

-তাও চুল, দাড়ি, গোঁফ, গায়ের জামাকাপড় কিছু?

প্রিয়াংশু ভাবনার অতলে ডুব দিল। চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করল। 'গালে চাপা দাড়ি। গোঁফ আছে কিনা জানি না। গায়ে নীল বা সবুজ শার্ট থাকতে পারে। নাকি খয়েরি... নাহ! মনে পড়ছে না। আপনি সিসিটিভি চেক করতে পারেন তো।' স্বয়ম্ভুর কপালে ভাঁজটা বাড়ছে। শিবাঙ্গীও কিছু মনে করার চেষ্টা করছে। ঘরের মধ্যে কিচ্ছুক্ষণের নীরবতা। স্বয়ম্ভু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে ওঠে, 'দেখুন সুস্মিতা, অরুণা আপনার কাছ থেকে ভালোবাসা কেড়ে নিয়েছিল। সেই রাগে আপনি যদি এই নাটকটা সাজিয়ে থাকেন তাহলে নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকেছেন। আর যদি সেটা না করে থাকেন তাহলে আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে আপনাদের কমন শত্রু?'

চোখে ফুটে ওঠা চমকটা গোপন করল সুস্মিতা। প্রিয়াংশুর চোখ সুস্মিতাকে নিরীক্ষণ করছে। স্বয়ম্ভুর চোখের মণি শকুনের শবদেহ খুঁজে চলার মতো দুজনের ওপর ঘুরে চলেছে। পাশের ঘরে পুষিকে আটকে রেখেছিল। কে যেন দরজা খুলে দিতে সেও এ ঘরে এসে ম্যাও বলে ডেকে উঠল।

১১

গেটকিপারের বয়ান অনুযায়ী সারা দিনে মাত্র একজনই সুস্মিতাদের ফ্ল্যাটে গেছে। সে ডেলিভারি বয়ই ছিল। তাকে দেখার জন্যই হামলে পড়ে সবাই সিসিটিভি ফুটেজ চেক করছে। মিনিট পাঁচেক এপাশ ওপাশ ফুটেজ দেখার পর গেটকিপারটাই চিনিয়ে দিল লোকটাকে। প্রিয়াংশুও বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো সে।' স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী দুজনের চোখেই অপার বিস্ময় দুজনেই একে অপরের দিকে চেয়ে কিছু নীরব কথা চালাচালি করে নিল। স্বয়ম্ভু বুঝল শিবাঙ্গীর চোখের ভাষা আর শিবাঙ্গী বুঝল স্বয়ম্ভুর চাউনি মুখে নীল মাস্ক। তার আড়াল থেকে চাপা দাড়ির উঁকিঝুঁকি। গায়ে নীল রঙের শার্ট। ফুটেজে টাইম দেখাচ্ছে সকাল ন'টা বারোতে ছেলেটি ঢুকেছে। লিফটের জন্য অপেক্ষা করেছে। ছ'তলায় উঠেছে। বেল বাজিয়েছে। দরজা খোলার জন্য ওয়েট করেছে। তারপর পার্সেল ডেলিভারি করে লিফটে করে নেমে বেরিয়ে গেছে ন'টা উনিশের মধ্যে |

-আমরা ক'টায় কচুরি খাচ্ছিলাম শিবাঙ্গী?

-দশটা-সোয়া দশটা।

-চেতলা থেকে ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক। মাঝে ট্রাফিক, জ্যাম এসব ঠেলেঠুলে....। মনে মনে ছকটা কষে নিল স্বয়ম্ভু। শিবাঙ্গী বলে উঠল, 'সময়টা মিলে যাচ্ছে স্যার।'

গাড়ির বনেটের ওপর দমাস করে একটা ঘুষি মারল স্বয়ম্ভু। 'বড্ড ভুল হয়ে গেছে শিবাঙ্গী। দুর্দান্ত কচুরিটা আমাদের হাত থেকে দারুণ একটা সুযোগ কেড়ে নিল।'এ

-কিন্তু স্যার, নকল দাড়ি তো যে কেউ লাগাতে পারে। কত লোক তো পরচুলা পরে বেরোয়। তাতে তো কাউকে ধরা সম্ভব নয়।

স্বয়ম্ভু চোখগুলো ছোট করে শিবাঙ্গীর দিকে চেয়ে বলল, 'বাইকের নম্বরটা তো নিতে পারতাম।' শিবাঙ্গীর মাথায় এটা সত্যিই আসেনি। তবে পরক্ষণেই আরেকটা দিক খুলে যায় শিবাঙ্গীর চোখের সামনে, 'স্যার, তাহলে কি খুনি মেয়ে নয়? ছেলে?'

-একটা ছেলে একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করল। তারপর তার হাত-পা বাঁধল। কিন্তু শরীরের কোনও অংশ ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখল না। কী করল? না একটা স্টিলেটো পরে মেয়েটার শরীরের ওপর তাতা থৈথৈ করে নেত্য করল যাতে সে মরে যায়। এত কষ্ট কেন করবে?

-হয়তো তার মেন্টাল কোনও প্রবলেম আছে!

-কার? এমন কেউ যে অবশ্যই অরুণা, সুস্মিতাকে চেনে। এদিকে সুস্মিতা তো এমন কারও কথা বলতেই পারল না।

-কিন্তু তর্পণা যে সুস্মিতাকে চেনে, ওর দোকান থেকে শাড়ি কেনে সেটা জানলেন কী করে?

-সুস্মিতার বুটিকের ওয়েবসাইটে আর সোশ্যাল মিডিয়ার পেজে যাও দেখতে পাবে। প্রতিটা কাস্টমার ওদের শাড়ি পরে ছবি পাঠালে সেটা বুটিকের পেজে পোস্ট হয়।

এই জন্যেই স্বয়ম্ভু সেন এত কম বয়সে এত বড় পদে বসে আছেন। অন্য কারও মাথায় যা আসে না ওনার মাথায় সেটা বিদ্যুতের চেয়েও তীব্র গতিতে খেলে যায়। মনে মনে গর্ব হল শিবাঙ্গীর। ভাব জগত থেকে বেরিয়ে শিবাঙ্গী বলল, 'আমাদের ইমিডিয়েটলি বাকি বন্ধুদের সঙ্গেও কথা বলতে হবে স্যার।'

-আমাদের ইমিডিয়েটলি আরও অনেক কিছু করতে হবে শিবাঙ্গী। সিসিটিভি চেক, এই ছেলেটিকে ট্র্যাক করা, তর্পণার ওপর সুস্মিতার কেন এত রাগ? এরপরের ভিক্টিম কি সুস্মিতা? সেটা বের করা। আমার মাসির সঙ্গে এই অবস্থার মধ্যেও কথা বলা, যদি অরুণা তাকে কিছুও বলে থাকে। তার থেকেও আরও একটা বড় প্রশ্ন, এমন খুন কোথায় করেছে খুনি? আরও অনেক অনেক, অনেক কিছু। আপাতত গাড়িতে ওঠ। বাড়ি চলো। মাথাটা জাস্ট আর কাজ করছে না।

কথাগুলো বলতে বলতেই গাড়িতে উঠে বসল স্বয়ম্ভু। শিবাঙ্গীও উঠে পাশের সিটে বসল। গাড়ি ছাড়ল। রাতের অন্ধকারে বিন্দু বিন্দু স্ট্রিট লাইটের আলোর সঙ্গে এক ঝাঁক রহস্য মাথায়

নিয়ে সবেগে হারিয়ে গেল স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী।

শ্রাবণেও রোদ ঝলমল করে। কিন্তু সে রোদে চেপে রাখা কান্নার একটা ভ্যাপসা আমেজ থাকে। যেটা বুকের ওপর চেপে বসে থাকে। নিশ্বাস নিতে দেয় না। উজ্জ্বল একটা দিনের দিকে চেয়েও মনে হয় কেন এমন দিন এল? আজকের দিনটা তো এমন নাও হতে পারত। যদি আগের কিছু ভুল, কিছু অন্যায়, কিছু অবুঝপনা সচেতনভাবে এড়িয়ে যেত তাহলে তো আজকের রোদ্দুরের মানেটাই পালটে যেত। এত বছর বেঁচে থাকার পর মনে হত না কেন বেঁচে আছি! বসার ঘরের তক্তপোশের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে এমনই আরও কত কী আকাশ পাতাল ভেবে চলেছেন সুমিত্রা দেবী। পাশের সোফায় বসে পুলকেশ কীসব লিখে চলেছেন। সুচিত্রা দুটো বাটিতে দুধ চিঁড়ে মেখে এনেছে কলা দিয়ে। ‘সুমি আর বেলা করিস না। খেয়ে নে। পুলকেশ তুমিও খাও।' সুমিত্রা দেবীর কোনও বিকার নেই। পুলকেশ মুখ তুলে একবার বাটির দিকে তাকাল। তারপর বড় করে শ্বাস ছাড়লেন। বারান্দায় গেট খোলার শব্দ হল। পুলকেশ মুখ বাড়ালেন। জুতো খুলে সরাসরি ঘরে ঢুকে এল স্বয়ম্ভু। পুলকেশ বললেন, 'আয় বোস।' সুচিত্রার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় মাসির অবস্থা জানতে চাইল। সুচিত্রা বিষন্ন মুখে শুধু দুপাশে ঘাড় নাড়ল। স্বয়ম্ভু নিজে থেকেই তার মেজ মাসির পাশে এসে বসল। জল ভরা চোখ তুলে তাকালেন সুমিত্রা। মুহূর্তের মধ্যে ঝরঝর করে কেঁদে স্বয়ম্ভুর বুকের ওপর মাথা রাখলেন। হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘এ কী হল ভোলা? এ কী হয়ে গেল!' ভোলা জড়িয়ে ধরল। কী বলবে বুঝে পেল না।

-বিয়ের আগে কতবার বারণ করেছিলাম। কত বাধা দিয়েছিলাম ওকে। কিচ্ছু শোনেনি। পালিয়ে গেল। আর এখন দ্যাখ, চিরকালের মতো পালিয়ে গেল মেয়েটা।

-মাসি, মাসি এভাবে কেঁদো না। শরীর খারাপ করবে।

-আর বাঁচতে চাই না ভোলা। আর বাঁচতে চাই না।

-এসব বললে হবে নাকি। মেসোকে কে দেখবে?

-জানি না। কিচ্ছু জানি না। ওই ছেলেটাকে তুই ছাড়িস না ভোলা। আমি বলছি, ওই মেরেছে আমার মেয়েটাকে?

ওই ছেলে বলতে মেজ মাসি যে কাকে বোঝাচ্ছে সে ভালোই বুঝল স্বয়ম্ভু। 'আমি সবটা দেখছি মেজ মাসি। তমাল অপরাধী হলে নিশ্চয়ই সাজা পাবে। কিন্তু সেটা যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তো আর ওকে ধরতে পারি না।' সুমিত্রা প্রায় চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন, ‘কী বলছিস ভোলা? একটা মেয়ের সঙ্গে তমালের মেলামেশা আছে। সেই জন্যেই তো আমার মেয়েটা মরল।'

-মেজ মাসি, অরুণা আত্মহত্যা তো করেনি। কোনও চিঠিও লিখে যায়নি। এমনকী কোনও ডায়রিও লিখত না। ওকে কেউ মেরেছে।

-ওই ছেলেটাই তো, ওই শয়তান তমালই মেরেছে পথের কাঁটা পরিষ্কার করবে বলে। কতবার অরুণাকে বলেছে যে মেরে পুঁতে রেখে দেবে।

-কী? কে বলেছে অরুণা?

স্বয়ম্ভু চমকে উঠল। সুমিত্রা বললেন, ‘ওদের যখনই ঝগড়া হত তখন মাঝেমাঝেই বলত। অরুণা একদিন কাঁদতে কাঁদতে বলেই ফেলল।'

-কী বলল?

-বলল মা, একদিন যে লোকটা আমায় বলেছিল আমায় ছাড়া নাকি বাঁচতেই পারবে না, আজ সেই মানুষটাই বলছে মেরে পুঁতে দেব। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তাও বলেছিলাম, অমন তো কত কথাই রাগের মাথায় বলে লোকে। সব কী আর ধরতে আছে? তখন তো বুঝিনি বাবা, আজকের দিনটাও আমাদের দেখতে হবে!

-আর কী বলেছে অরুণা? আচ্ছা, মেজ মাসি, একটা কথা বল এই অশান্তি শুরু হল কবে থেকে?

সুমিত্রা চোখের জল মুছে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'বছর দুই আগে একবার জামাইষষ্ঠীতে যখন তমালকে বলব বলে ফোন করেছি তখনই অশান্তির আঁচ পাই। তমাল ফোন তোলে না। অরুণাও কিছু বলতে চায় না। শুধু বলে আমরা এবারে আর যেতে পারব না। এরপরে আরও বেশ কয়েকবার আমি মেয়েকে ফোন করেছি কিন্তু গলা শুনে আমার কেমন যেন মনে হয়েছে। একদিন না জানিয়ে চলেই গেলাম মেয়ের কাছে। সেদিনই অরুণা সব বলল। তমাল নাকি তর্পণা নামের কোন এক মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। বাড়িতে অশান্তি করছে। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁরে অরুণা তোরা বাচ্চা নিচ্ছিস না কেন? একটা বাচ্চা কাচ্চা থাকলে তো সংসারটাও সুন্দর হয়। সেই থেকে ওর মাথায় বাচ্চা নেওয়ার শখ চাপল। কতকটা জেদ চেপে গেল জানিস। এর আগে অরুণাই চায়নি এত তাড়াতাড়ি বাচ্চা নিতে। কিন্তু যখন দেখল ঘরের মানুষটাই হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে তখন একটা বাচ্চার জন্য মেয়েটা ক্ষেপে উঠল। যদি তমালকে ধরে রাখতে পারে, এই আশায়!

-ক্ষেপে উঠল মানে?

-এক বছর চেষ্টার পরেও ওদের বাচ্চা হচ্ছিল না। ও নিজে ডাক্তারের খোঁজ নিয়ে ছুটে গেল। চিকিৎসা শুরু করল। ওদিকে তমাল কিছুতেই ডাক্তারের কাছে যাবে না। বললেই অরুণাকে আজেবাজে কথা বলত। শেষমেশ ও হাল ছেড়ে দিচ্ছিল।

-কিন্তু তমাল তো বলল, তমাল নাকি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। অরুণা যায়নি। কীসব নাকি জ্যোতিষ-ফোতিষ দেখাত।

-হ্যাঁ, একজন পুরুতের কথা ও বলেছিল। কিন্তু ও তো ডাক্তারের কাছে নিজে গিয়েছিল। তমাল নাকি গায়েও হাত তুলতে শুরু করেছিল।

-গায়ে হাত তুলত? এটা কি অরুণা বলেছিল না আপনারা দেখেছিলেন কখনও?

সরু করে আঁকা ভুরু দুটো তুলে প্রশ্নটা করল শিবাঙ্গী। উল্টোদিকে বসে থাকা তমালের প্রতিবেশীনী বউটি বলল, 'না না দেখিনি। তবে শুনেছি।'

-কী শুনেছেন?

-অরুণা কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করত। বলত, এত বড় সাহস তুমি আমার গায়ে হাত তোলো। আমি সারা পাড়ার লোককে ডেকে বলব তুমি কতটা ছোটলোক।

পাশেই অফিসে যাবার জন্য তৈরি হয়ে বসেছিলেন মহিলাটির স্বামী। এবার তিনি বলে উঠলেন, 'একদিন বোধহয় অরুণা পুলিশের কাছে যাবার জন্য বেরোচ্ছিল। তমাল দেখলাম জোর করে টানতে টানতে ঘরে ঢুকিয়ে দিল।' শিবাঙ্গী প্রশ্ন করল, 'আপনারা কোনওদিন কোনও মেয়েকে আসতে দেখেছেন?'' বউটি বলল, 'না।'

-মেরে ফেলব বা খুন করে দেব এরকম কোনও কথা কি শুনেছেন কখনও?

এবার স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অস্বস্তিতে পড়ল। একই ঘরে বসে নিজের মনে সাদা পাতায় রং পেন্সিল বোলাচ্ছিল বাড়ির বাচ্চাটি। সাড়ে পাঁচের বেশি হবে না। ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হয়েই গম্ভীর হয়ে বাচ্চাটিকে বলে উঠল, 'পাপান তোমায় বললাম না পাশের ঘরে গিয়ে আঁকতে? যাও।' শিবাঙ্গী বেশ লজ্জায় পড়ল। 'উপস সরি সরি। খেয়াল ছিল না আমার।' বাচ্চাটি গলা তুলে বলল, 'ও ঘরে তো মাম্মাম পুজো করছে। আমি গেলেই রাগ করে।'

-কেউ রাগ করবে না। যাও। আমি মাম্মামকে বলে দেব।

বাচ্চাটি ব্যাজার মুখে তার জিনিসপত্র গোটাতে শুরু করল। লোকটি বলল, 'দেখুন ম্যাডাম, আমাকে এবার বেরোতে হবে। এর বেশি সত্যিই আমরা কিছু জানি না। আর এসবের মধ্যে জড়াতেও চাই না৷ বুঝতেই পারছেন, বাচ্চা নিয়ে থাকি।' শিবাঙ্গীর শেষ প্রশ্নের উত্তরটার বড় দরকার ছিল। কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়েছে দেখে হাত জোড় করে উঠেই যাচ্ছিল। কিন্তু বাধ সাধল বাচ্চাটি। দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়েও ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'আমি জানি।' ঘরের মধ্যে সবাই হতবাক। 'তুমি আবার কী জানো পাপান? নির্ঘাত গল্প বানাবে এবার। যাও ও ঘরে যাও।'

-না গল্প নয়। সত্যি।

কারুর কথা কানে না তুলেই শিবাঙ্গী এগিয়ে গেল বাচ্চাটির দিকে। শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী জানো সোনা?'

-ওই কাকুটা খুব খারাপ।

-কোন কাকুটা?

শিবাঙ্গী প্রশ্ন করতেই বাচ্চাটির মা তড়পে উঠল। 'আহ! পাপান। কেন আজেবাজে কথা বলছ?' উলটে শিবাঙ্গী এবার গরম নিল, 'প্লিজ ম্যাডাম, পুলিশের কাজে বাধা দেবেন না।' স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ব্যোমকে গেল। ভীষণ নরম সুরে শিবাঙ্গী আবারও প্রশ্নটা করল পাপানকে, 'কোন কাকুটা খারাপ পাপান?'

-পাশের বাড়ির কাকু।

-কেন? কী করেছে সে?

-সেদিন কাকিমাকে বলছিল, তোমায় মেরে কুচি কুচি করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব। দেখব, কোন শালা বাঁচায়!

-ইসসস।

পাপানের মা ভুরু কুঁচকে সারা মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে তুলল। পাপানের বাবা এবার এগিয়ে এসে পাল্টা গরম নিয়ে বলল, 'অনেক হয়েছে ম্যাডাম। এবার রেহাই দিন। একে তো পাড়াটা নরক হয়ে গেছে। তার ওপর আপনাদের উল্টোপাল্টা প্রশ্নের জন্য বাচ্চাগুলোও...!' শিবাঙ্গী হাত জোড় করে বলল, 'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আর আমাদের উপকার করার জন্য ধন্যবাদ। এরপর আরেকদিন আসব। পাপানকে একটা ক্যাডবেরি দিয়ে যাব। ওটা ওর প্রাপ্য। চলি।' শিবাঙ্গী গটগট করে বেরিয়ে গেল। শার্ট-প্যান্ট পরা মেয়ে পুলিশটার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে রইল পাপান।

একটা কোনও ক্লু পাবেই এবার, সেই আশাতেই অধির আগ্রহে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল স্বয়ম্ভু। পাশে শিবাঙ্গী। চোখ থেকে চশমাটা কপালের ওপর তুলে রিসিপ্টটা ভালো করে দেখে দুপাশে ঘাড় নাড়লেন লোকটা। 'না স্যার, এটা আমাদের এখান থেকে ডেলিভারি হয়নি।'

-এটা আপনাদের রিসিপ্ট নয়?

স্বয়ম্ভু জিজ্ঞেস করল।

-লোগোটা আমাদেরই। কিন্তু এটা নকল।

-কী করে বুঝলেন?

-সাইন ছাড়া কোনও কিছু আমাদের হাতে লেখা থাকে না। এখানে দেখুন, কী ডেলিভারি হচ্ছে সেটা হাতে লেখা। তাও আবার শুধু গিফট।

স্বয়ম্ভু ডেলিভারি রিসিপ্টটা আবারও নিজে হাতে নিয়ে ভালো করে দেখল। ইংলিশে লেখা গিফট শব্দটা। তাও জিজ্ঞেস করল, 'আপনি শিওর? কোনওভাবে এটাই হয়তো হাতে লেখা হয়েছে।'

-আমাদের এখান থেকে তিন-চারবার চেক হয়ে তবেই মাল ডেলিভারির জন্য বেরোয় স্যার।

-হুম। চেতলার সাউথ এন্ড হাইটসে কিছু ডেলিভারিও হয়নি কাল?

ম্যানেজার একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'দুমিনিট স্যার।' ইন্টারকমের রিসিভারটা তুলে ইশিতা নামের কাউকে বললেন গতকালকের ডেলিভারি লিস্টটা দেবার জন্য। রিসিভার রেখে বললেন, 'গতকাল আমাদের যা যা ডেলিভারি হয়েছে তার অর্ডার নাম্বার, টাইম, প্লেস এবং ডেলিভারি কে করেছে সব প্রিন্ট আউট আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

-থ্যাংক ইউ। আরেকটা উপকার করুন....

-বলুন না স্যার।

-আপনাদের যে কজন ডেলিভারি বয় আছে সবার ছবি আমায় দেখান। রেকর্ড আছে নিশ্চয়ই?

-একদম স্যার। আমি এখুনি দেখিয়ে দিচ্ছি।

ম্যানেজার নিজেই ল্যাপটপ থেকে প্রত্যেকটা লোকের ছবি, নাম বের করে দেখিয়ে দিলেন। শিবাঙ্গী আর স্বয়ম্ভূ দুজনেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তবে সেটা দেখে খুব একটা উপকার কিছু হল না। কারণ কচুরি খেতে যে গিয়েছিল তার দাড়ি ছিল নকল। মুখের মধ্যে এমন কোনও বিশেষত্ব ছিল না যা নজরে পড়ার মতো। তাও শিবাঙ্গী বলল, 'এদের একবার সামনে দেখা গেলে ভালো হত না স্যার?' স্বয়ম্ভু বলল, "লাভ নেই। নিজের অর্গানাইজেশনের নকল রিসিপ্ট কেউ বানাবে না। বানালে কোথায় হাতে লেখা হয়, কোথায় টাইপ করা হয় সেটা সে জানবে। এত বড় ভুল করবে না। তাছাড়া সিসিটিভিতে মুখ তো খুব ভালো করে ধরা কিছু পড়েনি। যা দেখার আমরা নিজের চোখে দেখেছি। সেক্ষেত্রে প্রমাণও নেই।'

-স্যার আসব?

-হ্যাঁ হ্যাঁ এসো।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি চুড়িদার পরা মেয়ে ঢুকে আসে ঘরে। খোলা চুলে স্টেপ কাট। গলায় আইডি কার্ড। এই সম্ভবত ইশিতা। হাতে ধরা কয়েকটা প্রিন্ট আউট ম্যানেজারকে দিয়ে বেরিয়ে গেল। এইটুকু সময়ের মধ্যেই মেয়েটিকে আপাদমস্তক মেপে নিল স্বয়ম্ভু। ম্যানেজার নিজে ভালো করে দেখে বলল, 'না স্যার, কাল কোনও ডেলিভারি হয়নি।' স্বয়ম্ভুকে কাগজগুলো দেওয়ামাত্রই সে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। চলি।' কাগজগুলো একবার রিচেকও করল না। ম্যানেজার প্রতি নমস্কার জানালেন।

১২

-এত কেন ভাবছিস? পুলিশ তো দেখছে ব্যাপারটা।

দিয়া ভরসা দিল সুস্মিতাকে। সক্কাল সক্কাল দিয়ার ফ্ল্যাটে ছুটে এসেছে সুস্মিতা।

-একটা মানুষের পা থেকে চারটে আঙুল কেটে পাঠিয়ে দিল। তার পরেও ভাবব না? খুনি কী বলতে চাইছে? এরপর আমার পালা?

দিয়ার চোখ ছোট হয়ে গেল। পায়ের ওপর পা তুলে বসে বলল, 'আমারও হতে পারে।' সুস্মিতা অবাক। বলল, 'কেন?' হাসল দিয়া। বলল, 'না এমনি। মনে হল।' রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল কিয়ারা। ফ্রিজ খুলে কিছু একটা বের করল। এক ঝলক দুজনের দিকে নজর দিয়ে চলে গেল। দিয়ার কথা সুস্মিতার বিশ্বাস হল না। ও জোর দিল, 'না দিয়া তুই নিশ্চয়ই কিছু লুকোচ্ছিস।'

-আরে কী লুকোবো? সত্যি বলছি, এমনিই মনে হল।

-তোকে আমি চিনি দিয়া। তোর মনের জোর সাংঘাতিক। নইলে নিজের মরার কথা কেউ এইভাবে বলতে পারে?

-তুই মরতে ভয় পাস সুস?

-এই, মরতে কে না ভয় পায় রে?

-আর মারতে?

সুস্মিতা যেন কারেন্টের শক খেল। 'মা... মানে ?

-কিছু না। এমনি বললাম। আচ্ছা, আমাদের সেই নর্থ বেঙ্গলের ট্যুরের কথা মনে আছে তোর?

সুস্মিতার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। 'আছে। কেন?" দিয়া কী বলতে চাইছে? হঠাৎ নর্থ বেঙ্গল ট্যুরের কথা এতদিন বাদে তুলছে কেন?

-ওখানে তো আমরা চারজন গিয়েছিলাম। তুই, আমি, মৃত্তিকা আর অরুণা।

-হ্যাঁ।

-আর কী কেউ গিয়েছিল?

-কী পাগলের মতো বকছিস? আর কেউ গেলে আমরা জানতে পারব না?

-না, হয়তো আমি জানি না। তুই জানতে পারিস।

-না দিয়া। আর কেউ যায়নি বলেই আমি জানি। তাছাড়া তুই কার যাওয়ার কথা বলছিস?

-জানি না। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে আরও কেউ ছিল। আড়ালে।

দিয়ার মুখেও এবার চিন্তার মেঘ। সুস্মিতার মেরুদণ্ড দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে যাচ্ছে। চাপা স্বরে বলল সুস্মিতা, 'জানিস দিয়া, আমি যখন আসছিলাম তোর বাড়ি তখন কেউ যেন আমায় ফলো করছিল।'

-হোয়াট?

-হ্যাঁ রে। ফ্ল্যাট থেকে বেরোতেই মনে হল। কিন্তু কাউকে সেরকম দেখতে পেলাম না। অটোতে উঠলাম। তখনও মনে হচ্ছে আমার ওপর কেউ কন্সট্যান্ট নজর রেখেছে। তারপর নামলাম। তখনও...

-মনের ভুল। এই দিনের বেলা এত লোকের মাঝে এরকম হতে পারে না। এ কি থ্রিলার না হরর মুভি? যে কেউ আছে কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছিস না।

সুস্মিতা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল দিয়াকে, 'তাহলে তুই কেন জিজ্ঞেস করছিস যে নর্থ বেঙ্গলে আরও কেউ গিয়েছিল কিনা। ওটা কী হরর ছিল? কেউ আছে অথচ দেখতে পাচ্ছি না?' দুজনেই তলাতে তলাতে কোথায় গিয়ে ঠেকবে বুঝতে পারছে না। সুস্মিতা বলল, 'এবার মৃত্তিকাকে জানানো উচিত। ওর ছোট একটা মেয়ে আছে। ওর যদি কোনও বিপদ হয়?'

-অনেক কথা হয়েছে গাইজ। আর না। এবার শুধু আমার তৈরি মেক্সিকান স্যান্ডউইচ।

পরিবেশটাকে হালকা করতে দুহাতে দুটো প্লেট নিয়ে হাজির হল কিয়ারা। সুস্মিতা নাক কুঁচকে বলল, 'না না, আমি এসব খাব না রে।' দিয়া বলল, ''খা খা। নইলে বিশাল মিস করবি। কিয়ারা অওসম বানায় এটা।' আদুরে ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে ভুরু নাচাল কিয়ারা। সুস্মিতার গলা দিয়ে কোনও খাবারই নামবে না। তবু মন রাখা হাসি হেসে স্যান্ডউইচটা হাতে তুলে নিল। 'বাই দ্য ওয়ে, আমি তো তোকে বলতেই ভুলে গেছি। আজ তোকে ফোন করতামই।' স্যান্ডউইচে কামড় বসিয়ে দিয়ার দিকে তাকাল সুস্মিতা। দিয়া বলল, 'পরশু আমার জন্মদিন। কিয়ারার শখ হয়েছে এবার বড় করে করবে।' সুস্মিতা খুশির হাসি আনার চেষ্টা করল। দিয়া বলল, 'পাজিটা ভেনু বুক করে এসেছে জানিস। অবশ্যই আসবি। আমি প্রিয়াংশুকে ফোন করে দেব।' সুস্মিতা পাংশুটে মুখে বলল, 'নিশ্চয়ই আসব। যদি বেঁচে থাকি।

-একদম ফালতু বকবি না। অরুণাটা গাধা ছিল। সব কিছুতেই আগেভাগে হামলে পড়ার অভ্যেস। নিশ্চয়ই সেরকম কিছু করতে গিয়েই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। পাপ কখনও বাপকে ছাড়ে না। তোর থেকে আর সেটা কে বেশি জানবে বল? তোর ঘরেই তো ও থাবা বসিয়েছিল তাই না?

সুস্মিতা ঢোঁক গিলল। স্যান্ডউইচটা গলা দিয়ে কিছুতেই নামছে না। দিয়া ফোনটা তুলে বলল, 'মৃত্তিকা কি ফোন ধরবে এখন! দেখি একবার ট্রাই করে।' নম্বর খুঁজতে থাকে। সুস্মিতা বলে, 'আচ্ছা, অরুণার মৃত্যুর খবরটা কি মৃত্তিকা পায়নি? একবারও তো আমাদের কল করল না!'

সানগ্লাসটা চোখে দিয়েই ক্যাফের টেবিলে এসে বসল তর্পণা উল্টোদিকের চেয়ারে তমাল। রোদে লাল হয়ে গেছে তর্পণার মুখ নাকি প্রচণ্ড বিরক্তি আর রাগে?

-কী নেবে?

-কিচ্ছু না।

দাঁতে দাঁত পিষে তমালের প্রশ্নের উত্তর দিল তর্পণা। 'দয়া করে তাড়াতাড়ি বল কী বলবে?' কথাটা শেষ করতে করতেই চারপাশে চোখ চালিয়ে দিল।

-দোকানে নন্দিনী নেই?

-ও বোবা। কথা বলতে পারে না।

-এর আগেও তো ও দোকান সামলেছে। তখনও তো ও বোবাই ছিল।

-তমাল প্লিজ, ফর গড সেক, যা বলার তাড়াতাড়ি বলো। আমি এক্ষুনি উঠব।

তমাল খপ করে তর্পণার হাতটা ধরে বলে ওঠে, 'আমি আর পারছি না তর্পণা। আমার কিচ্ছু ভাল্লাগছে না! তুমিও ফোন ধরছ না।' ঝট করে হাতটা নিজের দিকে টেনে তমালের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল। 'তুমি পাগল হয়ে গেছ তমাল। পুলিশ, গোয়েন্দা সবাই তোমায় নজরে রেখেছে। আই থিংক তোমার ফোনটাও ট্যাপ করা। আমি যে তোমার গোপন ফোনে কল করেছিলাম সেটাও জেনে গেছে স্বয়ম্ভু সেন। আর তুমি এখন আমায় ক্যাফেতে ডেকে ন্যাকা কান্না কাঁদছ?'

-অফিস থেকে বলেছে কেস না মিটলে তুমি আসবে না। পাড়ায় বেরোলে প্রতিটা লোক এমন করে তাকাচ্ছে যেন আমি সত্যিই আসামি। দোকানে জিনিস কিনতে গেলে এমন ব্যবহার করছে যেন কুকুর-বেড়ালকে খেতে দিচ্ছে। কিন্তু তুমি তো আমায় ভালোবাসো। তুমি তো বিশ্বাস কর তর্পণা আমি খুন করিনি? এই সময় তুমি আমার পাশে থাকবে না?

তর্পণা কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেল। ফোঁস করে একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমি একটু ওয়াশরুম যাব। তার মধ্যে ঠিক কী বলতে ডেকেছ সেটার সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্ট করে রাখো। আমি জাস্ট আসব, শুনব, বেরিয়ে যাব। এইসব ভালোবাসো-টাসো ন্যাকামোগুলো পরে কোরো।' তর্পণা ব্যাগটা টেবিলে রেখেই উঠে চলে গেল দ্রুত পায়ে। তমাল সত্যিই বিভ্রান্ত। চোখের নীচে দুদিনেই কালি পড়ে গেছে। ঘুম হয়নি। মাথার চুলে তেল পড়েনি। উশকোখুশকো। গায়ের শার্টে অজস্র উল্টোপাল্টা ভাঁজ। কোনও স্তূপের মধ্যে থেকে বের করে এনেছে। যতটা পারে লোকের থেকে মুখ লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

কারও একটা মোবাইল গুমরে উঠছে। ভোঁ ভোঁ করে শব্দ হচ্ছে। কম্পনটা তমালের হাতে অনুভূত হতেই বুঝল মোবাইলটা তর্পণার ব্যাগ থেকেই আসছে। প্রথমে ভাবল বাজুক। কিন্তু তারপরেই খেয়াল হল, ও তো মোবাইল নিয়েই গেল। তাহলে আরও একটা মোবাইল! বলেনি তো তর্পণা। এদিকে ফোনটা বেজেই যাচ্ছে। নাহ, থামাতে হবে। ব্যাগের চেন খুলে ফোনটা বের করতেই চমকে ওঠে তমাল। আঙুলগুলো আটকে যায় তার। স্ক্রিনের ওপর ফুটে উঠেছে নন্দিনীর নাম। নন্দিনী কল করছে! সে তো বোবা! কথাই বলতে পারে না। তাহলে কী কোনও বিপদে পড়ল বাচ্চা মেয়েটা? তাই কল করে কিছু বলবার চেষ্টা করছে বেচারা? তমাল শুনেছে তর্পণার দোকানেও পুলিশ গিয়েছিল। হয়তো আবার এসেছে! দূরে তাকিয়ে দেখল তর্পণা আসছে কিনা। নাহ! ও এখন ওয়াশরুমে। টক করে ফোনটা ধরেই কানে ঠ্যাকাল তমাল। হ্যালো বলবার জন্য মুখটা হাঁ হলেও কোনও শব্দ বেরোলো না। শুধু চোখদুটো কড়কড় করে উঠল তমালের। কপালের দুপাশের রগ ফুলে উঠল। চোয়াল শক্ত হল। মুহূর্তে চোখের ওপর চেনা পৃথিবীটা ভীষণ অচেনা মনে হতে থাকল। ভয় করল খুব। তর্পণাকে ওয়াশরুম থেকে বেরোতে দেখে কান থেকে ফোনটা নামিয়েই কলটা কেটে দিল। আবার ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল। ওদিকে তর্পণা বাইরের বেসিনে হাত ধুয়ে, মুছে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল।

-বসব না। কী বলার আছে বলো।

তর্পণা সত্যিই বসল না। তমালও সময় নষ্ট না করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর তর্পণার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমার অভিশপ্ত জীবন থেকে তোমায় মুক্তি দিলাম। গুড বাই।' মুখে রুমাল চাপা দিয়ে মাথা নিচু করে প্রায় দৌড়ে ক্যাফের বাইরে বেরিয়ে গেল তমাল। তর্পণা খানিকক্ষণের জন্য স্থির হয়ে রইল। তমাল এই কথা বলার জন্য এখানে ডেকে আনল? অদ্ভুত! একটু আগেই তো অসহায়ের মতো তর্পণাকে পাশে চাইছিল। আর এইটুকু সময়ে কী এমন হল যে... কিচ্ছু বুঝতে পারল না তর্পণা। অন্যমনস্ক হয়ে কাঁধে ব্যাগটাকে তুলতে গিয়ে খেয়াল হল ব্যাগের চেনটা খোলা। ভিতরে রাখা ফোনে আলো জ্বলছে। ফোন এসেছে। চট করে ফোনটাকে বের করল। 'হুম... কী? আমি?' আর কোনও কথা বেরোলো না মুখ দিয়ে। স্তম্ভিত হয়ে ঈষৎ বিস্ফারিত চোখে বাইরের রাস্তাটার দিকে চেয়ে রইল তর্পণা।

লালবাজারের সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টে সটান ঢুকে গেল স্বয়ম্ভু। ছড়ানো ছেটানো কম্পিউটারে কাজ চলছে সারাদিন। ফোনের রিং, লোকের কথা, কিছু সময় নীরব হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে চেয়ে কোনও সাইবার দুষ্কৃতিকে ধরার চেষ্টা, এমনই হাজারও কাজের স্রোতে ভেসে ব্যস্তসমস্ত সাইবার এক্সপার্টরা। কারও দিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই। এরকমই এক সময়ে স্বয়ম্ভু ঘরের ভিতর ঢুকে একটা টেবিলে কোমর ঠেকিয়ে দাঁড়াল। দু-তিনটে ছেলে বলে উঠল, 'গুড আফটার নুন স্যার'। স্বয়ম্ভু সৌজন্যের হাসি ছুড়ে দিল। পাশে শিবাঙ্গীও হাজির। স্বয়ম্ভুর সামনে কিছু হাত দূরত্বে একটি লোক নির্বিকার। কম্পিউটারে চোখ গুঁজে বসেই আছে। ঘাড় বেঁকিয়ে লোকটাকে পিছন থেকে নিরীক্ষণ করে স্বয়ম্ভু বলে উঠল, 'জানো শিবাঙ্গী, আজ একটা ভয়ানক খবর শুনলাম।' শিবাঙ্গী ঘাবড়ে গেল। এই ঘরে এসেছিল একটা জরুরি কাজে। কিন্তু এমন করে তো শুরু হওয়ার কথা ছিল না! ভদ্রতার খাতিরে শিবাঙ্গীও উত্তর দিল, 'কী শুনলেন স্যার?'

-লালবাজার থেকে একটা ডিপার্টমেন্টকে তুলে দেওয়া হবে।' শিবাঙ্গীর মতই অবাক চোখে আরও দু-তিনটে ছেলের চোখ স্বয়ম্ভুর দিকে ঘুরে গেল। কেবল এর মধ্যে একজন বয়স্ক মানুষ ফিক করে হাসলেন চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে। পিছন ফিরে যিনি বসেছিলেন তিনি এক মনে নিজের কাজ করে চলেছেন। এইসব কথায় কোনও হেলদোল নেই তার।

-কী বলছেন স্যার! কোন ডিপার্টমেন্ট?

-সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্ট।

উত্তরটা স্বয়ম্ভু নয়, ওই পিছন ফিরে বসে থাকা লোকটি বললেন। যথারীতি সকলের চোখ লোকটির দিকে। লোকটিও রিভলবিং চেয়ার ঘুরিয়ে সরাসরি শিবাঙ্গীর দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার কিসু হবে না শিবাঙ্গী।' শিবাঙ্গীর মুখটা বাংলার পাঁচের মতো হয়ে গেল। লোকটি সিনিয়ার। বয়সে স্বয়ম্ভুর থেকে দু'বছরের বড় বৈ ছোট নয়। তার মুখ থেকে সক্কাল সক্কাল এমন কড়া কথা! 'এ কথা কেন বলছেন প্রদ্যুৎদা? কী করলাম আমি?'' প্রদ্যুৎ বললেন, ''খালি গোয়েন্দার পেছু পেছু ঘুরলেই হয় না। তাদের কথার ক্লুগুলোও ধরতে হয়।' উফফ! আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিল শিবাঙ্গী! 'এটাও বুঝলে না তো?' নিতান্ত অসহায় মুখে শিবাঙ্গী দুপাশে ঘাড় নাড়ল। সত্যিই বুঝছে না সে। কাঁধ ঝাঁকালেন প্রদ্যুৎ, 'স্বয়ম্ভু, সাইবার ক্রাইম নয়, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টটাকেই তুলে দিতে হবে। এই তো ভবিষ্যতের হাল! খোঁচাটা যে শিবাঙ্গীর উদ্দেশ্যে বর্ষিত হল সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধি ওর আছে। প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থায় স্বয়ম্ভুর দিকে তাকাল শিবাঙ্গী। স্বয়ম্ভু ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি এনে বলল, 'হচ্ছিল তো তোমার আমার, খামোকা বাচ্চা মেয়েটাকে কাঁদানো কেন প্রদ্যুৎ? দেখো মুখের কী অবস্থা!' কথা শুনে অল্প বয়সী দুটো ছেলেও এবার হেসে ফেলল। প্রদ্যুৎ বললেন, 'শিবাঙ্গী, মা আমার, সাইবার ক্রাইম কেন উঠে যাবে তোমায় বুঝিয়ে বলি, শোনো। গতকাল যে তুমি গুচ্ছের আবোল তাবোল নম্বর আমায় দিয়ে বলে গেলে তাদের ঠিকুজিকুষ্ঠি উদ্ধার করে দিতে সেটার রিপোর্ট এখনও তোমার বসকে দিয়ে উঠতে পারিনি। তাই সক্কাল সক্কাল স্বয়ম্ভু সেনের এত হম্বিতম্বি। বুঝলে?' শিবাঙ্গীও হেসে ফেলল। কী নাকি ভেবে মরছিল এতক্ষণ। আর ফাজলামি নয়। স্বয়ম্ভু এবার সরাসরি প্রশ্নে প্রবেশ করল, 'আবোল তাবোল নম্বর কেন?' যেন কী ছেলেখেলার প্রশ্ন করে ফেলেছে স্বয়ম্ভু, উত্তরটা এমন করেই দিতে শুরু করলেন প্রদ্যুৎ। 'তুসসস! তিনটে নম্বর রাশিয়ার, দুটো চিনের, বাকি তিনটে ইউ এস এ-র। অপরাধী প্রত্যেকবার নতুন নতুন ভিপিএন নম্বর ইউজ করেছে। প্রতিবার ডিভাইজের আই পি অ্যাড্রেস পালটে পালটে গেছে।'

-হাইটেক আসামি?

উচ্চকিত স্বরে বলে উঠল স্বয়ম্ভু। প্রদ্যুৎ বললেন, 'দ্যাখ স্বয়ম্ভু, হাইটেক তো বটেই। তবে এই দুহাজার বাইশে এসে, যখন কিনা অচেনা কেউ অচেনা কোনও নম্বর থেকে তোর মোবাইলের সব ডেটা চুরি করে নিচ্ছে, আদ্যপান্ত ক্লোন করে সাফ করে দিচ্ছে, সেই সময়ে

দাঁড়িয়ে এটা বিরাআআআআট বড় কোনও ব্যাপার নয় কিন্তু।'

-তাই যদি হবে ধরে ফেলো।

-মামার বাড়ির আবদার নাকি?

-বোঝো! তুমিই তো বলছ এমন কিছু ব্যাপার নয়।

-ব্যাপার নয় তাদের কাছে যারা দীর্ঘদিন ধরে অপরাধ করবে বলে ঘুঁটি সাজিয়েছে। নিখুঁত প্ল্যান করেছে। এই যে প্রতিবার ভিপিএন পাল্টেছে, তাতে নতুন নতুন আই পি কানেক্ট করেছে সেটা আম জনতার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এর কিছুটা জানবে যারা আই টিতে কাজ করেন। মানে ডিকোডিং, এনকোডিং বা এই জাতীয় আর যা যা আছে সেগুলো যারা শিখে কাজ করে তারা। সবথেকে বড় কথা, এগুলো একটা সাধারণ মানুষ জানলেই হল না। এগুলোকে যথাযথ ব্যবহার করতে জানতে হবে। সেটা জানে ক'জন? যারা জানে অপরাধী তাদের মধ্যেই একজন।

-এগুলো হয় কীভাবে? মোবাইল থেকে সম্ভব?

-সব সম্ভব। দ্যাখ, এখন প্রচুর কলিং সাইট আছে। কলিং অ্যাপ আছে। উইথ আউট সিমে কাউকে কল করতে চাইলেও করতে পারিস। অপরাধী সেরকমই কোনও সাইটে গিয়ে অ্যাপ ডাউনলোড করেছে। তারপর মোবাইলের অ্যাপ স্টোর থেকে ভিপিএন ডাউনলোড করেছে। সেই ভিপিএন নিয়ে ওই সাইটে পুট করে কল করেছে। এইসব ক্ষেত্রে র‍্যান্ডাম আই পি অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয়। এক্ষেত্রে তুই যেকোনও দেশের আই পি অ্যাড্রেস চুজ করতে পারিস। তোর ধর ইচ্ছে হল কোলকাতায় বসে চিন থেকে কল করবি। সেই দেশের আই পি নিয়ে কল কর। এরপর তুই যখন কল করছিস তখন সেই দেশের আই পি থেকে কল যাচ্ছে। ইন্টারন্যাশনালি এরকম কত ক্রাইম হচ্ছে! সেক্ষেত্রে অসুবিধে হচ্ছে অপরাধীর ডিভাইজ ট্রেস করা যাচ্ছে না। র‍্যান্ডামলি চেঞ্জ হচ্ছে তো। রাশিয়া থেকেই তিনটে আলাদা আলাদা আই পিতে তিনটে কল। ফোন হয়ে গেলেই অ্যাপ সমেত সব কিছু ডিলিট করে দিচ্ছে। ফোন নম্বর ডাজ নট এগজিস্ট। এবার দ্যাখ, এটা আমি তোকে মোটের ওপর বললাম। এই যে ভিপিএন পুট করা, আই পি সিলেক্ট করা এটা কিন্তু আমজনতা পারে না। হ্যাকিং জানতে হয়। আর সেরকম লোকও কম নেই। দেখছিসই তো আকছার এরকম হচ্ছে। কটা কেস ধরা পড়ছে বল তো?

-তার মানে হাল ছেড়ে দিচ্ছ?

-একদম না। কন্টিনিউয়াসলি ট্রেস করতে থাকব। কোনও ক্লু পেলেই ইনফর্ম করব।

স্বয়ম্ভু কোনও কথা না বলে ভূতে পাওয়া মানুষের মতো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। শিবাঙ্গীও অনুসরণ করল। সরাসরি নিজের ঘরে এসে দুহাত মাথার মধ্যে চালিয়ে দিল। চুলগুলোকে টেনে ধরল। চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রাখল। কিন্তু ডান হাতটা টেবিলের ওপর রাখা একটা পেপার ওয়েট ঘোরাতে থাকল। এই সময় কিছু বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছে না শিবাঙ্গী। স্পষ্ট বুঝতে পারছে স্বয়ম্ভুর মাথায় ঝড় উঠেছে। কিছু বলবে ভেবে দুবার মুখ খুলেও চুপ করে রইল। হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল স্বয়ম্ভু। কিছু বুঝতে না দিয়েই শিবাঙ্গীর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল, 'আচ্ছা, তমালকে কেন আমার অপরাধী বলে মনে হচ্ছে না বলো তো শিবাঙ্গী? কেন? তমালের প্রতিবেশী, যার বাড়ি তুমি গিয়েছিলে সেখানকার রিপোর্ট তমালের বিপক্ষে। আমার মাসি, মেসো তারাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তমালই অরুণাকে খুন করেছে। এই মুহূর্তে প্রদ্যুৎ যা বলল তার সঙ্গেও তমাল জড়িয়ে। তার পরেও কেন মনে হচ্ছে না আমার...'।

-বুঝলাম না স্যার। তমাল জড়িয়ে কীভাবে?

স্বয়ম্ভুর কথার ওপর দিয়েই বলে উঠল শিবাঙ্গী।

-তমাল আইটিতে কাজ করে। কীসব ওই ডিকোডিং এনকোডিং বলল না, সেগুলোও করে। এমনকি এথিক্যাল হ্যাকিং ব্যাপারটাও ও শিখেছে।

-সেকি!

-এখন আমার মনে পড়ছে, বিয়ের পর পর আমার মা জামাইষষ্ঠীতে ওদের বলেছিল।

তখন তমালের নিজের শ্বশুরবাড়িতে এন্ট্রি ছিল না। তাই আমার মা-ই ডেকে ভালোমন্দ রেঁধে খাইয়েছিল। সেদিনই তমাল ওর কাজের গল্প করছিল আমার সঙ্গে। যারা আইটির কাজ শেখে তারা এথিক্যাল হ্যাকিং করতে পারে। ওটা ওদের শেখানোই হয়। আরও কী কী সব যেন বলেছিল ও যে আরও কিছু জানে না সেটা কে বলতে পারে? 1

-স্যার, তমালবাবুকে আরেকবার ডেকে পাঠান। আর নয় তো সবচেয়ে ভালো হয় কিচ্ছু না জানিয়ে একবার ওর বাড়িতে ঢুঁ মারি আমরা। আবার চেপে ধরি। বলা তো যায় না, যদি কিছু বেরোয়।

-একদম ঠিক। তবে তার আগে কিছু খেতে হবে। চলো, আজ আমরা বাইরে খাব। কোনও ভালো হোটেলে খেয়ে তারপর...

বলতে বলতে থেমে গেল স্বয়ম্ভু। শিবাঙ্গীর মুখে একটা আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। 'কী হল স্যার?' চোখগুলো ছোট ছোট করে শিবাঙ্গীর দিকে চেয়ে স্বয়ম্ভু বলল, 'আজ যখন মাসির বাড়ি গেলাম, দেখলাম মেজ মেসো চোখে চশমা এঁটে খুব মন দিয়ে নিজের মেয়ের শ্রাদ্ধের ফর্দ লিখছে। অপঘাতে মৃত্যু তো, তাই কালই কাজ করবে।' স্বয়ম্ভুর ভেজা চোখের বাষ্প শিবাঙ্গীর চোখে লাগে। তাও মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, 'আজ বরং ক্যান্টিনেই খেয়ে নিই স্যার।' শিবাঙ্গী বুঝেছে, এই কথা মনে পড়ার পর স্বয়ম্ভুর গলা দিয়ে আর রেস্টুরেন্টের খাবার নামবে না।

ক্যান্টিনে খেতে খেতে শিবাঙ্গী বলল, 'স্যার, কাল থেকে সিসিটিভির ফুটেজগুলো তো চেক করা হচ্ছে না। আমরা যখন শিয়ালদার দিকেই যাচ্ছি তখন একবার চেক করে সরেজমিনে দেখে এলে হত না? তমালবাবুর বাড়ি না হয় সন্ধেবেলাতেই....

-এই জন্যেই তোমায় এত পছন্দ করি।

বেশ একটা প্রফেশনাল মুডে কথাগুলো বলছিল শিবাঙ্গী। কিন্তু স্বয়ম্ভু সেন যে মাঝখান থেকে এক্কেবারে পার্সোনাল এরিয়ায় ঢুকে পড়বে কে জানত? নাকি স্বয়ম্ভুও একেবারে প্রফেশনাল মুডেই বলল কথাটা? শিবাঙ্গী ই ভুলভাল ভাবছে! লাল হয়ে উঠল শিবাঙ্গী। খাওয়ার গতি কমে গেল নিমেষে! হাতের পাঁচটা আঙুল ডালমাখা ভাতের মধ্যেই ঘুরে চলেছে। কিন্তু স্বয়ম্ভু যেমন হাপুস হুপুস করে খাচ্ছিল সেরকমই খেয়ে চলেছে। এরই মাঝে বেরসিক ফোনটা গোঁ গোঁ করে ডেকে উঠল শিবাঙ্গীকে।

-হ্যাঁ বলো।... এই তো খাচ্ছি। .... আবার আইটেম বলতে হবে এখন? উফফফ, ভাত, ডাল, আলু পটল আর মাছ।... আচ্ছা মা, মাছটা টাটকা না বাসি এত খবর কী করে নেব?

স্বয়ম্ভু খেতে খেতেই চোখ তুলে শিবাঙ্গীর দিকে তাকাল। শিবাঙ্গী ও লজ্জায় পড়ল। অপরাধী ধরতে মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে, আর শিবাঙ্গী কিনা এখন মাছটা টাটকা না বাসি সেটা তদন্ত করে দেখবে! -হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে। রাখো এখন।

ফোনটা রেখে দিয়েই গজগজ করল শিবাঙ্গী, 'মা না। প্রশ্ন খুঁজে পায় না৷ মাছটা টাটকা তো?'

-কাকিমা খেয়েছেন?

-অ্যাঁ?

আচমকা প্রশ্নটা ধেয়ে আসাতে একটু হকচকিয়ে গেল শিবাঙ্গী। স্বয়ম্ভূ আবার বলল, ‘কাকিমা লাঞ্চ করেছেন?' তোতলাল শিবাঙ্গী। ‘কী জানি, বোধহয় খেয়েছে।

-কাকিমার প্রেশার আছে না?

-হ্যাঁ।

-প্রেশারের ওষুধ খেয়েছেন?

-হ্যাঁ, মা তো এই সময়েই খায়। খেয়েছে বোধহয়। জিজ্ঞেস করিনি -অথচ কাকিমা তোমায় জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি যে মাছটা খাচ্ছ সেটা টাটকা না বাসি।

-হ্যাঁ, মানে....

স্বয়ম্ভু ঠোঁট চওড়া করে হেসে বলল, ‘‘খাও। সিসিটিভিটা একসাথে দেখব।' মিষ্টি করে অল্প কথায় রগড়ে দিলেন স্যার। বাইরে লজ্জা পেলেও অন্তরটা ভালো লাগায় ভরে উঠল শিবাঙ্গীর। ক'জন বস এমন আপন করে জীবনের পাঠ শেখায়?

১৩

সবে ছয় মাসে পড়ল দেবোত্তমা। এখন বিছানার ওপর বসে নিজের শরীরটাকে টুকটুক করে সামনের দিকে ঠেলতে চেষ্টা করে। তুলতুলে পাগুলো বেশ কয়েকবারের চেষ্টায় হাঁটুর ওপর ভর দিতে পারে। পায়ে বাঁধা বালার মতো গোল নূপুরে শব্দ হয় ছুনছুন। ফোকলা মাড়ি ছড়িয়ে হিয়্যাক ক'রে খুশির শব্দ করে। দুপাশের ফর্সা গালদুটো টোপলা করে ফুলে ওঠে। আজ মা-বাবা দুজনেই চোখের সামনে আছে। এমনিতে উইক ডেজে এতক্ষণে দেবোত্তমার বাবা দীপায়ন বেরিয়ে যায়। আজকেও বেরোচ্ছিল। ঠিক সেই সময়েই ভয়ংকর খবরটা এল। দিয়া ফোন করে অরুণার খবর শোনানো মাত্রই সেই যে আতঙ্কে জড়সড় হয়ে চেয়ারে বসল। তারপর অনেক কষ্টে তুলে তাকে ওপরের ঘরের বিছানায় আনা গেছে।

-এগুলোর কোনও মানে হয় মৃত্তিকা? আমাকে তো কলেজে যেতে দিলেই না। নিজেও ব্রেকফাস্ট করলে না। ঠায় একভাবে বসে আছ। দুপুর হয়ে গেল।

দীপায়নের কথা শুনে বিস্ফারিত চোখে মৃত্তিকা তাকাল। ‘আশ্চর্য দীপায়ন! তোমার বউয়ের এমন একটা বিপদ আর তুমি বলছ এটা কোনও ব্যাপার না?

-এটাই তো। এটাই তো বুঝতে পারছি না।

জানলার ধার থেকে খাটে স্ত্রীয়ের পাশে এসে বসল দীপায়ন। ‘তোমার বন্ধু খুন হয়েছে বলে তোমার দুঃখ হতেই পারে। কিন্তু ভয় কেন পাচ্ছ? খুনি কি তোমাকে এসে মেরে ফেলবে? কেন?

-শুধু অরুণাই খুন হয়নি দীপায়ন। তুমি তো জানো।

এবার একটু নীরব রইল দীপায়ন। কথাটা সত্যি। মৃত্তিকা বলল, খুনি আমাদের চারবন্ধুকেই টার্গেট করেছে। সেটা বুঝছ?'

-কেন?

দীপায়নের দিকে ঝুঁকে থাকা মুখটা পিছিয়ে নেয় মৃত্তিকা। চোখদুটো ঘুরে যায় উল্টোদিকে। ‘কী হল মৃত্তিকা? খুনি কেন তোমাদেরই টার্গেট করেছে বলে মনে হচ্ছে?'

-আ...আমি কী করে জানব?

-কারণটা যখন জানই না তখন অযথা ভয় পাওয়ারও কারণ নেই। অরুণা আর সুস্মিতা নিশ্চয়ই খুনির শত্রু। নইলে ওদের সঙ্গে তোমাকে আর দিয়াকেও তো ভয় দেখাত। সেসব তো কিছু...

ভীষণ ভয়ে মৃত্তিকা দীপায়নের মুখে হাত চেপে ধরল। ‘এসব অলক্ষুণে কথা বোলো না প্লিজ।' মুখের ওপর থেকে মৃত্তিকার হাতটা সরিয়ে দিয়ে দীপায়ন বলল, ‘তাহলে পুলিশের কাছে চলো। প্রোটেকশন...'। ঝংকার দিয়ে উঠল মৃত্তিকা, ‘না না একদম না।'

-কেন?

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল দীপায়ন।

-না বলেছি না।

-তার মানে তুমিও ভয় পেয়ে গুটিসুটি মেরে বসে থাকবে আর আমিও কলেজ-ফলেজ ছেড়ে দেব তাই তো? এটাই সলিউশন।

কাঁদো কাঁদো মুখে অনেক কিছু বলতে চাইল মৃত্তিকা। কিন্তু পারল না। কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে থাকে।

খারাপ লাগল দীপায়নের। মৃত্তিকার কাঁধে হাত রেখে পাশে এসে বসল দীপায়ন। খুব নরম সুরে বলল, 'দেখো, দুদিন বাদে আমাদের একমাত্র মেয়ের অন্নপ্রাশন। কত কেনাকাটা করেছ বলো তো। এখনও তো বাকি আছে। সেসব নিয়ে ভাবো। উল্টোপাল্টা কথা নিয়ে একদম ভেবো না। আমি আছি তো নাকি? তাছাড়া খবরে দেখলাম তো কেসটা গোয়েন্দা বিভাগের হাতে আছে। তারপরেও এত টেনশন কেন?”

অরুণাকে বেড়ালের ডাক শুনিয়েছে, সুস্মিতাকে অরুণার পায়ের কাটা আঙুল পাঠিয়েছে। কেন? কে করতে পারে এসব? মনের মধ্যে তোলপাড় চলছে মৃত্তিকার। 'কী গো

শুনছ আমার কথা?' মৃত্তিকাকে ধরে ঝাঁকিয়ে দিল দীপায়ন। ব্যাপারটাকে হালকা করতে দীপায়ন আরও বলল, 'তাছাড়া আমার মনে হয় এটা কোনও পাগলের কাজ। নইলে যাকে মারবে তাকে ফোন করে বেড়ালের ডাক শোনায়?' দীপায়নের হাসি মৃত্তিকার মনে শুকনো লঙ্কার মতো চিরচিরে ভয়টাকে আরও বাড়িয়ে দিল।

-একদিকে ভালো হল জানো। আজ পুরুত মশাইকে ডেকে সব ফাইনাল করে ফেলব।

-কাকে ডাকবে?

-তুমি বলো। ওই কার্ডের দোকানের লোকটা যার কথা বললেন তাকে ডাকি? শিয়ালদায় নাকি ওনার নাম-ডাক প্রচুর। মিশ্রঠাকুর বলতে সব অজ্ঞান। তাছাড়া শিয়ালদা থেকে ফুলবাগান এমন কিছু পথ নয়। দুপুরে ডাকি? কী বলো?

-ডাকো।

মিনমিন করে জবাব দিল মৃত্তিকা।

বৃষ্টিতে পথ-ঘাট অনেকটাই ঝাপসা। তবু স্পষ্ট বোঝা গেল সাদা রঙের গাড়িটা বেরিয়ে এল গলি থেকে। ডিভাইডার দিয়ে রাস্তা ক্রস করে উল্টোফুটে চলে এল। খানিকটা যেতেই সিসিটিভি ক্যামেরার নজরের বাইরে। পাশের স্ক্রিনে উলটোফুটের সিসিটিভিটা গাড়িটাকে ধরে রেখেছে। কিন্তু সেটা খানিক গিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। ওদিকের স্ট্রিট লাইটটা জ্বলে না। আরও বেশ কিছু গাড়ি এসে ঢেকে দিল সেই গাড়িটাকে।

-দুটো ক্যামেরাই একটু করে রিওয়াইন্ড করে পিছনে যাও তো। কম্পিউটারে বসা ছেলেটি সেটাই করল যেটা স্বয়ম্ভু বলল।

-এবার একটু জুম কর।

ফুটেজ জুম হল। ভালো করে দেখল স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী। নম্বর প্লেট আগেই বোঝা গিয়েছিল। এখন গাড়ির মধ্যে বসে থাকা ড্রাইভার আর আরোহিণীর পোশাকের রং বোঝা না গেলেও মোটামুটি একটা ঝাপসা অবয়ব পাওয়া যাচ্ছে। ড্রাইভারের গায়ে চেক কাটা শার্ট। যাত্রী মহিলা যেটা পরে আছে সেটা আলাদা করে শনাক্ত করার বা খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই। পার্ক সার্কাসের রেল লাইনের ধারে, মর্গে ভালো করেই দেখেছে স্বয়ম্ভূ আর শিবাঙ্গী।

-দেখি চালাও এবার, স্বয়ম্ভু বলল। ছেলেটির আঙুলের চাপে থমকে থাকা স্ক্রিন চলতে শুরু করল।

-এ কী! এটা তো মৌলালির ট্র্যাফিক মনে হচ্ছে।

স্বয়ম্ভুর কথায় সম্মতি দিল শিবাঙ্গী ও ছেলেটি।

-মাঝে আর কোনও সিসিটিভি নেই। পাড়িয়া সেটাই বললেন।

শিবাঙ্গী জানাল।

-দেখি একটু জুম করো তো।

দুটো স্ক্রিনেই গাড়িটাকে সেন্টারে রেখে ছবি বড় করা হল। একটা ক্যামেরায় গাড়ির সামনে থেকে এবং আরেকটি ক্যামেরা রাস্তার উল্টোফুটে থাকার দরুণ গাড়িটাকে ডানদিক থেকে দেখা যাচ্ছে। স্বয়ম্ভু যেন স্ক্রিনের মধ্যে ঢুকে যাবে এবার। 'শিবাঙ্গীইইই...' স্বয়ম্ভু সুর টেনে হাঁকল।

-ইয়েস স্যার।

-পার্থক্যটা বুঝতে পারছ?

শিবাঙ্গী স্ক্রিনের কাছে মুখ নিয়ে এল। নম্বর প্লেট তো একই আছে। গাড়ির রংও সাদা। এরপর যেই ভিতরের দিকে চোখ পড়ল শিবাঙ্গীও থমকে গেল। বলে উঠল, 'ড্রাইভারের ড্রেস পালটে গেছে!'

-রাইট। ছিল চেক শার্ট। হয়ে গেল কালো জোব্বা। যতদূর মনে হচ্ছে ওটা বোরখা জাতীয় কিছু। মুখ দেখার উপায় নেই কারণ মাস্কে ঢাকা

-এই কোভিডটা এসে অনেক অপরাধীরই সুবিধে হয়েছে স্যার। আগে মাস্ক পরে বেরোলে

লোকে তাকে সন্দেহ করত। কিন্তু এখন এটাই নরমাল।

স্বয়ম্ভুর ঠোঁটে অল্প হাসি। অপরাধীর চালাকির কিছু সূত্র তো পেল অবশেষে! শিবাঙ্গী বলল, "তার মানে অপরাধী মেয়েই?"

-সেটা তো পরের প্রশ্ন। ঘোমটার আড়ালে কে যে খ্যামটা নাচছে সেটা এই মুহূর্তে বোঝার উপায় নেই। শুধু খটকা লাগছে ড্রাইভার পাল্টে গেল অথচ অরুণা কিছু বুঝল না? দিব্যি তো বসে আছে।

-নাকি বুঝেও কিছু বলার সুযোগ পায়নি!

-মানে?

স্বয়ম্ভুর ভুরু কুঁচকে গেল।

-খেয়াল করুন স্যার, পিছনের সিটে মাথা হেলিয়ে বসে আছে অরুণা।

শিয়ালদা থেকে মৌলালি পাঁচ মিনিটও লাগে না। এইটুকু সময়ে কোনও মানুষ কী ঘুমিয়ে পড়তে পারে?

-কারেক্ট শিবাঙ্গী। আগে থেকেই গাড়িতে ক্লোরোফর্ম স্প্রে করা ছিল বা অরুণা ওঠার পর লুকিয়ে স্প্রে করা হয়েছে। ড্রাইভার তাই মুখে মাস্ক পরে আছে। যাতে তার ওপর কোনও প্রভাব না পড়ে। এক মিনিট, আবার পেছোও তো ক্যামেরাটা।

-শিওর স্যার।

ছেলেটি রিওয়াইন্ড করল। স্ক্রিন থামিয়ে আবারও ভালো করে অবজার্ভ করল স্বয়ম্ভু। তারপর মৌলালির ফুটেজ ভেসে উঠল। সেটা দেখেই ভুরু দুটোর সঙ্গে ফর্সা কপালটাতে আরও কয়েকটা অতিরিক্ত ভাঁজ পড়ল স্বয়ম্ভুর। বলল, 'শিয়ালদার গলি থেকে গাড়ি বেরোল সন্ধে সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে। মৌলালি এসে পৌঁছল প্রায় আটটা। যেখানে ডিস্টেন্স মাত্র পাঁচ মিনিটের বাকিটা শিবাঙ্গী নিজের মনে অঙ্ক মেলাবার মতো করে আওড়াল। 'তার মানে যেখানে সিসিটিভি নেই সেই অন্ধকার জায়গাটেই যা হবার হয়েছে। ধরে নেওয়া হচ্ছে গাড়িটা দাঁড়িয়েছে। নইলে ড্রাইভার চেঞ্জ হবে কী করে?" -অপরাধীও নিশ্চয়ই অরুণার সামনেই আসল ড্রাইভারকে ক্লোরোফর্ম স্প্রে করে সেন্সলেস করবে না! কাজটা যদি অরুণার আড়ালেই হয়ে থাকে তাহলে অরুণা তখন কোথায় ছিল?

-তমাল একটা কথা বলেছিল স্যার।

-কী বলো তো?

-অরুণা প্রতি শনিবার সুরি-লেনের কাছে একটা মন্দিরে যেত। সম্ভবত সেটা শনি ঠাকুরের মন্দির।

-রাইট।

স্বয়ম্ভু লাফিয়ে উঠে বলল, 'সেদিন তো শনিবারই ছিল। তাহলে কী ও মন্দিরেই...!'

-আর ঠিক সেই সুযোগে অপরাধী যা করার করেছে। অরুণা এমনিতেই রেগেছিল। কষ্টও পাচ্ছিল খুব। তাই ফারদার গাড়িতে ওঠার সময় আর ড্রাইভারকে খেয়াল করেনি। আমরাই বা কত ড্রাইভারের মুখ মনে রাখি বা দেখি।

-ওফফফ শিবাঙ্গী, প্রদ্যুৎকে যদি তোমার এই পারফর্মেন্সটা দেখাতে পারতাম!

এমন পরিস্থিতিতেও ইয়ার্কি মারা এ একমাত্র স্বয়ম্ভু সেনের পক্ষেই সম্ভব। এই মানুষটা তাৎক্ষণিক আবেগে ভাসে না। কোনও বিষয় নিয়ে ডুবে থাকলেও চতুর্দিকে চোখ, কান ও সঙ্গে চেতনাচক্ষুটিও খোলা থাকে। শিবাঙ্গী লজ্জা পেয়ে আড়চোখে কম্পিউটারে বসা ছেলেটির দিকে তাকাল।

সেও ফিক ফিক হাসছে। ফাজলামি সেরে আবার সিরিয়াস মুডে স্বয়ম্ভু। বলল, 'তবে অবাক করা ব্যাপার ড্রাইভারকে যখন ক্লোরোফর্ম স্প্রে করল সে কোনও চিৎকার করল না?"

-হয়তো রুমালে করে মুখে চেপে ধরেছিল।

-সেটা ওই রাস্তায় হওয়া বেশ শক্ত। কারণ রুমালে ক্লোরোফর্ম নিয়ে মুখে চাপলে

অন্ততপক্ষে অপরাধীকে চার থেকে পাঁচ মিনিট চেপে ধরে থাকতে হবে। নইলে সে অজ্ঞানই হবে না। ওই যে সিনেমা, সিরিয়ালে দেখায় মুখে চেপে ধরল আর ধপাস করে সেন্সলেস - ওটা জাস্ট গাঁজা। ওরকম হয় না।

-তাহলে ড্রাইভার?

-ড্রাইভারের চেনা কেউ নয় তো? দেখো তো পারফিউমের গন্ধটা কেমন বলে শোঁকাল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে চেতনাশূন্য!

-অপরাধী খুব ভালো করে জানে কোথায় কোথায় সিসিটিভি আছে।

-একদমই শিবাঙ্গী। শুধু তাই নয়, অরুণার প্রতিটা মোমেন্টকে সে ফলো করেছে অনেক আগে থেকেই। নইলে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ঝোপ বুঝে কোপ মারা সম্ভব নয়। অরুণা তো রাস্তায় বেরোতে নাও পারত। বাপের বাড়ি নাও যেতে পারত।

শিবাঙ্গী বলল, 'স্যার, আমার কিন্তু তর্পণাকেই বেশি সন্দেহ হচ্ছে। এর সঙ্গে তমালও জড়িত বা জড়িত নয়। অজান্তেই অরুণার অনেক ইনফরমেশন তর্পণাকে সাপ্লাই করেছে। ভাবতেও পারেনি তার স্ত্রী খুন হয়ে যাবে!'

স্বয়ম্ভু চোখ বুজে খানিক ভেবে ছেলেটিকে বলল, ‘এরপরের ফুটেজগুলো চালাও তো।'

সকালে দিয়ার বাড়ি থেকে ঘুরে সুস্মিতাকে একটু কালীঘাটে যেতে হয়েছিল। শাড়ির গোডাউনে। কয়েকজনের শাড়ির অর্ডার আছে। সেগুলো কতটা এগোল সেটা দেখার জন্য। গোডাউন থেকে বেরোতেই শ্রাবণ মাসের চড়া রোদ এসে চিড়চিড়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল। কালীঘাট থেকে গড়িয়াহাট যাবে সুস্মিতা। এই রোদে ক্যাব না ধরলেই নয়। মোবাইলে ক্যাবের অ্যাপটা খুলতে গিয়েও আঙুলটা আটকে গেল। উল্টোফুটে ছাই রঙের জামা পড়া একটা ছেলে একভাবে চেয়ে আছে সুস্মিতার দিকে। ভালো করে তাকাতেই ছেলেটি সিগারেট ধরাবার ভান করল। সকাল থেকেই সুস্মিতার বুকের ভিতরটা ছ্যাৎ ছ্যাৎ করছে। সব সময়েই মনে হচ্ছে কে যেন ওকে ফলো করছে। এদিকে ছেলেটা তো একভাবে দাঁড়িয়েই আছে। ক্লিন শেভ মুখ। অনর্গল ধোঁয়া ছাড়ছে। ক্যাব বুক করতে গিয়েই অরুণার কথা মনে পড়ল অরুণাও তো ক্যাবে উঠে বাড়ি ফিরছিল। সেই ক্যাবেই যা সর্বনাশ হবার হয়েছে। নাহ! অটোতে যাওয়া অনেক সেফ। কিন্তু কালীঘাটের মন্দিরের পিছনের রাস্তায় এই গোডাউন। সেখানে অটো ধরতে গেলে অনেকটা রাস্তা পায়ে হেঁটে মেন রোডে আসতে হবে। তাই সই। তবু একা একা ক্যাবে উঠবে না। সুস্মিতা হাঁটতে শুরু করল। কালীঘাট মন্দিরের পাশের সরু ঘিঞ্জি রাস্তাটা ধরল সুস্মিতা। দুপাশে পুজোর সামগ্রীর দোকান। এক পা করে এগোচ্ছে আর একজন করে হাঁক পাড়ছে, 'দিদি এদিকে আসুন। এখানে চটি রাখতে পারবেন। মায়ের ডালা নিয়ে যান।' কোনও কথাই সুস্মিতার কানে ঢুকছে না। সোজা তাকিয়ে হেঁটে চলেছে। ছেলেটা কী এখনও ফলো করছে? যেতে যেতে পিছন ফিরে একবার দেখে নিল। যে কয়েকজন লোক হাঁটাচলা করছে তাদের মধ্যে সেই ছেলেটি নেই। তাহলে কী সুস্মিতার মনের ভুল? গতরাতের ঘটনাই কী এমন হাবিজাবি ভাবাচ্ছে তাকে!

গলি থেকে বেরোতেই ডানহাতের দোকানগুলোয় যেন গোটা স্বর্গলোক নেমে এসেছে। কৃষ্ণ, কালী, মহেশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দুর্গা, তারা, যিশু, মাতা মেরি কে নেই! প্রায় সবাইকেই ডাকতে ডাকতে দ্রুত পায়ে হাঁটছে সুস্মিতা। হঠাৎ খেয়াল হল, উল্টোফুটে ডাবভর্তি ঠ্যালাগাড়ি, নানারকমের ফলের দোকানের আড়ালে কারও একটা চোখ খেয়াল রাখছে ওর ওপর। আরেকটু দু-পা এগোতেই বুকের মধ্যে প্রবল চাপ অনুভব করে সুস্মিতা। ওই তো সেই ছেলেটা। ছাই রঙের জামা। চড়া রোদে মাথাটা টলে গেল। এ কিছুতেই সুস্মিতার মনের ভুল নয়। দূর থেকে যেটুকু বুঝছে তাতে লোকটাকে কস্মিনকালেও দেখেনি সুস্মিতা। তাহলে লোকটা ফলো কেন করছে? নাকি খুনির পাঠানো কোনও লোক? উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ওর ওপর নজর রাখছে। সুযোগ পেলেই অরুণার মতো সরিয়ে দেবে! ভাবতেই সারা শরীর কেঁপে উঠল। দরদর করে ঘাম নামছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। কী করবে ও এখন?

প্রিয়াংশুকে ফোন করবে! ও তো এখন অফিসে। কিছু হলে ওই বা কী করবে? তখনই খেয়াল হল আগের দিন স্বয়ম্ভু সেনের কার্ড নিয়ে রেখেছিল। সেটা কী কাঁধের ব্যাগে আছে নাকি বাড়িতেই ফেলে এসেছে? রাস্তা থেকে ফুটপাথে উঠে একটু ছায়া দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সুস্মিতা। উল্টোফুটের লোকটার ভুরুতে ভাঁজ। সেও উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করছে সুস্মিতাকে।

কার্ডটা পেয়েছে। সুস্মিতা তৎক্ষণাৎ স্বয়ম্ভুর নম্বরটা টাইপ করল। তিনবার রিং হতেই ওপার থেকে গলা ভেসে এল, 'হ্যালো'। -স্বয়ম্ভূ সেন বলছেন?

-বলছি।

-আমি সুস্মিতা বলছি। গতরাতে আমার ফ্ল্যাটে...

-হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। বলুন।

-খুব বিপদে পড়েছি স্যার। আমাকে বাঁচান।

-কী বিপদ? কোথায় আপনি?

-একটা লোক সবসময় আমায় ফলো করছে।

-কীরকম দেখতে?

-গায়ে ছাই রঙের শার্ট। চাপা গায়ের রং

-দাড়ি আছে না ক্লিন শেভ?

-ক্লিন শেভ।

-আপনি কোথায়?

-কালীঘাটে।

-কালীঘাটের কোথায়?

-ওই মন্দিরের দিক থেকে যে রাস্তাটা মেন রোডের দিকে গেছে।

-বুঝেছি। আপনার ডানপাশে ঠাকুরের মূর্তি বিক্রি হচ্ছে তো?

-হ্যাঁ স্যার। আমি সেইদিকেই।

-আপনি ফোন রাখুন আর যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ওখানেই থাকুন। আমি কল ব্যাক না করা পর্যন্ত নড়বেন না।

-ওকে স্যার।

সুস্মিতা ফোনটা কেটেই পাশের ফুটে দেখল। কাউকে দেখতে পেল না। ছেলেটা গেল কোথায়?

মিনিটখানেকের মধ্যেই স্বয়ম্ভু সেন রিং ব্যাক করল। প্রচণ্ড উত্তেজনায় দুহাতে মোবাইল ধরে কানে চেপে সুস্মিতা বলে উঠল, 'হ্যাঁ স্যার!'

-চিন্তা নেই। ও আমাদেরই লোক। আপনার ওপর নজর রাখছে যাতে কোনও বিপদে না পড়েন।

সুস্মিতা যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। স্বয়ম্ভূ 'রাখলাম' বলতেই তড়িঘড়ি সুস্মিতা জিজ্ঞেস করল, 'স্যার স্যার স্যার, একটা কথা।'

-বলুন।

-স্যার, বলছিলাম, খুনির নেক্সট টার্গেট কি আমিই?

হতেই পারেন। তবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কথা না বলাই ভালো। রাখলাম।

যেটুকু প্রাণ সে ফিরে পেয়েছিল সেটুকু মুহূর্তে কর্পূরের মতো উবে গেল। স্বয়ম্ভুকে যে একটা ধন্যবাদ জানাবে সে অবস্থা আর নেই। যতই পুলিশ নজর রাখুক, সময়ের কোন ছিদ্র দিয়ে যে শমন এসে হাজির হবে কেউ জানে না। তবু, আগের চেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সুস্মিতা মেন রোডের দিকে হাঁটতে থাকল।

১৪

গাড়িতে যেতে যেতে হাত উলটে ঘড়ি দেখল শিবাঙ্গী। 'ইসসস, সাড়ে ছ'টা বেজে গেল।' পাশেই বসে ছিল স্বয়ম্ভু। হঠাৎ বলে উঠল, 'তোমার কী মনে হয় শিবাঙ্গী?''

-কীসের স্যার?

-গাড়িটা রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের দিকে কেন বেঁকে গেল? কোথায় গেল গাড়িটা?

-ওদিক থেকে ঘুরে তো অনেক জায়গাতেই যাওয়া যায় স্যার। চাঁদনী চকের দিকে যেতে পারে। ধর্মতলাও...

-না না। ধর্মতলা যাবে না। সে তো সোজা রাস্তায় গেলেই পৌঁছে যেত।

স্বয়ম্ভু ঠিকই বলেছে, 'তাহলে?'

-গাড়িটাকেও আর দেখা গেল না।

-স্যার ওদিককার সব জায়গায় সিসিটিভি নেই। থাকলেও খারাপ। তাছাড়া ওই জায়গাগুলো এত ঘিঞ্জি যে অত গাড়ির মাঝে একটা গাড়িকে ট্রেস করা মুশকিল। তাও করা যেত যদি টার্নের মুখে বাসটা না দাঁড়িয়ে থাকত। বাসের আড়ালে গিয়েই যত কাল হল।

-ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন

-মানে?

-এই এই দাঁড়াও তো। বাঁদিক করে রাখো তো গাড়িটা।

শিবাঙ্গী থতমত খেয়ে গেল। তার কৌতূহলের উত্তর তো পেলই না। বরং দুম করে যেখানে যাচ্ছিল তার আগেই গাড়ি থামিয়ে দিল স্বয়ম্ভু। 'এইটাই সুরি-লেন না?''

-হ্যাঁ স্যার।

-আর ওইটাই কী সেই মন্দিরটা?

শিবাঙ্গী ঘাড় ঘুরিয়ে জানলার বাইরে তাকাল। গলির মুখে একটা বড় ঠাকুরের মন্দির। সেখানে পুজো চলছে। উপস্থিত কয়েকজন ভক্ত। সকলেই মহিলা।

আকাশি রঙের পাঞ্জাবি আর সরু কালো পাড়ের সাদা ধুতি পরে আরতি করে চলেছে মিশ্রঠাকুর। মুখে অনর্গল শনিদেবের মন্ত্র, 'নীলাঞ্জনসমাভাসং রবিপুত্রং যমাগ্রজম ছায়ায়া গর্ভসম্ভুতম তং নমামি শনৈশ্চরম'। শনি ঠাকুরের পাশেই দক্ষিণাকালীর মূর্তি। শনিমন্ত্রের পর 'ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে' মন্ত্রটি উচ্চারণ করে আরতি শেষে ভক্তি ভরে প্রণাম করলেন। তারপর ভক্তদের দিকে ঘুরতেই একটু যেন থমকে গেলেন। ভক্তদের মাঝেই শিরদাঁড়া টানটান করে দাঁড়িয়ে স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী। ঠাকুরমশাই হাসিমুখে সকলকে মঙ্গলারতির তাপ দিতে দিতে বললেন, 'এর আগে এ তল্লাটে দেখিনি তো! পাড়ায় নতুন?' স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গীও মাথা নিচু করে তাপ নিল। স্বয়ম্ভু বলল, 'এদিকে রিলেটিভের বাড়ি।'

-তাই ভাবি। নতুন মুখ দেখি।

-ওই জন্যেই চমকে গেলেন?

কথাটা শুনেই মিশ্রঠাকুর একটু থেমে বললেন, 'হ্যাঁ, ওই আরকি। দিনকাল ভালো না তো। নতুন মুখ দেখলেই মনে হয় কী জানি কে আবার কোন মতলব নিয়ে হাজির হল!'

প্রসাদ নিয়ে ভক্তরা যে যার মত চলে গেলেন। দাঁড়িয়ে রইল স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী। মিশ্রঠাকুর পুজোর জায়গাটা গোছাচ্ছিলেন। দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও কিছু বললেন না। স্বয়ম্ভুও কী যেন খেয়াল করে চলেছে। মিশ্রঠাকুরের দিকে তাকিয়েই আছে। বেশ কিছুক্ষণ পরেও যখন ঠাকুরমশাই নিরুত্তাপ তখন স্বয়ম্ভু নিজেই বলল, 'ঠাকুরমশাই, একটু কথা ছিল।' কাজ থামিয়ে হাসলেন মিশ্রঠাকুর। 'হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন না। তবে ভাগ্য বলতে পারব না বাবা!' শিবাঙ্গী তাকাল স্বয়ম্ভুর দিকে। 'সে কী! আপনি তো বলেন শুনেছি।' শিবাঙ্গী বলল। ঠাকুরমশাই উঠে দাঁড়ালেন। সামনে এগিয়ে এসে বললেন, 'বলতাম। কিন্তু একজন আমার সবকিছুকে মিথ্যে করে দিয়ে চলে গেছে। ও বুঝিয়ে দিয়ে গেছে আমি কিচ্ছু জানি না। তাই ওসব বলা আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

-সে কে? জানতে পারি?

স্বয়ম্ভু বলল। শান্তস্বরে মিশ্রঠাকুর জানালেন, 'একটি মেয়ে। তাকে আমি বলেছিলাম ওর সব কষ্ট চলে যাবে। সব ভালো হবে। কিন্তু ধৈর্য ধরল না একটুও। যেদিন বাড়ি ছাড়ল তারপরদিনই খবর পেলাম সে নাকি আর নেই। উফফফ! ভয়ানক সে মৃত্যু!' মৃত্যুর আতঙ্কে চোখ বুজে ফেললেন মিশ্রঠাকুর।

-কীরকম মৃত্যু?

মিশ্রঠাকুর শান্ত চোখে তাকালেন। 'লোকে বলছিল, রেললাইনের ধারে নাকি তাকে কেউ কচু কাটার মত করে কেটে ফেলে রেখে গেছে।' বলতেই বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল মিশ্রঠাকুরের। বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'এত যন্ত্রণা কেন দিলে ঠাকুর? তোমার যে কী বিচার তুমিই জানো। ' মনে মনে হাসল স্বয়ম্ভু। মানুষকে মেরে তারপর কচু কাটা করা হয়। তাতে যে মরল তার যন্ত্রণার থেকে যে মারছে তার মানসিক প্রতিহিংসা বেশি চরিতার্থ হয়। কিন্তু এ যে কচু কাটার চেয়েও মারাত্মক। যাই হোক, অনেক খবরে এই কচু কাটা শব্দটাই ব্যবহার করছে। স্বয়ম্ভু একটু গলা ঝেড়ে বলল, 'আপনি এই মন্দিরে কবে থেকে পুজো করছেন?'

-তা বছর দশেক।

-তার আগে কী করতেন?

-তার আগে এখানে ছিলাম না। আমার প্রথম জীবন কেটেছে মেদিনীপুরে।

-ও বাবা! আপনি মেদিনীপুরের মানুষ?

-হুম। তোমারও কেউ আছে নাকি? এই দেখেছ, তুমি বলে ফেললাম।

-নো প্রবলেম। না আমার কেউ নেই। তবে মেদিনীপুরের মানুষদের কথায় একটা সুন্দর টান থাকে। ওটা আপনার মধ্যে নেই।

মিশ্রঠাকুরের ঠোঁটে হাসি ফুটেও ফুটল না। বললেন, 'ওটা আমি খুব সন্তর্পণে বাদ দিয়েছি বাবা।'

-কেন?

-কিছু মনে কোরো না। তোমাদের এই কোলকাতার মানুষজন বড় বেয়াড়া। একটু অন্যরকম কিছু দেখলেই ভ্যাঙায়। খুব খারাপ লাগে।

বেশ অস্বস্তি নিয়ে কথাগুলো বললেন মিশ্রঠাকুর। স্বয়ম্ভু সরাসরি প্রশ্ন করল, 'অরুণা আপনার এখানেই আসত তাহলে!' নামটা শুনেই চমকে উঠল মিশ্রঠাকুর। 'তুমি চেনো তাকে?

-হুম। আমার মাসতুতো বোন।

-ও হো। জানো বাবা, আজকাল বড় ভয়ে ভয়ে থাকি। রাতে ঘুমোতে পারি না।

-কীসের ভয়?

-পুলিশের।

-মানে?

-ঘটনাটা যা শুনছি তা যদি সত্যিই হয় তাহলে তো ও শেষ দেখাটা আমার সঙ্গেই করেছিল। বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে ও আমার কাছেই এসেছিল। এখন পুলিশ যদি জানতে পারে ... থেমে গেলেন মিশ্রঠাকুর। আমতা আমতা করে বলল, 'অয় দেখেছ। তুমি তো ওর আত্মীয় বললে। বাবা! মিনতি করছি, পুলিশকে কিছু বোলো না। এরপর নইলে আমায় নিয়ে টানাটানি করবে। এমনিতেই প্রেশার, সুগার কী নেই। তার ওপর থানা বাড়ি হলে মরে যাব। '

-আপনাকে নিয়ে কেন টানাটানি হবে? অরুণা কি বিশেষ কিছু বলেছিল আপনাকে?

-না না। সে তো শুধু আমায় গাল পাড়তে এসেছিল। আমার কোনও কথা মেলেনি না। খুব রাগ দেখাল। তারপর বৃষ্টির মধ্যে গটগট করে রাস্তা পেরিয়ে গাড়িতে উঠে গেল।

-ও গাড়ি করে এসেছিল?

-হ্যাঁ, ওই রাস্তার ওপারে তো একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল দেখলাম। বাড়ি থেকে গাড়ি করে এসেছিল কিনা... অবিশ্যি আমায় বলল অরুণা শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছে। তাহলে তো গাড়ি নেবেই। সে যাই হোক, তোমাদের বিশ্বাস করে বলে ফেললাম। পুলিশের উৎপাত

আর আমি নিতে পারব না বাবা।

-না না। কাউকে বলব না। নিশ্চিন্ত থাকুন।

নিশ্চিন্ত হাসি ফুটল মিশ্রঠাকুরের মুখে। শিবাঙ্গী জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ঠাকুরমশাই, আপনি কাগজ পড়েন? বা টিভিতে খবর শোনেন?'

-কেন বল তো?

ঠাকুরমশাই বেশ অবাক হলেন এমন একটা উদ্ভট প্রশ্নে। ‘বলুন না।’ শিবাঙ্গী বলল,

-না মা। বাড়িতে টিভি ছিল। আমার ভাগ্নেটা বড্ড কুঁড়ে আর ফাঁকিবাজ। কোনও কাজ করবে না। কেবল টিভি মুখে করে বসে থাকত বলে কেবল লাইন কাটিয়ে দিলাম। তারপর থেকে টিভি আর চলে না। আর কাগজ নেবার দরকার পড়ে না। এই উত্তর কোলকাতায় আমরা বুড়োরা এখনও রকে বসে আড্ডা মারি। এই তো মন্দির বন্ধ করে যাব। ওখানেই সব খবর পেয়ে যাই। যতটা খরচা বাঁচে। এই মন্দির থেকে কতটুকুই বা রোজগার হয় বলো? ভাগ্নেটা সদ্য একটা কাপড়ের দোকানে কাজ পেয়েছে। সামান্যই মাইনে। তাতেই চালে-ডালে ফুটিয়ে দুজনের সংসার চলে যায়।

-থ্যাংক ইউ ঠাকুরমশাই। ভালো থাকবেন। চলি। ও হো, আপনার নামটাই তো জানা হল না।

-সবাই আমায় মিশ্রঠাকুর বলেই চেনে। ভালোও বাসে।

-তবু, নাম তো আছে একটা। সেটা কী জানতে পারি? -নিশ্চয়ই। পঙ্কজ মিশ্র।

-আচ্ছা, চলি।

স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী কয়েক পা হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে। এদিকে মিশ্রপুরুতের ভুরু দুটো কুঁচকে ওঠে। গাড়ি ছেড়ে একটু এগোতেই পিছনে কাচের ওপর পুলিশ লেখাটি চোখে পড়ে মিশ্র পুরোহিতের। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু ছানাবড়া। নিজেই বিড়বিড় করে বলে ওঠে, ‘ওরে বাবা! এরা পুলিশ ছিল নাকি! হে ঠাকুর, এ কী ফ্যাসাদে পড়লাম রে বাবা! নিজেই সব কথা বলে দিলাম?'

গাড়িতে উঠেই স্বয়ম্ভু শিবাঙ্গীকে বলে, ‘দেখেছ তো, গোয়েন্দার সঙ্গে সিভিল ড্রেসে ঘোরার উপকারিতা! এই যদি এখন তুমি ওই ধরাচুড়ো পরে থাকতে তাহলে ঠাকুরমশাই অত কথা বলত বলে তো মনে হয় না। এখন থেকে আমার সঙ্গে বেরোলে এরকম পোশাকই পরবে। অন্তত এই কেসটা যদ্দিন চলবে।' শিবাঙ্গী ঠোঁট টিপে হাসল।

বার তিনেক বেল বাজাল শিবাঙ্গী। ঘরের ভিতর থেকে কারও কোনও উত্তর নেই। লোহার গেটের ছিটকিনিতে আঘাত করতে গিয়ে স্বয়ম্ভু খেয়াল করল সেটা খোলা আছে। ঠেলে বারান্দায় উঠে পড়ল। ‘তমাআআআআল, তমাআআআল!' স্বয়ম্ভু ডাকল। তাও কোনও সাড়া নেই। এদিকে সন্ধে হয়ে গেছে কিন্তু কোনও আলো জ্বলেনি বাড়িতে। সোজা ঘরে ঢোকার দরজায় ঘা দিতেই দরজাটা কিছুটা ফাঁক হয়ে গেল। শিবাঙ্গীর দিকে তাকাল স্বয়ম্ভু। দুজনের চোখেই কোনও এক আশঙ্কা চলকে উঠল। সোজা ঘরে ঢুকে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেউ কোত্থাও নেই। পকেট থেকে মোবাইল বের করে টর্চ জ্বালাল স্বয়ম্ভু। আলোটা দেয়াল বেয়ে খুঁজে চলল সুইচ বোর্ড। কিন্তু তার আগেই সোফার ওপর আটকে গেল মোবাইলের আলো। সোফা থেকে হেলে পড়া মাথাটা দেখে আঁতকে উঠল স্বয়ম্ভূ আর শিবাঙ্গী। ঠোঁটের কাছে সাদা দাগ। 'শিবাঙ্গী আলো জ্বালো তাড়াতাড়ি।' শিবাঙ্গী দেয়াল হাতড়ে আলো জ্বালতেই সবটা স্পষ্ট হল। তমালের অচেতন শরীরটা সোফা থেকে অর্ধেক ঝুলে রয়েছে। মুখ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে গ্যাঁজলা বেরিয়ে ঠোঁটের বাঁ-পাশটা সাদা হয়ে আছে। স্বয়ম্ভু বারবার ডাকতে থাকে। তমালকে ধরে ঝাঁকায়। শুধু মাথাটা দুপাশে নড়ে ওঠে। তমালের নাড়ি চেপে ধরে স্বয়ম্ভু। কোনও সাড়া পায় না। বুকের ওপর মাথা রাখে। কোনও স্পন্দন নেই। হাত-পা ঠাণ্ডা। শিবাঙ্গীর মুখ দিয়ে ‘স্যার' ছাড়া কোনও শব্দ বেরোল না। স্বয়ম্ভু তমালের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

-সুইসাইড?

পাশের টেবিলে রাখা ফাঁকা গ্লাসের ওপর স্বয়ম্ভুর চোখ আটকে গেল। বলল, 'নাও হতে পারে!' বাইরে একটু মেঘ ডেকে উঠল। নাকি মাথার মধ্যে আরও বড় কোনও বাজ পড়ার প্রস্তুতি শুরু হল? 'আমি সবাইকে খবর দিচ্ছি। তুমি একটু ভেতরের ঘরগুলো দেখে এসো তো। বি কেয়ারফুল।'

-শিওর স্যার।

স্বয়ম্ভু মাটিতে বসেই কানে ফোন ঠ্যাকাল, 'স্বয়ম্ভু সেন বলছি, গোয়েন্দা লালবাজার।'

রিভলবার হাতে নিয়ে সন্তর্পণে ভিতরের ঘরের দিকে এগোতে থাকে শিবাঙ্গী। সজাগ দৃষ্টিতে চোখের মণি ঘুরতে থাকে চারপাশে। হাতের কাছে সুইচ বোর্ড পেলেই সুইচগুলো একসাথে অন করতে থাকে। টপাটপ করে আলো জ্বলে ওঠে। পাশের ঘর আলোকিত হতেই থমকে যায়। সারা ঘর তোলপাড়। আলমারি খোলা। বিছানার চাদর, তোশক সব উল্টেপাল্টে ছড়িয়ে আছে। মাটিতে



ছড়িয়ে জামা কাপড়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অপরাধী কিছু একটা জিনিস মরিয়া হয়ে খুঁজেছে। কিন্তু পেয়েছে কী?

পুলিশ এল। লাশের ছবি উঠল। তুহিনশুভ্রর অ্যাসিস্ট্যান্ট রোহিত আর সাত্যকি এসেছে। স্বয়ম্ভুই ডেকেছিল তুহিনকে। কিন্তু কী এক কারণে সে আসতে পারেননি। তাই দুই সাগরেতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। টেবিলের গ্লাসটা নাকের কাছে ঠেকিয়ে রোহিত গন্ধ শোঁকে। স্বয়ম্ভু জিজ্ঞেস করে, 'কী বুঝছ?'

-জলেই কিছু একটা ছিল।

গ্লাসের নীচে অতি সামান্য জল পড়েছিল। একটা পরিষ্কার কন্টেনারে সেটা ভরে গ্লাসটাকেও এভিডেন্স হিসেবে রেখে দিল। স্বয়ম্ভু ঘরের চারপাশ ভালো করে ঘুরে দেখে শিবাঙ্গীকে প্রশ্ন করে, 'কী বুঝছ শিবাঙ্গী?''

-অপরাধী যেটা খুঁজছিল সেটা নীচের ঘরেই পেয়ে গেছে। না হলে ওপরের ঘরেও তোলপাড় করত।

-কী খুঁজতে পারে? টাকা-পয়সা তো সব ওপরের আলমারিতে। টাকা পয়সা ছাড়া কী এমন বহু মূল্যবান বস্তু যেটা...

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই শিবাঙ্গী চোখ বড় করে বলে ওঠে, 'মোবাইল। কোত্থাও কিন্তু তমালবাবুর মোবাইল পাইনি আমরা। এখন সেটা নট রিচেবল।' স্বয়ম্ভুর মাথায় বিদ্যুৎ, 'আবার তর্পণা?''

-কেন স্যার, তর্পণা কেন?

-তমালের সঙ্গে তর্পণার যোগাযোগটা অন্য একটা বিশেষ ফোনেই হত।

-তাহলে যে ফোনটা ও নরমালি ইউজ করে সেটা সরানো হল কেন? ওটা তো আমরা সব চেক করেছি। তর্পণার নম্বর ছাড়া তো কিছুই....।

--তাই বলে খুন! তার মানে তমাল এমন কিছু জানত যা ফাঁস হয়ে গেলে অপরাধীর বিপদ হত। এমনকী খুনের প্যাটার্নটাও পাল্টে গেল। সিরিয়াল কিলিং যারা করে তারা চট করে প্যাটার্ন পালটায় না।

-এ তাহলে সিরিয়াল কিলার নয় বলছেন?

-না হবার সম্ভাবনাই বেশি। মুশকিলটা হচ্ছে এদের অতীত সম্পর্কে সেরকম কোনও কথা জানার সময়ই পাচ্ছি না। বাকিদের সঙ্গে কথা যে বলব... নাহ! এবার যেভাবে হোক...। এক কাজ করবে শিবাঙ্গী বাকি যে তিনজন রয়েছে...

-আর দুজন স্যার।

-ও হ্যাঁ হ্যাঁ। সুস্মিতা তো অলরেডি ডান। দিয়া আর স্বস্তিকা।

-স্যার মৃত্তিকা।

-ওই হল। দিয়ার কাছে আমি যাব। মৃত্তিকার কাছে তুমি যাও। ওদের ডেকে পাঠাতে চাই না। তাতে ওরা ভেবেচিন্তে প্ল্যান সাজিয়ে আসতে পারে। আচমকা জেরা করতে হবে। কালকেই প্ল্যান করে নেব।

-ওকে স্যার।

-এই খিলাড়ি বেশ গুছিয়ে মাঠে নেমেছে শিবাঙ্গী। আমাদের সহজে পার পেতে দেবে না।

-আমারও সেটাই ধারণা।

-অরুণার পায়ে একটা চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। কিন্তু তমালের পা একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন।

-স্যার, এক্ষেত্রে খুনি তো আলাদাও হতে পারে।

–হতেই পারে। একই বাড়িতে দুজন খুন হল। খুনি দুজন। তাহলে কারণও কি একটা? নাকি একাধিক?

মাটির দিকে চেয়ে চোখের মণি এক জায়গায় স্থির রেখে কথাগুলো বলে গেল স্বয়ম্ভু। আবারও ফোনটা বেজে উঠল। ভাবনার মধ্যে বাধা পড়লে বেশ বিরক্ত হয় স্বয়ম্ভু। সেই এক রাশ বিরক্তির সঙ্গে গলা দিয়ে 'হ্যালো' শব্দটা বেরিয়ে এল। 'হ্যাঁ রঞ্জিত শুনতে পাচ্ছি,

বলো।... আচ্ছা।... কোনও ট্রেস নেই?... ওকে।' ফোনটা কেটে স্বয়ম্ভু বলল, 'তমালের ফোনটা দুপুর দুটো আঠেরো মিনিটে অফ হয়ে যায়। খুনটা তার মানে তার আশেপাশেই।'

-আর লোকেশন?

-এই বাড়িটাই।

-স্যার, তমালের ফোনে যদি এমন কোনও ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস থেকে থাকে তাহলে তো কখনও না কখনও ফোনটাকে অন করতেই হবে।

-তার কোনও মানে নেই শিবাঙ্গী। এস ডি কার্ডটা বের করে নেবে।

-তমালের ফোনে এস ডি কার্ড নেই স্যার। এর আগে যখন ফোনটা নেওয়া হয়েছিল দেখেছিলাম।

-তাতেই বা কী? পরে লাগিয়ে নিতেই পারে। আর সেটা যদি নাও হয়, তাহলে ফোনটা খুলে ডিভাইসের ইন্টারনাল মেমোরিটাকে বের করে নেবে। একটু আলো দেখতে পেয়েও হারিয়ে ফেলল শিবাঙ্গী। আবারও স্বয়ম্ভুর ফোনটা বেজে উঠল। ফোনটা ধরে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "কোথায় থাকো মা? ফোনটা তো সঙ্গে রাখবে।' সুচিত্রা বললেন, 'কাল মেয়েটার কাজ। কত কাজ বল তো? সুমিত্রা তো খাচ্ছে না, ঘুমোচ্ছে না, কিচ্ছু করছে না।

-নিয়ম অনুযায়ী কালকে অরুণার কাজ হবে না মা।

-মানে? কেন?

-তমাল মারা গেছে।

-কে? তমাল?

-হ্যাঁ মা।

-কী করে?

-বিষ খেয়েছে বা খাওয়ানো হয়েছে। দ্বিতীয়টার চান্সই বেশি।

-কী বলছিস ভোলা? কে মারল?

-আমি রাখছি মা। পরে কথা বলছি। মেসোকে বলো ব্যাপারটা। আমি রাতে কথা বলব। ফোনটা রেখে দিল। মুখ কাঁচুমাচু করে শিবাঙ্গী বলে উঠল, 'এই সবকিছু আমার জন্যেই হল স্যার।'

-'মানে?' স্বয়ম্ভু অবাক। শিবাঙ্গী আফশোস করে বলল, 'আপনার কথা শুনে যদি দুপুরেই এখানে চলে আসতাম তাহলে হয়তো তমালবাবুকে বাঁচাতে পারতাম।' ঘরের বাইরে যেতে গিয়েও স্বয়ম্ভু ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'তার মানে তোমার কথা শোনাটা আমার উচিত হয়নি। তাই বলতে চাইছ? তাহলে তো দায় একা তোমার নয়। বাইরে চলো।

আবার ফোনটা ঝনঝন করে উঠল স্বয়ম্ভুর। পকেট থেকে বের করে ফোনটা রিসিভ করেই বলে উঠল, 'তোমরা একবারে কোনও কথা জানাতে পারো না রঞ্জিত?'

-সরি স্যার। আসলে তমালবাবুর কল লিস্টটা জাস্ট পেলাম। তাই ভাবলাম...

-বলো বলো।

-লাস্ট দুদিনে তর্পণার নম্বরে অনেকবার ফোন গেছে।

-অনেকবার মানে কতবার?

একটু 'উম আম' করে তুতলিয়ে বলল, 'সবমিলিয়ে উনিশবার।

-তারপর?

-কিন্তু একবারও রিসিভ হয়নি। একদম শেষবারে গিয়ে কলটা রিসিভ হয়। কথা হয় মাত্র এক মিনিট চার সেকেন্ড।

-এটা কোন নম্বরটা?

-তমালবাবুর সেকেন্ড নম্বরটা।

-আর আগেরটা?

-ওটা থেকে তর্পণার কাছে কল যায়নি। এমনকি খুব বেশি ফোনও হয়নি। ওই টুকটাক।

-রেকর্ডিংগুলো জোগাড় করা সম্ভব?

-সম্ভব স্যার। ট্যাপ তো করা ছিল।

-সেগুলো জোগাড় করে ডিটেলস পাঠাও।

-ওকে স্যার।

-আর কিছু?

-না স্যার।

-থ্যাংক ইউ। শ্লেষাত্মক ধন্যবাদ দিয়ে ফোনটা কেটে দিল স্বয়ম্ভু।

তমালের বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি। পাড়ায় একটা খুন হয়েছে। লোকজন উঁকিঝুঁকি তো মারবেই। তেমনই উঁকিঝুঁকি মারা একটি বাড়ির দিকে ধেয়ে যেতেই অতি কৌতূহলী মহিলাটি ভিতরের দিকে পা বাড়ায়। অমনি স্বয়ম্ভু ডাকে, 'শুনছেন শুনছেন!' বেচারি বউ ঘরের ভিতর সেঁধিয়ে যেতে গিয়েও মুখে একটা আলগা ভদ্রতা এনে ফিরে তাকায়।

-পালাচ্ছেন কেন আমাদের দেখে? আমরা বাঘ না ভালুক?

পাশ থেকে শিবাঙ্গী চাপা স্বরে বলে, 'স্যার এই বাড়িতেই এসেছিলাম।' মহিলার দিকে তাকিয়েও গুমগুমে স্বরে একটা 'হুম' বলে স্বয়ম্ভু। মহিলাটি হাসব কি হাসব না ভাব নিয়ে বলে, 'না না পালাব কেন? ছেলেকে খেতে দিতে হবে তো তাই?'

-পুলিশকে দেখে কারা পালায় জানেন তো? অপরাধীরা। আপনিও কিন্তু আমাদের সন্দেহের তালিকায় ঢুকে গেলেন।

এবারে চরম ভেবলে গেল মহিলা। 'মানে, সে কী! আমি কী করেছি?"

-সেটা তো আপনিই জানেন। যদি কিছু নাই করে থাকেন তাহলে খামোকা পালাতে যাবেন কেন বলুন? যাক গে, একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। দুপুরবেলা কে এসেছিল তমালের বাড়িতে?

-দেখুন আমরা ঘরে নিজেদের মত থাকি। কে কার বাড়িতে কখন এল খবর রাখি না।

-হ্যাঁ তার নমুনা তো পেলাম।

-মানে?

-মানে সত্যিই দেখেননি নাকি বলতে চান না?

আমতা-আমতা করছে মহিলা। শিবাঙ্গী বলে, 'যদি কিছু জানেন বলে দিন। এতে আপনাদেরই ভালো।'

-আমি কিছু দেখিনি বিশ্বাস করুন। দুপুরে ছেলেকে খাইয়ে ঘুমোচ্ছিলাম। -স্যার একটা কথা বলব?

কথাটা স্বয়ম্ভুদের পিছন থেকে কেউ যেন ধরা গলায় বলে উঠলেন। ঘুরে দেখল একটু বয়স্ক একটা লোক এগিয়ে এসেছে। 'হ্যাঁ বলুন।' লোকটি বললেন, 'আমি এই বাড়িটায় থাকি।' লোকটি আঙুল দেখিয়ে তার বাড়িটিকে দেখাল। তমালের বাড়ির পাশেই বলা যায়। ধরা গলায় লোকটি জানালেন, আজ দুপুরে খেয়ে উঠে আমি একটু বারান্দায় বেরিয়েছিলাম। ওই কাপড় মেলা ছিল সেগুলো তুলতে। তখন দেখলাম একজন পুলিশ ঢুকে গেলেন বাড়ির মধ্যে। তমালই ঘরে নিয়ে গেল।'

-পুলিশ!

বিস্মিত হয়ে তাকাল স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী। 'মিস্টার সমাদ্দার এদিকে একটু আসুন তো।' স্বয়ম্ভুর ডাকে দৌড়ে এলেন এক পুলিশ অফিসার। 'হ্যাঁ স্যার বলুন।'

-আপনাদের থানা থেকে আজ দুপুরে কেউ এসেছিল তমালের কাছে?

-থানা থেকে? না তো স্যার।

-হুম।

চট করে বয়স্ক প্রতিবেশীর দিকে ঘুরে স্বয়ম্ভু জিজ্ঞেস করল, 'সময়টা মনে আছে?'

--হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই তো প্রায় দুটোর কাছাকাছি।

-মানে দুটো বাজেনি।

লোকটি একটু ভেবে দুপাশে ঘাড় নেড়ে 'না' বললেন। 'কারণ দুটোর সময় আমার স্ত্রীর

একটা ওষুধ থাকে। সেটা আমিই দিই। ও তো উঠতে পারে না। বিছানাতেই পেচ্ছাপ পায়খানা।' লোকটি একটু অতিরিক্তই কথা বলেন। তবু স্বয়ম্ভু খুশিই হল মনে মনে। কিছু তো ক্লু পাওয়া গেল। আর লোকটি সত্যি যে বলছে তার প্রমাণ একটু আগে রঞ্জিতই দিয়েছে। দুটো আঠেরোতে তমালের ফোন সুইচড অফ। অর্থাৎ তার আগেই যা হবার হয়ে গেছে। বিষই যদি হত্যার অস্ত্র হয় তাহলে সেটা যথেষ্ট শক্তিশালী। কারণ কোনও ধস্তাধস্তির চিহ্ন পায়নি পুলিশ। এদিকে প্রতিবেশীর কথা অনুযায়ী তমাল নিজেই লোকটিকে ঘরে ঢুকিয়েছে। অবশ্য পুলিশ এলে সেটাই স্বাভাবিক। শিবাঙ্গী প্রতিবেশীকে জিজ্ঞেস করে, 'পুলিশ কখন বেরিয়েছে দেখেছেন?'

-না ম্যাডাম। ওটা আর দেখিনি।

স্বয়ম্ভুর প্রশ্ন, 'আপনি বুঝলেন কী করে উনি পুলিশ? পুলিশের গাড়িতে এসেছিলেন?'

-না। কোনও গাড়ি তো দেখিনি। আমি যখন দেখলাম তখন পুলিশ তমালের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। তমাল ওনাকে ঘরে ঢুকিয়ে নিল।

-ক'জন এসেছিল?

-একজনই।

-মুখ দেখেছেন?

-না স্যার। মুখ ঢাকা ছিল। মাস্কে।

স্বয়ম্ভূ প্রশ্ন করতে করতে ভদ্রলোকের দিকে ঝুঁকে এসেছিল। মাস্কে মুখ ঢাকা শুনে সটান মাথা তুলে দাঁড়াল। শিবাঙ্গীর দিকে তাকাল। এবার ইন্সপেক্টর সমাদ্দার প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোককে, 'তাহলে আপনি কী দেখে বুঝলেন যে লোকটা পুলিশ?' ভদ্রলোক হাসলেন। যেন এই আহাম্মক পুলিশটা কী বোকার মতই না প্রশ্ন করলেন। কাঁধ নাচিয়ে বয়স্ক বললেন, 'কেন? পোশাক দেখে। খাঁকি রঙের পোশাক পরে ভরদুপুরে আর কে আসবে?

-খাঁকি রঙের?

এই কথাটা স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গীর মুখ থেকে একসঙ্গে বেরিয়েছে। লোকটি আরও জোরের সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ। পুলিশের যেরকম পোশাক হয়। অবশ্যি এনার দেখছি সাদা। কিন্তু ওর কোমরে বন্দুকও তো ছিল।' ভদ্রলোক ওনার কথার প্রেক্ষিতে প্রমাণ দিয়েই চলেছেন। স্বয়ম্ভূ আর সমাদ্দার একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

-কী হল বলুন তো? ভুল বললাম কিছু?

বয়স্ক ভদ্রলোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে প্রশ্নটি করলেন। স্বয়ম্ভু তৎক্ষণাৎ স্মিত হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম আপনার?''

-অমর দাস।

-অনেক ধন্যবাদ অমরবাবু আমাদের সাহায্য করার জন্য। শুধু এরপর থেকে একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবেন। এরপর যদি এরকম কোনও পুলিশ দেখেন এ পাড়ায় ঘোরাঘুরি করছে তাহলে তক্ষুনি লোকাল থানায় ফোন করে জানাবেন। কারণ সেই পুলিশটির নকল হবার সম্ভাবনাই বেশি।'

-তাই নাকি? কেন বলুন তো?

-কোলকাতা পুলিশের পোশাক সাদা। একমাত্র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ বা তার ওপরের পদমর্যাদার কেউ তাঁদের খাঁকি পোশাক। বা আর পি এফ অথবা কনস্টেবলদের পোশাক খাঁকি। সেরকম কেউ একা একা এইভাবে আসবেন না।

অমরবাবু চুপ করে ঘাড় নাড়লেন। আদৌ কিছু বুঝলেন কিনা উনিই জানেন।

স্বয়ম্ভু গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে শিবাঙ্গীকে বলল, 'পুরোটাই নকল শিবাঙ্গী। আততায়ী পুলিশের বেশে এল। ঘরে ঢুকল। তারপর কাজ সেরে বেরিয়ে গেল।'

-শুধু চালে ভুল হয়ে গেল। সাদার বদলে খাঁকি।

-ওটাই প্রশ্ন। যে আততায়ী এত বুদ্ধি করে মানুষ খুন করবে। শহরের রাস্তা থেকে জলজ্যান্ত মানুষকে কিডন্যাপ করছে, সে এইটুকু জানবে না? গাড়ির কাছে পৌঁছে খানিক

ভাবল স্বয়ম্ভু। সমাদ্দারও সঙ্গে এসেছিল। এবার তাঁর উদ্দেশ্যেই স্বয়ম্ভু বলল, ‘সমাদ্দারবাবু, আপনি বডিটাকে তাড়াতাড়ি ফরেন্সিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আমি কথা বলছি।'

-শিওর স্যার।

স্বয়ম্ভূ গাড়িতে উঠল। উল্টোদিক দিয়ে উঠে বসল শিবাঙ্গী। গাড়ি ছাড়ল।

১৫

শরীর আর দিচ্ছে না নন্দিনীর। বড় বড় হাই উঠছে। তবু ফোনের কল রেকর্ডিং শুনে ঠিকঠাক ঠিকানাগুলো নোট করে রাখছে। পাশের ঘরে তর্পণা ফোনের মধ্যে কাকে যেন কী বোঝাবার চেষ্টা করছে অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু সে বোধহয় শুনছে না। সত্যি বলতে, পাশের ঘর থেকে কথাগুলো এ ঘর পর্যন্ত এসে একটার ওপর আরেকটা উঠে কীরকম যেন হাউ মাউ খাউএর মতো শব্দ হয়ে নন্দিনীর কানে ঢুকছে। আবারও একটা হাই উঠল মেয়েটার। ফোনের রেকর্ডিংয়ে তখন এক মহিলার ভয়েজ তার বাড়ির অ্যাড্রেস বলে চলেছে। আসলে সব ফুলের অর্ডার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হয় না। অনেকে ফোন করে অর্ডার দেয়। বলা ভালো, বেশিরভাগই তাই করে। তর্পণা সব রেকর্ড করে রাখে। দোকান থেকে রাতে ফিরে নন্দিনীর কাজ হল ফোনের রেকর্ডিং শুনে সব ঠিকানা নোট করা। নন্দিনী টেবিলের ওপর ঢুলে পড়তেই ডানদিকের কানে সজোরে টান পড়ল। এক ঝটকায় তন্দ্রা কেটে গেল। দেখল তার বস তর্পণা রুদ্রমূর্তি ধরে তাকে চেয়ার থেকে নামিয়ে দাঁড় করাল। ‘এইবার বুঝেছি কীভাবে আমার সর্বনাশ হচ্ছে। হারামজাদি আমারই খাবি, আমারই পড়বি আবার আমারই সর্বনাশ করবি?' তন্দ্রাভাঙা চোখে চূড়ান্ত বিস্ময় নন্দিনীর। কী করল সে? দাঁতে দাঁত পিষে তর্পণা বলে উঠল, ‘ঘুমোতে ঘুমোতে অ্যাড্রেস লিখিস তুই? তারপর বেহালার মাল গড়িয়া আর গড়িয়ার মাল টালিগঞ্জে ডেলিভারি করিস? সন্ধে থেকে দুজন ফোন করে উদোম গালাগাল দিল আমায়। তারা যে যেটা অর্ডার দিয়েছিল কেউ সেটা পায়নি।' ঠাস করে তেরো বছরে মেয়ের গালে চড় কষাল তর্পণা 1

-আমার কি শালা হুন্ডি আছে নাকি রে? খাইয়ে দাইয়ে তোর মত একটা বোবা মেয়েকে পুষব! লেখাপড়াও তো আমি শেখাই। কোন কাজে লাগিস তুই আমার? অকম্মার ঢেঁকি একটা!

কোঁকড়ানো চুলে বিনুনি করা ছিল নন্দিনীর। সেটা খামচে ধরতেই নন্দিনীর মাথাটা একপাশে হেলে গেল। যন্ত্রণায় ভুরু কুঁচকে এল। বিস্মিত নিষ্পাপ চোখ দুটোতে টলটল করে উঠল অশ্রু। তর্পণা বলল, ‘এই শোন, এখানে থাকতে গেলে মন দিয়ে কাজ করে খেতে হবে।' চুলটা ছেড়ে দিল তর্পণা। ‘নইলে তোর মামাকে বলব এসে নিয়ে যেতে। আমার পক্ষে তোকে রাখা সম্ভব নয়। যে ভাগাড়ের মাল সেই ভাগাড়েই গিয়ে মর।'

-খবরটা দেখেছি। খুব খারাপ খবর। যেমনই হোক, ছাত্র-ছাত্রীরা তো ছেলেমেয়ের মতই হয়।

-যেমনই হোক! মানে?

কলেজের করিডোর দিয়ে ক্লাস থেকে স্টাফ রুমের দিকে আসতে আসতে স্বয়ম্ভুর সঙ্গে কথা বলছেন প্রফেসর উদয়ন পাণ্ডে। এক মাথা কাঁচাপাকা চুল, নাকের নীচে মোটা কালো গোঁফ। চিবুকের কাছে কাটা দাগটা আর পাঁচজনের থেকে ওনাকে আলাদা করে রাখে। লম্বা চওড়া চেহারা। ইন করে শার্ট পরেন। পায়ে চকচকে ব্রাউন রঙের জুতো। দেখলেই বেশ একটা ডাকসাইটে শিক্ষক বলেই মনে হয়। গলার স্বরে ভারিক্কি ব্যাপারটাও মাত্রাছাড়া নয়। সবমিলিয়ে শ্রদ্ধা করার মতই। শান্ত কণ্ঠেই বললেন, 'কী বলি বলুন তো স্বয়ম্ভুবাবু। এত বছর হয়ে গেল ওরা যে যার মতো জীবন বেছে নিয়েছে। এখন এই বয়সে এসে ওদের সম্পর্কে বলতে খুব খারাপ লাগে।' স্বয়ম্ভুও বেশ বিনয় নিয়েই বলল, ‘বুঝতে পারছি উদয়নবাবু। কিন্তু আমাদের কাছে বড় থেকে ছোট, যেকোনও ইনফরমেশনই ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তাছাড়া আপনি হয়তো জানেন না, খুনি আরও একজন. যে কিনা অরুণারই বন্ধু তাকেও হুমকি দিয়েছে।'

-তাই নাকি?

-হ্যাঁ। অরুণার বাঁ পায়ের চারটে আঙুল কেটে সুস্মিতাকে পাঠিয়েছে।

-হোয়াট!

উদয়নবাবু আঁতকে উঠলেন। 'কী বলছেন কী?

-এটা আনঅফিশিয়ালি জানালাম আপনাকে। আশা করব এই কথাটা আমার আর আপনার মধ্যেই রাখবেন।

-ও শিওর শিওর। চলুন আমরা একটা ঘরে বসে কথা বলি। -প্লিজ।

কয়েকটা পুরোনো ফাইল পাড়লেন উদয়নবাবু। স্বয়ম্ভু চেয়ারে বসে। কাজ করতে করতেই কথা বলে চলেছেন উদয়নবাবু, ‘ওরা যখন পড়ত তখন আমি প্রফেসর ছিলাম। এখন এই দু-বছর হল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপাল হয়েছি। আমি ওদের ক্লাসও নিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কী, অরুণা, সুস্মিতা মৃত্তিকা আর দিয়া এই ফোর মাস্কেটিয়ার্সের পড়াশুনোয় বিন্দুমাত্র মনোযোগ ছিল না। একবার তো দিয়া আর সুস্মিতাকে কলেজে গাঁজা আনার জন্য সাতদিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়।’

-নেশাভাঙও করত?

-হ্যাঁ হ্যাঁ। সবরকম। এদের সঙ্গে একটা ছেলে ছিল।

-কী নাম?

-প্রিয়াংশু। তবে তমাল বলে আরেকটি ছেলের সঙ্গে সুস্মিতার বেশ মেলামেশা ছিল। সে এই কলেজের নয়। এই কলেজেরই একজন প্রফেসরের কোচিংয়ে পড়ত। সেখান থেকেই শুনেছি। দেখেওছি রাস্তাঘাটে। জানি না, ওদের এখন বিয়ে থা হয়েছে কিনা।

-না স্যার। তমালের সঙ্গে সুস্মিতার মেলামেশা থাকলেও বিয়েটা অরুণার সঙ্গে হয়। আর সুস্মিতা এখন প্রিয়াংশুর সঙ্গে থাকে।

-ওরেব্বাবা। এরা এখনও খেলে যাচ্ছে।

চিলতে হাসির গমকে স্বয়ম্ভুর ঠোঁটটা অল্প বেঁকে গেল। ‘খেলা আরও ভয়ানক হয়ে গেছে উদয়নবাবু।'

-কীরকম?

-গতকাল অরুণার স্বামী তমাল ব্যানার্জিও খুন হয়েছে।

-সে কী! আমি যে তমালের কথা বলছি সে?

-ইয়েস। এতক্ষণে হয়তো তার ক্রিমেশন হয়েও গেছে। কপাল ভালো মিডিয়া এই মৃত্যুটার খবর এখনও পায়নি। আসলে বডিটা তো রেললাইনের ধারে পাওয়া যায়নি। বাড়িতেই ঘটেছে।

উদয়নবাবুর মুখটা বেশ গম্ভীর হয়ে গেল। স্বয়ম্ভূ বলল, 'ঠিক সেই কারণেই আপনার কাছে আসা। ওরা স্কুল লাইফের বন্ধু নয়। চারজনেই কলেজ থেকে বন্ধু এবং যেহেতু অরুণার পরে সুস্মিতাকেও ভয় দেখানো হয়েছে তাই মনে করা হচ্ছে কলেজে এমন কেউ কী শত্রু ছিল ওদের যে এগুলো করতে পারে? ও, আরেকটা কথা। আপনি জানেন কিনা জানি না, অরুণা মৃত্যুর আগে বেশ কয়েকদিন ধরে একটা ফোন পাচ্ছিল। যে ফোনটা একেকবার একেকটা দেশ থেকে এসেছে। কখনও রাশিয়া তো কখনও চিন। তবে এটা যে ফেক সেটা বলাই বাহুল্য।'

-কে করছিল ফোনটা?

-একটা বেড়াল।

-মানে?

-সেটাই তো রহস্য। ফোন যদি করবেই তাহলে গলা পালটে হুমকি দেবে, টাকা চাইবে। বেড়ালের ডাক শোনাবে কেন?

-এটা কোনও সংকেত?

-এক্স্যাক্টলি স্যার। আমাদেরও এটাই ধারণা। কিন্তু কেউ তো করছে। ম্যাও ডাকের পিছনে লুকিয়ে থাকা মানুষটা কে সেটাই জানতে হবে।

উদয়নবাবু যে ফাইলগুলো পাড়লেন সেখান থেকে দুটো ফাইল সরিয়ে রেখে দুহাজার নয় সালের ফাইলটি বেছে নিলেন। কয়েকটা পাতা উল্টোলেন। বললেন, 'ইন দ্য ইয়ার টু থাউসেন্ড নাইন একটা কেস হয়। হঠাৎ একদিন একটি বাইরের ছেলে এসে কলেজে নালিশ

করে এই ফোর মাস্কেটিয়ার্সের নামে।'

-কী অভিযোগ?

-রেপ কেস। প্রতারণা।

-বাজে কথা৷ জাস্ট বাজে কথা। দেশে আইন নেই? আমাদের ছেড়ে কথা বলত?

-দেশে আইন ছিল, আছে আর থাকবেও। কিন্তু আপনারা সেইবছর কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে যান। তাই আর কলেজের পক্ষ থেকে কোনও স্টেপ নেওয়া হয়নি।

দিয়ার ক্যাফেতে বসেই কথা বলছে স্বয়ম্ভু। কলেজ থেকে সোজা দিয়ার ক্যাফেতে। পায়ের ওপর পা তুলে স্মার্টলি জবাব দিয়ে যাচ্ছে দিয়া 1

-তাতে কী? কোনও কিছুই তো প্রমাণ হয়নি।

-হবে কী করে? মেয়েটা তো মুখই খুলতে পারেনি। কারণ সে ততদিনে প্রায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

-তাহলেই ভাবুন, একজন পাগল কি বলল না বলল সেইটাকে ধরে নির্দোষ চারটে মেয়েকে কে শাস্তি দেবে? আর আপনি একজন গোয়েন্দা হ...

কথাটা বেশ জোরেই বলে ফেলেছে। কাস্টমার আছে কয়েকজন৷ তাই আবারও গলা চেপে দিয়া বলে, 'একজন গোয়েন্দা হয়ে এত বছর পর পুরনো বাজে মিথ্যে একটা কেস নিয়ে ডিস্টার্ব করতে এসেছেন। এর কোনও লজিক হয় মিস্টার সেন? তাছাড়া মেয়েটা স্পষ্ট বলেছিল যে আমাদের কোনও দোষ নেই। সব দোষ ওর নিজের।

স্বয়ম্ভু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'শমন যখন সামনে এসে হ্যালো বলে যাবে তখন বুঝবেন স্বয়ম্ভু সেনের লজিক কী!' দিয়ার মুখে একটা পরিবর্তন এল। নকল হাসি হেসে বলল, 'শমন এসে ভয় দেখাবার আগেই আপনি চলে এলেন ভয় দেখাতে! আশ্চর্য!'

-এখনও কোনও ফোন পাননি?

দিয়া চমকে উঠল। চমকটা চোখ এড়াল না স্বয়ম্ভুর। দিয়া বলল, 'কা... কার ফোন?'

-কার ফোন না জেনেই যা চমকে উঠলেন দিয়া ম্যাডাম তাতে সন্দেহ তো আরও বেড়ে গেল।

-কীসব বাজে বকছেন? কীসের চমক? কীসেরই বা ফোন?

স্বয়ম্ভু তার মুখটাকে দিয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে বলে ওঠে, 'মিয়াওওওও'। দিয়ার চোখের পাতায় আবার কেঁপে উঠল। 'দেখেছেন তো, আবারও চমকে উঠলেন।'

-আমি কোনও ফোন পাইনি স্বয়ম্ভুবাবু।

জোর দিয়ে বলল দিয়া। স্বয়ম্ভুও তার শক্তিশেল ছুড়ে দিল, ' স্বাভাবিক। কারণ ফোনটা আপনিই করেছেন।'

-ফাক... সরি। দেখুন, আপনার মন গড়া কথা শোনার সময় আমার নেই। অনেক কাজ আছে। কফি নেবেন?

-আজ আমি আপনার কাছে এসেছি। এরপরে লালবাজারে ডেকে পাঠাব। সব প্রমাণ জোগাড় করে। তখন আমি আপনাকে কফি খাওয়াব। আজ চলি?

দিয়া কিছু বোঝার আগেই স্বয়ম্ভু এগিয়ে গেল কয়েক পা। তারপরেই ফিরে তাকাল। আবার কী বলতে চায় গোয়েন্দা? এই ভেবে দিয়া উঠে দাঁড়াল। স্বয়ম্ভু কাছে এসে বলল, 'সব খোলসা করে বললেই ভালো করতেন ম্যাডাম। তাহলে হয়তো এ যাত্রা রক্ষে পেতেন। কিংবা শাস্তিটা একটু কম হত!

-কিন্তু আমি তো...

দিয়া বলতে গেল। স্বয়ম্ভু কানেও তুলল না কথাটা। গটগট করে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে গেল। দিয়ার মাথায় এখন অজস্র প্রশ্ন। কী বলে গেল এসব? এ যাত্রা রক্ষে পেতেন? আবার শাস্তিটা একটু কম হত? মানে? একটু আগেই বললেন আমি নাকি ফোন করে ভয় দেখাচ্ছি। তাহলে আমাকেই...! সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

-কেন লুকোচ্ছিস?

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কিয়ারা। দিয়া অবাক। ‘তুই কখন এলি?’

-যখনই আসি। তুই ফোনের ব্যাপারটা লুকিয়ে ভালো করছিস না দিয়া।

-ছাড় তো। শোন, অপরাধ যারা করে তারা সবথেকে বেশি ভীতু হয়। তাই ভাবে অন্যকেও বুঝি ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করবে।

-অরুণা কি ভীতু ছিল?

-তা নয় তো কী? একদিনের জন্যেও সুস্মিতার মুখের ওপর বলতে পেরেছিল যে ও তমালকে ভালোবাসে? সবার আড়ালে প্রেম করত আর সামনে দেখাত সুস্মিতাকে কত ভালোবাসে। এটা ভীতু নয় তো কী?

কাচের গ্লাসে আলতো করে চুমুক দিল শিবাঙ্গী। সামনের টেবিলে রাখল। উল্টোদিকের সোফাতে বসে হাত কচলাচ্ছে মৃত্তিকা। পাখার তলায় বসেও ঘামছে। ‘আপনার কী হাই প্রেশার?' শিবাঙ্গীর প্রশ্ন শুনে 'অ্যাঁ' বলে তাকাল মৃত্তিকা। যেন অন্য কোনও জগতে ছিল সে। 'না না, কই, সেরকম তো কিছু ...।

-তাহলে এত ঘামছেন কেন?

কান এঁটো করা হাসি মৃত্তিকার ঠোঁটে। ‘না, আসলে এত ভ্যাপসা গরম।' ঘরের ভিতর থেকে বাচ্চাটা কেঁদে ওঠে। মৃত্তিকার চোখ স্বভাবতই ঘরের দিকে চলে যায়। ‘আপনি দেখে আসতে পারেন। আমি বসছি।' শিবাঙ্গী বলল।

-না, দীপা আছে।

-আয়া?

-হ্যাঁ।

-বেশ। তাহলে আর সময় নষ্ট না করে বলে ফেলুন।

-কী?

-কলেজে থাকতে আপনাদের কোনও শত্রু ছিল?

-কলেজে? না তো।

- ঠিক?

-হ্যাঁ। আমাদের সকলেই ভালোবাসত। স্পেশ্যালি প্রফেসররা।

-পড়াশুনোয় ভালো ছিলেন?

-হ্যাঁ।

বলেই থমকে যায় মৃত্তিকা। ‘মানে ওই মোটামুটি। তবে ফেল করিনি কোনওদিন।'

-হুম।

-তাহলে আপনার জীবনে শত্রু কে?

-কেউ না।

-ভেবে বলুন মৃত্তিকা।

-সত্যি বলছি। শত্রু কেউ নেই। আমরা আমাদের মতো থাকতাম। পড়াশুনো করতাম। ঘুরতে যেতাম।

-ঘুরতে যেতেন? কাদের সঙ্গে? বাবা-মা?

-হ্যাঁ বাবা-মার সঙ্গেও গেছি। তবে কলেজে থাকতে আমরা চার বন্ধু ছিলাম। আমরাই ঘুরতে যেতাম।

-ছিলাম কেন বলছেন? এখন আর নেই?

-হ্যাঁ হ্যাঁ। তা থাকব না কেন?

-আপনার কী হাত চুলকনো বাতিক আছে?

‘না না। এ...এমনি।'

-এমনি এমনি কেউ কিছুই করে না মৃত্তিকা ম্যাডাম। যা কিছু হয় তার পিছনে কোনও না

কোনও কারণ তো থাকেই। এই যে অরুণা খুন হল। সুস্মিতা হুমকি পেল সেগুলো কী এমনি এমনি বলছেন?

ঝট করে কচলে চলা হাতদুটোকে থামিয়ে দেয়

-দেখুন ওদের ব্যাপারে আমি কী করে জানব?

-সে কী! আপনারা এতদিনের বন্ধু।

পাশের ঘর থেকে বাচ্চার কান্না থেমে গেছে। আয়ার গলা পাওয়া যাচ্ছে। বাচ্চাটার সঙ্গে খেলছে। মৃত্তিকা বলল, 'হ্যাঁ বন্ধু তো নিশ্চয়ই। কিন্তু এখন আর তেমন দেখা সাক্ষাত হয় না। সংসার করে বাচ্চা সামলে আর সময় পাই না।'

-বুঝলাম। কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে আপনার সঙ্গে অরুণার সম্পর্ক নাকি ভাল ছিল না!

-কে বলল?

-যেই বলুক। কথাটা সত্যি তো?

একটু ভাবল মৃত্তিকা। বলল, 'হ্যাঁ। লাস্ট চার বছর আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই।'

-কেন?

-ও সুস্মিতাকে ডিচ করে।

-তমালকে কেড়ে নেয়?

-হ্যাঁ।

-তার সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কেন খারাপ হবে?

-আমিই সুস্মিতাকে বলেছিলাম। একবার নয়, অনেকবার। এমনকি, অরুণাকেও। অরুণা বলেছিল, ওদের ব্যাপারে নাক না গলাতে। যেদিন ধরা পড়ল সেদিন....

-কীভাবে ধরা পড়ল?

-দিয়ার জন্মদিনের দিন আমাদের একসঙ্গে খেতে যাবার কথা ছিল। লাস্ট মোমেন্টে অরুণা বলল ওর নাকি খুব শরীর খারাপ। আমরা বললাম, তাহলে আমরা ক্যান্সেল করি। অন্যদিন করব সেলিব্রেশনটা। ও বারণ করল। বলল, না না, তোরা ক্যান্সেল করিস না। ঠিক তখনই আমি শুনতে পেলাম, আরেকটা ফোন বাজার আওয়াজ। ভীষণ চেনা। তমালের ফোনে ওই রিংটোনটা বাজে। এদিকে চারপাশ চুপচাপ। ফোনের আওয়াজটা থেমে যেতেই আমিও ফোনটা কেটে দিই। তারপর একটা প্ল্যান করি। সুস্মিতাকে বলি, এই তমালকে আজ একটা সারপ্রাইজ দিই চল। আজ আমরা ওকে নিয়েই লাঞ্চে যাব। দিয়ার বরাবরই অনেক পয়সা। কোনও কিছুর পরোয়া করে না।

-তার মানে আপনার সন্দেহ হয়েছিল যে অরুণা তমালের বাড়িতেই আছে?

-হ্যাঁ।

-কেন? তমালও তো অরুণার বাড়িতে আসতে পারত।

-তমাল কোলকাতায় একা থাকে। অরুণার বাড়িতে ওর বাবা-মা আছে।

-বেশ। তারপর?

-তারপর আর কী? গেলাম। বেল বাজালাম। তমাল বেরিয়ে এল আলুথালু বেশে। তাড়াহুড়োতে জামার বোতামটাও উল্টোপাল্টা। আমাদের দেখে তো থ।

তমাল চুল ঠিক করতে করতে বলল, 'কী রে তোরা, এই সময়?' সুস্মিতা কড়া গলায় বলল, ‘ঘরে যে আছে তাকে বেরিয়ে আসতে বল।'

তমাল তুতলিয়ে আমতা আমতা করে বলল, ‘‘ঘরে আবার কে থাকবে? কেউ নেই। তোরা খেতে যাসনি?' আবার সুস্মিতা বলল, ‘সত্যি ঘরে কেউ নেই?'

-না রে বাবা! কে থাকবে? আমি একা মানুষ।

-তাহলে ঘরে ঢুকতে দে। সর সর।

মৃত্তিকা বলল। তমাল বাধা দিল প্রাণপনে। ‘এই না না শোন। দ্যাখ, এটা ভদ্রলোকের পাড়া। আমি একা একটা ছেলে থাকি। ভর দুপুরে এতগুলো মেয়ে একসঙ্গে আমার বাড়িতে

দেখলে লোকে কী বলবে বল। আমার হেব্বি বদনাম হয়ে যাবে রে।' দিয়া খিস্তি দিয়ে উঠল, ‘বোকাচোদার মতো কথা বলিস না তমাল। আমরা তোর বন্ধু। এই টু থাউসেন্ড সেভেন্টিনে এসে তিনটে মেয়ে তোর বাড়িতে এসেছে দেখলে পাড়ায় বদনাম হবে তোর? কলঙ্কিনী রাধা?'

-আঃ দিয়া। তমাল তো ঠিকই বলেছে।

সুস্মিতার মুখে হঠাৎ এই কথা শুনে ভড়কে গেল মৃত্তিকা আর দিয়া। তমালও হাসবে কি হাসবে না বুঝতে পারছে না। ‘এই কী বলছিস তুই?'' দিয়া বলল।

-একটা ছেলের বাড়িতে তিনটে মেয়ে এলে পাড়ায় বদনাম তো হবেই। লোকে ভাববে দেখেছ, ছেলেটা এক সাথে তিনটে মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে। কী খারাপ ছেলে। কিন্তু, যদি একটি মেয়ে আসে তাহলে পাড়ার লোকে ভাববে, আহারে, ছেলেটা প্রেম করছে। তাই না তমাল?

-হ্যাঁ, মানে বুঝিসই তো লোকের স্বভাব...

-তোর বাড়িতে তুই একা?

প্রশ্নটা আবার করল সুস্মিতা। তমাল হ্যাঁ এবং না-এর মাঝামাঝি একটা উত্তর দিতে না দিতেই সুস্মিতা বারান্দার মাটি থেকে একটা হিল দেওয়া লেডিস জুতো হাতে তুলে ধরল। ‘তুই কি আজকাল লেডিস জুতো পরছিস নাকি রে?' ভেবলে গেল তমাল। মুখে পরবর্তী অভিব্যক্তি ফুটে ওঠার আগেই সপাটে একটা জুতোর বাড়ি পড়ল তমালের গালে। পরে আরও একটা। তাতে হল কী, সুস্মিতার মারের চোটে ঘরের ভেজানো দরজার ওপর গিয়ে পড়ল তমাল। হাট করে খুলে গেল দরজাটা। ঘর খালি। দিয়া আর মৃত্তিকা সোজা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। নীচের ঘরে কেউ নেই। সুস্মিতার সঙ্গে তিনজনেই সোজা ওপরে উঠে এল। তমাল চিৎকার করে বাধা দিতে দিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল। ওপরের বেডরুমে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তিনবন্ধু। বিছানার ওপর গুটিসুটি মেরে বসে অরুণা। চোরের মত তাকিয়ে আছে। সুস্মিতা বলল, 'তোর শরীর খারাপ না রে অরুণা? কী হয়েছে তোর? আমাদের বল। কীরকম শরীর খারাপ যে নিজের বাড়ি ছেড়ে একেবারে তমালের বিছানায় এসে উঠেছিস।' এরপরেও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল সুস্মিতা, ‘কী রে বল কীরকম শরীর খারাপ। শালা, বেশ্যা মাগী।'

- সুস্মিতা প্লিজ।

তড়পে উঠল তমাল। পাল্টা দিল সুস্মিতা। বুকে ফেলা ওড়নাটা ঝাঁকিয়ে তেড়ে গেল, ‘ওই শালা হারামি, একদম চুপ করবি তুই। তুই এত বড় বেইমান তমাল? তোর কার সাথে আলাপ আগে? অরুণা? না আমি? বল।’ কাঁদতে কাঁদতে কলার চেপে ধরল তমালের। দিয়া এগিয়ে এল। ‘সুস গায়ে হাত দিস না।'

-আরে ছাড় আমায়। ওকে খুন করে আমি জেলে যাব তাও ভালো। আর এই অরুণা?

এবার অরুণার দিকে তেড়ে গেল। ‘আমাদের চার বন্ধুকে লোকে ফোর মাস্কেটিয়ার্স বলত রে। ভুলে গেলি? সেই বন্ধুত্বে এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করলি? আমার ভালোবাসা কেড়ে নিলি?’

এতক্ষণ অরুণা একটা কথাও বলেনি। শুধু ফুঁসছিল। এইবার চাপাস্বরে গর্জে উঠল, ‘তোর ভালোবাসায় জোর ছিল না সুস্মিতা। থাকলে আমি কেন, পৃথিবীর কেউ তমালকে তোর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারত না।' থমকে গেল সুস্মিতা। জল ভরা চোখে চেয়ে তমালকে বলল, ‘অরুণা কী বলছে তমাল? আমি তো তোকে প্রোপোজ করেছিলাম। জোর না থাকলে, মন প্রাণ দিয়ে তোকে না চাইলে বলতাম বল? বল অরুণাকে।' তমাল বলল, ‘দ্যাখ সুস, তোর দিক থেকে হয়তো ওটা সত্যিই ভালোবাসা ছিল। কিন্তু আমার দিক থেকে ওটা শুধু ইনফ্যাচুয়েশন।' দিয়া, সুস্মিতা আর মৃত্তিকা তিনজনেই তমালের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তমাল বলছে, 'জীবনে প্রথম একটা মেয়ে আমায় প্রোপোজ করেছে। যে দেখতে শুনতে ভালো। জলি। খিলখিল করে হাসতে পারে, মস্তি করতে পারে। তাকে ফেরাবার প্রশ্নই নেই। কিন্তু অরুণা আমার জীবনে আসার পর বুঝেছি অ্যাকচুয়াল ভালোবাসা কী!' ঘরের মধ্যে থমথমে

নিস্তব্ধতা। তমালের উত্তরটা সুস্মিতার শরীর থেকে যেন সবটুকু জীবনীশক্তি শুষে নিয়ে খাটের ওপর বসিয়ে দিল। দিয়া এগিয়ে গেল তমালের মুখের সামনে। বলল, 'অরুণা তোকে ঠিক কীভাবে বোঝাল বল তো আসল ভালোবাসার মানে? বেড শেয়ার করে?' তমালের চোয়াল শক্ত -য় উঠল। বলল, 'তুই বুঝবি না দিয়া। কারণ নারী-পুরুষের ভালোবাসার অনুভূতিটাই তোর নেই।' হাতটা মুঠো করে ফেলল দিয়া। কিন্তু তুলল না। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আগে ভালোবাসার মানেটা বোঝ। তারপর মেল-ফিমেল ডিফারনশিয়েটটা করিস। উদগাণ্ডু শালা!'

সুস্মিতার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াল দিয়া। 'অনেক তো হল। এবার চ।' আমার জন্মদিনে কোনওদিন এত ভালো সেলিব্রেশন হয়নি রে।' মৃত্তিকা বলল, 'অরুণা, তোকে অনেক ধন্যবাদ। তুই আর তমাল আমাদের চোখ খুলে দিলি। আমরা কী জানতাম? একসাথে মজা করতে পারি, ক্লাস বাংক করে সিনেমা দেখতে পারি, রাতে বারে মদ খেয়ে চূড়ান্ত বাওয়াল করতে পারি, ঝগড়া করতে পারি এমনকি মারপিটও করতে পারি। কিন্তু আমরা যে কেউ কাউকে এইভাবে ডিচ করতে পারি সেটা জানতাম না। সুস তুই কি এখনও এখানে বসে থাকবি? এই দিয়া ওকে তুলে নিয়ে আয়। ওদের ফুলশয্যাটা পুরো করতে দে।'

কথাগুলো বলতে আজও মৃত্তিকার গালদুটো রাগে লাল হয়ে গেছে।

-সেই থেকে আমাদের সঙ্গে, বিশেষ করে আমার সঙ্গে অরুণার কোনও সম্পর্কই নেই। দিয়ার সঙ্গে ছিল। তবে দিয়ার সঙ্গে তমালের কথা হত না।

-হুম। তার মানে অরুণা আর তমালের ওপর সুস্মিতা প্রতিশোধ নিতেই পারে। তাই তো?

মৃত্তিকা একটু ভেবে বলল, 'নিতে পারে। তবে সুস্মিতা তো এখন প্রিয়াংশুর সঙ্গে থাকে। ও আর নতুন কোনও ঝামেলায় জড়াবে না।

-নতুন কোনও মানে?

অজান্তে মুখ ফসকে কথাটা বলেই অস্বস্তিতে পড়ল মৃত্তিকা। শিবাঙ্গী প্রশ্নটা আবার করল। 'না না, নতুন মানে ওই যে ওদের ঝামেলা হয়েছিল তার পর আর কিছুতে জড়াবে না তাই বলছিলাম।'

-আমাদের কাছ থেকে কিছু লুকোলে আপনারই ক্ষতি মৃত্তিকা। ভুলে যাবেন না আপনার একটা বাচ্চা মেয়ে আছে।

মৃত্তিকা আবার চমকে উঠল। গলার ঘাম মুছে বলল, 'বললাম তো কিছু না ম্যাডাম।'

-আচ্ছা বেশ। বাদ দিন। আমায় একটা কথা বলুন, কলেজে থাকতে আপনাদের বিরুদ্ধে একটি ছেলে রেপ কেস আনে।' মৃত্তিকার এবারের চমকানোটা বেশ নজরে পড়ার মতো। 'মিথ্যে কথা। কিচ্ছু প্রমাণ হয়নি। আর প্লিজ শিবাঙ্গী ম্যাডাম, এটা আমার শ্বশুরবাড়ি এখানে এই কথাগুলো বলবেন না।' শিবাঙ্গীর খটকা লাগল। 'কেন বলুন তো? এখানে তো আপনি, আমি ছাড়া কেউ নেই। আপনার হাজব্যান্ডও নেই।'

-তবু।

-তার মানে আপনারও দোষ ছিল?

-না না তা কেন?

-নিশ্চয়ই তাই। নইলে লুকোতে চাইবেন কেন? আপনার স্বামী কিচ্ছু জানবেন না। নির্দ্বিধায় বলুন।

-কিচ্ছু বলার নেই ম্যাডাম, বিশ্বাস করুন।

-বিশ্বাস করার মত তো বলছেন না ম্যাডাম। আমাদের কাছে আপনাদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগের প্রমাণ আছে। সাক্ষীও আছে।

-সাক্ষী! কে?

-আপনাদের কলেজের প্রফেসররা। আর দিয়া।

-দিয়া!

-হুম। দিয়ার জবানবন্দি অনুযায়ী একটি ছেলে আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে

আপনারা জোর করে ছেলেটির সর্বনাশ করেছিলেন।

-মিথ্যে কথা। ছেলেটাকে তো আমরা চিনতামই না। ও তো...

এ কী বলে ফেলছে মৃত্তিকা! কথাগুলো গলার কাছে এসে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। শিবাঙ্গীও এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে চেপে ধরল, ও তো? ও তো কী? ছেলেটাকে যদি নাই চেনেন তাহলে কাকে চিনতেন? আপনি যদি না বলেন তাহলে কিন্তু আমরা আপনার স্বামীর সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলতে বাধ্য হব।'

-না। প্লিজ না।

হাত নেড়ে আতঙ্কিত মুখে বলে উঠল মৃত্তিকা।

'হেভেন অফ ফ্লাওয়ারস'-এর সামনে পুলিশ লেখা গাড়িটা এসে থামে। নন্দিনী খুব যত্ন করে এক ক্রেতাকে ফুলের বোকে তৈরি করে দিচ্ছিল। স্বয়ম্ভুকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে সে একটু থমকেই গেল। দোকানের ভিতরে বসে মোবাইল ঘাঁটছিল তর্পণা। স্বয়ম্ভুকে এগিয়ে আসতে দেখে তর্পণা তড়িঘড়ি এগিয়ে এল। স্বভাবতই ভুরুটা তার কুঁচকে আছে। একটা দোকানের সামনে যদি থেকে থেকেই পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়ায় তাহলে সেই দোকানের রেপুটেশন নিয়ে ক্রেতাদের মনে প্রশ্ন জাগে বৈকি। তর্পণা এগিয়ে এসে নন্দিনীর উদ্দেশ্যে বলে, 'তোর আর কতক্ষণ মা? এই তো কী সুন্দর হয়েছে!' বলে নন্দিনীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। নন্দিনী একবার তাকালও না। চুপচাপ নিজের কাজ করে গেল। লক্ষ্য করল স্বয়ম্ভু।

-আবার বিরক্ত করতে এলাম তর্পণা ম্যাডাম।

-না না, বিরক্ত কেন বলছেন? প্রয়োজন হলে একশোবার আসবেন। শুধু একটু অপেক্ষা করতে হবে। কাস্টমারকে আগে ছেড়ে দিই তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলছি।

-প্লিজ।

-আপনি ভেতরে আসুন, প্লিজ।

-থ্যাংক ইউ।

স্বয়ম্ভু দোকানের ভিতর ঢুকে এল। তর্পণা বিল করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দোকানের ভিতর ঢুকলেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আগেরদিনও মুগ্ধ হয়ে দোকানটাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করেছে স্বয়ম্ভু। গ্ল্যাডিওলাস, কার্নেশন, নানা রকমের অর্কিড, পিটুনিয়া, ক্যান্ডিটাফট, ক্রিসান্থেমাম সঙ্গে হরেকরকমের দেশি ফুলও রয়েছে। এরই মাঝে একটা প্যাকেট রাখা। প্যাকেটের গায়ে লোগো 'সুস্মিতা'স বুটিক'। আর তার মধ্যে একটা আলো জ্বলছে আর নিভছে। প্যাকেটের ওপর দিয়ে আলোর আভাটুকু দেখা যাচ্ছে। স্বয়ম্ভু বিলিং কাউন্টারের দিকে তাকাল। সেখানেও আরও একটি মোবাইল রাখা। যেটা হাতে নিয়ে তর্পণা একটু আগেই এগিয়ে এল। স্বয়ম্ভুর সামনে এক গ্লাস জল নিয়ে এসে দাঁড়াল নন্দিনী। বোবা মেয়েটার ভদ্রতায় যতটা মুগ্ধ হল স্বয়ম্ভু ঠিক ততটাই আশ্চর্য হল নন্দিনীর মুখের দিকে চেয়ে। এর আগেও নন্দিনীকে দেখেছে সে। একটু আগেও দেখেছে। কিন্তু এত কাছ থেকে দেখেনি।

কাস্টমারের বিল মিটিয়ে এগিয়ে এল তর্পণা। 'বলুন স্বয়ম্ভুবাবু, এবার কী একেবারে প্রমাণ সমেত এসেছেন যে আমিই অরুণার খুনি?' শেষ ঢোঁকটা গিলে জলের গ্লাসটা নন্দিনীর হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর তর্পণার দিকে সরাসরি ঘুরে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনার সঙ্গে তমালের শেষ কবে দেখা হয়েছে তর্পণা?' মুখের হাসিটা অক্ষুন্ন রেখেই উত্তর দিল, 'আবার সেই একই লোককে নিয়ে প্রশ্ন!

-দরকার আছে। সরাসরি উত্তর দিন।

-গতকাল।

স্বয়ম্ভু হোঁচট খেল। 'কোথায়?'

-ধর্মতলার সিটি লাইট ক্যাফেতে।

-কেন?

-ওই আমায় আসতে বলেছিল। বলতে পারেন, ঘ্যানঘ্যান করছিল। আমি দেখা করতে

চাইনি। ও আমায় আগের দিন থেকে অজস্রবার ফোন করে। আমি ধরিওনি। কিন্তু বাধ্য হই এক সময় ধরতে। তখনই রিকোয়েস্ট করে প্লিজ একবারটি এসো। আর কখনও ডাকব না, দেখাও করতে বলব না। একটিবার তোমাকে দেখতে চাই।

-এত কথা বলে?

-হ্যাঁ। যত বলি পুলিশ আমাদের সম্পর্কটাকে ভালো চোখে দেখছে না। অরুণার খুনের জন্য ঠারেঠোরে সবাই আমায় দায়ী করছে। প্লিজ তুমি সরে যাও আমার জীবন থেকে। সে কে শোনে কার কথা। খারাপও লাগে মানুষটার জন্য। ওর কালকের কথাগুলো কীরকম যেন লেগেছিল আমার।

-কীরকম?

-ওই মানুষ যখন সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চায় তখন যেরকমভাবে বলে সেরকমই। তখন আমিই বলি আমার সকালে ধর্মতলায় কাজ আছে। ওখানেই এসো।

-কী কথা হল?

-সেরকম কিছুই না স্বয়ম্ভুবাবু। ফোনে যা যা বলেছে সামনে দেখা হওয়াতে তাই তাই বলল। আমি উলটে বললাম, এর জন্য তুমি আমায় দেখা করতে বললে? তখন ও একটা কথা বলল জানেন, কথাটা খট করে বুকে এসে লাগল আমার।

-খুব শক্ত কোনও কথা?

-মানে?

-না মানে খট করে বুকে এসে লাগল বলছেন তাই বলছি।

খোঁচাটা হজম করেই উত্তর দিল তর্পণা, 'হ্যাঁ। শক্ত কথাই। আমায় বলল, ভালো থেকো। নিজের খেয়াল রেখো। আর হয়তো আমাদের কখনও দেখা হবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন? ও বলল, চাকরিটা আমার আর থাকবে না আমি জানি। তাই সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। আমি বললাম, কোথায়? ও বলল, ঠিক করিনি। আমি বুঝলাম, ও জানাতে চায় না। ব্যস এটুকুই।

-তারপর?

-ও চলে গেল। আমিও দোকানে চলে এলাম।

-আপনাদের মধ্যে কতক্ষণ কথা হয়?

-ম্যাক্সিমাম পনেরো মিনিট।

-প নে রো মিনিট? সে তো অনেকক্ষণ।

-হ্যাঁ, ও খুব মুষড়ে ছিল। একটু কোল্ড কফি অর্ডার করেছিলাম। সেটা খেতেই যতটুকু সময়। কিন্তু কেন বলুন তো?

-মাফ করবেন, আমাকে আপনার ফোনটা একটু নিয়ে যেতে হবে।

-সর্বনাশ। এ কী বলছেন? এটা অসম্ভব। আমার ব্যবসা চলবে কী করে? কারও সঙ্গে কন্ট্যাক্টই করতে পারব না তো।

-কেন?

-কেন মানে, আমার ওই একটাই ফোন। ওটা দিয়েই সব। আমি পারব না স্বয়ম্ভুবাবু। আপনি এক কাজ করুন না, আমি ফোনটা এখনই দিচ্ছি। যা চেক করার করে নিন। কোনও অসুবিধে নেই।

ডানহাতের তর্জনি দিয়ে ঠোঁটের পাশটা চুলকে নিল স্বয়ম্ভু। 'থাক লাগবে না। চলি। আর হ্যাঁ, গতকাল দুপুরে তমাল মারা গেছে।'

-হোয়াট?

-ও আপনি জানতেন না?

-না। কীভাবে জানব?

মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়ল তর্পণা। 'জানতাম, তমাল এই মানসিক যন্ত্রণা নিতে পারবে না। তাই আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর সঙ্গে দেখা করি, যাতে একটু হলেও ও শান্তি পায়।

কিন্তু ও সেই সুইসাইড করল! কেন তমাল কেন?'

দুচোখের কোল বেয়ে অনায়াসেই নেমে এল জলের ধারা। দোকানের এক কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে নন্দিনী। মুখে তার অসীম ভয়। স্বয়ম্ভুর চোখ এড়াল না সেটাও। গলা ঝেড়ে বলল, 'না তর্পণা, আত্মহত্যা নয়। খুন। জলে পটাশিয়াম সায়ানাইড।' তর্পণার সারা শরীর কেঁপে উঠল। আরও যেন ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'না না না, এ হতে পারে না। তমালকে কে খুন করবে?'

-সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। তবে আপাতত যেটুকু জানা গেছে সেটা হল, অজস্রবার ফোন করার পর যখন আপনি তমালের ফোনটা রিসিভ করেন তখন মিনিট দশেক নয়, মাত্র এক মিনিট চার সেকেন্ড কথা হয়। আর এখনকার সব ক্যাফেতেই সিসিটিভি বলে একটা বস্তু আছে। চলি। খুব শিগগিরি আবার দেখা হবে।' তর্পণা বসেই রইল। বোবা হয়ে। নন্দিনী ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল স্বয়ম্ভুর চলে যাওয়ার দিকে।

১৬

-তোমার কী মনে হচ্ছে শিবাঙ্গী? এই সব কিছুর পিছনে কে আছে? ওই ছেলেটি?

এক গ্রাস ভাত তুলল স্বয়ম্ভু। শিবাঙ্গী ততক্ষণে প্রথম গ্রাসটা গিলে পরের গ্রাস মুখে তুলতে যাচ্ছিল। স্বয়ম্ভুর প্রশ্ন শুনে হাতটা ভাত সমেত মুখের কাছে এনেও থেমে গেল। বলল, 'সম্ভাবনা তো তার দিকেই যাচ্ছে।' গ্রাস মুখে উঠল শিবাঙ্গীর। চিবোতে চিবোতেই বলল, 'ছেলেটা অভিযোগ করতে এল, নামটাও বলল। অথচ যে ভিক্টিম সে একটা নামও বলল না! কিন্তু সে নিশ্চয়ই ছেলেটিকে নামটা বলেছিল! নইলে কলেজে এতগুলো ছেলের মধ্যে সে খামোকা কেন প্রিয়াংশুর নাম করবে?

আরেকটু তরকারির অর্ডার করে স্বয়ম্ভু বলল, 'কে বলতে পারে, প্রিয়াংশু হয়তো এর মধ্যেই মেয়েটিকে কোনওভাবে ভয় দেখিয়ে দেয়। তাই সে একটা কথাও বলে না সবার সামনে।

-এতে তো মেয়েটির ভাইয়েরই অপমান হল।

-প্রিয়াংশুর খবরাখবর নাও। এদের দলটা একেবারে যন্তর দল ছিল। একটি লোক এসে আরও খানিকটা আলু-পোস্ত স্বয়ম্ভুকে দিয়ে গেল। 'আপনাকে কিছু দেব ম্যাডাম?' শিবাঙ্গী হাত নেড়ে না বলল। লোকটি চলে যেতেই শিবাঙ্গী জানাল, 'মৃত্তিকা বলল, ওই মেয়েটা একটু ন্যালাক্যাবলা মত ছিল। তাই সবাই ওকে বুলি করত।'

-ওটা ভালো ভাষায় বলেছে। আসল কথা হল র‍্যাগিং।

-আমারও সেটা সন্দেহ। তবে যারা মেয়েটির পিছনে লাগল তারা যেই বলল প্রিয়াংশু তোকে ভালোবাসে অমনি সে চলে গেল? নাকি এই চারবন্ধুই কোনও ফাঁদ পেতেছিল মেয়েটির জন্য?

-যদি পাতেও। সেদিনই কি সে রেপড হয়েছিল? যদি সেটাই হয় তাহলে নিশ্চয়ই মেয়েটি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিল। একটা রেপড মেয়ে তো হেসেখেলে ঘুরে বেড়াবে না। এদিকে দিয়া বলল মেয়েটি একাই থাকত একটা বাড়িতে। চালচলন ভালো ছিল না। তার মানে ধরে নেওয়া যায় প্রিয়াংশু সেই সুযোগই নিয়েছিল। আর মেয়েটাও সেই সুযোগ দিয়েছিল। তাহলে আর শেষে এসে এই নাটক কেন? সত্যিই কি পয়সা খ্যাঁচার ধান্দা? যদি এটাই উদ্দেশ্য হবে তাহলে আবারও সেই একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসছে, মেয়েটা সকলের সামনে প্রিয়াংশুর নাম স্বীকার করল না কেন?

মুহূর্তে চোখের সামনে একটা দৃশ্য চলকে ওঠে স্বয়ম্ভুর। সুস্মিতাকে যখন জেরা করছিল তখন উত্তেজিত হয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে উঠছিল, 'আমি তর্পণাকে লেলিয়ে দিইনি। বিলিভ মি। ওকে আমি সহ্যও করতে পারি না।' স্বয়ম্ভু জানতে চেয়েছিল, 'কাস্টমারকে সহ্য করতে পারেন না? অমনি প্রিয়াংশু ব্যাপারটা হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে সুস্মিতাকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছিল, 'কী পাগলের মতো বলছিস? স্যার, ওর মাথার ঠিক নেই। কী বলতে কী বলছে ও নিজেই জানে না। আমি বলছি ও খুন করেনি। করতে পারে না।'

-পাগলের মতো উনি কী বলছেন? তর্পণাকে যদি উনি লেলিয়ে নাই থাকেন তাহলে কেন সুস্মিতা তাকে সহ্য করতে পারেন না? বলুন বলুন।

সেদিন স্বয়ম্ভু তার প্রশ্নের উত্তর পায়নি। 'কিছু ভাবছেন স্যার?' শিবাঙ্গীর প্রশ্নে বাস্তবে ফেরে স্বয়ম্ভু। সম্বিত ফিরে বলে ওঠে, 'সুস্মিতা সবকিছু জানে। শিবাঙ্গী অবাক হয়ে বলল, 'সে তো হবেই। সুস্মিতা ওদের মধ্যেই একজন।'

-আহ! ও কথা বলছি না শিবাঙ্গী। ব্যাপারটা বোঝো।

এই রে, হঠাৎ ক্ষেপে উঠল কেন? খুব সহজ কোনও ব্যাপার কী শিবাঙ্গী মিস করে গেল? স্বয়ম্ভু নিজেই বলল, 'এরপরেও আরও অনেক কিছু আছে। হয়তো এখনও চলছে। আর সেইসব কিছু সুস্মিতা জানে। ও সেদিন আমাদের মুখ ফসকে বলে ফেলছিল। প্রিয়াংশু চালাকি করে আটকে দিল।'

-কী স্যার?

-সেটাই তো জানতে হবে শিবাঙ্গী। সুস্মিতা কেন তর্পণাকে সহ্য করতে পারে না? আর সেটা বলাতে প্রিয়াংশু কেন চেপে দিতে চাইল? সুস্মিতা কি এর বাইরেও আরও কিছু বলতে চাইছিল, এই মেয়েটির কথা?

শিবাঙ্গীর মনে হঠাৎই একটা আলো ঝলসে উঠল। গলাটা বেশ উত্তেজিত শোনাল শিবাঙ্গীর, 'স্যার, অরুণার খুনের যা প্যাটার্ন তাতে ফরেন্সিক এক্সপার্ট ডক্টর তুহিনশুভ্র দাশগুপ্ত তো বলেইছেন এটা কোনও মেয়ের কাজ।'

-সেই ন্যালাক্যাবলা মেয়েটাই এত বছর ধরে নিজেকে তৈরি করে আজ এসেছে প্রতিশোধ নিতে, সেটাই বলতে চাইছ তো?

-হতে কী পারে না?

-অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু তাতেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। শ্রীদেবী যদি ফিরেই আসবে তাহলে প্রিয়াংশুকে আগে না মেরে অরুণাকে মারল কেন? সুস্মিতাকে ভয় দেখাল কেন? আমার বাড়িতে ওইসব পাঠাল কেন? দিয়া তো বলল এখনও কিছু পায়নি সে। মৃত্তিকাও তাই। এদিকে তমাল খুন হয়ে গেল। তাহলে কী এর মধ্যে...

বলতে বলতে সাংঘাতিক কিছুর সম্ভাবনায় নিজেই চুপ করে গেল স্বয়ম্ভু। বাকিটা শিবাঙ্গীই বলল, 'স্যার তমাল! এই জন্যে হয়তো সে সবার সামনে প্রিয়াংশুর নাম বলেনি। আসল কালপ্রিট তমাল ছিল।'

-সেটাই বা বলবে না কেন? শ্রীদেবীর ভাই, কী যেন নাম, শ্রীকুমার না রামকুমার, সেই বা প্রিয়াংশুর নাম বলবে কেন? রহস্যের জট ক্রমশ পাকিয়েই চলেছে শিবাঙ্গী। কীভাবে ছাড়াব জানি না। এদিকে আমি নিজেই এই কাজটা নিয়েছি। শ্রীদেবীর যদি একটা ভালো ছবি পাওয়া যেত!

-কলেজ থেকে দিতে পারল না?

-দিয়েছে। একটা জেরক্স করা পেজে সাদা-কালো ছবি। তাতেই মনে হল মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখেছিলাম। যদি আরেকটু ভালো কোনও ছবি পাওয়া যেত...

শিবাঙ্গী চুপ করে খেতে খেতে ভাবল। তারপর বলল, 'এত কিছুর পরেও একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না স্যার।'

-কী?

-এসবের মধ্যে বেড়াল আসছে কোথা থেকে?

ঝনঝন করে শিবাঙ্গীর ফোনটা বেজে উঠল। 'ব্যস, প্রতিদিন এই সময় মাকে ফোন করতেই হবে।' কলটা রিসিভ করেই শিবাঙ্গী বলতে শুরু করল, 'আমি খাচ্ছি। রান্না রিচ নয়। ভাত, ডাল, আলু পোস্ত আর চাটনি। মাছ নিইনি। তাই টাটকা না বাসি জানি না।' স্বয়ম্ভু চোখ তুলে তাকিয়ে হাসল মুচকি। আগের দিনের কথা মনে হতেই শিবাঙ্গীর সুরটা যেন একটু বেশিই নরম হয়ে গেল। 'বলছি মা, তুমি খেয়েছ?... আচ্ছা, আর প্রেশারের ওষুধটা?... মানে কেন?... শরীর খারাপ কেন হবে?... জিজ্ঞেস করতে পারি না?... আশ্চর্য তো। হ্যাঁ ঠিক আছে রাখো এখন। বাই।' ফোনটা রাখতেই স্বয়ম্ভু বলে উঠল, 'কাকিমার আর দোষ কী? সাত জন্মে যে মেয়ে খোঁজ নেয় না হঠাৎ করে খোঁজ করলে তো মায়ের মনেই হবে মেয়ের নির্ঘাত শরীর খারাপ হয়েছে।'

-হ্যাঁ সেই। কাজের সময়ে ফোনটা আমি একদম সহ্য করতে পারি না।

-এখন খাবার সময় শিবাঙ্গী।

কিছু বলতে গিয়েও কথা হারিয়ে ফেলল শিবাঙ্গী। মনে মনে গজরাল, মা যে কাকে পেটে ধরেছে বোঝা ভার!

-মনে মনে আমায় গাল পরে দেবে। এখন খাও।

এ কী রে বাবা! এ কী মনের কথাও শুনতে পায় নাকি? এই কথাগুলোও মনে মনে আওড়াল শিবাঙ্গী। কিন্তু উত্তরটা স্বয়ম্ভু মুখেই দিল, 'হ্যাঁ পাই পাই সব শুনতে পাই।' শিবাঙ্গীর

চক্ষু ছানাবড়া। এবার মনে মনেও কিছু বলতে গেলে খাবি খাচ্ছে সে। স্বয়ম্ভু বলল, ‘কাল দিয়ার জন্মদিন। সাউথ সিটিতে যে বার কাম রেস্টুরেন্ট আছে ওটা ভাড়া নিয়েছে ওর পার্টনার।'

-ইসস, গতকাল কিংবা আজকে করতে পারত।

এবার স্বয়ম্ভু ভেবলে গেল, ‘মানে? কাল জন্মদিন আর পার্টি করবে আজ? কেন?'

-কাল নাকি তেড়ে বৃষ্টি হবে।

চট করে মস্তিষ্কের মধ্যে কোনও চিন্তা যেন কামড় বসাল স্বয়ম্ভুর। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলটা নিয়ে কাকে যেন কল করল। ‘হ্যাঁ শোনো, কাল সুস্মিতার সিকিউরিটি বাড়িয়ে দিয়ো। এক চুলও যেন তোমাদের চোখের বাইরে না যায় সে। রাখছি।'

-কাল কী কিছু হতে পারে?

- যদি বৃষ্টি হয়।

শিবাঙ্গী একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপরেই বলে বসল, 'স্যার, আমাদের বলেছে?'

-কী?

-দিয়ার বার্থ ডে পার্টিতে?

স্বয়ম্ভূ কঠিন মুখে তাকাতেই চোখ নামিয়ে নিল শিবাঙ্গী। স্বয়ম্ভু বলল, “খালি খাই খাই খাই। কাল অনেক কাজ। সন্ধেবেলা কলেজস্ট্রিট যেতে হবে।'

-বই কিনবেন?

স্বয়ম্ভু চোখ উল্টে বলল, 'তোমার খিদে এখনও মেটেনি। এই কে আছিস আরও এক থালা ভাত দিয়ে যা তো শিবাঙ্গীকে।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, 'যাচ্ছি স্যার।'

-আরে! এটা কী হল? শিবাঙ্গী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইল স্বয়ম্ভুর দিকে।

কথা ছিল সকাল থেকে ঝেঁপে নামবে। কিন্তু নামেনি। দিয়া ভেবেছিল, যাক বাবা এ যাত্রায় জন্মদিনটা বাঁচিয়ে দিল। কিন্তু না, দুপুর গড়াতে না গড়াতেই আকাশ ঘোর কালো করে এল। হাওয়া বইল এলোপাথারি। দিয়া আর কিয়ারার মনে মেঘ। ক্রমে বৃষ্টি। সন্ধের মধ্যেই চারপাশ ঝাপসা। তাতে সাউথ সিটির বার কাম রেস্টুরেন্টের পার্টির জেল্লা কমেনি এতটুকু। বরং সময় যত এগিয়েছে ততই বেড়েছে রঙিন নেশার উল্লাস। আজ ব্লু হ্যায় পানি পানির সঙ্গে নীল রঙে মিশে গেছে লাল জমেছে দারুণ। দিয়া গিটার বাজিয়ে একের পর এক শিলাজিৎ, নচিকেতা, মোহিনের ঘোড়াগুলি ছুটিয়ে আবারও ফিরেছে ডিজে নাইটের ফর্মে। নাচের তালে টপাটপ খালি হচ্ছে গ্লাস। ভরে উঠছে আরও পেয়ালা। সঙ্গে কাবাব, ফ্রাই, তন্দুরির বন্যা। সুস্মিতা আসেনি। বিকেলে জানিয়েছে এই সময় ওর আসাটা সম্ভব নয়। পুলিশের নজর থাকলেও অদৃশ্য সেই ব্যক্তিটির নজর এখনও ওর ওপরেই আছে নাকি৷ মৃত্তিকা সেদিনই বলে দিয়েছে ও আসবে না। দিয়ার স্পেশাল রিকোয়েস্টে ডিজে বাজাচ্ছে বাংলা লোকসংগীত কিন্তু রিমিক্স ভার্সান। তাতেই উল্লাস জমে উঠেছে। রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাইরে বেড়েছে বৃষ্টির দাপট। যদিও তার কণামাত্র বার কাম রেস্টুরেন্টে পৌঁছচ্ছে না। হইহই যখন তুঙ্গে ঠিক তখনই লোকসংগীত বদলে শুরু হল 'আজ না ছোড়ুঙ্গা তুঝে দম দমা দম।' তাও কোনও প্রপার রেকর্ডিং নয়। একদল মেয়ে গাইছে। মাঝেমাঝে একজনের গলা পাওয়া যাচ্ছে। লাল-নীল-হলুদ আলোয় সাপের মতো হিলহিলে শরীর নিয়ে নেচে চলা ছেলেমেয়েগুলো আচমকাই ভড়কে গিয়ে থেমে গেল। এ আবার কী! বাজনা নেই, কিছু নেই। কারা গাইছে। শুরুতে সবাই ভেবেছিল প্ল্যাটফর্মটায় উঠে কারা বোধহয় গাইছে। কিন্তু সেখানেও ফাঁকা। নেশাতুর দিয়া হেঁচকি তুলে চমকে ওঠে। কিয়ারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঢুলুঢুলু চোখে দিয়ার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে থাকে। কে একজন বলে উঠল, ‘ইয়ে বিল্লি কাঁহা সে আ গয়ে?' সবাই তখন নিজেদের মধ্যে জল্পনা শুরু করে দিয়েছে। মেয়েগুলোর গানের সঙ্গে একটা বেড়ালের মিহি গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। শব্দ নয়, আর্তনাদ। কেউ যেন অডিওতে রিভার্ব লাগিয়ে আরও জোরে বাজিয়ে দিয়েছে গান আর বেড়ালের ডাকটাকে। দিয়া চিৎকার করে ওঠে ডিজের দিকে

তাকিয়ে। 'হোয়াট দ্য ফাক? এসব কী বাজাচ্ছ?' কিয়ারা বলে উঠল, 'কাকে বলছিস? ডিজে যে বাজাচ্ছিল সে কই?' অন্য আরেক দিশি মোরগের বিদেশি মুরগি বলে ওঠে, 'হোয়্যার ইজ দ্য গাই?' মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল ডিজে ছেলেটিকে। হন্তদন্ত হয়ে ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিয়ারা জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় ছিলে তুমি? এসব কী বাজছে? যতসব রাবিশ!' ব্রাউন চুলে স্পাইক করা ছেলেটি ঘাবড়ে গিয়ে ক্ষমা চায়। বলে জানি না এসব কীভাবে হল। এই গান তো ওর কালেকশনেই ছিল না। কে দিল? টলতে টলতে তেড়ে এল দিয়া। 'কে চালাল সে কী আমরা জানব? তুমি কোথায় ছিলে? তুমি ছাড়া আর কে চালাবে?' কিয়ারা দিয়াকে সামলায়। দিয়া এত টলছে ঠিক মত কথাও বেরোচ্ছে না। ডিজে ছেলেটি বলল, 'আসলে ম্যাম, আপনাদের মধ্যেই কোনও গেস্ট এসে গান বাজাবে বললো। আমি সব দেখিয়ে দিলাম। এখানে সবাই এরকম এসে নিজের মত গান বাজায়। ওনাকে দিয়ে আমি একটু ওয়াশরুমে গিয়েছিলাম। সরি ম্যাম, আমি এক্ষুনি অন্য গান....।

-ওয়েট ওয়েট ওয়েট। গেস্ট? কে? কী নাম?

হাঁফাতে হাঁফাতে প্রশ্ন করল দিয়া। কিয়ারা বুঝতে পারছে না দিয়া কেন এত টেনশন করছে! বেড়ালের আওয়াজ আছে বলেই কী দিয়া এত ক্ষেপে গেল? আর সত্যিই তো, এই গানের রেকর্ড কার? ছেলেটি বলল, 'আমি চিনি না ম্যাম। এখানে তো সব আপনাদেরই গেস্ট। তাই ভাবলাম...!'

নাহ, গেস্টদের মধ্যে কেউ নেই যে এই গানটি বাজিয়েছে। আবার গান বেজে উঠল। দিয়া ড্রিংক্সের গ্লাস হাতে কাউন্টারে ফিরে এল। চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মাথা কাজ করছে না। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। পাশ থেকে কিয়ারা বলছে কিছু। অনেকক্ষণ ধরে কিয়ারার মুখের কাছে মুখ নিয়ে, কান এগিয়ে দিয়ে শুনতে ও বুঝতে চেষ্টা করল দিয়া। কিন্তু কিয়ারার একটা কথাও বুঝতে পারল না। মিউজিকটা বেশ জোরে লাগছে। গা-টা শিরশির করে উঠছে। ভিতর থেকে ভীষণ ভয় করছে দিয়ার। প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ার অবস্থা। এর মধ্যেও দিয়া বুঝতে পারছে ওর চারপাশে কেউ একজন আছে যে ওর সব গতিবিধি লক্ষ্য করছে। টকটকে লাল চোখে ভিড়ের মাঝেই কতবার দেখার চেষ্টা করল, খোঁজার চেষ্টা করল লোকটাকে। মাঝে মাঝে কারও একটা ঝাপসা অবয়ব দেখতে পাচ্ছে। সে একভাবে দিয়ার দিকে চেয়ে রয়েছে। হাতে মদের গ্লাস নিয়েই টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে সেই অদৃশ্য মানুষটার দিকে। কিন্তু কোথায় কে? অচেনা তো কেউ নেই। সবাই ওর পরিচিত। চেনা। কিয়ারা কী করবে বুঝতে পারছে না। দিয়াকে সামলাবার জন্য তার পিছু পিছু ঘুরছে। এত মদ দিয়া কোনওদিন খায়নি। আজই বা কখন খেল? হঠাৎ কী হল তার?

-এই শালা বৃষ্টিটা পুরো তছনছ করে দিল সব। কলেজস্ট্রিট একদম ভাসছে। গাড়িতে আসতে আসতে নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠল স্বয়ম্ভু। শিবাঙ্গী অমনি বলল, 'কালকেই তো বলেছিলাম স্যার, আজ হেব্বি বৃষ্টি হবে।'

-হুম। আসলে আবহাওয়া দপ্তরের ভবিষ্যতবাণী যে এইভাবে মিলে যাবে ভাবতে পারিনি।

মুখ টিপে হাসল শিবাঙ্গী। ড্রাইভার তপন জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, ডানদিকে গলির মধ্যে নিয়ে নেব? নইলে সামনে প্রচুর জ্যাম পাব।'

-রাত এগারোটার সময়েও জ্যাম থাকবে বলছ?

-হ্যাঁ স্যার। এদিকেই তো থাকি। এইসব রাস্তার যা অবস্থা হয় কী বলব আপনাকে। তার ওপর বৃষ্টি পড়েছে।

একটানা কথাগুলো বলে গেল ড্রাইভার তপন। স্বয়ম্ভু জিজ্ঞেস করল, 'উঠবে কোথা দিয়ে?'

-সুরি-লেন দিয়ে উঠে মৌলালি ধরে নেব।

-তাই করো।

স্বয়ম্ভুর মুখ থেকে কথা খসতেই গাড়িটা ডানদিকে বেঁকে সরু গলিতে সেঁধিয়ে গেল।

-কাল বৃষ্টি থামলে আবার কী আসবেন?

শিবাঙ্গী জিজ্ঞেস করল।

-আসতে তো হবেই। এখনও অনেক প্রকাশনা বাকি আছে। খুঁজে বের করতেই হবে ওই পাতাটা কোন বইয়ের। দরকার পড়লে প্রেসগুলোতে ঢু মারব।

-আচ্ছা স্যার, তমালের বাড়িতে আর কোনও ক্লু পাওয়া যায়নি?

-নাহ! সেরকম কিছু নেই। অপরাধী হাতে গ্লাভস পরে কাজ সেরেছে।

এমনকি জুতোটা খুলে ঘরে ঢুকেছে। ঘরে জুতোর ছাপ পর্যন্ত নেই।

গাড়িটা ঝপাস করে একটা বড়সড় গর্তের মধ্যে কাত হয়ে পড়েই সোজা হয়ে গেল। মুড়ির টিনের মতো গাড়ির মধ্যের লোকগুলো এধার ওধার হয়ে গেল। স্বয়ম্ভু মজার ছলেই প্রশ্ন করল, ‘বাবা তপন, অদ্যই কি আমাদের শেষ রজনি?' তপন হাসল। লাজুক স্বরে বলল, 'ভেরি সরি স্যার, বুঝতে পারিনি।'

-ঠিক আছে

-ঠিক আছে চলো।

গাড়িটা খানিকটা এগোতেই ড্রাইভার গাড়িটা স্লো করে দিল। তপন গজরাল, ‘ধ্যাত, এত রাতে এই গলিতেও গাড়ি!' স্বয়ম্ভু সামনে তাকিয়ে দেখল একটি সাদা গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ির দরজাটা খোলা। একটি বিশাল নীল রঙের মোটা প্লাস্টিক সেই খোলা দরজার ভিতর থেকে ঢাকা দেওয়া।

তার ভিতরে মানুষ আছে। নড়াচড়া করছে। কিছু নামাচ্ছে গাড়ি থেকে শিবাঙ্গী বলে উঠল, ‘বাবা! এত রাতে কী করছে এখানে?' সাদা গাড়িটার পিছনে গিয়ে হর্ন দিল তপন। প্লাস্টিকের ভিতর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল খানিকক্ষণের জন্য। তারপর প্লাস্টিকের আড়াল থেকে যে মুখটা বেরিয়ে এল সেটা দেখে গাড়ির কাচটা আরেকটু বেশি করে নামিয়ে দিল স্বয়ম্ভু। ‘ঠাকুরমশাই আপনি? এত রাতে?' মাথায় ছাওয়া প্লাস্টিকটা একটা সরু গলির ভিতর ঢোকানো। সরু মানে খুবই সরু। একটা মানুষই যেতে পারে। আগেকার দিনের পাশাপাশি বাড়ি। নিয়ম মেপে জায়গা ছাড়ার ধারধারেনি। উত্তর কোলকাতার বাড়িগুলোর একটা ছাদ থেকে আরেকজনের বাড়ির ছাদে অনায়াসেই লাফিয়ে যে কেউ চলে যেতে পারে এতটাই গায়ে গায়ে বানানো। খুব সন্তর্পণে কিছু একটা বাঁচিয়ে প্লাস্টিকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন মিশ্রঠাকুর। অন্য কেউ প্লাস্টিকটা আড়াল থেকে ধরে রইল। কালো ছাতার নীচ থেকে মুখ বাড়িয়ে মিশ্রঠাকুর বললেন, 'আমি সেদিনই বুঝেছিলাম স্যার যে আপনারা পুলিশ। খামোকা মিথ্যে বললেন ব্রাহ্মণকে।' এসেই ঠুকে দিল। স্বয়ম্ভু কান এঁটো করা হাসি হেসে বলল, ‘সে তো বুঝলাম, কিন্তু আপনি এত রাতে এখানে গাড়ি থেকে কী নামাচ্ছেন?’

-কাপড়ের গাঁঠরি।

-আপনি কী কাপড়ের ব্যবসাও করেন নাকি?

-না স্যার। এই বয়সে আর অত ধকল সয় না। আমার ভাগ্নেটি করে। কলেজস্ট্রিটের একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করে। বলেছিলাম বোধহয়। রাতে গোডাউন থেকে গাঁঠরি তুলে আনতে হয় ওকে। আবার সকালে নিয়ে যায়। কখনও বেশ কিছু মাল দোকান থেকে এখানে এনে রাখে। গোডাউনের লোক এসে নিয়ে যায়।

-অ।

-দোকানের লোকগুলো এত চামার কী বলব স্যার, একটা এক্সট্রা লোক পাঠায় না জানেন। ওই একা আমার ভাগ্নের ঘাড়ে সব ফেলে দেয়। তাই আমি গাড়ি থেকে নামাতে হাত লাগাই। মাল ভিজে গেলে তো আবার ভাগ্নেকেই খেসারত দিতে হবে। তাই আমি এই প্লাস্টিক ধরে থাকি আর তিরু মাল নামায়।

-তিরু! ও আপনার ভাগ্নে?

-হ্যাঁ স্যার।

-আমরা হেল্প করি?

-এ মা! না না স্যার। আমাদের অভ্যেস আছে। আপনারা যদি একটু গাড়িটা নিয়ে এগিয়ে যান সুবিধে হয়। আসলে গাড়ি থেকে গাঁঠরি নামানোর সময় যদি জলের ছিটে লাগে তাহলে বেশ সমস্যায় পড়তে হবে। যা জল জমেছে। আপনারা বেরিয়ে গেলে আমরা এটা নামাব তাহলে।

-আচ্ছা, আচ্ছা। তপন চলো।

-থ্যাংক ইউ স্যার।

স্বয়ম্ভু একটু হেসে জানলার কাচটা তুলতে লাগল। তপন গাড়িটাকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। শিবাঙ্গীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা কথা। 'ও হো, আপনাকে তো বলতেই ভুলে গেছি।' স্বয়ম্ভু তাকাল। শিবাঙ্গী বলল, 'গতকাল যখন মৃত্তিকার বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি তখন দেখি এই পুরোহিত ঢুকছে।' স্বয়ম্ভুর চোখে প্রশ্ন।

-মৃত্তিকা বললেন ওনাদের মেয়ের অন্নপ্রাশন এই মিশ্রঠাকুরই নাকি করবে।

-বাবা! এই ঠাকুরের খ্যাতি তো দেখছি সুদূরপ্রসারী।

শিবাঙ্গী হাসতে হাসতে বলল, 'আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো তাকালেন।'

-সেটাই তো স্বাভাবিক। পুলিশকে নিয়ে বেশ ভীতি আছে ভদ্রলোকের। উলটোদিক থেকে ফুল স্পিডে একটা বাইক ছুটে এল হঠাৎ। সাঁআআআ করে ঝড়ের গতিতে স্বয়ম্ভুদের গাড়িকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। জমা জল ছ্যারররর করে ছিটিয়ে দিয়ে গেল গাড়ির গায়ে। গাড়িতে নয়, ওই নোংরা জল এসে যেন তপনের গায়ে লাগল। একেবারে খ্যাঁকখ্যাঁক করে তেড়ে উঠল। জানলার কাচ নামিয়ে তৈরি হচ্ছিল আচ্ছা করে দেবে বলে। স্বয়ম্ভু নিষেধ করল, 'আহ তপন ছাড়। রাত এগারোটার সময় আর কোঁদল করে কাজ নেই।'

-গাড়িটার কী অবস্থা করল বলেন তো স্যার।

-ঠিক আছে। কী আর করবে! উড়নচণ্ডীদের নিয়েই তো আমাদের সংসার। শান্ত মাথায় চলো।

এক হাত দূরের বস্তুকেও অদৃশ্য লাগছে এমন বৃষ্টি। অঝোর বৃষ্টির গা ছুঁয়ে ছড়িয়ে পড়া রাস্তার আলোগুলো তিলোত্তমার বুকে যেন এক গভীর রহস্যের জাল বিছিয়ে রেখেছে।

১৭

'দোলে কৃষ্ণ মেঘের ওই সৌদামিনী / হিন্দোলে দেয় দোল ব্রজগোপিনী'। নির্ঝঞ্ঝাট বাড়িটার সকালগুলো প্রতিদিনই এই গানের সুরে মোহিত হয়ে থাকে। হাতের ধূপটা ইতিমধ্যেই পাশাপাশি দুটো ঘর ঘুরে ফেলেছে। 'বাজায় নূপুর নাচে ময়ূরী ময়ূর / যমুনা উজান বয় ভরা শাওনে।' অপর্ণা দেবী সকাল হতেই উঠে পড়েন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ঘুম থেকে উঠেই স্নান সেরে নেন।

বাড়িতে গোপাল আছে তাঁর। 'কুসুম দোলায় দোলে শ্যামরায় / তমালশাখে দোলা ঝোলে' মেয়ের ঘরে ঢুকতেই গান থেমে গেল। গজগজ করলেন, 'এত বড় মেয়ে হল তবু শোয়ার ঠিক নেই।' বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মেয়ে। হাঁটুর ওপরে উঠে গেছে লং স্কার্ট। অপর্ণা স্কার্টটা টেনে ঠিক করে দিল। একটু নড়ে উঠল শিবাঙ্গী। পাশের বালিশটাকে টেনে মুখটাকে গুঁজে দিল। অপর্ণা আবারও গান গাইতে গাইতে ধূপ ঘোরাতে থাকলেন। দেয়ালে ঝোলানো একটাই ঠাকুরের ছবি, মা ভবতারিণীর। সেখানে ধূপ ঘুরিয়ে ঘরের কোণে কাপড় চাপা হারমোনিয়ামটার সামনেও ধূপ দেখালেন অপর্ণা। ঘরের দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সাদা পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে ফেলেছেন শেখরবাবু। অপর্ণা বললেন, 'আজকেও বাজার যাবে?' পাঞ্জাবিটা ভালো করে গায়ে চড়িয়ে বললেন, 'বাজার না করি দুধটা তো আনতে হবে। কাল কখন ফিরল মেয়ে?'

-রাত দেড়টা।

মুখে একটা পুচ করে শব্দ করে বললেন, 'এরকম করলে শরীর থাকবে? একটা আঠাশ বছরের মেয়ে সারাদিন খালি চোর ডাকাতের পেছন পেছন ছুটে মরছে।' অপর্ণা গুনগুন করে আবার গান ধরলেন। পরক্ষণেই থামিয়ে বললেন, 'ও শোনো, গোপালের নকুলদানা ফুরিয়ে গেছে। মনে করে এনো।

-হুম।

শেখর বেরোলেন। পিছন পিছন অপর্ণাও বাইরে বেরিয়ে এলেন। সিঁড়ির পাশ দিয়ে বেরিয়েই তুলসীমঞ্চ। সেটাকে ডানদিকে ফেলে পাঁচিল দেওয়া সরু প্যাসেজটা ছোট লোহার গেট পর্যন্ত চলে গেছে। শেখরবাবু গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। অপর্ণা তুলসী মঞ্চে ধূপ ঘোরাতে থাকেন। ওদিকে ছাতা খুললেন শেখর। অপর্ণা দেখলেন, পাঁচিলের ভিতর উঁকিঝুঁকি মেরে শেখরবাবু কী যেন দেখছেন। 'কী গো, কী দেখছ?'

-এটা কীসের বস্তা গো?

-বস্তা?

অবাক হলেন অপর্ণা। এগিয়ে গেলেন। রাস্তার পাশেই এ বাড়ির পাঁচিল। পাঁচিলের এপারে বাড়ির দেয়ালের মাঝে আরেকটা সরু প্যাসেজ। এখানে ফুল গাছ রাখা। অপর্ণা গলা তুলে বললেন, 'এ কী কাণ্ড! আমার ফুলের টব ভেঙে গেছে তো। এটা কীসের বস্তা? কে ফেলল?"

-দেখি ছাতাটা ধর তো।

শেখরবাবুর হাত থেকে অপর্ণা ছাতাটা নিলেন। শেখর বস্তার কাছে গিয়ে টেনে তুলতে চেষ্টা করলেন, 'বাবা রে, বেশ ভারী তো গো।'

-তুলতে যেও না। কাঁধে লাগবে তোমার।

-আরে তুলতে তো হবে নইলে দেখবেটা কে? কীসের বস্তা? কে ফেলল? মধুসূদন কিছু রেখে যায়নি তো?

-না তো। ও আর কী রাখবে? রাখার মধ্যে গাছের সার রাখে। সে তো সিঁড়ির নীচে রেখে যায়। বস্তাটার এপাশ ওপাশ দেখে শেখর মুখের বাঁধন খোলার চেষ্টা করলেন। একটু জোর খাটাতেই খুলে গেল। বস্তার মুখটা ফাঁক করতেই আঁতকে উঠে চার পা পিছিয়ে এসে টাল খেয়ে গেলেন। দমটা বন্ধ হয়ে যাবার আগে যেরকম শব্দ বেরিয়ে আসে শেষ হিক্কা ওঠার মত, সেরকমই একটা শব্দ বেরিয়ে এল শেখরবাবুর মুখ দিয়ে। 'কী গো কী হল তোমার?' অপর্ণার গলায় উৎকণ্ঠা। শেখরবাবুর দু-চোখ বিস্ফারিত। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছেন। অপর্ণা

এগিয়ে যায়, 'দেখি কী আছে।' শেখরবাবু বাধা দেন, 'না না অপর্ণা তুমি দেখো না। সহ্য করতে পারবে না।'

-মানে? কেন কী আছে ওতে। আমি দেখবই।

-অপর্ণাআআআআ...

স্বামীর বারণ না শুনে বস্তার মুখ ফাঁক করতেই গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে আসে অপর্ণার। বস্তার মধ্যে থেকে ওপরের দিকে চেয়ে থাকা রক্তাক্ত এক মেয়ের মুখ। জিভটা ঠোঁটের বাইরে বেরিয়ে এসেছে খানিকটা। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আছে। সারা গায়ে রক্ত মাখা। বস্তার ভিতর দিকে শরীরটা কেউ যেন কোনওরকমের ঠেলে দুমড়ে মুচড়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে। দুটো হাঁটু ওপরের দিকে উঠে আছে। চোখ অন্ধকার হয়ে আসে অপর্ণার। চিৎকার শুনে পাশের বাড়ি থেকে উঁকি দিয়েছে। পথ চলতি দুয়েকজন পাঁচিলের ওপারে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অপর্ণাকে নিয়ে শেখর কোনওক্রমে ভিতরে ঢুকতে যাবে, দেখল শিবাঙ্গী বেরিয়ে আসছে। 'মা তুমি কী চিৎকার করলে?'' ঘুমের ঘোরে ঠাওর করতে পারেনি ঠিক কে চিৎকার করল। অপর্ণা হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মেয়ের বুকে লুটিয়ে পড়লেন। শেখর থরথর করে কাঁপছেন।

ম্যুর এভিনিউয়ে এখন থমথমে নিস্তব্ধতা। চোরা আতঙ্ক চারিয়ে গেছে বাজারে, দোকানে, বাড়িতে বাড়িতে। একটা ক্যাব ধরে ঝড়ের গতিতে ছুটে এসেছে স্বয়ম্ভু। ততক্ষণে পুলিশের লোকজন ঘিরে ফেলেছে বাড়িটাকে। কেউ কেউ চিৎকার করে জায়গাটাকে ফাঁকা করতে বলছে। বস্তাটা টেনে রাস্তায় বের করা হয়েছে। বড় কাঁচি চালিয়ে বস্তা কাটা হল। পুরোটা খুলে যেতেই ক্ষতবিক্ষত লাশটা হাত-পা ছড়িয়ে নেতিয়ে পড়ে রইল রাস্তায়। লোকজন ঘেন্নায় চোখ কোঁচকাল। নাকে রুমাল দিল কেউ কেউ। কাটা, ছেঁড়া, থ্যাতলানো অস্থিমজ্জার ওপর চাবড়া চাবড়া রক্তের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে কিছু রক্ত ধুয়ে পিচের রাস্তাকে লাল করে দিচ্ছে। স্বয়ম্ভু চোখে হাত চাপা দিল। দুপাশে মাথা নাড়ল নিজের মনে। তারপর আঙুলের ফাঁক দিয়ে লাশের পায়ের দিকে তাকাল। দুপায়েরই চারটে করে আঙুল কাটা।



ডানপায়ের নীচে এবারেও ধারাল কিছু দিয়ে খুনি এঁকেছে। অর্ধেক গোল মতন রেখা। গোলের নীচের দিকটা একটু ছুঁচলো। কারও মুখ আঁকতে গেলে যেরকমভাবে প্রথমে মুখাবয়বের রেখা টানা হয় ঠিক সেরকম। কার মুখ আঁকতে চাইছে খুনি? আদৌ কি মুখ নাকি অন্য কিছু? শিবাঙ্গী হতভম্ব হয়ে সিনিয়ারের দিকে তাকাল। বলল, 'স্যার, এটা তো...' আর কিছু বলার আগেই স্বয়ম্ভু মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে বলল, "এত পুলিশ প্রোটেকশন থাকা সত্ত্বেও বাঁচাতে পারলাম না?'

-হুমকি তো সুস্মিতাকে দিয়েছিল।

-ওটাই তো চালাকি শিবাঙ্গী। পাক্কা খেলোয়াড়ের মতো খুনি আমাদের নাকের ওপর তুড়ি মেরে বেরিয়ে গেল।

-বেচারি। যেদিন জন্ম, সেদিনই....

কোনও গোয়েন্দার সহকারী নয়, এক সাধারণ মানুষের মত বুকের ভেতর গুমরে ওঠা কথাটা উগরে দিল শিবাঙ্গী। ভিতর থেকে ও দুর্বল হয়ে পড়ছে? স্থানীয় পুলিশ অফিসারকে এ পাড়ায় সিসিটিভির কথা জিজ্ঞেস করল স্বয়ম্ভু।

-না স্যার, এখানকার পাড়াগুলোতে সিসিটিভি নেই। মেন রোড থেকে একটু ভেতর দিকে তো। তাই...

-এবার থেকে এখানেও সিসিটিভি লাগাবার ব্যবস্থা করুন।

-শিওর স্যার।

হঠাৎ কোথা থেকে মৌমাছির ঝাঁকের মতো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চলে এল বেশ কিছু মিডিয়া। যে যার নিজের মতো ভাষণ দিতে শুরু করল। 'এই এখান থেকে তাড়াতাড়ি বড়ি সরাবার ব্যবস্থা কর।' বিরক্ত হয়ে পুলিশের গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল স্বয়ম্ভু। ড্রাইভার তপন গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছে। শিবাঙ্গীও স্বয়ম্ভুর পাশে এসে দাঁড়াল। 'কাকু-কাকিমার কী অবস্থা?' স্বয়ম্ভু জিজ্ঞেস করল।

-প্রচণ্ড ট্রমাটাইজড। মা তো সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিল। বাবা তাও শক্ত। -স্বাভাবিক। তুমি আজ কোথাও যেও না। ওনাদের সঙ্গে থাকো। আমি এ পাশটা দেখে নিচ্ছি।

-কী বলছেন স্যার? আমি থাকব না?

স্বয়ম্ভূ তাকাল। বসের মতো নয়। অভিভাবকের মতো। বলল, 'শিবাঙ্গী, জীবনে এর চেয়েও অনেক বেশি রোমাঞ্চময় কেস পাবে। কিন্তু আজ কাকুকাকিমার কিছু হয়ে গেলে সারা জীবন আফসোস করে কূলকিনারা পাবে না। যদি কোনও দরকার হয় আমি কল করে নেব।'

কথাগুলোর মধ্যে অদ্ভুত একটা অভিভাবকত্ব খুঁজে পেল শিবাঙ্গী। শান্ত অথচ কঠোর আদেশ। আর আপত্তি করল না। স্বয়ম্ভুর কথাগুলোই নতমস্তকে মেনে নিল সে। 'আর শোনো' ডাকল স্বয়ম্ভু।

-হ্যাঁ স্যার।

-দিয়ার কোনও আত্মীয়ের খোঁজ জানো? ওর তো একজন বন্ধু ছিল। কী যেন নামটা!

-কিয়ারা। দিয়ার পার্টনার।

স্বয়ম্ভু একটু থমকে শিবাঙ্গীর দিকে চেয়ে রইল। 'পার্টনার!'

-হ্যাঁ স্যার।

-ও। তা তার নম্বর কিছু?

-না স্যার। তবে আমি ডিরেক্ট লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি দিয়ার ফ্ল্যাটে। সেও নিশ্চয়ই এতক্ষণে খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করেছে।

-উঁহু। করেনি। করলে আমার কাছে খবর আসত। ওদের লোকাল থানায় আমার বলা আছে।

হঠাৎ দুজন মিডিয়ার লোক ধেয়ে এল স্বয়ম্ভুর দিকে। 'স্যার স্যার, আপনি এই কেসটার তদন্ত করছেন তো? কী বুঝছেন? কে বা কারা করছে?" মেয়েটির কথা শেষ হতে না হতেই

ছেলেটির প্রশ্ন, 'এটা কি সিরিয়াল কিলিং? নাকি পার্সোনাল কোনও রিভেঞ্জ?' সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ম্ভুর জিভ তীক্ষ্ণ বর্শার মতো আছড়ে পড়ল, 'উইথ আউট এনি রিজন কি সিরিয়াল কিলিং হয়? এক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই আছে যদি না খুনি উন্মাদ হয়ে থাকে তো। তবে সেটা পার্সোনাল রিভেঞ্জ কিনা এখুনি বলা সম্ভব নয়। তদন্ত চলছে।' এরপরে প্রথম মেয়েটির উদ্দেশে বলল, 'আর আপনি যে যে প্রশ্ন করলেন সেগুলোর উত্তর পেয়ে গেলে বোধহয় এই খুনটা হত না।' আবার ছেলেটি প্রশ্ন করল, 'গোয়েন্দার বাড়িতে ভিক্টিমের পায়ের কাটা আঙুল আর গোয়েন্দার সহকারীর বাড়িতে আস্ত একটা লাশ! খুনি কী শুধু ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টকে চ্যালেঞ্জ দিতেই চাইছে নাকি খুনির আসল রাগ আপনাদের ওপর? যাতে খুন হচ্ছে সাধারণ মানুষ?''

-তদন্ত সাপেক্ষ। এখন কিচ্ছু বলা যাচ্ছে না। প্লিজ আর কোনও প্রশ্ন নয়। প্লিজ। আরও কয়েকজনকে এগিয়ে আসতে দেখেই গাড়িতে উঠে গেল স্বয়ম্ভু। শিবাঙ্গীকে ঘরে যেতে বলল।

গাড়িটা ছাড়তে না ছাড়তেই ফোন বেজে উঠল। অজানা নম্বর। স্বয়ম্ভু ফোনটা ধরল। কিছুক্ষণ চুপ করে সব শুনল। তারপর বলল, 'আমি এখুনি আসছি।' ফোনটা কেটেই শিবাঙ্গীকে কল করে জানায়, 'কিয়ারা ড্যাফোডিলে ভর্তি। পুলিশ কাল মাঝরাতে কিয়ারাকে একটা ফুটপাথ থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে। মেরে পা ভেঙে দিয়েছে। আমি সেখানেই যাচ্ছি। এরপর কী হয় আমি জানাব তোমায়। ছাড়লাম।'

নার্সিংহোমে গিয়ে স্বয়ম্ভু শুনল কিয়ারাকে ওটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেরে পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে তার। মালাইচাকি ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেছে। 'পেলেন কোথা থেকে?' পুলিশ অফিসারকে প্রশ্ন করল স্বয়ম্ভু।

-ট্যাংরার কাছে একটা জায়গায়। ফুটপাথে পড়েছিল।

-তারপর?

-রেসকিউ যখন করি তখন কোনও জ্ঞান ছিল না। অত বৃষ্টির জল মুখে পড়েও যখন জ্ঞান ফেরেনি তখন আর সময় নষ্ট না করে আমরা নার্সিং হোমে নিয়ে আসি। পকেটে যে পার্স ছিল সেখানে আধার কার্ডে ওনার নাম জানতে পারি কিয়ারা ঘোষ। এদিকে ফোনটাও নেই। তারপর যখন জ্ঞান ফেরে তখন প্রচণ্ড চিৎকার করতে থাকে যন্ত্রণায়। ডক্টর বলেন ওনার পায়ের অবস্থার কথা। ইমিডিয়েট অপারেট করতে হবে। এতো পেন হয় যে উনি আবার সেন্সলেস হয়ে যান। শুধু একটাই কথা বলতে পেরেছিলেন।

-কী কথা?

-আপনার নাম। দু'বার বলেছেন।

-বুঝেছি। কতক্ষণ লাগবে অপারেশন?

বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। তবে আকাশের যা হাল আবার ঢালবে। নার্সিং হোমের বাইরে এসে মুখ নিচু করে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল স্বয়ম্ভু। বারবার নিজেকেই দোষী বলে মনে হচ্ছে। নিজেই কাজের দায়িত্ব নিয়ে গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ব্যর্থ প্রমাণ করছে স্বয়ম্ভু। এবার লোকে বলতে শুরু করেছে যেখানে গোয়েন্দাকেই বারবার একটা সমাজ বিরোধীর থ্রেটের মুখে পড়তে হয় সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?

-একদম ভুল স্যার। এসব কী আর আপনার হাতে? তাছাড়া যারা প্রশাসনিক বিভাগে কাজ করেন তারা কি অসাধারণ মানুষ?

শিবাঙ্গী সঙ্গে থাকলে কথাগুলো এইভাবেই সে বলত। এই সময় বড্ড দরকার ছিল শিবাঙ্গীকে। স্বয়ম্ভূ আজ অব্দি যেখানে গেছে শিবাঙ্গী ছিল তার ছায়া। তার ভরসা। কখনও তার সান্ত্বনাও। আচ্ছা, এইসব কথা এখন কেন মনে হচ্ছে স্বয়ম্ভূর? পাশে নেই বলে কী শিবাঙ্গীকে মিস করছে সে? চট করে আরও একটা বিষয় খেলে গেল স্বয়ম্ভুর মাথায়। প্রথমে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর মোবাইলে মৃত্তিকার নম্বর ডায়াল করতে গিয়ে দেখল সেটা

তার মোবাইলে সেভই নেই। একমাত্র শিবাঙ্গীর কাছেই থাকবে। ভাবতে ভাবতেই শিবাঙ্গী কলিং। চমকে উঠল স্বয়ম্ভু। ব্যাপারটা কী হল! একেই কী টেলিপ্যাথি বলে? 'হ্যাঁ বলো শিবাঙ্গী।'

-স্যার, আপনার পারমিশন না নিয়েই একটা কাজ করে ফেলেছি।

-কী করেছ?

-মৃত্তিকাকে ফোন করে বলেছি কোনও পার্সেল এলে ওরা যেন না খোলে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খবর দেয়। তারপর আমরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেব।

এত চাপ, এত ব্যর্থতার গ্লানি, এত অসহায়তার মধ্যেও অনেকটা শান্তি লাগছে স্বয়ম্ভুর। ঠিক এই কারণেই ও মৃত্তিকার নম্বর খুঁজছিল এক্ষুনি। সেটা কীভাবে যেন শিবাঙ্গী জেনে ফেলেছে। শান্ত গলায় আলতো হাসি মুখে স্বয়ম্ভু বলল, 'গ্রেট জব শিবাঙ্গী। একদম ঠিক সময়ে ঠিক কাজটা করেছ। কাকুকাকিমার কী খবর?'

-ডাক্তার ডেকেছিলাম। এমনিতেই হাই প্রেশার মায়ের। আরও বেড়ে গেছে।

-তুমি কিন্তু সাহস যুগিয়ে যাও।

-হ্যাঁ স্যার। সাহস জোগাতে জোগাতে মুখ ব্যথা হয়ে গেল আমার।

-দশ মাস দশ দিনের যন্ত্রণার থেকে সেটা অনেক কম।

ফোনের ওপারে শিবাঙ্গী বোধহয় ফিক করে হাসল। আর মিঠে সুরে 'হুম' বলল।

দীপায়ন সকালের চা খেতে খেতে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছে। মৃত্তিকা মেয়েকে কোলে নিয়ে বাইরের ঘরে এল। 'তুমি এত সকালে উঠলে কেন?' দীপায়নকে প্রশ্ন ছুড়ে আধো আধো আদুরে স্বরে মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে মৃত্তিকা।

-কলেজে রেনি ডে বলে কিছু নেই মৃত্তিকা।

খকখক করে কেশে নিল দীপায়ন।

-দেখেছ তো। কাল অত রাতে কাকভেজা হয়ে বাড়ি ফিরলে। তারপরে এসে ঘুমোলেও না।

দীপায়ন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আবার আমার পড়ার ঘরে রাতে উঁকি মেরেছ?'

-উঁকি মারতে হয় না মশাই। ঘরে আলো জ্বললে বাইরে থেকেই বোঝা যায়।

-আলো জ্বেলে তো ঘুমোতেও পারি।

খবরের কাগজটা একটু ঝাঁকিয়ে বলে দীপায়ন।

মৃত্তিকার আধো আধো কথা শুনে মেয়েটাও নানান অচেনা ভাষায় উত্তর দিচ্ছে, হাসছে, চোখদুটোকে গোল গোল করে তাকাচ্ছে। মেয়ের দিক থেকে মনটা হঠাৎই সরে গেল মৃত্তিকার। জানলার বাইরে মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বড্ড ভয় করছে আমার। কোনও ক্ষতি হবে না তো?'' আচমকা ঘরের ভিতরের হালকা পরিবেশটা মেঘলা আকাশের চেয়েও ভারী হয়ে উঠল। 'আবার তুমি ওসব ভাবছ? আর এই গোয়েন্দাগুলোও হয়েছে। বাড়িতে ঢুকে পড়ে মধ্যবিত্তের শান্তিটাই নষ্ট করে দিচ্ছে।' বিরক্তি উগরে দিল দীপায়ন। পরক্ষণেই পরিবেশটা আবার হালকা করতে দীপায়ন প্রসঙ্গ পাল্টায়। দুবার কেশে নিয়ে বলল, 'মেয়েটাকে তুলে দিলে কেন? আরেকটু না হয় ঘুমোত।'

-হ্যাঁ, তোমার মেয়ে না হলে আর ঘুমোয় কে! খালি উঁ উঁ করে বাইরের দিকে হাত দেখাচ্ছে। সাত সকালে আমার পচা মেয়েটাকে বেড়ুবেড়ু করতে নিয়ে যেতে হবে।

শেষ কথাগুলো মেয়ের দিকে তাকিয়ে তার মত করে বলতেই মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠল। 'দেখেছ অবস্থা! যেই শুনেছে বেড়ুবেড়ু অমনি হাসছে।' মৃত্তিকা বলল। দীপায়ন খবরের কাগজ ভাঁজ করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসল। যাক বউটার মন থেকে আপাতত আতঙ্কের মেঘটা সরানো গেছে। তারপর আবার কাগজের আড়ালে মুখ গুঁজে দিতে গিয়েই চোখ পড়ল বারান্দার দরজায়। চৌকাঠের কাছে মাটিতে কী যেন পড়ে আছে!

-এই মৃত্তিকা, ওটা কী দেখো তো

-কোনটা?

-ওই যে মাটিতে কী পড়ে?

বারান্দার দরজার দিকে পিছন করে বসেছিল বলে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে একটু কষ্টই হল মৃত্তিকার। 'পেনড্রাইভ মনে হচ্ছে।' দীপায়ন উঠে কুড়িয়ে আনল। একপিঠ লাল আর অন্য পিঠ কালো।

-এটা কার?

মৃত্তিকা বলল, 'আমার তো নয়।'

-এটা কি তাহলে আমারটা?

-চালিয়েই দেখো না। কী আছে দেখলেই বুঝতে পারবে কার।

এই সময়েই ঘরে ঢুকে এল বাচ্চার আয়া। মৃত্তিকা বলল, 'কী গো দীপা, আজ লেট হল?'

যা বৃষ্টি হয়েছে। বাড়ির সামনে এক হাঁটু জল। তার ওপর বাস নেই। দাঁড়াও, চট করে কাপড়টা পালটে আসছি।' দীপা ভেতরে চলে গেল। দীপায়ন ঘর থেকে ল্যাপটপ আনতে গেল। দীপার কাপড় ছেড়ে আসতে আসতে দীপায়নের ল্যাপটপ অন হয়ে গেছে। 'এবার ল্যাপটপটাকে পাল্টাতে হবে বুঝলে। এত সময় লাগছে অন হতে।'

-আর বোলো না গো। কাল থেকে

দীপা বাচ্চাকে নিয়ে ঘরে চলে গেল। মৃত্তিকা একটু আড়মোড়া ভাঙল। সেও ল্যাপটপের দিকে চেয়ে রইল কী আছে দেখার জন্য। পেনড্রাইভে একটাই ভিডিয়ো ফাইল। দীপায়ন প্লে বটনটা ক্লিক করতেই একটা মেয়ের বিস্ফারিত চোখের নৃশংস রক্তাক্ত মুখ ভেসে উঠল। চমকে সরে এল দীপায়ন। মৃত্তিকা আঁতকে উঠল। একটা কালো জোব্বা পরা কেউ প্রচণ্ড আনন্দে মেয়েটার পেটের ওপর দু-পা তুলে লাফাচ্ছে। পায়ে তার সিলভার রঙের জুতো। নীচে সরু লম্বা হিল। 'এটা তো দিয়া, দিয়া এটা।' আতঙ্ক মেশা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠল মৃত্তিকা। মুখে কাপড়ের শক্ত বাঁধন থাকলেও বন্ধুকে চিনতে পেরেছে মৃত্তিকা। 'কী বলছ মৃত্তিকা' দীপায়নের গা ঘিনঘিন করে ওঠে। আতঙ্কে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ভিডিয়োর অডিয়োতে একটা মেয়ে গাইছে, 'আজ না ছোড়ুঙ্গা তুঝে...' সঙ্গে সঙ্গে এক দল মেয়ে ধরছে পরের অংশটা, 'দম দমা দম'। আবার একটা মেয়ের গলা 'তুনে ক্যায়া সমঝা হ্যায় মুঝে....' সমবেত মেয়েরা 'দম দমা দম'। গানটা হয়েই চলেছে। সঙ্গে শোনা যাচ্ছে একটা বিড়ালের মৃদু আর্তধ্বনি। এই ভিডিয়োতে যেন দিয়ার মুখে কোনও বিড়ালের আর্তনাদ বসানো হয়েছে। নারকীয় হত্যার দৃশ্যে বেজে চলেছে পাঙ্গা নেওয়ার গান। জোব্বা পরা আততায়ী খানিকটা গানের তালে তালেই জোড়া পায়ে ওপরের কোনও একটা অংশ থেকে ঝুলে লাফাচ্ছে দিয়ার পেটে, বুকে। আসল অডিয়োটা থাকলে হাড় ভাঙার, মাংস থ্যাঁতলানোর শব্দও শোনা যেত। দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে দিয়াকে। ভেতর থেকে কতটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে সেটা দিয়ার মুখের ক্ষতবিক্ষত অভিব্যক্তি দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। একটু পরেই জোব্বা পরা পা দুটো পচ করে পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। না, পচ শব্দটা দীপায়ন আর মৃত্তিকার মন শুনল। আসল ভিডিয়োটাতে গানটাই হচ্ছে। ক্যামেরাটা ঠিক সেইভাবেই ফিট করা যাতে ভিক্টিমের কষ্টটা ভিডিয়োর এপারের লোক দেখতে পায়। কিন্তু নরখাদকের পা দুটো প্রায় অফ ফোকাস। ক্যামেরাটা ধরা আছে ভিক্টিম মেয়েটার মুখকে ফোরগ্রাউন্ডে রেখে। মৃত্তিকা গলা তুলে বলে উঠল, 'এই জন্যেই শিবাঙ্গী ম্যাডাম বলেছিল কোনও পার্সেল এলে খুলবেন না! -এটা যে সেই পার্সেল কীভাবে বুঝব?

কথাটা বলেই মৃত্তিকাকে ধরে দীপায়ন বলল, 'তার মানে খুনি নিজে আমাদের বাড়িতে এসে এটা ফেলে দিয়ে গেছে?"

ভয়েতে কেঁদে ফেলল মৃত্তিকা। আর নিতে পারছে না। দীপায়নের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। ভিডিয়োটা আর দেখতে পারছে না ওরা। কিন্তু হাত বাড়িয়ে যে অফ করে দেবে সেই শক্তিটাও কেউ যেন শুষে নিয়েছে দীপায়ন আর মৃত্তিকার শরীর থেকে।

ল্যাপটপের স্ক্রিনটা ঝট করে বন্ধ করে দিল স্বয়ম্ভু। ভিডিয়োটাও নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। মৃত্তিকার বাড়িতে পুলিশ এসেছে। সারা ঘর থমথম করছে। মৃত্তিকার ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে নাক টানার শব্দ ছাড়া ঘরের মধ্যে আর কোনও শব্দ নেই। তবে বাইরে থেকে একটানা চ্যাঅ্যাঅ্যা করে শব্দ আসছে যেটা স্বয়ম্ভুর কানে মাঝেমধ্যেই করাত চালিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া ডাইনিং থেকে চেয়ার সরানোর শব্দ হল দুবার। কাজের লোকটা ঝাঁট দিচ্ছে। চোয়াল শক্ত করে বসে আছে স্বয়ম্ভু। দীপায়ন প্রশ্নটা করল, 'কী হবে মিস্টার সেন? এগুলো আমাদের কেন পাঠাল?'

-দিয়া মিথ্যে বলেছিল আমাদের।

চাপা স্বরে বলে উঠল স্বয়ম্ভু। 'উনি নিশ্চয়ই এরকম কোনও হুমকি পেয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের জানাননি। জাস্ট চেপে গেছেন৷ এই খুনি লুকিয়ে থাকার লোক নয়। আমাদের চোখের সামনেই আছে। কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না। এ যাকে মারে তাকে সংকেত পাঠিয়ে তবে মারে। অরুণাকে যেমন...। কিন্তু দিয়া বারবার বলেছে ও কিচ্ছু পায়নি।'

-তার মানে এবার আমার পালা?

গলা শুকিয়ে এল মৃত্তিকার। গালদুটো লাল হয়ে গেছে চোখ থেকে ঝরে পড়া জল মুছে মুছে। স্বয়ম্ভু বলল, 'সুস্মিতাও আছেন লাইনে। ওনার কাছে অলরেডি অরুণার পায়ের আঙুল পৌঁছে গিয়েছিল। এবার শুধু দেখার বিষয় দিয়ার পায়ের আঙুল কার কাছে যায়?''

-আমাকেও কি খুন হয়ে যেতে হবে স্বয়ম্ভুবাবু?

প্রচণ্ড ভয়ে প্রশ্নটা করল মৃত্তিকা। স্বয়ম্ভু বলল, 'সেটা আপনাদের ওপরেই নির্ভর করছে মৃত্তিকা ম্যাডাম। আপনারা কেউ সরাসরি সোজাসুজি বলছেন না যে অতীতে আপনাদের সঙ্গে ঠিক কী ঘটেছিল? নাকি আপনারাই কিছু ঘটিয়েছিলেন! যাতে এমন সাংঘাতিক কোনও শত্রুতা তৈরি হতে পারে! দিয়া লুকিয়ে গিয়েছিল তাই আজ তার এমন পরিণতি। কিন্তু আপনারা কিচ্ছু না লুকিয়ে বলুন। আর এই যে গান, আজ না ছোড়ুঙ্গা তুঝে দম দমা দম। এর মানেটাই বা কী? আপনাদের সঙ্গে বেড়ালের ডাকের সম্পর্ক কী? খুনি কেন বারবার এই ম্যাও ডাকটাকে ব্যবহার করছে? প্লিজ বলুন।'

-আমি জানি না, কিচ্ছু জানি না। যা বলার আগেরদিন শিবাঙ্গী ম্যাডামকেই বলে দিয়েছি।

-সেটাও পুরোটা বলেননি। জাস্ট ওপর-ওপর বলে গেছেন। শ্রীদেবীর ভাই শ্রীকুমার আপনাদের নামে কমপ্লেন করেছিল যে আপনারা নাকি জোর করে তার দিদিকে প্রিয়াংশুর কাছে যেতে বাধ্য করেছিলেন। তাই আপনারাই আসল কালপ্রিট।

-এক সেকেন্ড মিস্টার সেন। শ্রীদেবী, শ্রীকুমার, কালপ্রিট এসব কী? কারা কাকে যেতে বাধ্য করেছে?

স্বয়ম্ভু আকাশ থেকে পড়ল। মৃত্তিকা মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে কাঁদছে। স্বয়ম্ভূ বলল, 'দীপায়নবাবুকে কিছু বলেননি আপনি? মৃত্তিকা ম্যাডাম!' মৃত্তিকা মুখ ঢেকে নীরবে দুপাশে ঘাড় নাড়ল। তারপরেই মুখ তুলে বলল, 'স্বয়ম্ভুবাবু, শ্রীদেবী কি কচিখুকি ছিল? আমরা জোর করলাম আর ও চলে গেল?'

-র‍্যাগিংয়ে কী না হয়? শ্রীদেবী শহরে একা থাকত। সুবিধে তো আপনাদের সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া আমি নিজে খবর নিয়েছি আপনারা চারবন্ধু এক‌েকটা মাসে একেকজন জুনিয়রের পিছনে লাগতেন। বুলি করতেন। কিন্তু সেই বুলি করাটার মাত্রাজ্ঞান আপনাদের অনেক সময়েই থাকত না।

তুতলে ওঠে মৃত্তিকা, 'আ...আমাদের তখন বয়স কম। এরকম অ... অনেক জায়গাতেই হয়। তাই বলে শ্রীকুমারের অভিযোগ একদম মিথ্যে তাছাড়া সেই ছেলেটাকে তো আমি দেখিওনি। প্রফেসররাও তো স্টেপ নিতে পারতেন আমাদের বিরুদ্ধে। কই? কেউ তো নেননি।

-কী করে নেবেন? শ্রীদেবী তো সবার সামনে কারও নাম করেনি। কারণ তাকে

আগেভাগেই ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া শ্রীদেবী যখন ফার্স্ট ইয়ার আপনারা তখন থার্ড ইয়ার। আপনাদের ফাইনাল এক্সাম হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ আপনাদের কলেজের পার্ট শেষ।

মৃত্তিকা বেশ জোরে বলে ওঠে, 'ও তো বলেইছিল ওর সর্বনাশের জন্য অন্য লোকে দায়ী। আমরা কেউ নই। কলেজে সবাই জানত আমরা জুনিয়রদের নিয়ে বুলি করতাম তাই আমাদের নামে বলাটা সহজ। শ্রীদেবী আসল অপরাধীকে বাঁচাতে চেয়েছে আমাদের নামে বলে। আর বাঁচাতে চেয়েছিল নিজেকে। আমাদের অপরাধ প্রমাণ হলে, বাজে মেয়ে বলে ওকে কলেজ থেকে রাস্টিকেট কেউ করতে পারত না। কিন্তু শেষমেশ সেটা হয়নি। ওর ভাইও তো আর কিছু করেনি।

-সময়ের অপেক্ষা করছিল। সুযোগ খুঁজছিল। এখন হয়তো সেই সময়... স্বয়ম্ভুর কথা সম্পূর্ণ করতে না দিয়েই বেয়াক্কেলে কাজের মেয়েটি ঘরে ঢুকে এল।

-ও বৌদি, এই সিলিপগুলো কী ফেলে দোবো একবার দেকে নাও।

সকলেই ভীষণ বিরক্ত হল। দীপায়ন বলেই ফেলল, 'ওহ বীণা, দেখছ তো সবাই জরুরি কথা বলছি!' বীণা বেশ ঘাবড়ে গিয়ে তুতলে উঠল। 'আ... আমি কী করব? আমায় তো আরেক বাড়ি যেতে হবে নাকি? তারপরে এগুলো ফেলে দিলে বৌদি আমার উপ্রে হাইমাই করবে।'

-বিলগুলো একবার দেখতে পারি?

বীণা প্রায় সকলের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে হাতে ধরা বিলগুলো মৃত্তিকার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেদিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে ছিল স্বয়ম্ভু। বলা ভালো বিলগুলোই তার চোখ টেনে ধরেছিল। দীপায়ন বিস্মিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ শিওর।'

পাঁচ-ছয়টা বিল একসঙ্গে করা ছিল। মোট তিনটে দোকানের নাম। ভুরু দুটোকে মাঝে টেনে এনে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল স্বয়ম্ভু। তারপরে বলল, 'আপনাদের আপত্তি না থাকলে এই বিলগুলো আমি নিতে চাই।'

-শাড়ি জামাকাপড়ের বিল। ওগুলো নিয়ে আপনি কী করবেন?

স্বয়ম্ভু হাসল। 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্যরতন! এগুলো রাখলাম কেমন?' শার্টের পকেটে বিলগুলো পুরতে পুরতে কাজের মেয়েটিকে হাসিমুখে বলল, 'ধন্যবাদ। আপনি আসতে পারেন।' কাজের মেয়ে বীণা লেবড়ে ঘেবড়ে এর মুখ ওর মুখ দেখে স্বয়ম্ভুর মুখের হাসিটি ডিটো নকল করে বলে উঠল, ''থাঙ্কু। তরতরিয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেল। ধন্যবাদের বদলে থাঙ্কু! শিবাঙ্গী থাকলে স্বয়ম্ভুর মুখটা দেখে নির্ঘাত হেসে ফেলত।

-আপনাদের মাথায় খাঁড়া ঝুলছে দীপায়নবাবু। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

স্বয়ম্ভুর কথা শুনে দীপায়ন আর মৃত্তিকার মুখ নতুন করে শুকিয়ে এল।

-আচ্ছা, এরকম কান জ্বালানো আওয়াজটা কী সারাদিন হয়?

অনেকক্ষণ সহ্য করার পর ব্যাজার মুখে প্রশ্নটা করেই ফেলল স্বয়ম্ভু। দীপায়ন বলল, 'প্রায় দিনই হয়। তবে সব সময় নয়। সামনেই একটা কামারশালা আছে। আওয়াজটা সেখান থেকেই আসছে।'

-মাথাটা জাস্ট ধরে গেল। যাই হোক, আপনার বাড়িটা আমরা একবার সার্চ করব।

-কেন স্যার? হঠাৎ কী হল ?

-হঠাৎ কোথায়? খুনি আপনাদের বাড়ি চিনে এমন একটা ভিডিয়ো পাঠিয়ে হুমকি দিয়ে গেল। কে বলতে পারে আপনার বাড়ির আরও অন্য কোথাও কেউ কিছু রাখেনি। আপনাদের ওপর নজর রাখার জন্য নিশ্চয়ই কোথাও ক্যামেরা ফিট করে রাখা আছে। কিম্বা সুস্মিতা ম্যাডামের মতো আপনাদের বাড়ির কোথাও থেকে হয়তো দিয়ার পায়ের কাটা আঙুল পাওয়া গেল!

শুনেই মৃত্তিকার ওয়াক উঠে এল। দীপায়ন বলল, 'প্লিজ আপনারা দেখুন। আমি তো কলেজে বেরিয়ে যাই। সারাদিন বাচ্চা নিয়ে একা থাকে মৃত্তিকা। আপনি যা শোনালেন তারপর তো... ।'

দলবল নিয়ে বাড়ির মধ্যে সেঁধিয়ে গেল স্বয়ম্ভু। বসার ঘর পেরিয়ে ডাইনিং। খাবার টেবিল চেয়ার পাতা। টেবিলের তলায় উঁকি মারল স্বয়ম্ভু। মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে টেবিলের নীচের দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, 'আপনাদের এই স্মার্ট কাজের মেয়েটি কদ্দিন কাজ করছে?' মৃত্তিকা জবাব দিল, ‘আট মাস।’

টেবিলের তলা থেকে চোখ সরে গেল দেয়ালে সাজানো কাচের গ্লাসের সেট, ফুলদানির দিকে। হাত দিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় থাকে?'

-ফুলবাগানেই। পাশেই একটা বস্তি আছে। ওখানে।

দলবলসমেত শোবার ঘরে ঢুকে গেল স্বয়ম্ভূ। বাচ্চা মেয়েটি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। পাশে শুয়েছিল আয়া দীপা। কতগুলো মদ্দা জোয়ান গটগট করে ঢুকে আসাতে একটু অস্বস্তি হল। বিছানায় এলোমেলো রাখা বাচ্চার কাচা কাঁথা আর জামাকাপড়। সেগুলো ভাঁজ না করে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। তাই লজ্জাটা একটু বেশিই পেল। মৃত্তিকা ছাড়ল না। সবার সামনেই প্রশ্ন করে ফেলল, “তুমি ঘুমোচ্ছ দীপা? এদিকে জামাকাপড়, কাঁথা সব পড়ে!'

-আসলে ওকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে কখন যে চোখটা লেগে গেছে! এখুনি করে দিচ্ছি।

-আপনার নাম দীপা?

হচ্ছিল কথা মালকিনের সঙ্গে। হঠাৎ করে গম্ভীর গলায় গোয়েন্দা নাম জিজ্ঞেস করাতে ঘাবড়ে গেল দীপা। শুধু ঘাড় নাড়ল। স্বয়ম্ভূ আবার জিজ্ঞেস করল, 'দীপা কী?'

- দেবনাথ।

-কোথায় থাকা হয়?

-শিয়ালদা।

-শিয়ালদার কোথায়?

-ওই জগত সিনেমা আছে। ওটার পাশের গলি দিয়ে ঢুকে ডানদিকে।

-সেন্টার থেকে?

-হ্যাঁ।

দীপার দিক থেকে চোখটা সরে ঘরের মধ্যে বনবন করে ঘুরতে থাকল স্বয়ম্ভুর। ঘরের দেয়ালে দুর্গা ঠাকুরের ছবি। ঠিক তার উলটো দিকে দীপায়ন আর মৃত্তিকার বিয়ের বেশে যুগলের ছবি। একটা আলমারি, ড্রেসিং টেবিল এবং তাতে লম্বা আয়না। সব দেখে মুখে একটা ‘হুম' শব্দ করে স্বয়ম্ভু বলল, ‘চলুন পাশের ঘরে যাই।'

-ওটা আমার স্টাডি রুম।

দীপায়ন বলল। -সেটাই তো একবার স্টাডি করব। চলুন। হাসিমুখে দীপায়নের চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বলল স্বয়ম্ভু।

স্টাডি রুমে ঢুকতেই এক ঝলক ভালো লাগার ঝাপটা লাগে স্বয়ম্ভুর চোখে। ওয়াল পেপারে মোড়া এই ঘরটায় অসীম যত্নের ছাপ। প্রফেসরের সাধনাকক্ষ এমনই হওয়া উচিত। ক্যাবিনেটে সাজানো হরেক বইয়ের নানান রং, ওয়াল পেপারের রং, ঝাঁ চকচকে উডেন পালিশ করা চেয়ার-টেবিল টেবিলের ওপর ল্যাপটপ। স্বয়ম্ভ টেবিলের ড্রয়ার দুটো টেনে ভিতরে চোখ চালিয়ে দিল। কয়েকটা খাতা, পেন, পেনসিল আর চারটে পেনড্রাইভ। ভিতরের দিকে দুটো হার্ড ডিস্ক রাখা। ড্রয়ার বন্ধ করে দেয়ালজোড়া বইয়ের ক্যাবিনেটের দিকে চোখ ফেরাল স্বয়ম্ভু। 'আপনি কলেজে কী পড়ান?'

-ইতিহাস।

-বাবা! তার মানে তো অতীতের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব রাখতে হয় আপনাকে!

দীপায়ন একটু লাজুক হেসে জবাব দিল, 'হ্যাঁ তা তো হয়ই।'

-ক'বছর হল চাকরি?

-এই তো ছয় হবে এই নভেম্বরে।

-আচ্ছা। আপনি কী কম্পিউটারও শেখান-টেখান নাকি?

-না না। অত বই দেখে বলছেন?

স্বয়ম্ভু দীপায়নের দিকে সরাসরি তাকাল। দীপায়ন বলল, ‘ওগুলো মেনলি মৃত্তিকার জন্য কিনেছিলাম। ও কম্পিউটার নিয়ে স্পেশ্যাল কোর্স করছিল।'

-কমপ্লিট?

-না সে আর হল কই? মেয়ে হবার পর থেকে আর কন্টিনিউ করেনি।

-কী কোর্স করছিল?

-ওই সফটওয়্যার নিয়ে। আপনি কি এ ব্যাপারে ডিটেলস কিছু জানতে চান তাহলে মৃত্তিকাকে ডাকছি। কারণ আমি খুব একটা এসব জানি না।

-না না দরকার নেই।

চারপাশে মুখ ঘোরাতে ঘোরাতেই বইয়ের টেবিলে চোখটা আটকে যায়। দেখে আসা টেবিলটাই আরেকবার দেখার জন্য এগিয়ে যায়। দীপায়নের একটু সন্দেহ হল। ‘স্যার, কিছু কী পেলেন?’

-উঁ? না সেরকম তো কিছু পাইনি।

কথাটা বলতে বলতেই মোবাইলে কীসব যেন টাইপ করল স্বয়ম্ভু। তারপর স্ক্রিন লক করে পকেটে পুরে রাখল। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটির উদ্দেশে বলল, ‘অভিনব, হোয়াটস্যাপ চেক কর। তোমার জন্য লালবাজার থেকে নোটিস আছে। এখানে দাঁড়িয়ে চেক করে নাও। আমরা বাইরেটা দেখছি।' হঠাৎ লালবাজার থেকে নোটিস আসায় ছেলেটি বেশ ঘাবড়ে গিয়ে ঘাড় নাড়ল, ‘ওকে স্যার।' অভিনব মোবাইল চেক করতে থাকে। স্বয়ম্ভু বাইরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দীপায়নকে বলে ওঠে, ‘ওইদিকটা কী আছে দীপায়নবাবু?’'

-ওদিকে কলতলা। এ বাড়ির পিছনের একটা এন্ট্রেন্স বলতে পারেন। দীপায়ন আর স্থানীয় পুলিশ অফিসারকে নিয়ে কলতলার দিকে চলে গেল স্বয়ম্ভু।

বারান্দা দিয়ে রাস্তায় বেরোতে হলে চারটে সিঁড়ি নামতে হয়৷ সেই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একপাশে তাকিয়ে কী যেন দেখল। নাকি ভাবল! তারপর নেমে গাড়ির কাছে চলে গেল স্বয়ম্ভু। স্থানীয় অফিসারকে বলল, ‘এদের ওপর একটু নজর রাখবেন। যেকোনও মুহূর্তে এদের ওপর বিপদ নেমে আসতে পারে। এখন আর কিচ্ছু বলা যাচ্ছে না।'

-শিওর স্যার।

-চলি তাহলে?

-আসুন।

স্থানীয় অফিসারকে বিদায় করে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অভিনবকে স্বয়ম্ভু বলল, ‘তুমি লালবাজারে গিয়ে এই পেনড্রাইভটা প্রাঞ্জলের হাতে দেবে। বলবে এই ভিডিয়োটার মেটাডেটাগুলো বের করতে। আর আরও একটা জিনিস... আর নয় থাক। যা বলার আমি বলে দিচ্ছি। তুমি এটা প্রাঞ্জলের হাতে পৌঁছে দাও। আর ওই জিনিসটা দাও।' অভিনব এগিয়ে এসে স্বয়ম্ভুকে জড়িয়ে ধরল। স্বয়ম্ভুও স্মার্টলি অভিনবকে হালকা হেসে জড়িয়ে ধরে। অভিনব ভাঁজ করা একটা সাদা কাগজ অত্যন্ত গোপনভাবে স্বয়ম্ভুর পকেটে পুরে দেয়। তারপর দুজন দুজনকে আলিঙ্গনমুক্ত করে। অভিনব বলল, ‘আপনি যাবেন না স্যার?’'

-না, আমার কয়েকটা কাজ আছে। তুমি বেরিয়ে যাও। আমি ক্যাবট্যাব কিছু করে নিচ্ছি।

-ওকে স্যার।

সবেমাত্র ক্যাব বুক করতে যাবে অমনি সুচিত্রা হাঁকডাক শুরু করলেন। 'হ্যাঁ মা বলো' স্বয়ম্ভু ফোন ধরল। উল্টোদিক থেকে হাইপার হয়ে সুচিত্রা বললেন, 'হ্যাঁ রে ভোলা, শিবাঙ্গীর বাড়ির সামনে লাশ পড়েছে, অ্যাঁ?'

-তোমায় আবার কে বলল?

-টিভিতে দেখাচ্ছে তো। কী অবস্থা রে মেয়েটার?

-মেয়েটার কিছু হয়নি। ওর মায়ের খুব শরীর খারাপ করেছে। আর বাবাও ট্রমাটাইজড হয়ে আছে।

-সে তো হবেই। স্বাভাবিক। শোন ভোলা, তুই সাতদিন মেয়েটাকে ছুটি দে। ওকে একদম কাজে ডাকবি না।

-ওফফফ মা, তুমি এমন করে বলছ যেন লালবাজারটা আমার বাবার। সাতদিন হবে না মা। আজকে ছুটি দিয়েছি।

-উদ্ধার করেছ। একটা মেয়ের বাড়িতে এরকম একটা অবস্থা আর তুই সেই মেয়েটাকে গুণ্ডাদের পেছনে লেলিয়ে দিবি? ছিঃ ভোলা!

স্বয়ম্ভু মাকে যথেষ্ট সমীহ করে। দাঁত খিঁচিয়ে কোনওদিনই কিছু বলেনি। মায়ের ওপর প্রচণ্ড বিরক্ত বা রাগ হলে এক্কেবারে নীরব হয়ে যায়। এখনও সেই রাস্তাই ধরল মায়ের ভোলা। হাজারটা ক্যাঁচরকোচরের মাঝে ব্যোমভোলা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'এই ভোলা কী রে?'

-কী আবার হবে? তুমি যা বলছ তাতে আমার চাকরিটাই চলে যাবে।

-কিচ্ছু করতে হবে না তোকে। যা করার আমি করব।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে রীতিমতো লাফিয়ে উঠল স্বয়ম্ভু। 'তুমি আবার কী করবে? মা, এই সময় উল্টোপাল্টা কিচ্ছু করবে না বলে দিলাম। চারপাশের অবস্থা খুব খারাপ কিন্তু।'

-আচ্ছা। তুই বললি আর আমিও শুনলাম। রাখছি। আর এদিকে কাজ হয়ে গেছে। তমালেরও কাজ করেছে ঠাকুরমশাই।

-সে ঠিক আছে। কিন্তু তুমি মা কিছু...

ওপাশ থেকে ফোনটা কেটে গেল। অসহায়ের মত হাত ঝেড়ে মাটিতে পা ঠুকল স্বয়ম্ভু। মনে মনে বলল, ''ধুস, যা পারে করুক। এই ট্যাক্সিইইইই...।'

১৯

‘গত চার-পাঁচদিনে খুন হয়ে গেলেন দুজন মহিলা। একজন পুরুষ। থুড়ি, দুজন পুরুষ। প্রথমে অরুণা ব্যানার্জি, তারপরে তার স্বামী তমাল ব্যানার্জি। এই সূত্রে জানিয়ে রাখি, তমাল ব্যানার্জি যে খুন হয়েছেন সে খবর পুলিশের তরফ থেকে প্রায় চেপেই যাওয়া হয়েছিল। আমরা গোপনসূত্রে জানতে পেরেছি তমালবাবুর খুনের কথা। এর মাঝে অরুণা ব্যানার্জির ক্যাব ড্রাইভার মারা যান। এক অর্থে এটাও খুনই বলা যায়। কারণ অতিরিক্ত ক্লোরোফর্মের জন্য তিনি মারা যান। এবার মারা গেলেন দিয়া চৌধুরি। যে কিনা অরুণার বন্ধু ছিলেন। দেশপ্রিয় পার্কে ওনার নামে একটি ক্যাফেও আছে। দিয়ার বান্ধবী কিয়ারা, তাকে মধ্যরাত্রে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে পুলিশ উদ্ধার করে ট্যাংরা অঞ্চলের কাছে একটি ফুটপাথ থেকে। আমাদের স্বপ্নের তিলোত্তমা, ভালোবাসার শহর কোলকাতা কি তাহলে মৃত্যুনগরী হয়ে যাচ্ছে?

এসব কী হচ্ছে একের পর এক? ও হো, আরেকটা কথা তো বলতেই ভুলে গেছি। দিয়া চৌধুরির লাশ পাওয়া গেছে আমাদের গোয়েন্দা স্বয়ম্ভু সেন অর্থাৎ যিনি এই খুনের কেসগুলোর তদন্তে আছেন তাঁর সহকারী শিবাঙ্গী বসুর বাড়ির বাগানের মধ্যে থেকে। ধরে নেওয়া হচ্ছে খুনি ভয় দেখাতেই লাশ শিবাঙ্গী বসুর বাড়িতে ফেলে দিয়ে গেছে।'

কার্ডের দোকানের লোকটা হাঁ করে খবর গিলছিল। মাঝেমধ্যে আঙুলের ঠ্যালা দিয়ে নাকের ওপর নেমে আসা পুরু কাচের চশমাটা তুলে দিচ্ছে। আবার খানিক বাদে সেটা নেমে যথাস্থানে এসে থমকে থাকছে। এমন সময়েই এক বাক্স মিষ্টি হাতে করে ঢুকে এল ত্রিদিব, ‘ও কাকা, মিষ্টি খাও গো।'

-বাবা! কী হল রে ত্রিদিব? হঠাৎ মিষ্টি খাওয়াচ্ছিস?

-ফুলবাগানের যে বাড়িটায় মামাকে রেফার করেছিলে ওই অন্নপ্রাশনের জন্য, ওটা কনফার্ম হয়ে গেছে।

-হবে না? এমন করে বলেছি টোপ না গিলে যাবে কোথায়? তা এই শুকনো মিষ্টি খাইয়ে কাজ সারতে এসছিস হতচ্ছাড়া? কোথায় লাল টুকটুকে বউ এনে পেটপুরে মহাভোজ খাওয়াবি ভাবলুম। এই মিশ্রঠাকুরের ফোন নম্বরটা দে তো। ওনাকে বলি। ও হো, ওটা তো আগেরদিনই আমায় দিলি না? দাঁড়া, আজই কল করছি। এবার তোর বিয়ে দেব তারপর আমার শান্তি।

-আরে সে তো সময় লাগবে। এখন আপাতত মিষ্টিই খাও।

বয়স্ক মানুষটি এক গাল হেসে মিষ্টির বাক্স হাতে নিলেন। সামনের দাঁতটা ভাঙা। মাথার ওপর কয়েকগাছি চুল। ঘাড়ের কাছটায় সরু সরু ঝুরির মতো আরও কয়েকগাছি নেমেছে। ‘তুমিও এসব খবর দেখছ কাকা? বন্ধ কর তো।'

-বন্ধ করব কী রে, খুনি নাকি খোদ গোয়েন্দার বাড়িতে লাশ ফেলে গেছে।

-গোয়েন্দার সহকারীর বাড়ি।

-ওই হল। কী যে দিনকাল পড়ল কে জানে? কোনদিন দেখবি আমিই খুন হয়ে পড়ে আছি।

-কেন? তুমি কার ক্ষতি করেছ যে খুনি তোমায় মারবে?

-যেগুলো মরছে সেগুলো বলছিস কারও ক্ষতি করেছে?

-আমি কেন বলব? লোকে বলছে।

-কিন্তু খবরে তো সেরকম কিছু বলল না!

-শিয়ালদা থেকে বাসে চেপে কলেজস্ট্রিট এসো না একবার, দেখবে বাসভর্তি গোয়েন্দা। ওই শম্ভু সেন না কে যেন গোয়েন্দা তদন্ত করছে না? তার আর দরকার হবে না। সবাই মুখে মুখে মার্ডার কেসের ফাইল ক্লোজ করছে।

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল বয়স্ক মানুষটা। ত্রিদিব কী যেন ভাবতে ভাবতে বলল, ‘কিছু না কিছু তো আছেই কাকা। নইলে খুনি টাকা নিচ্ছে না, ডাকাতি করছে না। অথচ প্রাণে মারছে। নিকুচি করেছে বাদ দাও। এসব খবর আর দেখো না। এইসব যত দেখবে আমার মামার মতো

অবস্থা হবে।

-কেন? তাঁর আবার কী হল?

-রাতে ঘুমোচ্ছে না। ঠিক করে খাচ্ছে না। রাস্তা দিয়ে হাঁটছে চলছে আর এদিক ওদিক ঘুরে তাকাচ্ছে। কে যেন ওনাকে ফলো করছে। -বলিস কী? মিশ্রঠাকুরকে কে ফলো করবে?

-দুদিন বাদে মামাটা আমার ঠিক পেগলে যাবে দেখো।

-ওসব মনের ভুল। ঠিক সময়ে বিয়েশাদি না করলে এমনই হয়। ওই জন্যে বলছিই.....

--আমি আসছি কাকা। দোকানে কাজ আছে।

বলেই ত্রিদিব শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। বয়স্ক মানুষটা চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে ত্রিদিবের উদ্দেশ্যে বলল, ‘সময় গেলে সাধন হবে না। তখন বুঝবি।'

বইয়ে ঠাসা ঘুপচি ঘর। দোকানের একদম ভিতর দিকে প্রকাশক বসে কোনও এক বইয়ের বিচ্ছিন্ন দুটো পাতায় চোখ বোলাচ্ছিলেন। খানিকবাদে স্বয়ম্ভু সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা তো আমাদেরই প্রকাশনার বই। একটা ক্রাইম থ্রিলার উপন্যাস।'

-এই দুটো পাতাই কী একই বইয়ের?

-একদম। এখনও প্রকাশিত হয়নি। পরশুদিন ছাপাখানায় গেল সবে। কিন্তু এই প্রুফের পাতা আপনি কোথায় পেলেন?

স্বয়ম্ভু একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, ‘সময়মতো জানতে পারবেন। তার আগে আপনি বলুন এই বইয়ের লেখক কে? কী নাম তার?”

-দীপায়ন চ্যাটার্জি।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো নামটা স্বয়ম্ভুর কানে বাজল। তবু স্বয়ম্ভু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনি শিওর? এই বইয়ের লেখক দীপায়ন চ্যাটার্জি?'

-কী মুশকিল! যে বই আমাদের এখান থেকে প্রকাশ হচ্ছে তার লেখকের নাম জানব না?

-ছবি আছে কোনও?

-হ্যাঁ। আমরা বইয়ের লেখক পরিচিতিতে ছাপাব বলে ছবি নিয়েছিলাম। দাঁড়ান, এই শাশ্বত...

ঘরের আরেক কোণে ডেস্কটপের সামনে বসে থাকা ছেলেটা সাড়া দিল। প্রকাশক বললেন দীপায়ন চ্যাটার্জির ছবিটা ফাইল থেকে বের করে দেখাতে। ছেলেটি সেটাই করল। ছবিটা দীপায়নেরই। স্বয়ম্ভুর মগজে নতুন করে আঁকিবুকি কাটছে কেউ। এলোমেলো রেখার যত জট ফুটে উঠছে ততই ভাবনার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে স্বয়ম্ভু। প্রকাশকের কানের কাছে মুখ নিয়ে আচমকাই একটা বেয়াড়া হুকুম করে বসে সে, 'শুভদীপবাবু, এই বইটি আপনি এখুনি প্রকাশ করবেন না।' প্রকাশকের মাথায় বাজ, 'এ কী বলছেন স্যার? বই তো আর মাত্র কয়েক কপি ছাপাই বাকি।'

-আস্তে কথা বলুন।

-সরি সরি।

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল শাশ্বতকে। দূরে ডেস্কটপে বসে কাজ করছে।

-বই ছাপিয়ে গোডাউনে এনে রেখে দিন। যতক্ষণ না লালবাজার থেকে এই বই প্রকাশের হুকুম পাবেন ততক্ষণ এই বই যেন প্রকাশের আলো না দেখে। এই কথা যেন লেখকের কান পর্যন্ত না পৌঁছোয়। এটা শুধুমাত্র আপনার আর আমার কথা।

অত্যন্ত গোপনীয় ভঙ্গীতে কথাগুলো বলল স্বয়ম্ভু। শুভদীপের মুখে চিন্তার ভাঁজ। ‘সেরেছে! দীপায়নবাবুকে কী বলব?’

-কিছু একটা বলে দেবেন। বলবেন, ছাপাখানার প্রবলেম। আর এক্ষুনি, এই ক্রাইম থ্রিলারটির একটা কপি আমার লাগবে।

ফ্ল্যাটের দরজা জানলা বন্ধ করে বসে আছে সুস্মিতা। আজ বুটিকেও যায়নি। প্রিয়াংশুকেও বেরোতে দেয়নি। সকাল থেকে ঠায় নিউজ চ্যানেলগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একই

খবর দেখে চলেছে। শহরে সিরিয়াল কিলিং।

-একই খবর আর কতবার দেখবি? বন্ধ কর না।

মনে মনে প্রমাদ গুণছে সুস্মিতা। যদি একটিবারও খবরে বলে যে অপরাধীর হদিশ পেয়ে গেছে পুলিশ তাহলে কিছুটা হলেও শান্তি পাবে। কিন্তু এটা যে অলীক কল্পনা সেটাও জানে সুস্মিতা। কোন অপরাধীকে ধরবে গোয়েন্দা? টিভিতে বারবারই দিয়ার মৃত্যুর খবর দেখিয়ে চলেছে। রসিয়ে রসিয়ে বলা হচ্ছে নৃশংসতার বর্ণনা।

-হারাধনের দশটি ছেলে কবিতাটা মনে আছে প্রিয়াংশু?

-হঠাৎ!

বলেই বুঝল সুস কেন এই কথা বলছে। ‘ওফফ! আজেবাজে চিন্তাভাবনা বন্ধ কর সুস। প্লিজ। আমাদের কিচ্ছু হবে না দেখিস। আরে পুলিশ তোর ওপর নজর রাখছে। তোর আবার চিন্তা কীসের?”

কথাগুলো সুস্মিতাকে ধরে ঝাঁকিয়ে বলল প্রিয়াংশু। তাতে সুস্মিতার বুকের ভেতরটা যেন আরও কেঁপে উঠল। খপ করে প্রিয়াংশুর দুটো হাত আঁকড়ে বলে উঠল, ‘আমি কিন্তু তোকে ভালোবাসি প্রিয়াংশু। তোর ভালোমন্দ সবকিছু নিয়ে আমি তোকে ভালোবাসি।' প্রিয়াংশু আলতো হেসে সুস্মিতার কপালে চুমু খেয়ে বলল, ‘আমি জানি।' ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সুস্মিতা বলে, ‘কিন্তু এবার যে আমার পালা প্রিয়াংশু। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি।' প্রিয়াংশু সান্ত্বনা দেবার আগেই পোষা পুষিটা ম্যাও করে ডেকে উঠল। চমকে উঠল সুস্মিতা। তারপর নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে চোখ বুজে একটু শান্ত হল। কিন্তু আবারও তাকে কাঁপিয়ে পাশে রাখা মোবাইলটা বেজে উঠল। সুস্মিতা ধরছে না। কেবল ভয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অপরিচিত নম্বর। 'কী রে ধর। ফোন বাজছে তো।'

-ও আমায় বাঁচতে দেবে না প্রিয়াংশু।

-আরে ফোনটা ধর। পাগল কোথাকার।

ধরিস না, বলে ফোনের দিকে হাত বাড়াতে যেতেই সুস্মিতা ‘না না না, প্লিজ' বলে কাঁদো কাঁদো হয়ে কাকুতি মিনতি করে ওঠে। কপট ধমক দিল প্রিয়াংশু, ‘কোনও দরকারি ফোন হতে পারে তো? পুলিশও তো হতে পারে। হয়তো তোকে কিছু জানাবে। দাঁড়া, আমি ধরছি।' মুখ কাঁচুমাচু করে সুস্মিতা দেখল প্রিয়াংশু ফোনটা ধরেছে। ‘হ্যালো... না, আমি ওর... হ্যাঁ প্রিয়াংশু। আপনি?... ও আচ্ছা আচ্ছা ধরুন।' কান থেকে ফোনটা দূরে সরিয়ে বলল, ‘নে কথা বল। বুটিক থেকে।' সুস্মিতার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না! দুপাশে হাত নেড়ে না বলছে। প্রিয়াংশু গলা চেপে ধমক দিল, 'ধর বলছি। কথা বল।' কাঁপা কাঁপা হাতে মোবাইল কানে চেপে 'হ্যালো' বলল সুস্মিতা। তারপরে ওপার থেকে কোনও বিশ্বস্ত গলা ভেসে আসতে নিশ্চিন্ত হল। দুটো কথা বলেই দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। ‘একদিন আমি নেই আর তোমরা সামলাতে পারছ না? আমি না থাকলে তো ব্যবসা লাটে তুলে দেবে তোমরা। যা পারো কর। যা ইচ্ছে কর। আমায় ডিস্টার্ব করবে না।' খটাস করে উল্টোদিকের ব্যক্তির মুখের ওপর ফোন কেটে দিল।

-এত মাথা খারাপ করার কোনও মানে নেই সুস। ওরা নয়, এইভাবে চললে তুই নিজেই তোর ব্যবসা লাটে তুলবি।

পায়ের কাছে এসে পুষি ম্যাও ম্যাও ডাক ছাড়তেই কোলে তুলে নেয় প্রিয়াংশু।

-ওই ছেলেটা আমায় বাঁচতে দেবে না প্রিয়াংশু।

পুষিকে আদর করতে করতেই নিজের মনে যেন বলে ওঠে প্রিয়াংশু, ‘কোন ছেলেটা?”

-শ্রীকুমার।

মুচকি হাসে প্রিয়াংশু। বলে, ‘তুই সত্যিই পাগল হয়ে গেছিস।' বুকের মধ্যেকার ভয়টায় কীভাবে যেন অপার বিস্ময় মিশিয়ে দিল প্রিয়াংশুর হাসি। সুস্মিতা অবাক হয়ে তার প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে রইল অজস্র প্রশ্ন নিয়ে।

-কী বলছেন স্যার, দুটো একই বইয়ের পাতা?

-শুধু একই বই নয় শিবাঙ্গী, একই কালিতে প্রুফ চেক করা। ভেবে দেখো, একটা অরুণার বডির পাশ থেকে পাওয়া গেল আর অন্যটা খোদ লেখকের ঘর থেকে।

চামচে করে মাকে স্যুপ খাওয়াতে খাওয়াতে স্বয়ম্ভুর সঙ্গে ফোনে কথা বলছে শিবাঙ্গী। অপর্ণা একটু উঠে বসেছে। পিঠে বালিশ দিয়ে রিল্যাক্স করছে। চোখ এখনও আতঙ্কে জর্জর।

--তাহলে ঠিকুজিকুষ্ঠি সব জানতে হচ্ছে স্যার।

-সে তো হচ্ছেই। আমি এখন যাচ্ছি ড্যাফোডিলে। কিয়ারার নাকি সেন্স আসছে একটু করে।

-বাহ! এটা ভালো খবর।

-যতক্ষণ না কিছু জানতে পারছি ততক্ষণ কিছুই ভালো নয় শিবাঙ্গী।

শিবাঙ্গীর বাড়িতে বেল বাজল। ফোনের ওপার থেকে বেলের আওয়াজ কানে যেতেই স্বয়ম্ভু বলল, ‘সাবধানে দরজা খুলবে শিবাঙ্গী। যদিও এখনই কিছু হবার সম্ভাবনা নেই তাও '

-হ্যাঁ স্যার। এক সেকেন্ড ধরুন। বাবা, মাকে একটু খাইয়ে দাও না। অপর্ণা ক্লান্ত গলায় বলল, ‘থাক। আমি পারব। তুই দেখে দরজা খুলবি।'

বাইরে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দরজা খুলতেই এক গাল হাসি আর অনেকটা বিস্ময় উছলে পড়ল। আপ্লুত হয়ে শিবাঙ্গী বলে উঠল, 'জেঠিমা আপনি! আসুন আসুন। বাড়ি চিনলেন কী করে?' জেঠিমা ডাকটা শুনেই স্বয়ম্ভুর মনে কেমন যেন খটকা লাগে। ‘কে এসেছে শিবাঙ্গী?' শিবাঙ্গী হাসতে হাসতে কান থেকে ফোন সরিয়ে ফিসফিস করে সুচিত্রাকে বলল, 'স্যার'। সুচিত্রা ফোনটা কানে চাপতেই বলে উঠল, 'তোকে না বললাম ভোলা, মেয়েটাকে একটু ছুটি দে। সেই ফোন করে জ্বালাচ্ছিস?' সুচিত্রার হাতে ধরা ভারী ব্যাগটাকে শিবাঙ্গী নিজে নিল। ওপার থেকে স্বয়ম্ভূ প্রায় আঁতকে উঠে বলল, ‘মা তুমি ! শিবাঙ্গীদের বাড়ি গেছ। দেখছ চারপাশে বিপদ ওঁৎ পেতে আছে।'

-এই শোন, সেই মাধ্যমিকের পর থেকে আমি তোকে একা বড় করেছি। আমায় ভয়ডর দেখাস না। রাখ এখন।

-ঠিকানা কোথা থেকে পেলে?

সুচিত্রা দেবীর ঠোঁটে লেডি শার্লকহোমসের হাসি, 'গোয়েন্দা স্বয়ম্ভু সেন আমায় পেটে ধরেনি। আমি তাকে পেটে ধরেছি।'

-হ্যাঁ বুঝেছি। তুমি অনেক বড় গোয়েন্দা। শিবাঙ্গীই বলেছে তোমায়।

-এই বুদ্ধি নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করিস? ছেড়ে দে। ও যদি আমায় ঠিকানা দিত তাহলে শুরুতেই বাড়ি চিনলে কী করে বলত? ফোনের মধ্যে সেটা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছিস!

স্বয়ম্ভু চোখ-মুখ কোঁচকাল। সত্যিই এটা খেয়াল করেনি সে। গলা ঝেড়ে ব্যাপারটা ঘোরাতে গিয়ে বলল, ‘যাক গে, শোনো, বেশি বেলা করবে না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে। আর বলছি, আজকেও কী মাসির বাড়ি যাবে? নাকি এ বাড়িই...।'

সুচিত্রা হাসল মনে মনে। মায়ের হাতের রান্না ছাড়া ভোলার মন ভোলে না এ তিনি ভালোই জানেন। তবু বললেন, ‘না রে ভোলা, আর দুটো দিন যাক। সবে আজ কাজ মিটেছে তো। রবিবার ফিরব।' একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ভোলা জানাল, ‘বেশ! তাই কোরো। রাখছি এখন।

-রাখ।

সুচিত্রা মোবাইলটা শিবাঙ্গীর হাতে ধরিয়ে দিতে দেখল ফোনটা কেটে গেছে।

-এসব কী এনেছেন জেঠিমা?

-আজ আর তোমাদের রেঁধেবেড়ে কাজ নেই। সকাল থেকে যা চলছে। তাই আর থাকতে পারলাম না। ওই দুটো তরকারি, ডাল আর চাটনি করে এনেছি। শুধু ভাতটা একটু করে নিয়ো।

-কোনও মানে আছে জেঠিমা? এত দূর থেকে। ইসস দেখেছেন, এতক্ষণ এখানেই দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আসুন আসুন।

ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে শিবাঙ্গী জিজ্ঞেস করল, ‘স্যার তো আপনাকে ঠিকানা দেয়নি। তাহলে কে দিল?'

-তপন।

-তপন!

-আরে তোমরা বেশিরভাগ সময় যার গাড়ি করে ঘুরে বেড়াও। ওকেই একদিন জিজ্ঞেস করে রেখেছিলাম।

-ওরে বাবা।

ঘরের ভিতর থেকে শেখর বেরিয়ে এলেন। অবাক চোখে দেখতে লাগলেন। শিবাঙ্গী আলাপ করিয়ে ঘরে নিয়ে গেল। এইবারেই আসল ব্যাপারটা ঘটে গেল। শিবাঙ্গী এক্কেবারে ভেবলে ভ। সুচিত্রা ঘরে ঢুকে অপর্ণাকে দেখেই থমকে গেল। অপর্ণাও স্যুপের বাটিটা মুখের সামনে ধরে চুপ করে চেয়ে রইল। শিবাঙ্গী খেয়াল করল দুই বয়স্কার মুখে এক সঙ্গেই হাসি ফুটে উঠল। সুচিত্রা গলার শির ফুলিয়ে বলে উঠলেন, 'অপু না! অপর্ণা তো?' অপর্ণাও বললেন, ‘সুচি তুই? এ কী রে? তুই কীভাবে? কোথা থেকে?’’

-আকাশ থেকে টপকালাম। তুই সেই ভ্যাবলাই আছিস। কথাটা শেষ করেই অপর্ণাকে জড়িয়ে ধরল সুচিত্রা।

-এটা কী হল? তোমরা কী একে অপরকে চেনো নাকি?'

শিবাঙ্গীর প্রশ্নের উত্তরটা অপর্ণাই দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার ওপর দিয়ে হাত পা নেড়ে সুচিত্রা বলে উঠলেন, ‘চিনি মানে? ওরে এ যে আমার সেই ছোট্টকালের সই। একই রাণাঘাটের মেয়ে আমরা।' অপর্ণার মুখটা অনেকক্ষণ বাদে ঝলমল করে উঠেছে। গলার স্বর থেকে উত্তেজনা ঝেড়ে মায়াভরা সুরে প্রশ্ন করলেন সুচিত্রা, ‘কতদিন পর অপু! এইভাবে যে দেখা হবে ভাবতেই পারিনি। কেমন আছিস রে?

-আর থাকা। শুনেছিস তো সব।

-তোর আবার চিন্তা কী? ঘরে এমন লক্ষ্মীর মতো মেয়ে থাকতে।

-লক্ষ্মী যদি লক্ষ্মী হয়ে থাকত তাহলে কী আর চিন্তা হত রে? তিনি তো চামুণ্ডা হয়ে দিনরাত অসুরদের তাড়া করে বেড়াচ্ছেন।

-দোষ তোর মেয়ের নয়। আমার ছেলেটার। দিনরাত খালি তোর মেয়েটাকে দৌড় করিয়ে মারে। দেখি তো।

-উফফ তোমরা কী শুরু করলে বলো তো। এটা তো আমাদের কাজ। নাকি!

শিবাঙ্গী ছদ্মরাগ দেখাল। সুচিত্রা বললেন অপর্ণাকে, ‘ওই দ্যাখ দেখলি। কারুর নামে কাউকে বলা যাবে না। আমারও কী কম চিন্তা ভোলাটাকে নিয়ে? কে জানে বাবা কবে কী অঘটন ঘটিয়ে বসে।'

-তোর বাড়িতে তো তাও পায়ের আঙুলগুলো ফেলেছে। আর আমার বাড়িতে দ্যাখ, গোটা লাশটাই।

-উফফ মা থামো না।

সুচিত্রা বড় বড় চোখ কপালে তুলে একবার শিবাঙ্গীর দিকে আরেকবার তার বন্ধু অপর্ণার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমার বাড়িতে পায়ের আঙুল মানে? কই আমি তো কিছু জানি না? ও শিবাঙ্গী কী হয়েছে মা? ভোলা তো কিছু...!' সুচিত্রা যে এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না সেটা ভালোই বুঝল শিবাঙ্গী।

স্পন্দনরেখাগুলো ইচ্ছেমতন এঁকেবেঁকে একটা নির্দিষ্ট গতিতে সরে যাচ্ছে। টিক টিক করে শব্দ তুলছে যন্ত্রটা। আশঙ্কিত নীরবতা লোমশ জন্তুর মতো কিয়ারার কেবিনে থুম মেরে বসে আছে। নাকে নল দেওয়া। পায়ে আগাপাস্তা ব্যান্ডেজ। কপালের একটা দিক একটু লাল হয়ে ছড়ে গেছিল।

সেখানে মলম লাগানো। হাতের চামড়া ভেদ করে স্যালাইন চলছে। বেডের পাশে

কিয়ারার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে স্বয়ম্ভু। দু-তিনবার ডাকার পর চোখ খুলছে অল্প করে।

-নমস্কার। আমি স্বয়ম্ভু সেন।

ধীরে, বেশ গোটা গোটা করে উচ্চারণ করে বলল স্বয়ম্ভু। যাতে কথাগুলো একবারে বুঝতে পারে কিয়ারা। আলতো চোখ খুলেই জবাব দিল, ‘চিনি।’ মিডিয়া স্বয়ম্ভুকে রাতারাতি সেলিব্রেটি বানিয়ে দিয়েছে। তাই তাকে না চেনার কোনও কারণ নেই। স্বয়ম্ভু বলল, ‘আপনাকে বেশি প্রশ্ন করতে চাই না। আপনি শুধু আমায় বলুন আপনার এই অবস্থা কীভাবে হল? একদম পার্টি থেকে শুরু করে আপনার ফুটপাথে পড়ে থাকা পর্যন্ত।' কথাটা শুনতেই কিয়ারার ভুরু কুঁচকে গেল। ও হয়তো জানেই না ওকে কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। স্বয়ম্ভু বলল, ‘আপনাকে ট্যাংরার কাছে একটা ফুটপাথ থেকে পাওয়া গেছে। আপনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। পুলিশ আপনাকে এই হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। কেউ বা কারা আপনার পা ভেঙে দিয়েছে। তাই অপারেশন হয়েছে। আপনি তো জ্ঞান ফেরার পর আমার নামও করেছেন শুনলাম। কী বলবেন ধীরে ধীরে বলুন। আপনার কষ্ট হলে চুপ করে যাবেন।' একটানা এতগুলো কথা বলে থামল স্বয়ম্ভু। কেবিনের মধ্যে চাপ চাপ আতঙ্কটা আরও যেন চারিয়ে বসল। কিয়ারা বলতে শুরু করল, ‘পার্টি চলছিল। আমরা নাচছিলাম। বাইরে বৃষ্টি। তাও প্রায় সবাইই এসেছিল। কয়েকজন ছাড়া। হঠাৎ ডিজেতে গান পালটে গেল। একটা মেয়ে.... না সঙ্গে আরও কয়েকজন মেয়ে গাইছিল।

স্বয়ম্ভুর ছড়িয়ে থাকা ভুরুটা কুঁচকে কাছাকাছি চলে এল। অন্তর্কর্ণ দুটো আরও সজাগ হল। প্রশ্ন করল, ‘‘কোন গান? লাইভ গাইছিল?' কিয়ারা দুপাশে মাথা নাড়ায়। ‘লাইভ নয়। সাউন্ড সিস্টেমে বেজে উঠেছিল। সঙ্গে একটা বেড়ালের ডাক।' ভিতরের চমকানিটা বাইরে প্রকাশ করে না স্বয়ম্ভু। কিয়ারা বলে, ‘আজ না ছোড়ুঙ্গা তুঝে দম দমা দম। একবার একটা মেয়ে, তারপর কোরাস। যতবার গাইছে ততবারই বেড়ালটা কেঁদে উঠছে।'

-আপনি ঠিক শুনেছেন? বেড়ালটা কাঁদছিল?

-ওইরকমই লাগল। এক্স্যাক্ট জানি না। কিন্তু গানটা ক্যাজুয়ালি রেকর্ড করা মনে হল। ওই মোবাইলে যেমন...

-তারপর?

-আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম। দিয়া প্রচণ্ড রেগে গেল। ওর ততক্ষণে নেশা হয়ে গিয়েছিল। তবে এতটাও খায়নি যে কথা জড়িয়ে যাবে।

-কিন্তু দিয়ার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল।

স্বয়ম্ভূ যেন জানেই এটা হবে। কিয়ারা সায় দিল। স্বয়ম্ভু প্রশ্ন করল, ‘ডিজে যে বাজাচ্ছিল সে কীভাবে গানটা পেল জিজ্ঞাসা করেননি?'

-ডিজে ছিল না। ওয়াশরুমে গিয়েছিল। তার আগে একটা ছেলে নাকি ডিজে বাজাবে বলে নিয়েছিল। ডিজে ছেলেটি ভেবেছিল ইনভাইটেড গেস্ট। তাই সেও চলে যায় ওয়াশরুম। আবার গান চলে। কিন্তু দিয়ার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। ও ঝিমিয়ে পড়তে থাকে। আমি ভয় পেয়ে যাই। দিয়া বাড়ি যেতে চাইলে আমি ওকে নিয়ে বেরোই। দিয়া বারণ করছিল। শুধু ওকে গাড়িতে তুলে দিতে বলছিল। কিন্তু আমি রাজি হইনি। সব গেস্টদের ভার একজনের ওপর দিয়ে আমি দিয়াকে নিয়ে বেরোবো বলে ক্যাব বুক করতে যাই। সেই সময় বোধহয় ওই হোটেলেরই একটা লোক আমায় বলে উনি আমাদের বাড়িতে ছেড়ে দেবেন।'

-লোকটা চেনা আপনার?

-না। তবে ওই রেস্টুরেন্টের ড্রেস পরেই ছিল মনে হয়। তখন আমাদের কারও অন্যদিকে নজর দেবার উপায় ছিল না। লোকটির কথায় রাজি হয়ে যাই। রূপক আর আমি দিয়াকে ধরে নিয়ে সাউথ সিটির বাইরে রাস্তায় আসি ৷

-রূপক কে?

-আমাদের বন্ধু।

-বাইরের রাস্তায় কেন এলেন? গাড়ি তো বেসমেন্টে থাকে।

-লোকটি বলল তার গাড়িটি বাইরে রাখা। ভিতরে রাখার জায়গা পায়নি। আমরা তখন বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। দিয়ার শরীর ভালো না। তার ওপর তুমুল বৃষ্টি৷ গাড়ি পর্যন্ত যেতে যেতেই ভিজে গেলাম। কোনওরকমে উঠে পড়তেই গাড়ি ছেড়ে দেয়। লোকটি গাড়িতে উঠেই ভালো করে স্যানেটাইজ করে দেয়।

-কী? স্যানেটাইজ করে?

-হুম। লোকটি খুবই হেলথ কনশাস মনে হল। নিজেও মুখের মাস্ক খোলেননি। গাড়িতে স্যানিটাইজার রাখেন। আমার বেশ ভালোই লাগল। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরেই আমার চোখটা কীরকম যেন টেনে আসতে থাকে। মাথা ঘুরতে থাকে। শরীরে অস্বস্তি হতে থাকে। আস্তে আস্তে ঝাপসা হতে থাকে সবকিছু। ঠিক কতক্ষণ পরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি আমার মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন ফিল করলাম আমার ডান পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। আমি এই বেডে শুয়ে আছি। আর কিছু মনে নেই।'

-হুম বুঝলাম৷

–দিয়া কোথায় স্বয়ম্ভুবাবু? দিয়া...

বন্ধুর বিপদের আশঙ্কায় চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে কিয়ারার স্বয়ম্ভূ একবার ডাক্তারের দিকে তাকাল। ইশারায় জানতে চাইল, এখন বলাটা ঠিক হবে কিনা। ডাক্তারও চোখের ইশারায় সম্মতি দিলেন। স্বয়ম্ভূ বড় করে একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, 'দিয়া আর নেই।' কথাট শোনামাত্রই কিয়ারার আঁতকে ওঠার কথা ছিল। ছটফট করে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই হল না। বরং নীরবে চোখ বন্ধ করে ফেলল। দুচোখ বেয়ে অবিরাম অশ্রু। স্বয়ম্ভুর একটু অবাকই লাগল। অপেক্ষা করতে থাকল কিয়ারা আর কিছু বলে কিনা তার জন্য। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন কিয়ারা কিছুই বলছে না তখন স্বয়ম্ভু নিজেই কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই কথা বলে উঠল কিয়ারা, 'আমি বলেছিলাম দিয়াকে।'

-কী বলেছিলেন?

-আপনাকে সবটা বলতে। কোনও কিচ্ছু গোপন না করতে।

স্বয়ম্ভু টানটান হয়ে বসল। 'কী গোপন করেছেন উনি?"

-দিয়ার কাছে দুদিন ধরে একটা ফোন আসছিল। আননোন নম্বর থেকে

-বেড়ালের ডাক?

উত্তরটা স্বয়ম্ভু দিয়ে দেওয়াতে দিয়া চোখে চোখ রেখে ওপর নীচে ঘাড় নাড়ল। 'আমি রিংব্যাক করেছিলাম। ডাজ নট এগজিস্ট। ফোনটা এলেই দিয়া ক্ষেপে উঠত। রাগে কাঁপত।'

-রাগে না ভয়ে?

-হতে পারে। কিন্তু ও কীরকম একটা হয়ে যেত।

-কিন্তু কেন? কে ফোন করত সে ব্যাপারে কিছু বলেছে আপনাকে?

-না। দিয়া খুব ডেয়ার ডেভিল মেয়ে। একমাত্র ফোনটা এলেই ওকে ভয় পেতে দেখতাম। আবার পরক্ষণেই ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করত। ড্রিঙ্ক করত, গান গাইত। জোরে মিউজিক সিস্টেম চালিয়ে গান শুনত। কিন্তু আর কিচ্ছু বলত না।

-এমন কারও নাম বলতে শুনেছেন যাকে আপনি চেনেন না বা চেনেন! ফোন এলেই তার নাম বলত দিয়া!

-না৷

-আর কিছু? মানে কোনও পার্সেল বা কিছু এসেছিল?

কিয়ারা একটু চুপ করে ভাবল। তারপর বলল, 'কোনও একটা ভিডিয়ো এসেছিল দিয়ার ফোনে।

-কীসের ভিডিয়ো?

-জানি না।

-ভিডিয়ো এসেছিল জানেন অথচ কীসের জানেন না?

-আমরা কেউ কারও পার্সোনাল জায়গায় নাক গলাতাম না। প্রাইভেসি মেইনটেইন করতাম।

-তাহলে আপনি কী করে জানলেন যে ভিডিয়ো এসেছিল? দিয়া বলেছিল?

-আমার সামনেই নোটিফিকেশন আসে। সেটাও একটা আননোন নম্বর। নোটিফিকেশনে ভিডিয়ো না অডিয়ো সেটা বোঝা যায়। আমি সেটুকুই বুঝেছিলাম। আমিই ফোনটা ওকে দিই। ও ইয়ার ফোন দিয়ে দেখতে শুরু করে। যত দেখে তত বুঝতে পারি ও প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে। চোখটা লাল হয়ে গিয়েছিল দিয়ার। আমি বলেছিলাম, কোনও প্রবলেম থাকলে বল। এখনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। স্বয়ম্ভুবাবুকে জানা সব। ও শোনেনি। সেদিন যদি একটিবার আমার কথা শুনত!

কেঁদে ফেলল কিয়ারা। স্বয়ম্ভু সান্ত্বনা দিল, 'কাঁদবেন না প্লিজ। আপনার শরীর ভালো না।'

-দিয়া নেই। আমি আর বেঁচে কী করব স্বয়ম্ভুবাবু?

-রেস্ট করুন। আমরা আজ আসি। পরে হয়তো কথা হবে। বাই দ্য ওয়ে, দিয়ার বাড়ির কোনও লোক আছে? আপনি চেনেন?

-ওর মা, বাবা সবাই আছে। বেহালায় থাকে। পর্ণশ্রীতে। কিন্তু ওর সঙ্গে বিশেষ একটা সম্পর্ক নেই৷

-কেন?

একবার স্বয়ম্ভুর চোখের দিকে তাকিয়ে চোখটা নামিয়ে নিল দিয়া। স্বয়ম্ভু জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার কারণে?'

-হ্যাঁ।

-ওদের ফোন নম্বর!

-আমার ফোনে ওর মায়েরটা ছিল।

-তাহলে তো পাওয়ার সম্ভাবনাই নেই। আপনাদের কারও কোনও ফোন পাওয়া যায়নি। সেটা টিল নাও সুইচড অফ। আসি কিয়ারা।

ফোনটা কেঁপে উঠল স্বয়ম্ভুর। কেবিন থেকে বেরিয়ে জিনসের পকেট থেকে ফোনটা বের করতেই দেখল ডক্টর তুহিনশুভ্র ফোন করেছে। 'হ্যাঁ তুহিনদা বলুন।

-আমার কাজ হয়ে গেছে। সত্যি বলতে আলাদা করে আর কিছু বলার নেই আমার

-সেম প্যাটার্ন তো?

-একদম। খুনটা হয়েছে রাত বারোটা থেকে একটার মধ্যে।

-কীভাবে খুন হয়েছে তার ভিডিয়োটাও পেয়েছি।

-মানে?

-আসছি। সব বলব।

২০

কিয়ারার প্রতিটা কথাই সঠিক। সাউথ সিটির সিসিটিভিতে যা যা দেখতে পাচ্ছে তার সবটার সঙ্গেই মিলে যাচ্ছে কিয়ারার সাক্ষ্য। শুধু এখানেও আগন্তুকের মুখে মাস্ক। তার নীচে চাপ দাড়ি, সম্ভবত। কারণ লোকটি খুব সুচতুরভাবে নিজের মুখটিকে পুরো জার্নিটাতেই নীচের দিকে করে রেখেছে। যাতে কোনও সিসিটিভিতেই সেটা স্পষ্ট ধরা না পড়ে। আরও একটি বিষয় লক্ষ করে স্বয়ম্ভু। কিয়ারা বলেছে, লোকটি রেস্টুরেন্টের ড্রেস পরেই ছিল। আসলে লোকটি সাদা জামা আর কালো প্যান্ট পরে আছে। যেটা ওয়েটারদের পোশাক। তাই তাড়াহুড়োতে মনে হয়েছে লোকটি রেস্টুরেন্টের। ওদিকে ধরে নেওয়া যায় এই লোকটিও ডিজেকে ইনভাইটেড গেস্টের পরিচয় দিয়েছিল। তাতেও অবিশ্বাস করার জায়গা নেই। কারণ লোকটি আদতে রেস্টুরেন্টের কর্মচারী নয় তাই ডিজে গেস্টের পরিচয়টাই বিশ্বাস করেছে। অতিথিরা সাদা কালো কম্বিনেশন তো পরতেই পারেন। প্রবল বৃষ্টি আর এলোপাথাড়ি হাওয়ার জন্য রাস্তাঘাট ঝাপসা। তার মধ্যেও গাড়িটাকে দেখার চেষ্টা করছে স্বয়ম্ভু। ক্যামেরাটা জুম করতেই গাড়িটার ছবি কাছে চলে আসছে। কিন্তু সেটাও ফাটা। 'দেখো তো নম্বরটা পড়তে পারছ?' কম্পিউটারে বসা ছেলেটি ভীষণ ভালো করে দেখে বলল, 'স্যার, পুরোটা তো বোঝা যাচ্ছে না। তবে লাস্ট তিনটে ডিজিট নাইন এইট নাইন মনে হচ্ছে।' হাতের কাছে একটা কাগজ আর একটা পেন টেনে নম্বরটা বড় করে লিখল স্বয়ম্ভু। নম্বরটার দিকে খানিক চেয়ে রইল। চোখ বুজল। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা কপালের মাঝখানে চেপে ঘষতে লাগল। পেন দিয়ে নম্বরটার ওপর বেশ কয়েকবার বোলাল। কোথায় দেখেছে নম্বরটা? নাইন এইট নাইন পরপর ছিল। শেষ কয়েকদিনেই দেখেছে স্বয়ম্ভু। কিন্তু কোথায়? চোখটা আবার সিসিটিভির ফুটেজের ওপর রাখল। তক্ষুনি মনের গহনে একটা আলোর ইশারা। গাড়ির পিছনের কাচে বজরংবলীর স্টিকার। এটা মোটেও আলাদা কিছু নয়। এখন রাস্তাঘাটে আকছারই এমন স্টিকার গাড়ির কাচে, অটোর গায়ে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এইটা স্পেশ্যাল। সেই রাতেও গাড়িটাকে ওভারটেক করতে গিয়ে স্বয়ম্ভুর চোখে পড়েছিল স্টিকার আর গাড়ির নম্বর। স্বয়ম্ভু বলল, 'গাড়ির নম্বরটা ওয়ান নাইন এইট নাইন। উনিশশো ঊননব্বই।' ছেলেটি চট করে ছবিটা আবার দেখে। এইবার ছেলেটির মনে হল, ঝাপসা অংশটায় ওয়ান সংখ্যাটাই যেন লেখা। 'হতে পারে স্যার। নাইনটিন এইট্টি নাইন-ই লেখা আছে বোধহয়।' -বোধহয় নয়। ওটাই লেখা। পিছনেই দাঁড়িয়েছিল অভিনব। সে বলল, 'এতটা শিওর কী করে হচ্ছেন স্যার?'

-শেষ দুদিনের মধ্যেই এই গাড়িটাকে আমি দেখেছি।

-কোথায়?

-শিয়ালদার কাছে।

-সেই গাড়িটাই যে এটা বুঝলেন কী করে? নম্বরটা তো স্পষ্ট নয়।

স্বয়ম্ভু হাসল। বলল, 'নম্বর স্পষ্ট নাই হতে পারে। বজরংবলীর স্টিকারও অজস্র গাড়িতে থাকতে পারে অভিনব। কিন্তু সেই স্টিকারগুলোর সবকটারই কী বাঁদিকটা ছেঁড়া হবে?'

স্বয়ম্ভুর কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে স্ক্রিনের দিকে এগিয়ে এল অভিনব। মনে মনে স্বয়ম্ভুর অবজার্ভেশনের তারিফ করে ঠোঁট উলটে হাসল। স্বয়ম্ভু মজার ছলে বলল, 'শুধু হাসলে হবে? গাড়িটার খোঁজ লাগাও। শেষ পনেরোদিনে, না না, শেষ তিনদিনে গাড়িটা কোথায় কোথায় গেছে? কে কে ভাড়া নিয়েছে সব বের করে ফেলো।'

-এখুনি করছি স্যার।

অভিনব দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। টেবিলের ওপর রাখা মোবাইলটা গোঁ গোঁ শব্দ করে কেঁপে উঠল। শিবাঙ্গী কলিং।

-বলে ফেলো।

-খেয়েছেন?

প্রথমটায় হোঁচট খেল স্বয়ম্ভু। পরক্ষণেই বলল, 'মা এখনও যায়নি?'

-জেঠিমা অনেকক্ষণ চলে গেছেন। আমি গাড়িতে তুলে দিয়েছি।

-ও। তার মানে এই প্রশ্নটা তোমার?

-হ্যাঁ। কেন করতে পারি না?

-হ্যাঁ তা পারবে না কেন? জুনিয়ররা সিনিয়ারদের ভালো মন্দ থাকার খবর নেবে এ আর এমন কী ব্যাপার? তবে তোমার কাছ থেকে অন্য প্রশ্ন আশা করেছিলাম।

-জানি। ওটা আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল।

-কোনটা?

-কিয়ারা কী বলল?

স্বয়ম্ভু হাসল। মেয়েটা ভারী বুদ্ধিমান। শুধু খিদে পেলে আর মাথার ঠিক থাকে না বেচারির। স্বয়ম্ভু গড়গড় করে রচনা বলে গেল। শেষে বলল, 'যেটা কিয়ারা জানে না সেটা হল, গাড়িতে উঠতেই ক্লোরোফর্ম স্প্রে করে দিয়েছে স্যানিটাইজের নামে। ঠিক এই কারণেই অপরাধীর মুখে মাস্ক। একটার বদলে দু-তিনটেও থাকতে পারে। তারপর গাড়িটা সাউথ সিটি থেকে বাইপাসে উঠেছে। ততক্ষণে গাড়ির মধ্যে দুজনেই অজ্ঞান। কিন্তু ওদের মোবাইলটা সুইচড অফ করতে ভুলে গিয়েছিল অপরাধী। তাই ওদের লোকেশন ট্র্যাক করে দেখা গেছে চিংড়িহাটার আগে বাইপাস ধাবা বলেnএকটা রেস্টুরেন্ট আছে। যেটা মেট্রোপলিটনে। সেই ধাবার পাশ দিয়ে গাড়ি ঘুরে ট্যাংরা এসেছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছে। সরি তার আগে খানিক চক্কর কেটেছে। কারণ ফাঁকা জায়গা খোঁজ করতে হয়েছে তাকে। তারপর সেটা দেখে কিয়ারাকে গাড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। বলতে পারো ছুড়ে ফেলেছে। মানে লোকটা বেশ ক্ষমতা রাখে। তার আগে গাড়ির মধ্যেই ভারী কিছু দিয়ে মেরে কিয়ারার পা ভেঙে দিয়েছে। তারপর ফেলেছে। এইখানে খেয়াল হয়েছে এই রে ফোন সুইচড অফ করা হয়নি তো। ব্যস, কাজ সেরে ফেলল। এরপর গাড়ি নিয়ে সোজা জাহান্নমে।

-জাহান্নাম!

-তা নয় তো কি স্বর্গ?

স্বয়ম্ভু কথা বলতে বলতে করিডোরে বেরিয়ে এসেছে। শিবাঙ্গী জিজ্ঞেস করল, 'কিয়ারার পা ভাঙল কেন?'

-দুটো কারণে। জ্ঞান ফিরলেই যাতে হাঁটতে বা দৌড়োতে না পারে আর অন্য কোনও কিছু ভাবার আগেই যাতে ও পায়ের যন্ত্রণায় ছটফট করে। তাহলে আর দিয়ার কথা বলার মত অবস্থায় থাকবে না।

-বাপ রে বাপ।

-আরও একটা খবর আছে।

-কী স্যার?

-দিয়াও সেই রহস্যময় ফোনটা পেয়েছে।

-ম্যাও?

-ইয়েস। সঙ্গে একটা ভিডিয়ো যা দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল দিয়া।

-তার মানে কী অরুণাকে খুন করার ভিডিয়োটা ওকে পাঠিয়েছিল?

-জানি না। যদি তাই পাঠায় তাহলে তো বীভৎস নৃশংস সেই ভিডিয়ো সেটা দেখেও আমাদের কিচ্ছু জানাল না দিয়া? একটা মেয়ের কত মানসিক শক্তি থাকতে পারে? নাকি ভিডিয়োটায় অন্য কিছু ছিল!

-অন্য আর কী... হ্যাঁ আরেকটা জিনিস হতে পারে স্যার।

-কী?

-ভিডিয়োতে এমন

কিছু ছিল যেটা শুধু ওকে ভয় দেখাতে নয়, ব্ল্যাকমেল করতে পাঠানো হয়েছিল। জাস্ট এমনি বলছি, ধরুন দিয়া কাউকে খুন করেছে। এবার সেই খুনের ভিডিয়োটা কেউ তুলে রেখেছে। এখন যে খুনগুলো করছে সেই হয়তো দিয়াকে দিয়ার করা অপরাধের ভিডিয়ো

পাঠিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। বা ও যে খুন হবে সেই কথা বলতে চাইছে।

-ভুল বলোনি শিবাঙ্গী। কিন্তু সেটাই বা কী? আমাদের সামনে একমাত্র অপরাধ শ্রীদেবীর রেপ কেস। যেটা প্রিয়াংশুর বিরুদ্ধে উঠেছে। যদিও এখনও তাকে জেরা করা হয়নি। শালা সময়ই দিচ্ছে না। আমরা কিছু ভাবার আগেই সে কিছু একটা ঘটিয়ে বসে থাকছে।

-বহুদিনের প্ল্যানিং স্যার। নইলে এতটা নিখুঁত অপরাধ চট করে কেউ করতে পারে না।

-সে তো বটেই। কিন্তু শ্রীদেবী এখন কোথায়? সে কী বেঁচে আছে? নাকি পাগল হয়ে কোনও মেন্টাল অ্যাসাইলামে আছে? নাকি তাকেও খুন করা.... না না, এরা খুন করেছে এটা আমার মন বলছে না।

-এমনও হতে পারে স্যার, এরা হয়তো খুন করতে চায়নি৷ কোনওভাবে হয়ে গেছে।

স্বয়ম্ভু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কোনও উত্তর না পেয়ে শিবাঙ্গী বলল, ‘তবে হতে পারে অনেক কিছুই। কিন্তু এখন একটা জিনিসই হবে।' -কী হবে?

-আপনার খাওয়া।

চোখ উল্টোলো স্বয়ম্ভু। “বুঝতে পেরেছি, সুচিত্রা দেবী এসে আমার জুনিয়রের ভালোই মগজ ধোলাই করেছেন।

-যদি করেই থাকে। অন্যায় তো কিছু করেননি। তার ওপর তিনি যখন আমার হারিয়ে যাওয়া মাসি তখন তো সে অধিকার তার আছেই।

-কী কী কী?

স্বয়ম্ভু প্রায় ভিরমি খায় আর কী! শিবাঙ্গী জোর দিয়ে বলল, 'হারিয়ে যাওয়া মাসি।'

-মানে?

-হে হে হে! আমার বাড়িতে আজ কত যে ড্রামা হয়ে গেছে ভাবতেও পারবেন না।

-শুনি একটু ছোটো করে৷

-আপনার মামারবাড়ি তো রাণাঘাট?

-ছিল। এখন আর কেউ নেই।

-আমার মামারবাড়িও রাণাঘাট। আর জেঠিমা আর আমার মা দুজনেই ছোটবেলার সই। প্রাণের সই যাকে বলে।

-বোঝো।

-তারপর আমার দাদুর পোস্টিং হয় আসানসোলে। মাকে নিয়ে চলে যায়। ব্যস, জেঠিমাও দু'হাত বাড়িয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে দেবদাসের পারোর মত চিৎকার করে বলেছিল, আরে ও অপর্ণাআআআআআ, ওয়াপস আনাআআআআআ!”

স্বয়ম্ভু গল্প শুনবে কী, হেসে খুন। আশেপাশে হেঁটেচলে বেড়ানো লালবাজারি লোকগুলো সন্দেহের চোখে স্বয়ম্ভুকে এক ঝলক দেখে নিয়ে চলে যাচ্ছে। খোশগল্প করছে স্বয়ম্ভু সেন! তাও আবার ফোনে! তার ওপর আবার হাসি। কেউ কেউ চোখ মেরে নীরব টিপ্পনি কেটে চলে যাচ্ছে। কতদিন বাদে এমন প্রাণখুলে হাসছে স্বয়ম্ভু।

-তার মানে তুমি আমার মাসতুতো বোন।

-একদম না। একই জায়গায় থাকলেই কী ভাই বোন হয় নাকি? তাহলে তো দেবদাস আর পার্বতীও...

বলতে গিয়েও থেমে গেল শিবাঙ্গী। স্বয়ম্ভুও ব্যাপারটা বুঝে ওঠার জন্য চুপ হয়ে গেল কিছু মুহূর্ত। তারপর বলল, 'হুমম। খুব চাপ!’

-আপনাকে আর চাপ নিতে হবে না। আপাতত খেয়ে নিন। রাখলাম।

ফোনটা কেটে গেল। স্বয়ম্ভুর বুকের বাঁদিকটা একটু যেন চিনচিন করে উঠল। নির্ঘাত গ্যাস হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ খিদে পেয়েছে। ক্যান্টিনের দিকেই পা বাড়াল স্বয়ম্ভু।

আচ্ছা, গ্যাস হলে কি বুকের বাঁদিকটাই চিনচিন করে শুধু?

-স্যার, স্বয়ম্ভু স্যাআআর।

দিব্যি ক্যান্টিনের দিকে এগোচ্ছিল। আবার কে পেছন থেকে ডেকে দিল। নাহ! আজ আর

খাওয়া হবে বলে মনে হচ্ছে না স্বয়ম্ভুর। রঞ্জিত ছুটে আসছে। ‘কী ব্যাপার রঞ্জিত! খবর আছে?

ক্লিন শেভ মুখে হাসলে ছেলেটার দুটো টোল পড়ে গালে। গায়ের রং তামাটে। চুলে লালচে আভা। রঞ্জিত বলল, 'হ্যাঁ স্যার। গতকাল দীপায়ন চ্যাটার্জির ফোন রাত এগারোটা দশের পর সুইচড অফ হয়ে গিয়েছিল। লাস্ট লোকেশন শিয়ালদা।'

-শিয়ালদা!

নিজেই বিড়বিড় করল স্বয়ম্ভু। স্মৃতির অতলে ডুব দিল নিমেষের জন্য।

-গতকাল সন্ধে থেকে রাতের মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন দীপায়নবাবু? কলতলার দিকটা দেখতে দেখতে প্রশ্নটা করেছিল স্বয়ম্ভু।

-বাসন্তী দেবী কলেজের ওখানে একটা কোচিং আছে। ওখানে পড়াই। সেটা কাল রাত ন'টা পর্যন্ত চলেছিল। কিন্তু তখনই বেরোতে পারিনি। এত বৃষ্টি পড়ছিল যে ওই সময় বাইক চালানো বিপদজনক হয়ে যেত।

-আপনি বাইকে যাতায়াত করেন?

-হ্যাঁ।

-তারপর?

প্রশ্নটা করতে করতেই বেগুনি রঙের রেনকোটের দিকে চোখটা আটকে গেল স্বয়ম্ভুর। কলতলার দড়িতে মেলা। দীপায়ন বলল, ‘প্রায় রাত দশটা বেজে গেল। বৃষ্টি কিছুতেই কমছিল না। কী করব কিছু ভেবে না পেয়ে জয় দুগগা বলে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ি ফিরলাম কখন জানেন?

-কখন?

-রাত সাড়ে বারোটার পর।

-এত দেরি কেন?

-বীভৎস জ্যাম। যেখানে সেখানে জল জমেছে। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মাঝে এমন ঝেঁপে নামল আবার একটা দোকানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ। তারপর....

-অত রাতে দোকান খোলা ছিল?

-না না। দোকান বন্ধ। দোকানের সামনে একটা শেড দেওয়া ছিল। তাই রক্ষে।

-কোথায়?

- অ্যাঁ?

-কোন জায়গায় অপেক্ষা করলেন?

-ওই তো ইসে... কোথায় দাঁড়ালাম যেন... হ্যাঁ জোড়া গির্জার কাছে।

-জোড়া গির্জা?

-হ্যাঁ। তালতলা।

-বুঝেছি। মানে আপনি জগদীশচন্দ্র ধরে এসেছেন।

-হ্যাঁ হ্যাঁ।

-আপনি কী ওটা দিয়েই যাতায়াত করেন রোজ?

-বেশিরভাগ সময়েই।

-স্যার কিছু ভাবছেন?

রঞ্জিতের ডাকে সম্বিৎ ফেরে স্বয়ম্ভুর। মনে মনে মেলাতে চেষ্টা করছে কিছু কথার সঙ্গে প্রমাণ। 'রঞ্জিত একটা কাজ কর তো, দীপায়নের লাস্ট কয়েকদিনের লোকেশনগুলো ট্র্যাক কর। কোথায় কোথায় গিয়েছিল। কতক্ষণ স্টে করেছে সব আমার ডিটেলস চাই।'

-শিওর স্যার। তবে একটু সময় লাগবে।

-কতক্ষণ?

-আজকের দিনটা।

-বেশ। আর একটু প্রদ্যুৎকে বলে দিয়ো আমি খেয়ে এসে ওর সঙ্গে বসব।

গালে টোল ফেলে হেসে ঘাড় নাড়ল রঞ্জিত। স্বয়ম্ভূ আবারও ক্যান্টিনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। হঠাৎ কী মনে হওয়াতে আবার ঘুরে রঞ্জিতকে ডাকল। রঞ্জিত দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল। শিয়ালদার এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে ফোনটা সুইচড অফ হয়েছে সেই অ্যাড্রেসটা নোট করে রাখতে বলল স্বয়ম্ভু। খেয়ে এসে দেখবে। রঞ্জিত আবারও ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

ক্যান্টিনে এসে বসল স্বয়ম্ভু। ঘড়ি দেখল। প্রায় চারটে বাজতে চলেছে। খাবারের অর্ডার দিয়ে মোবাইল কানে দিল। ‘স্বয়ম্ভূ সেন বলছি মিস্টার সমাদ্দার। আপনার একটা হেল্প চাই। আজই।'

২১

দিয়ার বাড়িতে খবর পৌঁছেছে। পর্ণশ্রী পল্লি পুলিশ স্টেশনের হস্তক্ষেপে সেটা সম্ভব হয়েছে। বাড়িতে বাবা, দাদা, বৌদি আর তাদের এক ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। দাদা আসতে চাইছিল না। বোনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক নেই দাদার। বাবার সঙ্গেও একই। কিন্তু বাবা তো, মেয়ের এমন খবর পেয়ে আসতে তো হবেই। পুলিশের সঙ্গে বয়স্ক মানুষটাই এসেছিল। লালবাজারে বসেই খবর পেল স্বয়ম্ভু। কিন্তু সব কথা যে আদৌ ওর মাথায় ঢুকেছে তা বলা যায় না। খবরটা যিনি দিতে এসেছিলেন হাত নেড়ে তাকে চলে যেতে বলে স্বয়ম্ভু। ওর চোখ এখন পেনড্রাইভ থেকে ডিলিট হয়ে যাওয়া ফাইলগুলোর দিকে। প্রাঞ্জলের প্রচেষ্টায় যেটুকু উদ্ধার করা গেছে তা দিয়ে এই কেসের মোড়টাই ঘুরে যেতে বসেছে। দীপায়ন আর মৃত্তিকার বিয়ের ছবি, মেয়ে হবার পরে ওদের দুজনের একসঙ্গে হাসিখুশি ছবি, মৃত্তিকার প্রেগনেন্ট থাকাকালীন কিছু ইউ এস জি রিপোর্টের স্ক্যানড কপি এবং দীপায়নের যে উপন্যাসটি এখনও প্রকাশের আলোয় আসেনি তার পিডিএফ কপিটি পাওয়া গেছে পেনড্রাইভ থেকে। যেগুলোকে ডিলিট করে দেওয়া হয়েছিল। যাতে বোঝা না যায় এই পেনড্রাইভটি আসলে কার! তার জায়গায় পুরে দেওয়া হয়েছে খুনের ভিডিয়োটা। এই মুহূর্তে স্বয়ম্ভুর মধ্যে এক অদ্ভুত মানসিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। প্রমাণ পাওয়ার আনন্দে হাসবে নাকি রহস্যের চোরা স্রোতে হারিয়ে যাবার ভয়ে কুঁকড়ে যাবে! মৃত্তিকার ঘরেই যে বসে আছে স্বামীর বেশ ধরে সেই কি তাহলে আসল খুনি! নাকি খুনের সঙ্গে শুধু জড়িত! কিন্তু খুনগুলো দীপায়ন কেন করবে? মোটিভ কী? বেচারি মৃত্তিকা জানেও না ও কার সঙ্গে দিবারাত্র ঘুরছে, ফিরছে, ঘুমোচ্ছে, সহবাস করছে। পান থেকে চুন খসলেই তলিয়ে যাবার অথৈ সম্ভাবনা। নাহ, কুঁকড়ে যাবার ছেলে স্বয়ম্ভু নয়। চট করে মোবাইল কানে দিল। উলটোদিক থেকে হ্যালো ভেসে আসতেই সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দিল, 'ঠিকুজিকুষ্ঠি উদ্ধার করা গেছে?'

- না স্যার। সারচিংয়ে গেছে। কালকের মধ্যে আশা করছি পেয়ে যাব সব।

-চাপ দাও। জলদি চাই।

-শিওর স্যার।

ফোনটা রেখে প্রাঞ্জলের দিকে তাকাল স্বয়ম্ভু। মুখে আলতো হাসি। তারপর ছেলেটির কাঁধ চাপড়ে বলল, 'আমার তরফ থেকে একটা বিরিয়ানি পাওনা রইল প্রাঞ্জল!' প্রাঞ্জল তো আহ্লাদে আটখানা। ঘরের মধ্যেই বছর পঁয়তাল্লিশের একটি লোক ডেস্কটপের সামনে বসে বলে উঠল, 'গোয়েন্দারাও ঘুষ দেয় তাহলে!' স্বয়ম্ভু ঘুরে বসল। লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'অ্যাপ্রিসিয়েশনটা যদি ঘুষ হয় তাহলে তাই।' লোকটি দমল না। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠল, 'অ্যাপ্রিসিয়েশনটা যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়ে ব্যক্তিবর্গের জন্য হয় তাহলে সেটা ঘুষ বলে পরিগণিত হয় না।' ঘরের মধ্যে একটা গুনগুন, খিসখিস হাসির রব উঠল। স্বয়ম্ভু বলল, 'বেশ তাই-ই হবে।'

-মঙ্গল হোক। জয় শিব স্বয়ম্ভু। তা শিবের পাশে শিবাঙ্গীটি কই? তেনার কি আজ হলিডে মুড?

-না। ফ্যামিলি মুড। আমিই বললাম আজ ওর বাবা মায়ের কাছে থাকা উচিত।

-ও হো, হ্যাঁ হ্যাঁ। কী বিপদ দেখো দিকি!

শিবাঙ্গীর বাড়ির অবস্থা ভেবে বেফাঁস মজা করার জন্য লোকটি নিজেই একটু লজ্জিত হল।

-স্যার আসব?

স্বয়ম্ভু বলল, 'হ্যাঁ বিকাশ এসো।' হাড়ের ওপর চামড়া জড়ানো ছেলেটি এগিয়ে এসে বলল, 'আপনার অনুমানই ঠিক। প্রথম তিনটে হাতের লেখাই এক। কিন্তু আজ সকালে যেটা দিলেন মানে প্রুফ দেখা কাগজটা সেখানে কিন্তু অন্য লোকের হাতের লেখা।'

-কী বলছ? দুজন?

-হ্যাঁ স্যার। আমি শিওর।

স্বয়ম্ভুর মুখে প্রাঞ্জল যে স্বস্তির হাসিটা ফুটিয়ে তুলেছিল সেটা নিমেষে উধাও হয়ে গেল। আবার মেঘ করে এল এক রাশ। স্বয়ম্ভু মোবাইল কানে দিয়ে ড্রাইভারকে বলল, 'তপন আমি বাড়ি যাব। আসছি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে গটগটিয়ে বেরিয়ে গেল। ডেস্কটপে কাজ করে চলা রসিক লোকটি বলে উঠল, 'প্রাঞ্জল! বিরিয়ানিটা গেল মনে হচ্ছে। যত নষ্টের গোড়া এই হাড়গিলেটা। আসার আর সময় পেলে না। এই তোর নাম বিকাশ কে রেখেছিল বল তো?"

বিকাশ আকাশ থেকে মাটিতে একেবারে হুড়মুড়িয়ে পড়ল। ছ্যারছ্যার করে কথা শুনিয়ে দিল লোকটি, 'গতর আর বুদ্ধি কোনওদিকেই তো বিকাশের লেশমাত্র নেই।'

কড়া করে এক কাপ কফি নিয়ে এসে বিছানায় বসল স্বয়ম্ভু। এই বাড়িতে এমনিতেই দুজন মানুষের বাস। তার মধ্যে আবার একজন নেই। বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে। একলা থাকতে ভালো লাগে না স্বয়ম্ভুর। এখন আবার ল্যাপটপে সেই বীভৎস বিচ্ছিরি ভিডিয়োটা চালিয়ে বসতে হবে ওকে। সকালে মৃত্তিকাদের বাড়িতে সম্পূর্ণটা দেখতে পারেনি। গা গুলিয়ে উঠেছিল। দিয়ার পেটের চামড়া ভেদ করে ছুঁচালো জুতোটা ঢুকে যাচ্ছে। স্তন ফেটে রক্তে ভিজে উঠছে। চোখের সামনে থেঁতলে যাচ্ছে পুরো শরীরটা। উফফফ! কী নৃশংস! তার ওপরে আবার গান, আজ না ছোড়ুঙ্গা তুঝে দমদমাদম। গানটা সিনেমাতেও হিরো-হিরোইনের পাঙ্গা নেবার প্রেক্ষাপটে ব্যবহার হয়েছিল। 'রিভেঞ্জ' এই একটাই শব্দ এখন স্বয়ম্ভুর মাথায় পাক খাচ্ছে। ইচ্ছে না থাকলেও ভিডিয়োটা আবার চালাল স্বয়ম্ভু। সেই একই দৃশ্য। তবে সকালের চেয়ে একটু কম ঘেন্না করছে। আসলে প্রথম ধাক্কাটা সয়ে নিয়েছে মস্তিষ্ক। যে ঘরে এই নারকীয় ঘটনা ঘটে চলেছে সেটা বেশ অন্ধকার। একটু ভালো করে দেখলে বোঝা যাচ্ছে কোনও একটা সিঁড়ির নীচের ঘরে এটা ঘটছে। মাথার ওপরের সিলিংটা স্লাইডিংয়ের মতো নেমে এসেছে। অর্থাৎ ওখান দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। মোবাইলটি একদম স্থির। বোঝাই যাচ্ছে কোনও স্ট্যান্ডে রাখা হয়েছে। বেশ কায়দা করেই রাখা যাতে খুনির মুখ ধরা না পড়ে।

কফির কাপে দুটো চুমুক দিল স্বয়ম্ভু। হঠাৎ ঠক করে কাপটা খাটের পাশের টেবিলের ওপর রাখল। ভেতর থেকে একটা ঝটকা অনুভব করল। এটা কী দেখল সে? ভিডিয়োটা একটু রিওয়াইন্ড করে আবার চালায়। খুনি লাফাচ্ছে। লাফিয়ে পা-টা নীচের দিকে নেমে আসার সময় তার গায়ের কালো জোব্বাটা বেশ খানিকটা ওপরে উঠে গেল। পা-টা আউট অফ ফোকাস। কিন্তু মোবাইলে সাবজেক্ট আর অবজেক্টের প্লেস চেঞ্জ হলে আলোর তারতম্য ঘটে। তখন অনেক সময়েই অস্পষ্ট ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার উল্টোটাও ঘটে। তেমনই এক সন্ধিক্ষণে ভিডিয়োটাকে বারবার পজ করছে স্বয়ম্ভু। একটি বিশেষ জায়গা পজ করে জুম করল। মুহূর্তে চোখটা বিস্ফারিত হয়ে গেল। ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে চোখটা উঠে গেল ফাঁকা দেয়ালটায়। পাশে জ্বলা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় স্বয়ম্ভুর মুখটা উদ্ভাসিত। কোনও কিনারা পেল? নাকি আরও কোনও ভয়ানক সর্বনাশের ইঙ্গিত সামনে এসে দাঁড়াল?

ভাবনার জগত থেকে খানিক বিরতি নিয়ে ভিডিয়োটা আবার প্লে করল স্বয়ম্ভু। দিয়ার শেষ নিশ্বাসটা বেরিয়ে গেছে। ক্যামেরার ফোরগ্রাউন্ডে দিয়ার মাথাটা এলিয়ে পড়েছে। চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে কপালের দিকে উলটে ক্যামেরার সামনে। যেন কোনও পিশাচের ঘুম ভেঙেছে। জিভটা মুখের বাইরে এসে নেতিয়ে পড়েছে। তবু লাফিয়ে চলেছে আততায়ী। ক্যামেরাটা একটু নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল আততায়ীর লাফানো। থেমে গেল গান। ঠিক তখনই আরও একটা শব্দ। কোথাও কোনও বাসন পড়ল! খুব সামান্য সময়ের জন্য বোঝা গেল শব্দটা। বারবার শুনল স্বয়ম্ভু। হচ্ছিল তো গান তাও খালি গলায় কতগুলো মেয়ে গাইছিল। হঠাৎ করে শেষের শব্দটা ধন্দ লাগিয়ে দিল। এই শব্দটা কীসের? এই ঘরটাই বা কোথায়? ঘরের দেয়ালে এমন কোনও মোটিফও চোখে পড়ল না যাতে পরে চিহ্নিত করতে সুবিধে হয়। আরও একটা ব্যাপার স্বয়ম্ভুকে ভাবিয়ে তুলল। দিয়ার পায়ের আঙুলগুলো খুনি কখন কাটল? মরে যাবার পর? নিশ্চয়ই তাই। নইলে দুপায়ের আঙুল কেটে নেবার পরেও

এতক্ষণ এই তীব্র অত্যাচার সহ্য করে বেঁচে থাকা অসম্ভব। খুনি তো এইভাবেই মেরে ফেলল। তাহলে পায়ের আঙুল কাটল কেন? আবারও কাউকে পাঠিয়ে ভয় দেখাবে বলে? নিজেই মাথার চুলগুলোকে ঘেঁটে দিল স্বয়ম্ভু। কিচ্ছু মাথায় আসছে না। কেবল অজস্র প্রশ্নের ঢেউ আছড়ে পড়ছে মস্তিষ্কের কোষে কোষে।

ড্রয়ার থেকে একটা খাতা বের করে খসখস করে লিখল স্বয়ম্ভু, 'দীপায়ন মিথ্যে বলল, কেন?' লাঞ্চ করে আসার পরই রঞ্জিতের ঘরে ঢুঁ মেরে ছিল স্বয়ম্ভু।

-রঞ্জিত হল?

-হ্যাঁ স্যার। গতকাল রাত দশটা নাগাদ বাসন্তী দেবী কলেজের কাছ থেকে বেরিয়ে দীপায়ন চ্যাটার্জি আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড ধরে বেনিয়াপুকুর হয়ে সোজা সুরি-লেনে গিয়ে থামে।

-সুরি-লেন?

-হ্যাঁ স্যার।

-মাঝে আর কোথাও দাঁড়ায় না? স্পেশ্যালি তালতলায় জোড়া গির্জা না কি যেন আছে ওখানে?

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে একটু দেখে রঞ্জিত বলে, 'না স্যার। সেরকম তো কিছু পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে ওই ট্র্যাফিকে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাও বেশিক্ষণ হয়। এক্কেবারে সুরি-লেনে গিয়ে দাঁড়ায়।

-দাঁড়াবার কতক্ষণ পরে সুইচড অফ হয়?

-মিনিট পাঁচেক পর

-আচ্ছা, কটা নাগাদ সুরি-লেনে ঢোকে?

-মোটামুটি এগারোটা দশ-পনেরো।

কথাটা শোনামাত্রই স্বয়ম্ভুর মনে পড়ে যায় শিবাঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে কলেজস্ট্রিট থেকে ফেরার সময়ের কথা। তপন ওদের সুরিলেনের মধ্যে দিয়েই নিয়ে এসেছিল। গলি থেকে বেরোবার আগেই একটা মোটরবাইক উল্টোদিক থেকে এসে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি আর বাইকের গতিতে যতটুকু দেখা সম্ভব হয়েছিল তাতে বাইক চালকের গায়ে রেনকোটই পরা ছিল। মুখ দেখা যায়নি হেলমেট, বৃষ্টি এবং পর্যাপ্ত আলোর অভাবে। এদিকে আজ সকালেই মৃত্তিকাদের বাড়ি থেকে বেরোবার সময় দীপায়নের বাইকটা বাইরে দাঁড় করানো ছিল। পিছনের চাকা এবং তৎসংলগ্ন বাইকের গায়ে প্রচুর কাদা জলের ছিটে। ওদিকে কলতলায় রেনকোট শুকোচ্ছিল দীপায়নের বাড়িতে। তার মানে কাল রাতে সেই সুরি-লেনে গিয়েছিল? কেন? কার কাছে? ফুলবাগানে এলে তো সুরি-লেন কোনওভাবেই ধরবে না। আগামীকাল ইন্সপেক্টর সমাদ্দার সিসিটিভির ফুটেজ দিলে এটা শিওর হওয়া যাবে।

স্বয়ম্ভূ আবারও খাতায় লিখল, 'অরুণা মারা যাবার দিন সুরি-লেনের মন্দিরে যায়। ওই অঞ্চল থেকেই অরুণার ক্যাব ড্রাইভারের পোশাক পালটে যায়।' এইটা লিখতে লিখতেই চড়াত করে মাথার মধ্যে আরও একটা কথা খেলে যায় স্বয়ম্ভুর। আবার লেখে সে, 'ছিল স্ট্রাইপ দেওয়া বা চেক কাটা শার্ট। হয়ে যায় কালো বোরখা বা জোব্বা। এদিকে ভিডিয়োতে খুনি একইরকম কালো রঙের জোব্বা বা বোরখা পরে। সেই ড্রাইভার আর এই খুনি কী একই লোক? যদি তাই হয়, তাহলে কে সে? শ্রীকুমার? কিন্তু এখানে দুজন ব্যক্তি আছে। দ্বিতীয় জন কে? দীপায়ন? কিন্তু কেন? দীপায়নের সঙ্গে শ্রীকুমারের দিদি শ্রীদেবীর সম্পর্ক কী? নাকি প্রিয়াংশু?"

প্রিয়াংশুর নামটা লিখতেই হারুনের কথাগুলো মনে হল স্বয়ম্ভুর। হারুন মণ্ডল একজন বিশ্বস্ত ইনফর্মার। প্রিয়াংশুর ওপর সন্দেহ হতেই তার ওপর নজরদারি করবার জন্য হারুনকে ফিট করে স্বয়ম্ভু। আজ সকালে হারুন ফোন করে জানিয়েছে প্রিয়াংশু কালকে শিয়ালদা গিয়েছিল। তবে সুরি-লেনে নয়। নেতাজি ইন্সটিটিউট হলে কিছু অনুষ্ঠান হচ্ছিল। তবে কখন বেরিয়েছে সেটা হারুন দেখতে পায়নি। কেন? হারুন তো বলল, একদম মেন গেটে

বসেছিল। তাহলে প্রিয়াংশু বেরোল কোন গেট দিয়ে? লুকিয়ে পালাল?

মাথা চুলকে নিয়ে পেনটাকে আবার কাগজে ঠ্যাকাল। কী লিখবে, কোনটা লিখবে সেটা ভাবতে ভাবতেই স্বয়ম্ভূ পেন চালাল। 'শ্রীকুমার যদি এই খুনগুলো করেই তাহলে প্রিয়াংশুকে কেন মারছে না? আসল কালপ্রিট তো সে।'

'শ্রীদেবীর রেপ কেসে তমালের নাম কেউ কোনওভাবে করেনি। তাহলে তমালকে কেন খুন হতে হল? কে খুন করল? তাও আবার পুলিশ সেজে!' 'তর্পণা আসলে কে? শ্রীদেবীর কেসের সঙ্গে তর্পণার সম্পর্ক কী? তর্পণার সঙ্গে দেখা করার পরেই কেন ওকে খুন হতে হল?''

'ক্যাফের সিসিটিভিতে দেখা গেছে, তর্পণা না থাকাকালীন তার ব্যাগ থেকে একটা ফোন বের করে কানে দেয় তমাল। সেটার পরেই খুব তড়িঘড়ি ব্যাগে পুরে দেয়। কেন? তারপর তর্পণা আসতেই কোনওরকমে উঠে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায় তমাল।'

'তর্পণার একটা গোপন ফোন আছে। সেটা লুকিয়ে গেল কেন?'

এত পর্যন্ত লিখে দুহাত মাথার ওপর ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল স্বয়ম্ভু। ডানহাতটা গিয়ে পড়ল একটা প্যাকেটের ওপর। কড়মড় করে শব্দ হল। ইসসস, একদম ভুলেই গিয়েছিল এটার কথা। প্যাকেটের ভিতরে সাজিয়ে রাখা একগুচ্ছ পাতা অর্ধেকটা বের করতেই বেরিয়ে এলো লেখাটা। কালো কালিতে মোটা করে টাইপ করা 'অন্তরালের মানুষ'।

২২

বাজের আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল মৃত্তিকার। পাশেই ছোট্ট মশারিটার মধ্যে শুয়ে থাকা মেয়েটা নড়ছে। কী ভাগ্য কেঁদে ওঠেনি। দরজা-জানলা বেশ ভালোভাবেই আঁটসাঁট করে বন্ধ করা। তাও বাইরে থেকে যা শব্দ ভেসে আসছে তাতে বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে যাচ্ছে। ঘরে নীল রঙের নাইট ল্যাম্প জ্বলছে। ছ'মাসের মেয়েটা ছোট্ট ছোট্ট হাত-পাগুলো নাড়িয়েই চলেছে। খিদে পেলে মেয়েটা এরকম করে। এদিকে ব্রেস্ট ফিডও করে না। নার্সিং হোম থেকে বাড়িতে আসার পর থেকেই কৌটোর দুধ খায় মেয়ে। মৃত্তিকার পাশের বিছানা খালি। এত রাত হল এখনও দীপায়ন লেখাপড়া করছে? উফফফ! একটু যে মেয়ের পাশে এসে বসবে সে সময়টুকু নেই। বিছানা ছেড়ে টেবিলের কাছে গেল মৃত্তিকা। বাইরে আবার একটা বাজ পড়ল। দুধের কৌটো হাতে নিতেই দেখল তাতে দুধ নেই। খেয়াল হল আগের দুধ সব ফুরিয়ে গেছে বলে দীপায়নকে দুধ আনতে বলেছিল। কিন্তু সে কী এনেছে? এখন মেয়েকে ঘরে একা রেখে বেরোতে হবে। ঘুম চোখে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরোল মৃত্তিকা। ডাইনিং ঘুটঘুটে অন্ধকার। খুব সন্তর্পণে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিল। দু-পা এগোতেই অবাক হল সে। অন্য সময় দীপায়নের পড়ার ঘরে আলো জ্বলে। সেটা দরজা বন্ধ থাকলেও বোঝা যায়। বন্ধ দরজার নীচ দিয়ে আলোর রেখা চোখে পড়ে। কিন্তু আজ তো সেটা দেখতে পাচ্ছে না! মৃত্তিকার গা-টা কেন কে জানে ছমছম করে ওঠে। সকালে ওইরকম বীভৎস ভিডিয়োটা মৃত্তিকাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। কে জানে, ওর কপালে কী নাচছে! দীপায়ন কী ওই ঘরেই ঘুমিয়ে পড়ল? বন্ধ দরজার কাছে এসে দীপায়নের নাম ধরে গলা চেপে দু-তিনবার ডাকল মৃত্তিকা। বাইরের ঝলসে ওঠা বাজের আলো ডাইনিংয়ে পড়তেই কী যেন একটা নড়ে উঠল। আঁতকে উঠে পিছনে তাকাল মৃত্তিকা। এক দলা অন্ধকার যেন চোখের পলকে সরে গেল। পরের ডাকটায় গলাটা কেঁপে উঠল মৃত্তিকার। দীপায়নকে কতবার বলেছে একটা রাতের আয়াও রাখতে। প্রত্যেকবার বাজে খরচের হিসেব দেখিয়েছে। এদিকে নিজেও পাশে থাকবে না। দিনরাত খালি ঘরে দোর দিয়ে বই মুখে করে বসে থাকবে। 'এই দীপায়ন, শুনছ? কী গো?' দরজার ওপর একটু চাপ দিতেই পাল্লা দুটো খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। দরজা খোলা! অন্যদিন তো ভিতর থেকে কষে বন্ধ করা থাকে। ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায় না বলে ও ঘর থেকে এ ঘরে ফোন করতে হয়। বেচারা এই ঘরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃত্তিকা দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। 'এই শুনছ, মেয়ের দুধ এনেছিলে তুমি?' অন্ধকার থেকে কেউ সাড়া দিল না। ঘরে দেয়াল হাতড়ে সুইচ টিপে দিল। ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠল। পিছনে ফিরতেই চিৎকার করে উঠল মৃত্তিকা। ভয়ানক দৃশ্যটা দেখে বইয়ের ক্যাবিনেটে পিঠ ঠেকে যেতেই কয়েকটা বই দুমদাম করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। দীপায়নের রক্তাক্ত শরীরটা বইয়ের টেবিলের ওপর থেকে ঝুলে আছে। বুক, পেট থেঁতলে রক্ত-মাংস, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে। চোখ উলটে বিস্ফারিত। জিভটা বাইরে বেরিয়ে এসে মুখের ডান পাশ দিয়ে লকলক করে ঝুলছে। টেবিল চুঁইয়ে মাটিতে নেমে আসছে গাঢ় তাজা রক্তের ধারা। চোখে অন্ধকার নেমে আসছে মৃত্তিকার। বাইরে বাজের তাণ্ডব আর বৃষ্টির উন্মত্ত লীলা আরও যেন বেড়ে গেছে। জোর করে চোখ টেনে ধরল মৃত্তিকা। মনে পড়ল ঘরে মেয়ে একা শুয়ে। কিন্তু দরজা-জানলা সব ভালো করে বন্ধ। তাহলে কে খুন করে গেল?

গেল? নাকি এখনও এই বাড়িতেই আছে! ভাবতেই বাইরের বৃষ্টি অঝোরে নামল মৃত্তিকার চোখের কোল বেয়ে। মোবাইলটা বিছানাতেই পড়ে আছে। পা দুটো প্রচণ্ড ভারী হয়ে গেছে মৃত্তিকার। কিছুতেই নড়াতে পারছে না। বাড়িতে ঢুকে এইরকম নৃশংসভাবে মেরে দিয়ে গেল আর ও কিচ্ছুটি টের পেল না? গলা ছেড়ে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু কেউ যেন ওর মুখ চেপে ধরে ফিসফিস করে বলছে, 'চুপ চুপ। চিৎকার করিস না। সে শুনে ফেলবে। সে যে এখনও এই বাড়িতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে! পা দিয়ে চেপে পিষে মেরে ফেলবে তোকে।' দমটা বন্ধ হয়ে আসছে মৃত্তিকার। কিন্তু আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। ঘরে তাকে যেতেই হবে। মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে। নিজের ভিতর থেকেই নিজেকে ঠেলে ঘরের

বাইরে নিয়ে এল মৃত্তিকা। নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে খুব। সত্যিই কেউ যেন দুটো পায়ের চাপে হৃদপিণ্ডটাকে পিষে দিতে চাইছে। কে দাঁড়িয়ে আছে বুকের ওপর। হঠাৎ বাজের আওয়াজ ভেদ করে একটা সুর ভেসে এল। থমকে গেল মৃত্তিকা। কে গুনগুন করে গাইছে? কে? একটা লোকের গলা। না না, লোক নয়, ছেলে। মৃত্তিকা স্পষ্ট বুঝতে পারছে একটা কিশোর বয়স্ক ছেলেই গাইছে গানটা। 'আজ না ছোড়ুঙ্গা তুজে দম দমা দম!' ঘর থেকে ছ'মাসের মেয়েটা কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। মৃত্তিকার হৃদযন্ত্রটা এবার পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। সেটা আর ফুলছে না। চুপসেও যাচ্ছে না। সব ভয়কে উপেক্ষা করে দৌড়ে ঘরে যায় মৃত্তিকা। দরজা খুলতেই নীল নাইট ল্যাম্পের আলোয় একটা কালো অন্ধকার যেন দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা বিছানায় নেই। সেই আগন্তুক আততায়ীর কোলে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো জোব্বায় ঢাকা মানুষটা গানটা গেয়েই চলেছে। মৃত্তিকা কান্না জড়ানো কাঁপা গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'ছেড়ে দাও আমায় মেয়েটাকে।' লোকটি কথা শোনে। বলা মাত্রই কোলে ধরে থাকা মেয়েটিকে ছেড়ে দেয়। ছ'মাসের মেয়েটি আছড়ে পড়ে মাটিতে। বাচ্চাটির কঁকিয়ে ওঠা শেষ কান্নার সঙ্গে মিশে যায় মেয়ের নাম ধরে ডেকে ওঠা মৃত্তিকার আর্ত চিৎকার, শ্রীদেবীইইইইই।'

'ম্যায় তেরি দুশমন, দুশমন তু মেরা, ম্যায় নাগিন তু সাপেরা... ম্যায় নাগিন তু সাপেরা...'

-উফফ! কিছু নাচত!

কচুরিতে কামড় দিয়ে কথাটা বলল স্বয়ম্ভু। চোদ্দ ইঞ্চি রঙিন টিভিতে শ্রীদেবীর নাচ আজও সুপারহিট। শুধু শিবাঙ্গীই বুঝতে পারছে না সাত সকালে কী কারণে এই মৌলালিতে এনে নাস্তা করাচ্ছে তার বস। 'কী গো কিছু বলো।' শিবাঙ্গী অমনি গেয়ে উঠল, 'আমার বলার কিছু ছিল ন। ব্যোমকে গেল স্বয়ম্ভু, 'আরিত্তারা! গলায় তো দিব্যি সুর আছে?'

-মা ঘাড় ধরে দুবেলা রেওয়াজে বসাতো। রবীন্দ্রসঙ্গীতে ফিফথ ইয়ার আর নজরুলগীতিতে থার্ড ইয়ার কমপ্লিট।

-বলো কী?

-বাজে কথা রাখুন। এত সকালে এখানে আমরা এসেছি কেন জানতে পারি? তার ওপরে এই কচুরি!

-ভালো না?

-মোটেও না।

-যাহ! ভাবলাম তোমার ভালো লাগবে তাই নিয়ে এলাম। আর তোমার ভালোই লাগছে না?

-বুঝেছি। নির্ঘাত নির্দিষ্ট সময়ের আগে চলে এসেছেন তাই এইভাবে সময় কাটাচ্ছেন। একা একা বোর হবেন তাই আমায় ডেকেছেন৷

স্বয়ম্ভুর গলাটাই পালটে গেল। তুলতুলে রসগোল্লার মতো নরম মিষ্টি স্বরে বলল, 'তোমার ভালো লাগছে না? সত্যি করে বলো!''

এ কী! স্বয়ম্ভু সেনের মুখে এ কেমন কথা! ঠাট্টা করছেন কি? শিবাঙ্গীর কথা হারিয়ে গেল কেন? হঠাৎ এই কথা কেন বলছেন উনি? ওনার শিবাঙ্গীর সঙ্গ সত্যি ভালো লাগে নাকি গতকাল শিবাঙ্গী খাবার কথা জিজ্ঞেস করে একটু বেশিই দরদ দেখিয়ে ফেলেছে বলে আজ আচ্ছা করে চাটছেন! এই লোকটার হাবভাব বোঝা বোধকরি শিবেরও অসাধ্য।

-বাবা রে বাবা! একটা সহজ কথাই তো জিজ্ঞেস করলাম ভাই। এতে এত কীসের ভাবনা?

-না না ভাবছি না।

লজ্জা পেল শিবাঙ্গী।

-ভেবো না। ভালো না লাগলেও কচুরি খাও। সিনিয়াররা যা দেয় জুনিয়রদের তাই হাসিমুখে খেতে হয়। এটা সর্বদা মনে রাখব। শিবাঙ্গী হাসল।

-আসলে কী বলো তো শিবাঙ্গী, কোনও বড় কাজে যাবার জন্য একটু খেয়েদেয়ে বুদ্ধি বাড়িয়ে নিতে হয়। পেটে না পড়লে তো ঘটে কিছু ঢোকে না, না?

-কার?

-অবভিয়াসলি তোমার!

-ভালোই তো খোঁটা দিতে পারেন। শুধু কচুরিটা যদি ভালো দোকানের হত তাহলে কাজের কাজ হত।

-ভালো করে কাজ কর। খাওয়াব।

-মাংসের খিচুড়ি।

চোখ উল্টিয়ে তাকাল স্বয়ম্ভু। শিবাঙ্গী যেন দেখতেই পেল না এমন ভান করে কচুরি চিবোতে লাগল।

স্বয়ম্ভুদের গাড়িটা সুরি-লেনের মধ্যে ঢুকেছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্বয়ম্ভু এক পথচারীকে প্রশ্ন করল, ‘দাদা, সতেরোর বাই দুইটা কোথায়? লোকটি পিছন ফিরে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, ‘একদম সোজা চলে যান। রাস্তাটা ডানদিকে বেঁকে বাঁদিক নেবে। বাঁকের থেকে ডানহাতে চারটে বাড়ি পরেই সতেরোর বাই দুই '

-থ্যাংক ইউ দাদা।

গাড়ির কাচ তুলে তপনকে এগোতে বলল। শিবাঙ্গীর মোবাইলে লোকেশন ম্যাপ খোলা আছে। এক জায়গায় আসতেই শিবাঙ্গী বলে উঠল, ‘এই তো স্যার সতেরোর বাই দুই। তপন গাড়ি থামাও।' গাড়ি থামল। শিবাঙ্গী আর স্বয়ম্ভু নামল। শিবাঙ্গী বলল, 'স্যার পরশুদিন এখান দিয়েই এলাম না?' স্বয়ম্ভু শুধু একবার হুম বলল।

-স্যার এখানেই তো ওই পুরোহিতের বাড়ি।

স্বয়ম্ভু ভুরু কুঁচকে তাকাল। ‘এখানেই আশেপাশে কোথাও।' তখন তপন বলল, ‘ওই কাপড়ের গাঁঠরি তুলছিল তো যে?' শিবাঙ্গী বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানেই না?' তপন বলল, 'মনে হচ্ছে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। ওই সামনে যে ডানদিকে রাস্তাটা বেঁকেছে ওইদিকে।'

-রাইট রাইট।

শিবাঙ্গী বলল। স্বয়ম্ভু চারপাশটা ভালো করে দেখছিল। বলল, ‘এইখানে, এই সতেরোর বাই দুই বাড়ির সামনেই দীপায়নের বাইক থেমেছিল পরশু।'

-নক করি?

-চলো।

শ্যাওলা রঙের দরজায় কারও নাম নেই। কেবল মোটা দুটো লোহার কড়া ঝুলছে। সেটা ধরেই তিন-চারবার নাড়তে ভিতর থেকে দরজা খুলে গেল। তারপরেই দরজার এপার আর ওপারে অপার নীরবতা। এক তরফ বলল, ‘তোমরা!' আরেক তরফের প্রশ্ন, ‘আপনি?' পরের প্রশ্নটা ধেয়ে গেল স্বয়ম্ভুর দিক থেকে, ‘এই বাড়িটা আপনার?'

-অ্যাঁ হ্যাঁ। কেন? মানে তোমরা আমার কাছে!

মিশ্রঠাকুর বাড়িতে গোয়েন্দা দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। মুহূর্তের মধ্যে স্বয়ম্ভুর স্বর পালটে গেল। ভাব বদলে গেল। কপাল চুলকে হেসে ফেলল। বলল, ‘দেখেছেন তো। দিনরাত খুনে ডাকাত, চোরছ্যাঁচড়দের পেছন পেছন ঘুরতে ঘুরতে মাথাটাই কাজ করে না। আমি আসলে আপনার কাছেই এসেছিলাম। ভাবলাম এই বাড়ির লোককে জিজ্ঞেস করি আপনার বাড়িটা কোনটা? কিন্তু এটাই যে আপনার বাড়ি ভাবতে পারিনি। সেদিন রাতে অন্য একটা জায়গায় দেখলাম আপনাকে তাই... যাক গে। আসতে পারি?'

-হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এসো এসো।

শিবাঙ্গী একদম চুপ। খেলা কোনদিকে ঘুরতে চলেছে বুঝতে পারছে না। শুধু এটুকু বুঝছে স্যার যেদিকে খেলা ঘোরাবে ওকেও সেদিকেই খেলতে হবে। সরু অন্ধকার প্যাসেজটা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই বোঝা যায় বাড়িটা বহু প্রাচীন। দরজা দিয়ে ঢুকে খানিকটা গেলে ছোট্ট মতন একটা উঠোন। সেখানে ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে আলো আসার মত এক ফালি আলো মাথার ওপর খোলা আকাশ থেকে নামছে। বাড়িটার হাড়গোড় বেরিয়ে পড়েছে।

কমন একটা চামসে গন্ধ। না, শুধু চামসে গন্ধ নয়। সঙ্গে আরও একটা বোটকা গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারছে। এই ধরণের বাড়িগুলোতে এমন গন্ধ হামেশাই পাওয়া যায়। মিশ্রঠাকুর ছোট্ট উঠোনে এসে বেশ গলা তুলে বলে ওঠেন, 'কোলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা আমার বাড়িতে এসেছেন এটা ঠিক আমার জন্য আনন্দের না ভয়ের সেটাই বুঝতে পারছি না।'

-আমরা তো সামনেই আছি পুরোহিতমশাই। এত চিৎকার করার কী আছে?

বোকা বোকা হাসি ছড়িয়ে পড়ল মিশ্রঠাকুরের মুখে। সৌজন্যের হাসি ঠোঁটে নিয়ে বললেন, 'আহ...আসলে, উত্তেজনায়। যত বয়স বাড়ছে ততই যেন অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছি।'

-কত বয়স আপনার?

ফস করে এমন একটা প্রশ্ন যে করা হবে বুঝতে পারেননি মিশ্রঠাকুর। -না... মানে, আমার বয়সের কী আর গাছপাথর আছে বাবা। বলো বলো, আমার কাছে কী দরকারে এসেছ?

স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী একবার চোখাচোখি করে নিল। দুজনেই বুঝেছে বয়সের কথা উনি বলতে চান না। স্বয়ম্ভু বলল, 'একটু বসে কথা বললে ভালো হত।' এবার বেশ লজ্জায় এবং অস্বস্তিতে পড়লেন মিশ্রঠাকুর। এই ভাঙাচোরা বাড়ি, স্যাঁতস্যাঁতে দেয়াল, শ্যাওলা পড়া উঠোন। এখানে কোথায় যে বসতে দেবেন ভেবে পেলেন না। অবশেষে নিজের ঘরেই নিয়ে গেলেন। যত্ন করে চাদর ঝেড়ে বসালেন। স্বয়ম্ভুর কাশি শুরু হল হঠাৎ করেই। মিশ্র তড়িঘড়ি দৌড়লেন রান্নাঘরের দিকে। কাশতে কাশতেই স্বয়ম্ভুর চোখ বনবন করে ঘরের কোণায় কোণায় ঘুরে নিল। চাদর তুলে খাটের তলা, আলমারির খাঁজ, আলনায় কাপড়-জামার আড়াল সবকিছু ছানবিন করে আবার নিজের জায়গায় বসল। ইতোমধ্যে জল হাতে চলে এসেছেন মিশ্রঠাকুর। স্বয়ম্ভু ঢক ঢক করে পুরো জলটা খেয়ে ফাঁকা গ্লাসটা খাটের পাশের টেবিলে রাখলেন। 'বলো বাবা, আমি কী দরকারে লাগতে পারি।' স্বয়ম্ভূ গলা ঝেড়ে বলল, 'আসলে আমার এক দাদার বিয়ে। এই সামনের মাসেই। আমার ইচ্ছে এই বিয়েতে আপনি পৌরহিত্য করেন। না করতে পারবেন না।'

-ওরে বাবা! না কেন করব? এ আমার সৌভাগ্য বৈ কি! তা কবে বিয়ে?

-একুশে অগাস্ট। ওই দিনটাই সবচেয়ে ভালো।

-কোথায়?

-বেহালা। পর্ণশ্রী।

-ওরে বাবা। সে তো বিস্তর দূর। এই বয়সে আমি ....

-শুরুতেই বলেছি ঠাকুরমশাই। না বললে শুনব না। এখানে আপনার যা নাম-ডাক সে তো আর এমনি নয়। আমি সব খোঁজ নিয়েছি।

-গোয়েন্দা বলে কথা। খোঁজ তো নেবেই। বেশ। তুমি যখন বলছ তখন আমিই করব।

-নিশ্চিন্ত হলাম। উঠি ঠাকুরমশাই।

বলেই দাঁড়িয়ে পড়ল স্বয়ম্ভু। মিশ্র অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'প্রথমবার এলে। শুধু মুখে যেতে হচ্ছে। ভাগ্নেটাও নেই যে একটু মিষ্টি ফিষ্টি কিছু ...।'

-ওসব কিচ্ছু লাগবে না। আপনার ভাগ্নে কোথায়?

-কাজে গেছে।

-এত সকালে শাড়ির দোকান খুলেছে?

-অ্যাঁ? না না, দোকানে তো পরে যায়। আগে তো ওকে গোডাউনে যেতে হয়।

-ও আচ্ছা। আজ তাহলে চলি ঠাকুরমশাই! তারিখটা মনে রাখবেন, একুশে অগাস্ট।

আলতো হেসে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লেন মিশ্রঠাকুর। স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী গাড়িতে উঠে সামনে গিয়ে ডানদিকে বেঁকে গেল। মিশ্রঠাকুর হাসলেন। দরজা বন্ধ করতে করতে আপন মনে বিড়বিড় করলেন, 'পাগল গোয়েন্দা একটা। সাত সকালে এসে ফাজলামো করে গেল! হে হে হে হে!'

ভিতরে আসতেই একটা ছায়া সিঁড়ির আলো থেকে মিশ্রঠাকুরের সামনে এসে দাঁড়াল।

মিশ্রঠাকুর বললেন, ‘হুঃ! বীরপুঙ্গব একেবারে। আমি পুলিশের ভয়ে রাতে ঘুমোতে পারছি না বলে আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছে। এদিকে বাড়িতে যেই গোয়েন্দা এল অমনি ঘরের কোণে সেঁধিয়ে গেলেন।' তিরু জানতে চাইল, ‘কী বলল?' হাসলেন মিশ্রঠাকুর। বললেন, ‘কী আর বলবে? অসহায় ন্যালাভোলা পুরুতের সঙ্গে একটু মশকরা করে গেল।'

-মানে?

মিশ্র ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। ফিরে তাকালেন ভাগ্নের দিকে। চোখের মণিদুটো শানিত তলোয়ারের মতো ঠিকরে আসা আলোয় ঝিকিয়ে উঠল তার। বললেন, ‘ভাদ্রমাসে ওনার দাদার বে দিচ্ছেন। আর সেই বে নাকি আমায় দিতে হবে।' আবারও খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসতে হাসতে ঘরের দিকে যাবে বলে পা বাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে আবারও দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। মিশ্রঠাকুর আর ভাগ্নে দুজনেই মুখোমুখি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাইরের দরজায় দুবার কড়া নাড়ার শব্দ হতেই আরও একটা দিক থেকে দরজা ধাক্কাবার শব্দ হতে থাকে। তিরু অবাক হয়ে বলল, ‘পিছন দরজা কে ধাক্কাচ্ছে?'

-পাড়ার কেউ হবে হয়তো দেখ। আমি এদিকটা দেখছি। তুই আবার চট করে এধারে আসিস না।

দুজন দুদিকে চলে গেল। মিশ্রঠাকুর দরজা খুলতেই দেখলেন ওই গোয়েন্দার মেয়ে সহকারীটা দাঁড়িয়ে। শিবাঙ্গী বলল, 'স্যার বোধহয় মোবাইলটা আপনার ঘরে ফেলে গেছেন।

-ও হো। এসো এসো।

ওদিকে তিরু দরজা খুলতেই মাথায় বাজ। সানগ্লাস চোখে এঁটে দাঁড়িয়ে আছে গোয়েন্দা স্বয়ম্ভু সেন। স্বয়ম্ভু বিস্মিত হবার ভান করে বলল, “তুমিই তো মিশ্রঠাকুরের ভাগ্নে তিরু।' আর তো লুকোবার উপায় নেই। তাই বাধ্য হয়েই ঘাড় নাড়তে হল।

-আমি তোমার মামাকে ভুল ডেট বলেছি জানো তো? দেখি সরো তো, আরেকবার গিয়ে বলে আসি।

তিরু কিছু বলার আগেই স্বয়ম্ভু প্রায় হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই বলে, ‘তোমাকে তো প্রচুর শাড়ি বাড়িতে এনে রাখতে হয় না?”

-হুম।

-ইসসস কী কষ্ট। কিন্তু বাড়ির পেছন দিয়ে কেন আনো? এইরকম একটা ভয়ানক সরু গলি। তার ওপর আবার বাঁক। একটা মানুষই ঠিকমত যেতে পারে না। এবার থেকে সামনের রাস্তা দিয়ে মাল ঢোকাবে। যাক গে, তোমার মামাকে বলে আসি। '

ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও মোবাইলটা পাওয়া গেল না। শিবাঙ্গী প্রায় বোকার মত বাইরে বেরিয়ে এল। মিশ্রঠাকুর বললেন, ‘ওই মোবাইলে একটা কল করে দেখুন না।'

-করেছি। বাজছে। কিন্তু কেউ ধরছে না। সাইলেন্ট করা আছে তো।

এই সময়েই মিশ্রঠাকুরের চোখ পড়ে স্বয়ম্ভুর দিকে। পিছনের প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে আসছে। ‘দেখুন তো ঠাকুরমশাই, আবার গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেলেছি। আপনাকে সম্পূর্ণ ভুল তারিখ বলে গেছি। ওটা একুশে অগাস্ট হবে না। পনেরোই অগাস্ট। একুশ তারিখটা তো ভাদ্র মাস পড়ে যাচ্ছে। হিন্দুদের কী ওই মাসে বিয়ে হয় নাকি? এদিকে আপনিও কিছু বললেন না। দিব্যি বললেন ওই দিন যাবেন। কী কাণ্ড হত বলুন তো?”

-পৌষেও বিয়ে হয় না। কিন্তু সে মাসেও আমি বিয়ে দিয়েছি। আসলে যারা বিদেশে থাকে তারা ওই মাসটায় ছুটি পায়। তাই দেশে ফিরে ওই সময় বিয়ে সেরে নেয়। আমিও সেরকমই কিছু ভেবেছিলাম।

মিশ্রঠাকুরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেপে নিল স্বয়ম্ভু। লোকটা ধূর্ত না বুদ্ধিমান?

-আপনার ভাগ্নে কখন এল? বললেন যে কাজে চলে গেছে।

-এই তো তোমরা ডানদিকে গেলে। আর ও বাঁদিক দিয়ে মানে মেন রোড দিয়ে এল। গোডাউনের একটা চাবি ওর কাছে ছিল। নিতে ভুলে গিয়েছিল।

-অ। তা এখন নিয়েছ তো তিরু?

তিরু নীরবে ঘাড় নাড়ল। 'আপনার ভাগ্নেটি কথা কম বলে না?' স্বয়ম্ভুর প্রশ্নে উত্তর দেবার সময়েই ঠাকুরমশাইয়ের ফোনটা ট্যাংট্যাং করে বেজে উঠল। আদ্যিকালের সেট। ফোনের রিংটোনটা কান জ্বালিয়ে দিল। 'হ্যাঁ বলুন।' ঠাকুরমশাই ফোনে কথা বলতে লাগলেন। 'না না।... হ্যাঁ ঠিক আছে। আরে বাবা বুঝতে কেন পারছ না?... উফফফ কী করে বোঝাই! শোনো আমি পরে কথা... হ্যালো। হ্যালো... ধুস! নেটওয়ার্ক হয়েছে এক। একটা কথা ঠিক মতো বলা যায় না।' নিজের মনে গজর গজর করে স্বয়ম্ভুর দিকে তাকালেন। স্বয়ম্ভূ বলল, 'দেখেছেন, আবার ভুলে যাচ্ছিলাম। আপনার ফোন নম্বরটাই নেওয়া হয়নি। দিন দিন। এই শিবাঙ্গী, আমার ফোনটা তো পাচ্ছি না। তোমারটায় একটু সেভ করে নাও তো।'

-ইয়েস স্যার।

মিশ্রঠাকুর সবে বলতে শুরু করেছে, 'নাইন এইট থ্রি ফাইভ...' ট্যাং ট্যাং ট্যাং, আবার ফোনটা ঝনঝনিয়ে উঠেছে। মুহূর্তে ফোন রিসিভ করেই মিশ্রঠাকুর বলে উঠলেন, 'মইলে ভনে পছারি কল গরছু। ফরেস্ট কো ছৌমা এতি কমতিমা হুদাইনা। পরে কল গরছু। (আমি বললাম তো পরে কল করছি। ফরেস্টের কাছে এত কমে হবে না। ব্যস্ত আছি। পরে কল করছি। ' বলেই ফোনটা কেটে দিলেন। কথার ধরণ শুনে মনে হল মিশ্রপুরোহিত ফোনের ওপারের লোকের প্রতি বেশ বিরক্ত। স্বয়ম্ভুর মুখের দিকে চাইতেই কিছু একটা আঁচ করলেন ঠাকুরমশাই। শিবাঙ্গী আর স্বয়ম্ভুর মুখে নির্বাক বিস্ময়! তিরু যেন একটু ছটফট করছে। স্বয়ম্ভূ বলল, 'বাবা! উত্তেজনায় আপনি নেপালিও বলেন? নেপালে কোনও আত্মীয়-টাত্মীয় থাকেন নাকি?'' মিশ্র কী বলবে বুঝতে পারে না। আমতা আমতা করে বলেন, 'না না, নেপালে কেউ নেই। ওই চাকরিসূত্রে মেদিনীপুরে এক নেপালি বন্ধু জুটেছিল। তার সঙ্গে থাকতে থাকতেই এই ভাষাটা জেনেছি। সেই ফোন করেছিল।'

-বাহ! দারুণ ব্যাপার। কিন্তু কর্মসূত্রে মানে? আপনি চাকরি করতেন?

-হ্যাঁ, ওই বাবার ঠ্যালায় পড়ে ওখানকার কারখানায় কাজ শুরু করি। তারপর আর মন টেকে না। শনি মহারাজ ডেকে নেন। সেই থেকে পুজো করছি।

বটেই তো। বড় ঠাকুরের ডাক স্বর্গের কোনও ঠাকুর এড়াতে পারেন না, সেখানে মিশ্রঠাকুর এড়াবেন কী করে? তা বলছিলাম এই বাড়িটা তো আপনাদেরই?

মিশ্র ভালোই বোঝেন ঠারেঠোরে ঠিকুজিকুষ্টি জেনে নিচ্ছে গোয়েন্দাটি।

'হ্যাঁ আমাদেরই। ঠাকুরদার বাবা তৈরি করেছিলেন।'

-বাআআবাআ! শতাব্দী প্রাচীন! চলি ঠাকুরমশাই। ও হো, ফোন নম্বরটাই তো পুরো নেওয়া হল না।

মিশ্রঠাকুর ফোন নম্বরটা আবার বলেন। শিবাঙ্গী সদর দরজার দিকে এগোতে থাকলে স্বয়ম্ভু বলে ওঠে, 'শিবাঙ্গী, গাড়ি তো পেছন দরজায়। ওদিকে চলো।' তিরুর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে এক গাল হেসে স্বয়ম্ভু বলে, 'আসি তিরুবাবু। আবার দেখা হবে।' কথাটায় কী কোনও শ্লেষ ছিল! তিরু সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল।

গাড়িতে উঠেই শিবাঙ্গী খেয়াল করল স্বয়ম্ভুর মুখে আলতো হাসি চলকাচ্ছে।

-স্যার হাসছেন? তার মানে ক্লু পেয়েছেন কিছু?

-ক্লু বলে ক্লু? অনেক কিছু মিলে যাচ্ছে!

-একটু শুনতে পারি?

-তার আগে তুমি কী বুঝলে বলো।

-আমি বুঝলাম বলতে, এই বাড়িটা আর এই লোকটা মানে মিশ্রঠাকুর বেশ রহস্যময়। পুরোহিত বেশ বুদ্ধিমানও। ভাগ্নে নেই বলে যে ঢপটা মেরেছিল সেটা শুধু ম্যানেজ করল তাই নয়, আপনার বলা ভাদ্র মাসে বিয়েটাও যে ভুল ছিল সেটা শুরুতেই ধরতে পেরেছিল।

-কারেক্ট। তাই পয়সাকড়ির কথা জিজ্ঞেসই করেনি। আর?

-মিশ্রঠাকুর ভুল ম্যানেজ করতে ওস্তাদ উইথআউট এনি ফাম্বেল অ্যান্ড হেজিটেশন।

-আর?

-উমমম....

ভাবল শিবাঙ্গী। তারপর বলল, ‘আর একটা প্রশ্ন, বাড়ির সামনে অমন বড় দরজা থাকতে পিছনের দরজা দিয়ে কাপড়ের গাঁঠরি তোলে কেন?”

-আর?

শিবাঙ্গী এবার একটু অস্বস্তিতে পড়ল। ‘আরও?’

-সবথেকে বড় জিনিসটাই তো বললে না।

-কোনটা?

-লোকটা শুরুর দিন থেকেই মিথ্যে বলে গেছে আমাদের। যারা মেদিনীপুরের লোক হয় তারা চট করে মে-দি-নী-পুর বলে না। মিদনাপুর বলে। কিন্তু মিশ্রঠাকুর পরিষ্কার করে বললেন, মেদিনীপুর। কথায় কোনও মেদিনীপুরের টানও নেই। উপরন্তু নেপালি ভাষায় বেশ পোক্ত। লোকটা ভিতরে ভিতরে সত্যিই আমাদেরকে দেখে ভয় পেয়েছে। স্পেশ্যালি আজকে।

কিন্তু শুরু থেকেই যেন কিছুই হয়নি সেরকম শান্ত গলায় আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল। অথচ ব্যাটার বুকের মধ্যে দোদোমা ফাটছিল। হঠাৎ করে ফোনটা আসায় সেটাই বেরিয়ে আসে। সঙ্গে নেপালি ভাষা।

-কিন্তু ওনাকে দেখে তো নেপালি মনে হয় না।

-তোমায় দেখে কী হিন্দিভাষী মনে হয়? নাকি ব্রিটিশ মনে হয়? কিন্তু তুমি তো হিন্দি আর ইংলিশটা ভালোই বলো।

-তার মানে ওই নেপালি বন্ধুর কেসটা সত্যি?

-ধুস। ওটাও ডাহা ঢপ। লোকটা এমন কোনও জায়গায় থাকত যেখানে নেপালি বলার চল আছে এবং জঙ্গল আছে। আমি শিওর সেখানে ওর কোনও বাড়িও আছে।

-কী করে?

-নেপাল বাদে কোথায় কোথায় নেপালি লোক থাকতে পারে?

-পাহাড়ে। মানে সিকিম, দার্জিলিং এইরকম নর্থ সাইডে।

-কিন্তু সেখানে জঙ্গল আছে কী?

শিবাঙ্গী চুপ করে ভাবল। স্বয়ম্ভু বলল, ‘কোথায় গেলে লোকে জঙ্গলের কাছে থাকতে চাইতে পারে?'

-ডুয়ার্স!

-সেই সম্ভাবনাই বেশি। লাটাগুড়ি, চাপড়ামারি, রাজাভাতখাওয়া এইসব সাইডে খবর নিতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। শিবাঙ্গী খোঁজ লাগাও।

-শিওর স্যার।

-আরও কিছু খটকা! ঘরের মধ্যে অত রুমফ্রেশনারের বোতল কেন? কোনও সাধারণ মানুষের বাড়িতে এত রুম ফ্রেশনারের বোতল থাকে নাকি?

শিবাঙ্গী প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, ‘হ্যাঁ আমিও খেয়াল করেছি। ঘরের মধ্যে তিনটে রুম ফ্রেশনার।' এক ঝলক শিবাঙ্গীর দিকে দৃষ্টি হেনে স্বয়ম্ভু বলল, “খাটের তলায় আরও চারটে ছিল।'

-ও বাবা!

-শুধু তাই নয়। খাটের নীচে কালো বুট জুতো। আট নম্বরের। এদিকে সদর দরজার কাছে আরেকটা চটি সাত নম্বরের। মিশ্রঠাকুর বেশ লম্বা। তাই তার পায়ের মাপ অবধারিতভাবে আট। আর তিরুর হাইট তার মামার চেয়ে খাটো। পায়ের পাতাও ছোট। স্বাভাবিকভাবেই তার সাত নম্বর জুতো।

-ফরেনসিক এর ডক্টর তুহিনশুভ্র বলেছিলেন খুনির পায়ে সাত বা আট নম্বর জুতো ছিল। আর সে মেয়ে।

- সম্ভবত মেয়ে।

‘সম্ভবত' শব্দটার ওপর জোর দিল স্বয়ম্ভু। ‘আমি তো তোমার জুতো পায়ে গলিয়ে কাউকে খুন করতেই পারি।'

-তাহলে তো এরা দুজনেই করতে পারে। কিন্তু কেন? খামোকা এদেরই বা খুনি বলে সন্দেহ করছি আমরা?

-ক্রমশ প্রকাশ্য।

শিবাঙ্গী মনোক্ষুন্ন হল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। স্বয়ম্ভু বলল, ‘একজন পুরোহিত বুট পরে কোথায় যাবে?”

-আগে কারখানায় চাকরি করত। হয়তো তখনকার।

-হতেই পারে। কারণ বুটটা বেশ পুরনো। কিন্তু এটা...

বলেই থেমে গেল স্বয়ম্ভু। চোখ বন্ধ করে মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে দিল। গাড়িটা কিছুক্ষণ চুপচাপ এগিয়ে চলল গন্তব্যের দিকে। এক সময় স্বয়ম্ভু মাথাটা সোজা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, “আমাকে কয়েকদিনের জন্য একটু আউট অফ স্টেশন যেতে হবে। তুমি সামলাতে পারবে না?

ঝট করে এমন একখানা বোমা ফেলবে স্বয়ম্ভু সেটা ভাবতেও পারেনি শিবাঙ্গী। ‘আ...আমি! একা?' ঘাবড়ে বলে উঠল।

-একা কেন? পুরো ডিপার্টমেন্ট তোমার সঙ্গে থাকছে। আমিও ফোনে ফোনে থাকব।

মুখের ওপর পারব না একথা বলা যাবে না। কিন্তু ভেতর থেকে জোরও পাচ্ছে না। তবু বাধ্য হয়ে বলল, 'বেশ। কবে যাবেন?'

-কাল বা পরশু।

অজান্তেই চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল শিবাঙ্গীর। বেচারির অবস্থা দেখে এত চিন্তার মধ্যেও মনে মনে হাসল স্বয়ম্ভূ।

২৩

মাথার কাছে খোলা জানলা। মাঝ সকালের আলোটা ত্যারচা হয়ে মৃত্তিকার কপালে এসে পড়েছে। চোখ বুজে শুয়েছিল। একটা হাত কপাল স্পর্শ করতেই চোখ মেলে চাইল। 'জ্বরটা ছাড়ছে।' মৃত্তিকা জুলজুল করে তাকিয়ে আছে দীপায়নের দিকে। দীপায়ন মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সপ্রেমে। 'কী হয়েছিল তোমার? ভোর রাতে ওরকম চেঁচিয়ে উঠলে! তারপরেই অজ্ঞান হয়ে গেলে।' খুব অস্ফুট স্বরে মৃত্তিকা বলে উঠল, 'দেবী?' নরম স্বরে উত্তর দিল দীপায়ন, 'তোমার পাশে। ঘুমোচ্ছে।' ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েকে দেখে নিল দুচোখ ভরে। গায়ের ওপর হালকা চাপা দেওয়া। কুণ্ডলী পাকিয়ে মায়ের গা ঘেঁষে অকাতরে ঘুমোচ্ছে মেয়ে। মৃত্তিকা দীপায়নের হাত ধরে নিজের মুখে চেপে ধরে। নীরবে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। 'কী হয়েছে মৃত্তিকা? ভয় পেয়েছ? আমি আছি তো?'

-বীভৎস স্বপ্ন। ভয়ানক।

-বুঝেছি। ওই ভিডিয়োটাই যত কাল করেছে। কিচ্ছু হবে না মৃত্তিকা। আমি বলছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। পুলিশ আর গোয়েন্দা ঘিরে রেখেছে আমাদের। ভয় কীসের? তুমি শুধু ভুলভাল কথা ভাবা বন্ধ কর। যা শুরু করেছ তাতে আর ডায়টেশিয়ানের কাছে গিয়ে ওজন কমাতে হবে না। এমনিই দশ কেজি কমে যাবে। শোনো, সামনে মেয়ের অন্নপ্রাশন। সবাইকে বলা হয়ে গেছে। তুমি কত প্ল্যান করেছ বলো তো? সকালে জলসইতে যাবে একটা শাড়ি পরে, মেয়েকে ভাত খাওয়াবার সময় আরেকটা আবার বিকেলে রিসেপশনে আরেকটা। মোট তিনটে শাড়ি কিনিয়েছ মনে থাকে যেন। একটাও আলমারিতে না পড়ে থাকে। পার্লার বুক করেছ?

মৃত্তিকা দুপাশে ঘাড় নাড়ল।

-দেখেছ, সেটাও কি আমি করব?

-ফোনে বুকিং হয় না। যেতে হবে।

-তা যাও। জ্বরটা কমলে বেরোও। কিচ্ছু হবে না। বুক করে এসো। আমার কলেজে যাওয়ার তো আজকেও বারোটা বাজিয়ে দিলে। এমন করলে চাকরিটা থাকবে?

-জানো, ওই ভয়ংকর স্বপ্নে আমি দেবীকে শ্রীদেবী বলে ডেকে ফেলেছি। দীপায়নের মুখে যে প্রেমিক মনটা ছায়া ফেলেছিল নিমেষে সেটা বিস্ময়ের অতলে তলিয়ে যায়। 'স্বপ্নে মানুষ সেটাই দেখে যেটা সে মন থেকে করতে চায় বা বলতে চায়। এই নামটা তো আমি দিয়েছিলাম। তোমার তো একদম পছন্দ নয়। তাহলে স্বপ্নে ডাকলে কেন?''

-আমি জানি না।

জামার বুক পকেটে রাখা ফোনটা বেজে ওঠে দীপায়নের। হাতে নিয়ে দেখে। মৃত্তিকার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ফোনটা ধরে। 'হ্যাঁ বল...। কে?... কেন?' দীপায়নের ভুরুটা কুঁচকে ওঠে। এরপর অনেকক্ষণ চুপ করে শোনে। কুঞ্চিত ভ্রু দুটোর নীচে চিন্তায় ডুবে যাওয়া চোখটা আরও একবার মৃত্তিকাকে দেখে নেয়।

-এত তাড়াতাড়ি!... বড্ড কম সময়।... দেখছি। রাখলাম।

ছেঁড়া ছেঁড়া কথাগুলো শুনে মৃত্তিকার বুকের মধ্যেটা কেমন যেন করে উঠল। ফোন রাখতেই জিজ্ঞেস করল, 'কে ফোন করেছিল গো? কীসের কম সময়?'

-তিন বান্ডিল খাতা দিয়েছে। এদিকে দুদিনের মধ্যে নাকি জমা দিতে হবে কলেজে। আবার কলেজ থেকে ছুটিও দেবে না। অদ্ভুত। কোন দিকটা যে সামলাব?

নিশ্চিন্ত হল মৃত্তিকা। বলল, 'আমায় নিয়ে ভেবো না। আমি ঠিক আছি। তাড়াতাড়ি কাজ সারলে তোমারই ভালো। অনুষ্ঠানে ফ্রি হয়ে যেতে পারবে। দীপায়ন হাসল। সত্যি, এইভাবে ভেবে দেখেনি বিষয়টা।

-তুমি শুয়ে থাকো। আজ বাইরে থেকে খাবার অর্ডার করে দেব।

-এই গাড়িটা আপনাদের?

গাড়ির নম্বর লেখা চিরকুটটা রিসেপশনে বাড়িয়ে দিল অভিনব। রিসেপশনের দেওয়ালে বড় করে লেখা 'ময়ূরী কার রেন্টাল কোম্পানি'। সালোয়ার পরা মেয়েটি দেখে বলল, 'হ্যাঁ স্যার। এটা আমাদের।' অভিনব বলল, 'গতকাল পর্যন্ত শেষ তিনদিন এই গাড়িটা কোথায় কোথায় ভাড়া গেছে তার ডিটেলস প্রোভাইড করুন।'

-সরি স্যার।

খামোকা একটা জোয়ান ছেলে এসে হিসেব চাওয়াতে মেয়েটি অবাক হয়ে যায়। অভিনব পকেট থেকে আই কার্ড বার করে দেখাতেই মেয়েটির মুখের গড়নটাই পালটে যায়। তুতলিয়ে বলে ওঠে, 'ও...ওকে স্যার। একটু সময় লাগবে।'

-বেশি সময় নেই। কুইক।

-আচ্ছা। দিচ্ছি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সব ডিটেলস চলে এল অভিনবর হাতে। লিস্টে বেশ অনেকজনের নাম, সময়, গাড়িটা কোথা থেকে কোথায় গেছে সব উল্লেখ আছে। সেখানে একবার চোখ বুলিয়ে মেয়েটিকে অভিনব বলল, ''আপনারা কাস্টমারদের আই কার্ড রাখেন তো?''

-হ্যাঁ স্যার।

-এদের প্রত্যেকের আই কার্ডের প্রিন্ট আউট দিন।

-বলেছি স্যার। এখুনি নিয়ে আসছে।

-থ্যাংক ইউ।

-স্যার চা, কফি কিছু?

-না থ্যাংকস।

একটু পরেই সব ডকুমেন্টস হাতে চলে এল। অভিনব নামগুলোতে চোখ বোলাতে থাকল। এক এক করে নামতে নামতে বারো নম্বরে এসে ওর চোখ আটকে গেল। নাম নয়, সময়টা সন্দেহজনক। গাড়িটার আউট টাইম বৃহস্পতিবার মানে যেদিন দিয়া খুন হয় সেদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আর ইন টাইম পরেরদিন ভোর পাঁচটা দশ। গাড়ি যিনি ভাড়া নিয়েছিলেন তার নাম দয়াময় সান্যাল। আই কার্ডের জেরক্সগুলো অফিসের ভিতর থেকে সরাসরি অভিনবর হাতে চলে এল। সবার আগে সে দয়াময় সান্যালের ছবিটা দেখল। ভোটার আই কার্ডের ছবি। সাদা কালোয় কিছুই বোঝার উপায় নেই। তবে আরও একটা জায়গায় গিয়ে চোখটা আটকে গেল অভিনবর।

তুমুল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গাড়িটা সূর্য সেন স্ট্রিট থেকে ডানদিকের গলিতে ঢুকে গেল। উল্টোদিকে আরও বেশ কিছু পরে রাতের দিকে বাইকটা মৌলালি ক্রস করে শিয়ালদার দিকে এগিয়ে গেল। ভিডিও পজ করে নম্বর মেলাবার চেষ্টা হল। একে বৃষ্টি, তার ওপর রাত। ছবি অনেকটাই ঝাপসা। তবু নম্বর প্লেটে লেখার অবয়বগুলোর সঙ্গে স্বয়ম্ভুর হাতে ধরা নম্বরের আঁকিবুকি মিলে যাচ্ছে। বাইকের রং, আরোহীর রেনকোট, হেলমেট সবই মিলছে। মৌলালির ট্রাফিক সিগনাল সবুজ হতেই শিয়ালদার দিকে এগিয়ে গেল বাইকটা। একটা সময় পর অন্ধকারে বাইকটা মিলিয়ে গেল। পরের সিসিটিভিতে দেখা গেল বাইকটা ঝড়ের গতিতে এসে সুরি-লেনের গলিতে ঢুকল। তার কয়েক সেকেন্ড পরেই বেরিয়ে এল স্বয়ম্ভুদের বোলেরো। ভিডিয়ো বন্ধ হল।

চেয়ারে এলিয়ে চোখ বুজল স্বয়ম্ভু। শিবাঙ্গী বলল, 'সবই তো মিলে গেল স্যার। ওটা দীপায়নই ছিল।'

-হুম। কিন্তু অত রাতে সতেরো বাই দুই বাড়ির সামনে থামল কেন? শিবাঙ্গী খোঁজ শুরু করেছ?

-পঙ্কজ মিশ্র?

-হুম।

-সকালেই নর্থ বেঙ্গলের পি এসগুলোতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি।

-বেশ। প্রিয়াংশুকে কখন আসতে বলেছ?

হাত উলটে ঘড়ি দেখে শিবাঙ্গী বলল, 'বিকেল চারটের মধ্যে।'

সুস্মিতা আজ বুটিকে এসেছে। অফিস যাবার পথে প্রিয়াংশু নামিয়ে দিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে ভয় কাটাবার চেষ্টা করছে। সুস্মিতা নিজেও বুঝেছে এইভাবে ভয় পেয়ে ঘরে বসে থাকলে ও পাগল হয়ে যাবে। তাই আজ দোকানে এসে সকাল থেকেই হিসেবনিকেষ দেখছে। নতুন নতুন ডিজাইন করার চেষ্টা করছে। এখন দুপুর সাড়ে তিনটে। বাইরে বেশ বৃষ্টি পড়ছিল খানিক আগেই। সঙ্গে মেঘের ডাক। অবশ্য এখন খানিকটা ধরেছে। কাচের দরজা ঠেলে বেগুনি রঙের রেনকোট চাপিয়ে একজন ঢুকে এল। সারা গা থই থই করছে জলে। দরজা থেকে সুস্মিতার ডেস্কের কাছে আসতেই দোকানটা ভিজে গেল রেনকোট থেকে ঝরা জলে। বেশ বিরক্তির স্বরে লোকটাকে কথা শোনাতে গিয়েও চুপ করে গেল সুস্মিতা। লোকটি তার আগেই পকেট থেকে কার্ড বের করে দেখিয়েছে। এই ক'দিনে কোলকাতা পুলিশের লোগো দেখে দেখে চোখ সয়ে গেছে সুস্মিতার। লোকটি মাস্কের আড়াল থেকে গম্ভীর গলায় বলল, 'স্যার আর্জেন্ট কিছু কথা বলতে বললেন। একটু আলাদাভাবে বলতে হবে।' আবার কী হল রে বাবা! তবে কী আজ রাতেই কিছু হবে বলে স্বয়ম্ভু লোক পাঠিয়েছে? সবেমাত্র ভয়টাকে কাটিয়ে উঠছিল। আবার কোথা থেকে কোলা ব্যাঙের মতো থুপথুপে ভয়টা ঝাঁপিয়ে পড়ল সুস্মিতার ঘাড়ে। 'ও! ভেতরে চলুন। মীনাক্ষী তুমি একটু এদিকটা সামলে নিয়ো।'

- হ্যাঁ হ্যাঁ।

পুলিশের লোকটি কড়া গলায় হুকুম করলেন মীনাক্ষীর উদ্দেশ্যে, 'কোনও কাস্টমার ঢুকলে আমাদের এনকোয়্যারিতে প্রবলেম হবে। তাই আপনি যদি একটু বাইরে দাঁড়িয়ে কাউকে ঢুকতে না দেন ভালো হয়।'

-ওকে ওকে স্যার। নো প্রবলেম।

লোকটি বাঁহাতের পাঁচটা আঙুল ছড়িয়ে বলল, 'জাস্ট পনেরো মিনিট! '

-আচ্ছা।

হাসিমুখে কথাটা বলে বেরিয়ে গেল মীনাক্ষী।

দুরুদুরু বক্ষে পুলিশকে নিয়ে ঘরে ঢুকল সুস্মিতা। পুলিশটি ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। তখন নিজের চেয়ারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সুস্মিতা। সজোরে এক রদ্দা পড়ল ঘাড়ের কাছে। আঁক করে শব্দ বেরিয়ে এল সুস্মিতার মুখ দিয়ে। চোখ অন্ধকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই ধরে নিল পুলিশটা। যত্ন করে মাটিতে শোয়াল। শব্দ হল না কোনও। রেনকোটের পকেট থেকে বেরিয়ে এল গ্লাভস। দুহাত ঢেকে গেল তাতে। তাকে সাজিয়ে রাখা একটা সুন্দর শাড়ি বেছে নিল পুলিশ। রানি রঙের শাড়ি। দুহাতে উল্টেপাল্টে দেখল সেটা। তারপর দ্রুত হাত চালিয়ে কষে বেঁধে দিল মুখ। তারপর আরও চারটে শাড়ি দিয়ে বাঁধা হল দুটো হাত, দুটো পা। মোট পাঁচটা শাড়ি বেঁধে ফেলল সুস্মিতাকে। আরও একটা শাড়ি ভালো করে নিজের মুখের চারপাশে জড়িয়ে গায়ের মধ্যে জাপটে নিল। পুলিশটার হাত ঢুকে গেল রেনকোটের ভিতরে থাকা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে। সেখান থেকে বেরিয়ে এল ধারাল ছুরি। সজোরে গেঁথে গেল সুস্মিতার বুকের মাঝখানটায়। খ্যাচ করে শব্দ হতেই সুস্মিতার শরীরটা একবার ওপরের দিকে ঝাঁকিয়ে উঠল। তারপর নিথর। কিন্তু আততায়ী থামল না। বুক থেকে লম্বা করে ছুরির ঘা দিতে দিতে পেট অব্দি নামল। শেষে দুটো উরুতে একের পর এক আঘাত করে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। সুস্মিতার শরীরটার ওপর ঝুঁকে কুকুরের মত হাঁফাচ্ছে আততায়ী। ছুরিটা ডান পায়ের পাতার কাছে নিয়ে এল। ধারালো অংশটা দিয়ে চামড়া কেটে পাশাপাশি দুটো গোল চিহ্ন আঁকল। দুটো গোলের মাঝেই ছুরির মুখটা দিয়ে খুঁচিয়ে দুটো ফুটো করে দিল। রক্ত গড়াতে থাকল চামড়ার কাটা অংশটা দিয়ে। পায়ে বাঁধা নতুন শাড়িতে ভালো করে মুছে নিল রক্তাক্ত ছুরিটা। উঠে দাঁড়াল। দরজাটা সাবধানে খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখল। কেউ নেই। রক্তের ছিটে লাগা রেনকোট পরে ঢুকে গেল ওয়াশরুমে। অতি সন্তর্পণে রেনকোটটা গা থেকে খুলে কলের তলায় মেলে ধরল। ধুয়ে গেল সব রক্তের দাগ।

জলের সঙ্গে মিশে অতি সহজে এঁকেবেঁকে চলে গেল অন্ধকারের গর্ভে। ছুরিটাও ভালো করে ধুয়ে টাওয়েলে মুছে পুরে নিল ব্যাগের ভিতর। আবার গায়ে চাপিয়ে নিল রেনকোট। বাইরে বৃষ্টিটা ধরেছে। বাথরুম থেকে বেরোতে গিয়েও একটু থমকালো আততায়ী। হাতের গ্লাভসটাও ধুয়ে, গায়ে পরে থাকা পুলিশের পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। দরজাটা আলতো ফাঁক করে দেখল এখনও দোকান খালি। রেনকোটের বোতাম লাগাল না। শেষবারের মতো সুস্মিতার লাশের কাছে গিয়ে বলল, 'তোর কপালটা খুব ভালো। বেঁচে থাকতে বেশি কষ্ট পেলি না।' তাক থেকে একটা নতুন শাড়ি অত্যন্ত সাবধানে তুলে নিয়ে 'সুস্মিতা'স বুটিক' লেখা প্যাকেটে পুরে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে। মীনাক্ষীকে বলল, ‘সুস্মিতা ভেতরের ঘরে একটা কলে আছেন লালবাজারের সাথে। এখন ওনাকে ডিস্টার্ব করতে বারণ করলেন। কল শেষ করে নিজেই বেরোবেন।' মীনাক্ষী হাসিমুখে বলল, “আচ্ছা স্যার।’ পুলিশটি রাস্তা পেরলো। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। দুম করে একটা লোক মুখের সামনে এসে দাঁড়াল। কড়া চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কোন থানা?’ ফিক করে হাসল আততায়ী। 'আমায় বেশ পুলিশ পুলিশ লাগছে তাহলে বলুন!' উল্টোদিকের লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘মানে?' আততায়ী আবার হাসল। বলল, ‘মধুসূদন মঞ্চে শো আছে। সেখানে আমি দারোগার পাট করছি।' লোকটি বেশ ব্যোমকেই গেল। আততায়ীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেপে নিয়ে বলল, ‘অভিনেতা?”

-আজ্ঞে।

-মাস্ক, চশমা সব খোলো।

আততায়ী থমকে গেল। লোকটি গলায় ঝাঁঝ আনল, ‘কী হল? খোলো।' আততায়ী চশমা খুলল। মাস্কও সরে গেল মুখের ওপর থেকে। নাকের কাছে বড় একটা আঁচিল। ওপরের ঠোঁটটা মোটা কালো গোঁফে ঢাকা। চোখের নীচে কুঁচকনো চামড়া। গালে চাপা ঘন কালো দাড়ি। লোকটা বেশ কালো।

-তিলটা আসল না নকল?

-নকল। তবে স্যার এটা আমায় খুলতে বলবেন না প্লিজ। এই তিল আটকানো বড় ঝামেলা।

-ড্রেসটা খাঁকি কেন? পুলিশের তো সাদা পোশাক এখন।

-এটা পিরিয়ড পিস। নকশাল আন্দোলনের সময়কার গল্প। তখন আর সাদা কই?

-অ। ঠিক আছে যাও।

আততায়ী এক গাল হেসে লোকটিকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়েই, ‘এই শোনো।' মুখটা মুহূর্তে ভার হয়ে গেল আততায়ীর তবু হাসি মুখেই বলল, 'দাদা, এবার দেরি হয়ে যাবে আমার।' লোকটি তবু ছাড়ল না। জিজ্ঞেস করল, ‘করছ তো দারোগার পাঠ। তাতে বুটিকের শাড়ি কী হবে?'

-খুনিকে ধরতে ছদ্মবেশ নেবে দারোগা। আমাদের সব পোশাক এই বুটিক থেকেই যায়। তাই এসেছিলাম এই শাড়িটা নিতে। এবার যাই দাদা?

-ঠিক আছে ঠিক আছে।

আততায়ী টুকটুক করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। স্বয়ম্ভুর ফিট করা লোকটি পকেট থেকে খৈনি বের করে হাতে তালি মেরে ডলতে থাকে।

-আমাকে এইভাবে ডেকে আনার মানেটা কী?

প্রিয়াংশু বেশ বিরক্ত। স্বয়ম্ভু বলল, ‘প্রশ্ন নয়। উত্তর শুনব বলে ডেকেছি। শ্রীদেবীকে রেপ করেছিলেন?' শুরুতেই ঝাঁট জ্বলে গেল প্রিয়াংশুর। ‘কে বলল এসব বাজে কথা?”

-আমি কিন্তু শুরুতেই বলেছি প্রশ্ন নয়, উত্তর চাই।

-প্রশ্নটাই অবান্তর।

স্বয়ম্ভুর চোয়াল শক্ত হল। ‘হ্যাঁ কি না?’

-না।

-তাহলে আপনার নামে কলেজে অভিযোগ উঠেছিল কেন?

–সেটা যে অভিযোগ করেছিল তাকেই জিজ্ঞেস করুন।

-কে করেছিল অভিযোগ?

-আশ্চর্য! আমার নামে অভিযোগ করেছিল সেটা জানেন আর কে করেছিল সেটা জানেন না?

টেবিল চাপড়ে ক্ষেপে উঠল স্বয়ম্ভু, 'আমরা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই প্রিয়াংশুবাবু।' পাশের চেয়ারে বসে শিবাঙ্গী এক দৃষ্টে প্রিয়াংশুর দিকে চেয়ে আছে। এবার একটু থতমত খেয়ে প্রিয়াংশু বলল, 'শ্রীকুমার।

-বাহ! নামটা তো বেশ মনে আছে। আচ্ছা আপনার কী মনে হয়? হঠাৎ শ্রীদেবীর ভাই এসে খামোকা আপনাদের নামে কমপ্লেন কেন করবে? কী শত্রুতা ছিল আপনাদের সঙ্গে? ও তো কলেজেও পড়ত না।

-আমি কিচ্ছু জানি না স্বয়ম্ভুবাবু।

-এবার তো আপনি অবান্তর কথা বলছেন। দুম করে একটা ছেলে এসে কয়েকজন কলেজ স্টুডেন্টদের নামে যা ইচ্ছে তাই অভিযোগ করে দিল?

-তাই তো হয়েছে। খোঁজ নিয়েই দেখুন। শ্রীদেবী নিজে তো আমাদের নাম বলেনি। বরং সবার সামনে বলেছিল আমরা নিরাপরাধ। যা বলেছিল শ্রীকুমার।

-তার আগে আপনি তো শ্রীদেবীকে মেরে ফেলার হুমকি দেন।

-হোয়াট! কী আজেবাজে বকছেন?

-আরে মশাই আমাদের যাতে আজেবাজে বকতে না হয় সেই জন্যেই তো জিজ্ঞেস করা। যা যা হয়েছিল খোলসা করে বলে দিন। নইলে দেখতেই তো পাচ্ছেন, দিয়াও খুন হয়ে গেল। আমরা কিন্তু সুস্মিতাকে বাঁচাতে চাই।

-সুস্মিতার কিচ্ছু হবে না।

চমকে ওঠে স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী। 'কী করে বলছেন এত জোর দিয়ে?''

ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলে বেশ ফাঁপরে পড়ল প্রিয়াংশু। 'কী হল স্যার যা জিজ্ঞেস করছে বলুন। কী করে এত জোর দিয়ে বলছেন?' শিবাঙ্গী চেপে ধরল। 'তার মানে এই খুনের মধ্যে আপনিও জড়িত?'

-আরে বাবা, এটা আমার বিশ্বাস। কারণ আপনারা ওর ওপর, আমার ওপর সবসময় নজর রেখেছেন। সেদিন তো রাস্তায় আপনাদেরই লোককে দেখে ও ভয় পেয়ে আপনাকে কল করেছিল। করেনি?'

-করেছিল।

স্বয়ম্ভূ বলল। 'আমরা তো দিয়ার ওপরেও নজর রেখেছিলাম। কই, বাঁচাতে তো পারিনি।

-ও তাহলে আপনারা নিজের মুখেই আপনাদের ব্যর্থতা স্বীকার করছেন? স্বয়ম্ভু চোখ বুজে নিজেকে সামলাল। অনেকক্ষণ কথার মারপ্যাঁচ চলছে। এবার স্বয়ম্ভুর মাথায় আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। 'হ্যাঁ করছি। কারণ আমরা সৎভাবে একজনকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোনওভাবে মিস করেছি। কিন্তু আপনি অসৎভাবে সব কিছু আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে যাচ্ছেন। সেটা ব্যর্থ হবার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ।'

-আমি কোনও অপরাধ করিনি।

-তাহলে সেদিন শিয়ালদার নেতাজি ইন্সটিটিউট থেকে লুকিয়ে বেরোলে কেন?

-মানে?

প্রিয়াংশুর মুখ চুন।

-যেদিন দিয়া খুন হয় সেদিন আপনি শিয়ালদার নেতাজি ইন্সটিটিউতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেরিয়েছেন কখন কেউ জানে না। কোথা দিয়ে পালালেন প্রিয়াংশুবাবু?

-মোটেও পালাইনি। পালাব কেন?

-তাহলে সবার সঙ্গে সামনের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরোলেন

কেন? লোকে তো বৃষ্টি হলে জল কাদা এড়িয়ে চলে। কিন্তু আপনি পিছনের মাঠ দিয়ে জল কাদা মাড়িয়ে বেরোলেন? কেন?

-কে...কে বলল এসব?

-আবার প্রশ্ন করছেন? বলেছি না শুধু উত্তর দেবেন।

ধমকে উঠল স্বয়ম্ভু।

-ওটা শর্ট কাট। নইলে রাস্তা দিয়ে বাসরাস্তায় আসতে গেলে ঘুরতে হত।

-বাহ! ভালো যুক্তি। তা সেদিন রাতে কখন বাড়ি ফিরলেন?

-সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছিল। কিচ্ছু পাচ্ছিলাম না।

-আপনি আসতে পারেন।

প্রিয়াংশু আশা করেছিল আরও অনেক প্রশ্ন করবে। কিন্তু তা না করে হঠাৎ করে 'আসতে পারেন' বলে দেওয়াতে বেশ অবাক হয়ে যায়। প্রিয়াংশু চলে যেতে স্বয়ম্ভু বলল, 'শিবাঙ্গী, প্রদ্যুৎকে গিয়ে বলো আজ রাতে লুকোচুরি খেলতে হতে পারে।

-ওকে স্যার।

শিবাঙ্গী চলে যেতে একা ঘরে ভাবনায় ডুবে গেল স্বয়ম্ভু। মাথার ওপর পাখাটা ঘুরে চলেছে। দুপুরে ঘণ্টা দেড়েক ঝেড়ে বৃষ্টি হওয়ায় বাইরের আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে আছে। তাই পাখাটা কমানো। ব্লেডগুলো দেখা যাচ্ছে। একেকটা ব্লেড স্বয়ম্ভুর ভাবনাগুলোকে কেটে কেটে কুচি কুচি করে ছড়িয়ে দিচ্ছে। স্বয়ম্ভুর মনের মধ্যে এক পাগল বাউল গান ধরেছে, 'তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলেম আর পেলেম না। '

-স্যার আসব?

ভাবনার দুনিয়া থেকে সোজা লালবাজারের ঘরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্বয়ম্ভু। দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসো অভিনব।' গাড়ির সব ইনফরমেশন ধরিয়ে দিল স্বয়ম্ভুর হাতে। অভিনব তার মনের খটকার কথা জানাল, 'স্যার, গত পরশুদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দয়াময় সান্যালের নামে একটা গাড়ি বুক হয়। তার ডিটেলসটা একবার দেখুন।'

-এতগুলো লোকের মধ্যে হঠাৎ একেই বাছলে কেন?

-দুটো জায়গায় খটকা লাগছে। এক সময়টা মিলে যাচ্ছে। আর দুই, লোকটা লাটাগুড়ির।

জায়গার নামটা শুনেই মেরুদণ্ড সোজা করে বসল স্বয়ম্ভু। নিজেই বিড়বিড় করল, 'লাটাগুড়ি!' ঝটপট সবকটা পাতা ফেলে দিয়ে আগে দয়াময়ের আইডি কার্ডের জেরক্স কপিটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল স্বয়ম্ভু। বলল, 'সবাই আধার কার্ড দিয়েছে। একমাত্র এরই ভোটার আই কার্ড।' টেবিলে রাখা টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। একটা নম্বর টিপে কানে ধরে রইল। 'প্রদ্যুৎ স্বয়ম্ভু।... হ্যাঁ ওটা তো করবেই। শিবাঙ্গীকে এক্ষুনি পাঠাও তো।'

শিবাঙ্গী প্রায় দ্রুত পায়ে এসে হাজির। দয়াময়ের আইডির জেরক্স কপিটা স্বয়ম্ভু এগিয়ে দিল, 'এক্ষুনি এই ডিটেলস পাঠাও লাটাগুড়ি পুলিশ স্টেশনে। অ্যাসাপ খবর চাই।''

-ওকে স্যার।

শিবাঙ্গী কাগজটা নিয়ে বেরিয়ে যেতেই নিজের মনে মুচকি হাসল স্বয়ম্ভু। বিড়বিড় করল, 'ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখোনি।'

আবারও মনের মধ্যে জড়ো হয়ে ছড়িয়ে থাকা খেলনার ভাঙা টুকরোগুলোকে এক এক করে জুড়তে শুরু করেছিল স্বয়ম্ভু। কিন্তু ঠিক তখনই ফোনটা এল।

-হ্যাঁ শুভায়ু বলো।... হোয়াট?

টেবিলের ওপর বসে ছিল স্বয়ম্ভু। এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে পড়ল। চিৎকার করে বলে উঠল, ''কী বলছ কী? কখন?... তুমি কী করছিলে?... রাখো আসছি।' অভিনব ঘরেই ছিল। কৌতূহলে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে স্যার?' -শিবাঙ্গীকে ডাকো। এক্ষুনি বেরোতে হবে। সুস্মিতা খুন হয়েছে।

২৪

ত্রিদিবের মুখের সামনে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল বউটা। 'এইটা একটু বিল করুন না।' হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল ত্রিদিব। 'পেমেন্ট কীসে করবেন? ক্যাশে না কার্ডে?"

-ক্যাশে।

-ওকে।

প্যাকেট থেকে শাড়িটা বের করে দেখল ত্রিদিব। 'একটাই নিলেন ম্যাডাম? আরও ভালো ভালো স্টক এসেছিল তো।' পিঠের বিনুনিটা হাত দিয়ে টেনে বুকের ওপর ফেলে বলল, 'হ্যাঁ দেখলাম। পরে আসব হাজবেন্ডকে নিয়ে। এখন এই ফুলকারিটাই থাক।' ত্রিদিব হাসল। 'বাইশ শো পঞ্চাশ ম্যাম।' মহিলাটি টাকা বের করছে তখনই ত্রিদিবের পাশে যে বসে সে এসে বলল, 'এই ত্রিদিব, আবার তো খুন হয়েছে।' ত্রিদিব চমকে তাকাল। 'কোথায়?

-গড়িয়াহাটে। বুটিক আছে মহিলাটির। ওই গোয়েন্দা স্বয়ম্ভু সেন, সে গেছে দেখলাম। রিপোর্টাররা তো যাচ্ছেতাই করে বলছে।

টাকা বের করতে করতেই ক্রেতা মহিলার হাত থেমে যায়। তিনি বলেন, কী নাম বলছে?'

-কার? দোকানের?

-না না যে খুন হয়েছে।

-সুস্মিতা।

ত্রিদিব চুপ করে কী যেন ভাবে। দূর থেকে দু-তিনজন টিভির সামনে এসে দাঁড়ায়। চারপাশ থেকে উড়ে আসতে থাকে নানান মন্তব্য।

-বলবেই তো। পুলিশগুলো একেকটা অপদার্থ।

-কী শুরু হল বলো তো।

-আরে সিরিয়াল কিলিং গো।

-সে তো বুঝেছি। কিন্তু করছেটা কে?

ক্রেতা মহিলাটির মুখ শুকিয়ে আসে। মুখটা যেন সে লুকোতে চাইছে। ত্রিদিব হাঁ করে খবর গিলছে। ডেডবডির ছবি একজনই তুলতে পেরেছে। তাও ব্লার করে দেখানো হচ্ছে। স্বয়ম্ভু পুলিশবাহিনী নিয়ে ঢুকেই সবাইকে দোকান থেকে বের করে দিচ্ছে। কারা যেন স্লোগান দিচ্ছে, অপদার্থ কোলকাতা পুলিশ দূর হটো।

-শুনছেন, আমার বিলটা একটু দিয়ে দিন না।

ত্রিদিব সম্বিত ফিরে পায়। প্যাকেটটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'বিলটা ভেতরে আছে।'

-আচ্ছা।

প্যাকেটটা নিয়ে কোনওরকমে দোকান থেকে বেরিয়ে যায় মহিলাটি। ত্রিদিব আবার টিভির দিকে চায়।

ক্ষতবিক্ষত হয়ে লাশটা এখনও পরে আছে মাটিতে। ফ্ল্যাশের ঝলক থেকে থেকেই বুটিকের ছোট্ট ঘরটাকে উজ্জ্বল করে তুলছে। সুস্মিতার বিস্ফারিত চোখের ওপর ক্যামেরার আলো ঝলসে উঠলে মনে হচ্ছে কোনও প্রলয় রাতের বাজে পিশাচিনী গিলতে আসছে কাউকে। স্বয়ম্ভূ আর শিবাঙ্গী বুটিকে ঢুকতেই দেখল প্রিয়াংশু বসে আছে মাথায় হাত দিয়ে। ভাষাহীন পাথরমূর্তি। কিছুটা দূরত্বে বসে মীনাক্ষী কাঁদছে। দুজনের দিকে এক ঝলক দেখে নিয়েই ছোট ঘরটায় ঢুকে গেল। স্বয়ম্ভূ আর শিবাঙ্গী। তবে ঘরে ঢোকার আগে স্বয়ম্ভূ দরজার কাছে একবার থমকে গেল। বুটিকের ছোট ঘরের দরজার পাশেই আরেকটা দরজা। সেখানে জল পড়ে আছে। সঙ্গে কয়েক ফোঁটা রক্ত। স্বয়ম্ভু সবার আগে হাতে গ্লাভস পরে নেয়। তারপর পাশের দরজাটা খুলতেই বুঝল এটা বাথরুম। ভিতরটা ভালো করে দেখে নিল। দরজা বন্ধ করে ছোট ঘরটায় ঢুকে গেল। তুহিনশুভ্র আগেই এসে গেছেন। সঙ্গে দুই শাগরেদ রোহিত ও সাত্যকি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন মৃতদেহ ও তার আশেপাশের জিনিসগুলো। স্বয়ম্ভুকে দেখেই তুহিন এগিয়ে এলেন। মুখে অবাক করা অভিব্যক্তি, 'কী হল বলো তো

স্বয়ম্ভু? খুনি দুম করে প্যাটার্ন চেঞ্জ করে ফেলল!”

-খুব সহজ। যেভাবে এতদিন খুনগুলো করছিল সেগুলো যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ এবং তাতে ভিক্টিমের জায়গায় এসে করা সম্ভব নয়। তাকে তুলে নিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে সেটা করেনি।

-কেন?

-ভয় পেয়ে গেছে।

তুহিনের চোখে চোখ রেখে বলল স্বয়ম্ভু। ‘ওই জন্যে এখানে এসে কোনওরকমে মেরে দিয়ে চলে গেছে। আসল উদ্দেশ্য ছিল সুস্মিতাকে মারা। তাছাড়া তমালের খুনটাও তো অন্যভাবে হয়েছে।' তুহিন বললেন, 'কিন্তু পায়ের চিহ্নটা আঁকতে ভোলেনি। তমালের ক্ষেত্রে সেটা করেনি।' স্বয়ম্ভু হাঁটু মুড়ে বসে পায়ের তলাটা দেখতে থাকল। বিড়বড় করে বলল, ‘দুটো গোল! শিবাঙ্গী বলল, ‘দুটো গোলেরই মাঝে একটা করে গর্ত।

-এর মানে কী? কী বোঝাতে চাইছে?

তুহিন বললেন। স্বয়ম্ভু বলল, 'কিছু একটা আঁকতে বা লিখতে চাইছে।' -তা সেটা একবারে লিখলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। যত সব চ্যাংড়ামো। দাঁড়িয়ে পড়ল স্বয়ম্ভু। বলল, 'খেলা। চোর পুলিশ খেলা চলছে। খুনি বলছে এই যে আমি এখানে। দেখি তো ধরো কী করে!

-খুনির সাহস আছে। দিনদুপুরে দোকানে ঢুকে কুপিয়ে দিয়ে গেল?

তুহিনকে কিছু বলার আগেই কে যেন স্বয়ম্ভুর নাম ধরে ডেকে উঠল। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল প্রিয়াংশু। চোখ লাল। দুঃখ যখন আগুন হয়ে বেরোয় তখন এইরকম চোখ হয়। গালের ওপর শুকিয়ে যাওয়া জলের দাগ। ‘আপনারা নাকি চব্বিশ ঘণ্টা সুস্মিতার ওপর নজর রেখেছিলেন! কী সিকিউরিটি দিয়েছিলেন আপনারা? দিনের বেলা দোকানে লোক থাকা সত্ত্বেও খুনি এসে কুপিয়ে খুন করে ঝেড়ে মুছে চলে গেল। আপনাদের লোক কোথায়? বলুন। কোনও সিকিউরিটি দেননি। শুধু মিথ্যে বলে গেছেন। জাস্ট ঢপ।' প্রচণ্ড রাগ আর তীব্র অসন্তোষ ঝরে পড়ে প্রিয়াংশুর গলা দিয়ে। স্বয়ম্ভু পাল্টা প্রশ্ন করে, ‘তার আগে আপনি বলুন তো প্রিয়াংশুবাবু, আপনি একটু আগে কীসের ভরসায় আমাদের বলে এলেন যে সুস্মিতার কিচ্ছু হবে না? যে রাগত চক্ষু স্বয়ম্ভুর দিকে হেনে দাঁড়িয়েছিল প্রিয়াংশু, সেটা নিমেষের মধ্যে নেমে গেল। ‘এখনও চোখ নামিয়ে নেবেন? এক এক করে সবাই শেষ হয়ে যাচ্ছে আর আপনি মুখে কুলুপ এঁটে আছেন।

-আপনারা কী করবেন না করবেন জানি না, আমি ভেবেছিলাম সুসকে আমি প্রাণ দিয়ে আগলে রাখব। তাই ও কথা বলেছিলাম।

-আপনার বান্ধবীর লাশের সামনে দাঁড়িয়েও মিথ্যে বলছেন প্রিয়াংশুবাবু।

প্রিয়াংশু মুখ ফিরিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। স্বয়ম্ভুও বাইরে এল। পুলিশের যে লোকটি সুস্মিতার ওপর নজর রেখেছিল সে মুখ ছোট করে দাঁড়িয়েছিল। স্বয়ম্ভূ এসে মীনাক্ষীর সামনে দাঁড়াল। মীনাক্ষী ভয়ে ভয়ে জল ভরা চোখ তুলে তাকাল। স্বয়ম্ভু জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম?”

-মীনাক্ষী সাহা।

-আপনি এই দোকানে কাজ করেন?

-হুম।

-কতদিন?

প্রশ্নটা করা মাত্র ঘর থেকে একজন বেরিয়ে এসে জানাল সুস্মিতার মোবাইল পাওয়া গেছে। স্বয়ম্ভু শিবাঙ্গীকে ইশারা করে ফোনটার ব্যবস্থা করতে বলে। ‘হ্যাঁ মীনাক্ষী বলুন, কতদিন কাজ করছেন?”

-আড়াই বছর।

-খুনটা যখন হয় তখন আপনি ছিলেন?

মুখটা আরও কাঁদো কাঁদো হয়ে ওপর নীচে নড়ে মীনাক্ষীর। স্বয়ম্ভু প্রশ্ন করে, ‘তার মানে আপনি খুনিকে দেখেছেন।

একটা চোরা ভয় মীনাক্ষীকে গ্রাস করে। উত্তর দেবে কি দেবে না ভাবতে ভাবতেই স্বয়ম্ভু বলে, ‘চুপ করে থাকবেন না। আপনি খুনিকে দেখেছেন?’’

-দেখেছি।

-দেখলে চিনতে পারবেন?

একটু ভাবল মীনাক্ষী। তারপর বলল, ‘না।' নড়ে বসল স্বয়ম্ভু, ‘‘কেন? মুখ ঢাকা ছিল?’’

-মাস্ক পরা ছিল।

আবার সেই মাস্ক। স্বয়ম্ভু চোখটা বুজে ফুলে ওঠা রাগটাকে সংবরণ করে নেয়। মীনাক্ষী বলে, ‘তবে মনে হল গালভর্তি ঠাসা দাড়ি। বেশ অনেকটা।'

-কাঁচা না পাকা?

- কাঁচা বোধহয়। পাকাও থাকতে পারে।

-মানে কাঁচাপাকা মেশানো।

-আসলে রেনকোটে মাথা থেকে ঢাকা ছিল। তার নীচে পুলিশের টুপি চোখে সানগ্লাস।

-কী রঙের রেনকোট?

-ডিপ সবুজ। না না, পার্পেল মনে হল। আসলে আমি তো ওইভাবে দেখিনি তাই সঠিক করে বলাটা.....

স্বয়ম্ভু মনে মনে পার্পেল রংটাকেই সঠিক হিসেবে ধরে নিল। ‘সিসিটিভি আছে না?'

-হ্যাঁ। তবে শুধু এই ঘরেই আছে।

-আজ সকাল থেকে সব ফুটেজ চেক করব।

-দেখাব?

-হুম। তবে তার আগে এই শুভায়ূ...

যে লোকটিকে স্বয়ম্ভু ফিট করেছিল সুস্মিতার ওপর নজর রাখতে সে দু-পা স্বয়ম্ভুর দিকে এগিয়ে এল। স্বয়ম্ভু জিজ্ঞেস করল সে কাউকে দেখেছে কিনা 1

-সকাল থেকে তিন-চারজনই এসেছিল। তার মধ্যে একজন তর্পণা ৷

-তর্পণা!

মীনাক্ষীর দিকে তাকাল স্বয়ম্ভূ, 'তর্পণা কখন এসেছিল?' মীনাক্ষী বলল, ‘এগারোটা-সাড়ে এগারোটা হবে।' স্বয়ম্ভূ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, ‘সুস্মিতা দোকানে ছিল?'

-হ্যাঁ।

-কী কথা হয়েছে ওদের মধ্যে জানেন কিছু?

-অন্যান্যবার তর্পণা ম্যাম এলে ওই ঘরটায় ঢুকে যান। দিদিও যেতেন। তখন আমাদের ওই ঘরে যাওয়া বারণ ছিল।

-আমাদের মানে? এখানে কী আরও কেউ আছেন? -হ্যাঁ। এই দোকানে কর্মচারী বলতে আমি আর পিয়ালী। -তিনি কোথায়?

-ওর শরীর খারাপ। দুদিন ধরে আসছে না।

-থাকেন কোথায়?

-কবরডাঙ্গার দিকে।

-কবরডাঙ্গা!

আরও দুবার জায়গায় নামটা চোখ বুজে আওড়ে নিয়ে শিবাঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল, ‘এই শিবাঙ্গী, এই কেসে কবরডাঙ্গায় কে থাকত বলো তো?' শিবাঙ্গীর সপাট জবাব, 'অরুণার ক্যাব ড্রাইভারের গাড়ি কবরডাঙ্গা থেকেই পাওয়া গেছিল।'

-রাইট রাইট।

ঝট করে মীনাক্ষীর দিকে ঘুরে স্বয়ম্ভূ বলল, 'পিয়ালীর ডিটেলস আমার চাই। অ্যাড্রেস, ফোন নম্বর সব।' মীনাক্ষী সম্মতি জানাল। স্বয়ম্ভু প্রশ্ন করল, ‘সুস্মিতার সঙ্গে তর্পণার সম্পর্ক কেমন ছিল?'

-তর্পণা ম্যাম তো সব সময় হাসিমুখেই আসতেন। কিন্তু দিদি খুব একটা খুশি হত বলে

মনে হয় না। মাঝেমধ্যে বেশ বিরক্তও প্রকাশ করতেন।

-কতদিন অন্তর অন্তর আসেন তর্পণা ম্যাম?

-কোনও ঠিক নেই। কোনও মাসে দুবার এলেন। আবার দু-তিন মাস এলেনই না। তবে এর মধ্যে উনি দু-তিনবার এসেছেন।

-এর মধ্যে মানে কতদিনের মধ্যে?

-এই সাত-আটদিনে।

-হুম। উনি যখনই আসেন তখনই শাড়ি কেনেন?

-না না। কখনও নতুন কিছু এলে দেখে যান। ইচ্ছে হলে কেনেনও।

-আজ কি উনি শাড়ি কিনেছেন?

-না। উনি এলেন। বললেন, গতদিন নাকি ওই ঘরে একটা রানি কালারের শাড়ি দেখেছিলেন। সেটা আরেকবার দেখবেন। বলে নিজেই পাশের ঘরে চলে গেলেন। শাড়ি ঘেঁটেঘুটে দেখলেন। তারপর বললেন, উনি যেটা খুঁজছেন সেটা দেখতে পাচ্ছেন না। তারপর চলে গেলেন।

-উনি যখন ও ঘরে ছিলেন তখন কী আপনারা কেউ গিয়েছিলেন ওঁর সঙ্গে?

-না স্যার। দিদিও জাননি। ভীষণ বিরক্ত হয়েছিল দিদি।

-তাহলে শাড়ি ঘেঁটেছেন না কী করেছেন জানলেন কী করে?

-তর্পণা ম্যাম বেরিয়ে যাবার পর দিদি ও ঘরে গিয়েছিল। নিলো তো নাই। সব ঘেঁটে দিয়ে চলে গেল বলে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে এসেছিল। তাই ভাবলাম।

-শুভায়ূ, বলো এবার তুমি আর কী দেখেছ?

-স্যার, আমি উল্টোফুটেই দাঁড়িয়েছিলাম। তখন বৃষ্টি পড়ছে। সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। একটা লোক রেনকোট পরে দোকানে ঢুকল।

- কীসে এসেছিল?

-হাঁটতে হাঁটতে।

স্বয়ম্ভুর চোখ ছোট হয়ে এল। শুভায়ু বলল, ‘তারপরেই দেখলাম উনি (মীনাক্ষী) বেরিয়ে এসে কাকে যেন ফোন করলেন। তারপর যথেষ্ট রিল্যাক্স মুডে বেশ অনেকক্ষণ ধরে গল্প করছিলেন। আমার অস্বাভাবিক কিছু লাগেনি। প্রায় পনেরো মিনিট বাদে লোকটা একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। এনার সঙ্গে কী যেন কথা বলল। তখনই আমার একটু খটকা লাগল। রেনকোটের বুকের বোতাম খোলা। ভিতরে খাঁকি জামাকাপড় দেখা যাচ্ছে। পুলিশের মত। তারপর লোকটা এই ফুটে আসতেই আমি তাকে ধরি। আমার সন্দেহ হয়, জিজ্ঞেস করি, কোন থানা? লোকটা হেসে ফেলে।

-মুখে মাস্ক ছিল?

-হ্যাঁ স্যার। তবে চশমা, মাস্ক সব খুলে দেখেছি। নাকে কাছে একটা বড় আঁচিল। সেটা নকল। লোকটাই বলল। মধূসূদন মঞ্চে আজ নাকি নাটকের শো আছে। সেখানে ও দারোগা। তাই গায়ের পোশাকটাও খাঁকি। বলল নকশাল আন্দোলনের নাটক।

-খোঁজ নিয়েছিলে সত্যি কিনা?

-না স্যার।

স্বয়ম্ভু চুপ করে শুভায়ুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। শুভায়ু চোখ নামিয়ে নিল। শিবাঙ্গীর দিকে একবার তাকাতেই সে বুঝল স্যার এবার ঠিক কী করতে বলছেন। শিবাঙ্গীও চোখের ইশারায় সম্মতি জানিয়ে একটু কোণের দিকে চলে গেল। স্বয়ম্ভু আবার শুভায়ুকে জিজ্ঞেস করল, 'হাতের প্যাকেটে কী ছিল?'

-নতুন শাড়ি। ওদের নাটকে লাগবে। এখান থেকেই নাকি নাটকের সব ড্রেস যায়।

সঙ্গে সঙ্গে মীনাক্ষী বলে উঠল, ‘সেকি! আমাদের এখান থেকে কোনওদিন কোনও নাটকের ড্রেস যায়নি তো।'

উত্তরটা স্বয়ম্ভূ দিল ‘সেটাই স্বাভাবিক। বুটিকে কাপড়ের দাম এমনিতেই হাই। তার ওপর

কোলকাতায় নাটকের দল বুটিক থেকে নতুন শাড়ি নেবে ড্রেসের জন্য এমন বড়লোক নাটকের দল কমই আছে। যেগুলো আছে সেখানে অভিনেতাকে তার ড্রেস বুটিকে এসে নিয়ে যেতে হয় না। ড্রেসার আসে।'

মীনাক্ষী আরও বলল, 'আমিও প্যাকেটটা দেখেছি। ভাবলাম ম্যাডাম দিয়েছেন বা উনি কিনেছেন বোধহয়।'

-আপনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন কেন?

যা হয়েছিল সেটাই বলল মীনাক্ষী।

-লোকটা চলে যাবার কতক্ষণ পর আপনি দেখলেন?

মীনাক্ষী বলল, 'প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট তো হবেই। পুলিশটা বলে গেল লালবাজারের সঙ্গে দিদির কল চলছে। দিদিই বারণ করেছে ডিস্টার্ব করতে। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে যাবার পরেও দিদির কোনও গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম না। কল চললে একটু কিছু তো আওয়াজ পাওয়া যাবে। আমি প্রায় দু-তিনবার দরজার পাশ থেকে গিয়ে ঘুরে এসেছি। একদম চুপচাপ সব। তারপর বাধ্য হয়েই দরজায় নক করি। দেখলাম তাতেও সাড়া নেই। আমার কেমন যেন ভয় করতে শুরু করল। আমি বাইরে থেকে লকটা টানতেই দরজা খুলে গেল। আর তারপরেই...।' বীভৎস দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই চোখ বন্ধ করে ফেলল মীনাক্ষী। এতক্ষণে ঘর থেকে তুহিনশুভ্র আর দুই শাগরেদ বেরিয়ে এসেছে।

-সিসিটিভিটা দেখব একবার।

স্বয়ম্ভূ বলল। মীনাক্ষী মাটিতে পাতা গদি থেকে উঠে কম্পিউটারের কাছে গেল। ইতোমধ্যে তুহিন এসে বললেন, 'পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। আই মিন জুতোর।' দোকানটার চারপাশ ভালো করে নিরীক্ষণ করতে করতে স্বয়ম্ভূ বলে, 'আট নম্বর জুতো তো?'

-একদমই তাই।

-বাথরুমের সামনে দু-ফোঁটা রক্তও পড়েছিল।

-আততায়ী বাথরুমে গিয়ে ছুরি থেকে রক্ত ধুয়েছে এটা নিশ্চিত। তবে গায়ে কী ওর রক্ত লাগেনি! রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে ফিরল কী করে?

-ওই ঘরে এক্সট্রা একটা শাড়ি পড়ে আছে। রক্তমাখা। সেটাকে মুখে, গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নেয়। তার ওপর গায়ে রেনকোট। সেখানে যা রক্ত সেটা বাথরুমে গিয়ে ধুয়ে নেয়। এই শুভায়ু, তুমি যখন দেখেছ তখন প্রচুর জল ঝরছিল তো রেনকোট থেকে?

-হ্যাঁ স্যার।

-কিন্তু বৃষ্টি নিশ্চয়ই হচ্ছিল না।

-না। তখন থেমে গিয়েছিল।

-তাহলে পনেরো মিনিট আগে যে লোকটা দোকানে ঢোকে। এসির হাওয়াও খায়। পনেরো মিনিট পরেও সেই লোকটার রেনকোট দিয়ে ঝরার মতো জল থাকে কী করে? তার থেকেও বড় কথা যে ঘরে খুন হল সে ঘরে অত জল ঝরেনি যতটা বাথরুম থেকে বাইরের দরজার দিকের অংশটায় পড়ে আছে।

মীনাক্ষী ডাকে। সকলেই সিসিটিভি দেখতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তখনই স্বয়ম্ভুর ফোনটা বেজে ওঠে। হাতে নিয়েই একটু থমকে সরে যায় স্বয়ম্ভু। 'ইয়েস স্যার।... ইয়েস স্যার... আমি ওখানেই আছি।' এরপর খানিকক্ষণ একদম নীরব। স্বয়ম্ভুর মুখের ভাবগতিক খুব একটা ভালো ঠেকে না তুহিনশুভ্রর। অত্যন্ত নরম স্বরে 'শিওর স্যার' বলে মোবাইলটা পকেটে পুরে রাখে স্বয়ম্ভু। তুহিনের চোখে চোখ পড়তেই স্বয়ম্ভু বোঝে তুহিন কিছু একটা আঁচ করেছেন। দু-পা এগিয়ে এসে নিজেই বলে স্বয়ম্ভু, 'জয়েন্ট সিপি। কাল সকাল দশটায় দেখা করতে বলেছেন।

-মেঘ না রৌদ্র?

-আম্ফানের পূর্বাভাস।

বলেই মীনাক্ষীকে বলে, 'কই দেখি। চালান।

শিবাঙ্গী ফোন রেখে এগিয়ে এসে বলে, ‘স্যার মধুসূদন মঞ্চে আজ কোনও নাটক হচ্ছে না। ডান্স ড্রামা হচ্ছে, চণ্ডালিকা।' স্বয়ম্ভূ বলে, ‘‘রবীন্দ্রনাথের লেখা চণ্ডালিকাই হচ্ছে তো নাকি এখনকার কারও লেখা?’

-বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে হচ্ছে যখন রবীন্দ্রনাথেরই হবে।

-না ভাবলাম এখনকার কারও লেখা হলে হয়তো সেখানে দারোগার কোনও চরিত্র আছে! তাই।

শিবাঙ্গী আড়চোখে শুভায়ুর দিকে তাকাল। মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

সকাল দশটা আটত্রিশে এক মহিলা দোকানে ঢোকেন। প্রায় পঁচিশ মিনিট ধরে শাড়িগুলো উল্টেপাল্টে দেখেন। তারপর একটা কেনেন। এগারোটা বারোতে বেরিয়ে যান। এর পরের জনই তর্পণা মিত্র। সময় এগারোটা সাতাশ। ঢোকেন, মীনাক্ষীর সঙ্গে হেসে কথা বলেন। সুস্মিতার দিকে তাকিয়ে কী যেন বললেন। সুস্মিতা ছোট করে একটা উত্তর দেয়। তারপর তর্পণা একাই পাশের ঘরে ঢুকে যান। এগারোটা বত্রিশ। ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তর্পণা। তারপর আরও দু-তিনটে কথা। বেরিয়ে যান। দুপুর একটা ষোলো নাগাদ একজন অনলাইন ডেলিভারি পার্টনার আসে। খাবার ডেলিভারি করে চলে যায়। তার পরেরজনই সেই পুলিশ। এতক্ষণ মীনাক্ষী আর শুভায়ু যা যা বলেছে সেই অনুযায়ী ভিডিয়োটা চলতে থাকে। পনেরো মিনিট বাদে লোকটিকে স্মার্টলি দরজার দিকে যেতে দেখে স্বয়ম্ভু বলে ওঠে, 'পজ পজ।' মীনাক্ষী থামায় ভিডিয়ো।

-জুম করো হাতের দিকে।

মীনাক্ষী সেটাই করে। ক্যামেরায় ডানদিকটা আসছিল আততায়ীর। ডানহাতটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কবজি পর্যন্ত বেগুনি রেনকোটের হাতা। তারপর হাতের পাতাটা উন্মুক্ত। স্বয়ম্ভূ ভিডিয়োটাকে পিছিয়ে লোকটির দোকানে ঢোকার সময়ে নিয়ে যায়। হাতের ওপর জুম করে শুভায়ুকে ডাকে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে তুহিন, শিবাঙ্গী, প্রিয়াংশু। স্বয়ম্ভু বলে, ‘হাতের রংটা খেয়াল কর শুভায়ু। তোমার বলা অনুযায়ী বেশ কালো। এবার লোকটার বেরিয়ে যাবার সময়ে হাতের রংটা খেয়াল করো। মীনাক্ষী ফরোয়ার্ড করুন তো একবার।' সবাই দেখে বেরিয়ে যাবার সময় হাতের রংটা আগের চেয়ে অনেকটাই পরিষ্কার। মুখের রঙের তুলনায় হাতের রংটা বেশ ফর্সা লাগছে।

-বুঝতে পারলে শুভায়ু?

শুভায়ু মিউ মিউ করে বলল, 'ওটা রং ছিল!'

-লোকটা তো বলেইছিল, সে মেক আপ করে আছে। অভিনেতা। তার শো আছে। তবু তোমার স্ট্রাইক করল না একবারও?

শুভায়ুর মাথা নিচু। প্রিয়াংশুর চোয়াল শক্ত। পারলে শুভায়ুকে কেটেই ফেলে। কোমরের পাশে হাত দুটোকে শক্ত মুঠো করে দাঁড়িয়ে থাকে। আজ এই লোকটার অপদার্থতার জন্য সুস্মিতা অকালে চলে গেল। নৃশংসভাবে।

-এক মিনিট, আমায় একটা জরুরি ফোন করতে হবে। স্বয়ম্ভু চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল। বাইরে যেতে গিয়েও থমকালো। রিপোর্টার উপচে পড়েছে। বাইরে স্লোগান হচ্ছে পুলিশের বিরুদ্ধে। এদিকে একটা ফোন করা ভীষণ প্রয়োজন। বাধ্য হয়েই লাশ পড়ে থাকা ঘরে আবার ঢুকতে হল। মোবাইলের স্ক্রিন আনলক করে একটা নম্বর ডায়াল করে। ওপার থেকে কেউ একজন ফোন তোলে। স্বয়ম্ভু জিজ্ঞেস করে, ‘‘কোথায় আছ?'

ফোন সেরে বাইরে বেরিয়ে এসেই স্বয়ম্ভু বলে, 'আচ্ছা এই ঘরে কোনও সিসিটিভি নেই না?' মীনাক্ষী বলে, 'না স্যার।'

-হুম। এদিকে তর্পণা এসেছিল কিন্তু শাড়ি কেনেনি। তাই তো?

-হ্যাঁ স্যার।

-সুন্দর। চলুন এবার যাওয়া যাক।

-স্যার একটা কথা ছিল।

মীনাক্ষী বলে উঠল। স্বয়ম্ভূ ঘুরে তাকাল, 'বলুন '

-যে এসেছিল তার বাঁ হাতের চেটোতে একটা সেলাইয়ের দাগ আছে।

বুটিকের বাইরে বেরোতেই কান জ্বালিয়ে দেওয়া প্রশ্নের সুনামি থেকে বাঁচিয়ে পুলিশি প্রহরায় কোনওরকমে স্বয়ম্ভূ, শিবাঙ্গী, তুহিনশুভ্র একটা গাড়িতে উঠে গেল। আরেকটা গাড়িতে তুহিনের দুই জুনিয়র রোহিত আর সাত্যকির সঙ্গে শুভায়ু উঠে পড়ল। জনপ্লাবন কাটিয়ে দুটো গাড়ি বেরিয়ে গেল। সুস্মিতার ক্ষতবিক্ষত লাশটাও চাদরে ঢেকে বের করা হল। স্বয়ম্ভুর গাড়ি ছুটল লালবাজারের দিকে। তুহিনশুভ্র জিজ্ঞেস করল, 'তোমার খাস চালকটি কোথায়?' স্বয়ম্ভুর মাথায় হাজারও প্রশ্নের ভিড় ঠেলে কথাটা খুব ক্ষীণ হয়ে প্রবেশ করল। তাই সম্বিত ফিরতেই 'অ্যাঁ' বলে তুহিনশুভ্রের দিকে তাকাল। তুহিন প্রশ্নটা রিপিট করার আগেই শিবাঙ্গী উত্তরটা দিল, 'তপনের খুব শরীর খারাপ। চারপাশে যা জ্বরজারি হচ্ছে সেরকমই কিছু একটা।'

-ভাইরাল!

-হ্যাঁ।

স্বয়ম্ভু জিজ্ঞেস করল, 'তুহিনদা কী বুঝছেন বলুন তো? এ তো দেখছি আমরা যেই একটা প্ল্যান করছি খুনি তার আগেই বাজিমাত করে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গোটা পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে নাকের ওপর নাচাচ্ছে। সময়ই দিচ্ছে না।'

-সাহসটা ভাবো। খুনি খুব ভালো করেই জানে পুলিশের নজর আছে সুস্মিতার ওপর। তা সত্ত্বেও দিনেরবেলা গটগট করে হেঁটে এসে কুপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল! পুলিশের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে একটুও ঘাবড়াল না। উপরন্তু হেসে পটাপট ঢপ দিয়ে আবার হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

-এবার বাকি রইল মৃত্তিকা।

শিবাঙ্গী বলল। স্বয়ম্ভু শিবাঙ্গীর দিকে তাকাল। ভাষাহীন চোখে প্রশ্ন করল, 'অন্নপ্রাশনটা যেন কবে?''

২৫

-এটা সুপ্রভা অধিকারীর বাড়ি তো?

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলাটি নামটা বলল। মিশ্রঠাকুর গায়ে নামাবলিটা সবে চাপিয়েছিলেন বেরোবেন বলে। ঠিক তখনই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। মহিলাটির পাশে একটি লম্বা তাগড়াই চেহারার ছেলে। হালকা হলুদ শার্ট, কালো প্যান্ট। গলায় ঝোলানো ক্যামেরা। মহিলাটি বিনুনি করা। গায়ের রং চাপা। পরনে শাড়ি। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, হাতে কভার ফাইল। মিশ্রঠাকুর অবাক হয়ে পরিচয় জানতে চাইলে মহিলাটি জানান তাঁরা কর্পোরেশন থেকে আসছে। এই এলাকায় যত পুরোনো বাড়ি আছে সেগুলো সার্ভে করছেন। কোনটা কত প্রাচীন, কোন বাড়ির কী অবস্থা এইসব।

-এখনি আসতে হল আপনাদের?

একটু উষ্মা প্রকাশ করলেন মিশ্রঠাকুর। মহিলাটি বললেন, 'আসলে আমরা সকাল থেকে অনেক বাড়ি ঘুরছি। অসুবিধে হল?'

-তা তো একটু হল বৈ কি মা। মন্দিরে বেরোচ্ছিলাম তো।

ছেলেটি বলল, ‘এখনও তো সন্ধে হয়নি ঠাকুরমশাই।' মিশ্র চশমার মধ্যে দিয়ে নাক সিঁটকে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘শ্রাবণ মাসের শনিবার তো। তাই গ্রহরাজের পুজোটা একটু বড় করেই করতে হয়। এসব আর আপনারা কী করে...! আসুন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরের মধ্যে ডাকল দুজনকে। চারপাশ দেখতে দেখতে মহিলাটিই জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম তো পঙ্কজ মিশ্র?'

-হুম। দেখে আসবেন উঁচুনিচু আছে।

মিশ্রঠাকুর বললেন। ছেলেটি সামনের প্যাসেজের একটা ছবি তুলল। মিশ্রঠাকুর আরও একটু বিরক্ত হলেন।

-তাহলে সুপ্রভা অধিকারী কে?

মিশ্রঠাকুর ঘুরে তাকিয়ে মহিলাটিকে বললেন, “আমার দিদি।' মহিলাটি ঘাড় বেঁকিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে জানতে চাইলেন, ‘দিদি মানে? নিজের দিদি?'

-হ্যাঁ। দিদি বিয়ের পর অধিকারী হয়। এটা তার খুশ্বশুরের বাড়ি ছিল। দিদিকে দিয়ে গেছেন।

-দিদি কোথায় থাকেন?

-মেদিনীপুর। আমিও ওখানেই থাকতাম।

-মেদিনীপুরের কোথায়?

-চন্দ্রকোণা।

উত্তরটা দিয়ে একটু তাড়া দেখিয়েই মিশ্রঠাকুর বললেন, ‘এই ছোট্ট উঠোনের দুপাশে দুটো ঘর। একটা রান্নাঘর। ওই যে ওটা। আর বাথরুমটা এই সরু গলি দিয়ে গিয়ে। আগেকার বাড়ি তো তাই বাথরুমটা দূরে। এইটুকুই ব্যস।'

-সে কি! বাইরে থেকে তো বেশ বড় লাগে বাড়িটাকে। ওপরে কী আছে?

-ওপরেও ঘর আছে একটা। সঙ্গে ছাদ। কিন্তু আমরা ব্যবহার করি না। থাকি তো দুটো মানুষ। লাগে না বিশেষ একটা।

ছেলেটি একের পর এক ছবি তুলে যাচ্ছে। মহিলাটি সোজা মিশ্রঠাকুরের ঘরের দিকে হাঁটা লাগালেন।

-আপনারা কী ঘরের ভিতরও ঢুকবেন নাকি?

-অবশ্যই। নইলে বুঝব কী করে? শুধু ঘর নয়। আমরা আপনার বাথরুমটাও দেখব।

-দেখুন আমায় না পুজোটা সময় মেনে করতে হবে। আপনারা বরং কাল আসুন। আমি নিজে সব ঘুরিয়ে দেখাব।

-সরি, এটা একেবারেই সম্ভব নয়। কাল রবিবার তো। হবে না। আমরা বেশিক্ষণ নেব না। মিনিট দশেক। এই সুবীর, সবকিছুর ভালো করে ছবি তুলে নাও যাতে চোখে ধরা না পড়লেও

ছবিতে ধরা পড়ে।

কথাটা কি মিশ্রঠাকুরকে শুনিয়ে ইচ্ছে করে বলল মহিলাটি! মিশ্রঠাকুর আর একটাও কথা বললেন না। মিশ্রঠাকুরের ঘর ঘুরে খাটের তলা থেকে আলমারির খাঁজ সব দেখে পাশের ঘরে গেলেন। ঢুকতেই দেখলেন ঘরের মধ্যে অ্যাকোয়াস্টিক ড্রাম সেট রাখা। পুরোনো ঝর্ঝরে বাড়িতে এমন চকচকে ড্রামস কয়লাখনিতে হিরের মতো চমকাচ্ছে। 'ড্রামস কে বাজায়?'' প্রশ্ন করলেন মহিলাটি।

-আমার ভাগ্নে। কানের মাথা খেয়ে ফেলে।

-কী নাম?

- তিরু।

-তিরু কী?

-তিরু ডাকনাম। ভালো নাম ত্রিদিব মণ্ডল।

মহিলাটি এবার বেশ বড়সড় হোঁচট খায়। ছেলেটিও ছবি তুলতে গিয়ে থমকে মিশ্রঠাকুরের মুখের দিকে তাকায়। মিশ্র বুঝতে পারেন। কোনও প্রশ্ন ধেয়ে আসার আগেই গুছিয়ে উত্তর দেন, 'আমার ছোড়দির ছেলে। ছোড়দি আর জামাইবাবু যখন মারা যান তখন তিরুর বারো বছর বয়স। ' -ওনারা একসাথে মারা গেছেন?

এবার ছেলেটি মানে সুবীর প্রশ্ন করল।

-হ্যাঁ। দোলের সময় শান্তিনিকেতন যাচ্ছিল। একটা ট্রাক এসে সব শেষ করে দেয়। ভাগ্য ভালো তিরু তখন আমার কাছে ছিল। তিরুর ঘর আর মিশ্রঠাকুরের ঘরে মোটামুটি একই আসবাব। আলাদা শুধু ওই ড্রামসটাই। সবকটা ঘরেই সিমেন্ট খসে ইঁট বেরিয়ে এসেছে কিছু জায়গায়। রান্নাঘরেরও একই হাল। একটা পাম্প দেওয়া স্টোভ। কয়েকটা হাঁড়িকুড়ি, থালা, বাটি, হাতা, খুন্তি, সাঁড়াশি, বঁটি। ছোট একটা ফ্রিজ। মহিলাটি সেটা খুলতে যেতেই মিশ্রঠাকুর বেশ কড়া গলায় বলে উঠলেন, 'আপনারা তো বাড়ির অবস্থা দেখতে এসেছেন। সেখানে পরের বাড়ির ফ্রিজ খুলে দেখার কী সম্পর্ক জানতে পারি?' মহিলাটি হাতটা গুটিয়ে নেয়। মিশ্রঠাকুর হাত উলটে ঘড়ি দেখছেন আর পুচ-পাচ করে শব্দ করছেন মুখে। বাথরুমে ঢুকতেই চামসে গন্ধ। সঙ্গে প্রস্রাবের কটুগন্ধ। মহিলাটি নাকের নীচে দুবার আঙুল ঘষে নিল বেসিনটায় হলদেটে ছোপ। অনেক দিন পরিষ্কার হয় না বোঝাই যাচ্ছে। খুব জোরে না পেলে কমোডে বসতে কারও মন চাইবে না। দাঁত বের করা দেয়ালের গায়ে জং ধরা একটিই ট্যাপকল ঝুলছে। দুটো বালতি। দেয়ালে একটা আখাম্বা সাতখানা তাকের র‍্যাক। ওপর থেকে সোজা মাটি পর্যন্ত নেমেছে। একটাতে তেল, সাবান, শ্যাম্পুর শ্যাসে, ছোবড়া। আরেকটাতে দুটো মগ। বাকিগুলো প্রায় খালিই পড়ে আছে। কয়েকটাতে ঝুল পড়ে গেছে। ছেলেটা বাথরুমেরও গুছিয়ে ছবি তুলল।

-চলুন এবার ওপরটা ঘুরে বেরিয়ে যাব।

মিশ্রঠাকুর একটা বড়সড় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। একেকটা সিঁড়ি বেশ উঁচু। এখনকার মানুষের উঠতে বেশ বেগ পেতে হবে। মিশ্রঠাকুর অবলীলায় উঠে গেলেন। স্বাভাবিক, ওনার অভ্যেস তো থাকবেই। ওপরের ঘরটা আবর্জনায় ভর্তি। ঘর লাগোয়া ছাদখানা বেশ সুন্দর। নীচে নামতেই মিশ্রঠাকুর এবার বিরক্তি দেখিয়েই বললেন, 'আশা করি আর কিছু নেই আপনাদের! যদি থাকেও সেটা এখন আর আমি দেখাতে পারছি না। কাল কিম্বা পরশু আসুন।'

-আর মাত্র দুটো কাজ বাকি ঠাকুরমশাই।

-উফফফ। কী?

অসহ্য হয়ে দুপাশে মাথাটা ঝাঁকিয়ে কথাটা বললেন। মহিলাটি একটা কাগজ বাড়িয়ে বললেন, 'এখানে একটা সই করতে হবে। আর দুটো হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ।' সই করা ও কালির মধ্যে বুড়ো আঙুল চুবিয়ে ছাপ নেওয়ার সময়েও চকাচক ছবি উঠল।

তিনবছর হয়ে গেল সুস্মিতার সঙ্গে একই ফ্ল্যাটে, একই ঘরে, একই বিছানায় সুখ-দুঃখের সময় ভাগ করে নিয়েছে প্রিয়াংশু। ইচ্ছে ছিল বছরখানেকের মধ্যেই বিয়েটা সেরে ফেলবে। লাল বেনারসি পরে কনেবউটি সেজে বিয়ে করবে না সুস। ওরকম পুতুল পুতুল বিয়ে একদম পছন্দ নয় ওর। ডেস্টিনেশন ওয়েডিং করবে। সমুদ্রে। কোন সমুদ্র সেটার একটা প্ল্যানিংও ছকে রেখেছিল। প্রিয়াংশুকে বলেনি। শুধু প্রিয়াংশু যখন ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ে কত খরচ হবে সেটার হিসেব নিয়ে বসত তখন সুস্মিতা মুষড়ে পড়ত। সাধ আর সাধ্যের দ্বন্দ্ব লাগত তখন। তারপর রাতে প্রিয়াংশুর অফুরন্ত চুমু সুস্মিতার দুঃখ ভুলিয়ে নতুন এক সকাল আনত। পুষি কেবলই এ ঘর থেকে ও ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও সোফার নীচে উঁকি দিচ্ছে। তুরতুর করে ঢুকে যাচ্ছে খাটের তলায়। কখনও ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজার সামনে গিয়ে বসে আছে চুপটি করে। প্রিয়াংশু মায়াভরা চোখে পুষিকে দেখে চলেছে। একটা সময় সারা বাড়িতে কোথাও সুস্মিতাকে না পেয়ে প্রিয়াংশুর পায়ের কাছে এসে মিউ মিউ করে জানতে চাইছে তার মা কোথায়? কখন আসবে? মদের গ্লাসটা টেবিলে রেখে পুষিকে দুহাতে তুলে নিয়ে চুমু খায় প্রিয়াংশু। বেড়ালটার কানে কানে বলে, ‘তোর মা আর কক্ষনও আসবে না পুষি। কোনওদিন আসবে না।' কথাটা বলতে বুকটা কেঁপে উঠল তার। কান্না পেল খুব। সুস্মিতার ক্ষতবিক্ষত লাশটা এখনও ঠাণ্ডা ঘরে শুয়ে। হঠাৎই সুস্মিতার খেয়াল চেপেছিল বেড়াল পোষার। একদিন রাতে সুস্মিতা আর প্রিয়াংশু যখন যুগলশয্যায় তখনই কথাটা পাড়ে সুস্মিতা। এবার বেশ গোলগাল নাদুসনুদুস পুষি চাই তার। প্রিয়াংশু বুঝতে ভুল করে বলেছিল, ‘তার মানে গোলগাল ছোট্ট মতন মেয়ে চাই তাই তো?' সুস্মিতা আদুরে ঠোঁটটাকে উলটে বলেছিল, ‘না। অনেক ঝামেলা। তার চেয়ে একটা বেড়ালই ভালো। পার্শিয়ান ক্যাটগুলো দেখেছিস?’’ আরেকটু হলেই প্রিয়াংশু তড়াক করে লাফিয়ে উঠত, ‘পার্শিয়ান ক্যাট! খরচ কত জানিস?’’ -উফফফ! পার্শিয়ান ক্যাটই আমি চেয়েছি নাকি? বলেছি ওইরকম।

নাদুসনুদুস। বেশ চটকাতে পারব।

-সত্যি কথা বলব?

-বল।

-তুই আসলে একটা পুতুলের মতো বাচ্চা চাইছিস। যাকে তুই প্রাণ ভরে আদর করতে পারবি। চটকাতে পারবি। কিন্তু অত ঝামেলা তো মহারানির সইবে না। তাই দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে একটা নাদুসনুদুস বেড়াল। আবার কে চাইছে? না যে কিনা কুকুর বেড়ালের থেকে শত হাত দূরে থাকত!

কথাটা শুনে প্রিয়াংশুর বুকের ওপর থেকে উঠে বসেছিল সুস্মিতা। ভাবুক হয়ে গিয়েছিল সে। বলেছিল, 'কুকুর না। আমার বেড়ালই চাই।' প্রিয়াংশু বুঝতে পারেনি সুস্মিতার ইচ্ছের কারণ। তবে পরের কথার মানেটা সেদিন সে ভালোই বুঝেছিল। প্রিয়াংশুর মুখের দিকে চেয়ে সুস বলেছিল, 'মেয়েও চাই না।'

মদের গ্লাসটা মুখের ওপর উপুড় করে দিল প্রিয়াংশু। কোল থেকে কখন যে পুষি নেমে গেছে খেয়াল করেনি। রক্তজবার মতো দুচোখের মণি। কান মাথা দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেছে। মুখের দুপাশের শিরাগুলো চামড়া ভেদ করে ফুটে উঠেছে। ঝট করে মোবাইলটা হাতে নিয়ে কন্ট্যাক্টের সার্চ বক্সে টাইপ করে ‘tarpana' নামটা ভেসে উঠতেই বুড়ো আঙুল দিয়ে জোরে চাপ দেয় নামটার ওপর। চাপ দেবার সময় মুখটা হিংস্র হয়ে বেঁকে যায় প্রিয়াংশুর। শ্রীরাধার গলায় 'লাবো সে চুম লো, আঁখো সে থাম লো মুঝকো' বেজে উঠল। গানের কথাগুলো আরও আগুন জ্বালিয়ে দিল মাথার মধ্যে। বেশ খানিকক্ষণ কলারটিউন শুনিয়ে ফোনটা কেটে গেল। প্রিয়াংশু আবার কল করল। গান শুনিয়ে কেটে গেল। ধরল না তর্পণা। আরও চারবার একই গান। মদের গ্লাসটা দেয়ালে ছুড়ে দিতেই চুরচুর করে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। মাথাটাকে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকিয়ে নিল। উঠে পড়ল সোফা ছেড়ে। টেবিল থেকে বাইকের চাবি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার। নন্দিনী হাতে একটা বড় ছাতা নিয়ে নিঃসাড়ে তর্পণার

কাছে এল। তর্পণা খেয়াল করেনি। ইয়ার ফোনে চোখ বুজে গান শুনছে। নন্দিনীর হাতের স্পর্শ পেতে কান থেকে ইয়ার ফোনটা সরিয়ে তাকায়। 'কী হয়েছে?' নন্দিনী ঘড়ির দিকে আঙুল দেখাল। তর্পণা ঘড়ির দিকে তাকাতেই বলে উঠল, 'সাড়ে আটটা বেজে গেল?' খেল নন্দিনী হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। পয়সা চাইছে। 'ওই টেবিলের ওপর থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে আয়।' নন্দিনী এনে দিল। কুড়ি টাকার নোট বার করল তর্পণা। নন্দিনীর হাতে দিয়ে বলল, 'দোকানে বলবি আগেরদিনের মত রুটিগুলো যেন শক্ত না হয়।' নন্দিনী টাকাটা হাতে নিয়ে ঘাড় নাড়ল। টেবিল থেকে একটা কাগজ আর পেন নিল। তর্পণার কথাটাই লিখল সে। কাগজটাকে ভাঁজ করে বেরোতে যাবে কাছেপিঠে কোথাও একটা বাজ পড়ল। তর্পণার ভ্রুক্ষেপও নেই। কানে গান গুঁজে চোখ বন্ধ করে আছে। ভয় পেয়ে নন্দিনী একটু দাঁড়িয়ে তার মালকিনকে দেখে নিল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপচাপ ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল।

স্বয়ম্ভু, শিবাঙ্গী, প্রদ্যুৎ চুপ করে বসে আছে। সামনে কম্পিউটারে লালনীল-হলুদ-সবুজ রঙের নানান আঁকিবুকি। শিবাঙ্গী বলল, 'তর্পণার ফোনে প্রিয়াংশুর কল কেন এল? একবার নয়, তিন-চারবার। তাও আবার সেদিন এল যেদিন সুস্মিতা মারা গেছে। প্রিয়াংশুর কী কথা থাকতে পারে তর্পণার সঙ্গে?' প্রদ্যুৎ বলেন, 'মারা যাবার খবরটা দিতে পারে।'

-সারা শহরে তোলপাড় হচ্ছে প্রদ্যুৎ স্যার। সবাই জানে। আর এই খবরটা তর্পণা জানে না হতেই পারে না।

স্বয়ম্ভু সম্পূর্ণ অন্যদিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'আমি যখন কাউকে খুব জরুরি কিছু বলতে চাই তখনই বারবার ফোন করি। উল্টোদিকের লোকটা যখন ফোন তোলে না তখন আমরা কী করি?'

শিবাঙ্গী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তার কাছে চলে যাই।' স্বয়ম্ভু ঝট করে শিবাঙ্গীর দিকে তাকায়।

নন্দিনী রাস্তা দিয়ে জল-কাদা বাঁচিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বেশ খানিকটা হেঁটে গিয়ে রুটির দোকান। বৃষ্টির বেগটাও বাড়ছে। নন্দিনীর পা পড়ছে। পিছনে আরও এক জোড়া পা পড়ছে। বুট পরা এক জোড়া পা ছায়ার মতো অনুসরণ করছে বাচ্চা মেয়েটাকে। কিছুক্ষণ পর নন্দিনীর ষষ্ঠেন্দ্রিয় তাকে জানায় পিছনে কেউ আছে। হঠাৎ করেই কেঁপে ওঠে তার শরীরটা। চট করে ঘুরে তাকায়। জোড়া পা দুটো ঘুরে বিদ্যুৎবেগে আড়ালে চলে যায়। নন্দিনী বিশেষ কাউকেই দেখতে পায় না। ও আবারও হাঁটতে শুরু করে। একটু পরে সেই জোড়া পা দুটোও হাঁটতে শুরু করে নন্দিনীর পিছন পিছন।

মোবাইলটা হাতে নিয়ে এখনও গান শুনছে তর্পণা। হঠাৎ পায়ের কাছে রাখা আরেকটা মোবাইল ভাইব্রেট করে ওঠে। স্ক্রিনে লেখা নন্দিনী কলিং কান থেকে ইয়ার ফোনটা খুলে দ্বিতীয় মোবাইলটা কানে দিল, 'বলো....। বহুবার করেছে।... পাগল নাকি? ওর ফোন ধরে মরি আমি!... তুমি কি ফিরেছ?... নন্দিনী একটু পাশের ফ্ল্যাটে গেছে। ওর এক বন্ধু হয়েছে। তার সঙ্গে একটু সময় কাটিয়ে চলে আসে।... কী বলে ওরাই বা কী বোঝে জানি না।... আমি বাধা দিই না... সারাদিন খাটে মেয়েটা। ওরও তো একটা জীবন আছে। তা তোমার পরের প্ল্যানটা বলো। '

কলিং বেল বাজতে তর্পণা বলে, 'এই শোনো, তোমায় পরে ফোন করছি। কেউ একটা এসেছে।' ফোনটা কেটে আলমারি খুলে শাড়ির ভাঁজে সেটাকে লুকিয়ে রাখল তর্পণা। দরজা খুলতেই সজোরে একটা ধাক্কা খেল। 'এ কী তু...তুমি?' অনুমতি না নিয়েই রক্তচক্ষু শানিয়ে ভিতরে ঢুকে এল প্রিয়াংশু। জামাকাপড় ভিজে একশা। তর্পণা পিছিয়ে গেল ভয়ে, 'কী চাই কী তোমার?''

প্রিয়াংশু কথা বলল না। শুধু ঢুকে পা-টাকে পিছনে ভাঁজ করে দরজাটা ঠেলে দিল। দুম করে শব্দ হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। তর্পণা ঢোক গিলে নিজের ভয়টাকে লুকিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল, 'হ্যাঁ আমি পেয়েছি খবরটা। আমার কেমন যেন পাগল পাগল লাগছিল। তাই তোমার ফোন তুলতে পারিনি। এসব কী হচ্ছে বলো তো?"

-সেটাই তো আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছি তর্পণা। কেন মারলে সুস্মিতাকে?

-মানে? এসব কী বলছ তুমি?

কান্নামেশা ধরা গলাটা ঝংকার দিয়ে উঠল প্রিয়াংশুর, 'এই শালি, আমার সাথে একদম ন্যাকামি মারাবি না।' তর্পণা পিছনে সরতে সরতে খাবার টেবিলের দিকে পিছিয়ে গেল।

-মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গোয়েজ প্রিয়াংশু। তুমি একটা মেয়ের সাথে কথা বলছ। এটা মাথায়....

-খুনি খুনি। আমি একটা খুনির সঙ্গে কথা বলছি।

-গলা নামিয়ে কথা বলো। এখানে আরও দশটা মানুষ বাস করেন।

-জানুক লোকজন। সবাই জানুক।

তর্পণা এবার নিজের রাগ সম্বরণ করে শান্ত গলায় বলল, 'প্রিয়াংশু,

প্রিয়াংশু কুল৷ আমি জানি এখন তোমার মনের অবস্থা। তুমি পরে কথা...'। -কোনও পরে কথা হবে না। এক্ষুনি জবাব দিতে হবে তোমায়। কেন? কেন মারলে সুস্মিতাকে?

-কেন পাগলের মতো কথা বলছ? আমি কেন মারব? ও কী আমার শত্রু ছিল?

-সেটাই তো জানার আছে। শ্রীকুমার তোমার কে হয়? যার জন্য এত রিস্ক নিচ্ছ তুমি?

-শুরুতেই তো বলেছিলাম। বন্ধু।

-বন্ধু নাকি বিশেষ বন্ধু নাকি ধান্দার বন্ধু?

-শ্রীকুমার আমার যেই হোক তা জেনে তুমি কী করবে?

-বাহ! যার হয়ে তুমি টাকা আদায় করে যাচ্ছ মাসের পর মাস ধরে সে তোমার কে হয় সেটা আমি জানব না?

-এতকাল তো জানোনি?

-প্রয়োজন পড়েনি।

তর্পণা হাসল। 'কারণ তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা যে সত্যি সেটা তুমি প্রথমদিনেই বুঝেছিলে।'

-প্রত্যেক মাসে তো মোটা টাকা পেয়ে যাচ্ছ। তাহলে সুস্মিতাকে মারলে কেন? বলো।

চিৎকার করে উঠল প্রিয়াংশু। 'আমি কাউকে মারিনি প্রিয়াংশু। মিথ্যে ব্লেম দেবার চেষ্টা কোরো না।

-সকালে বুটিকে গিয়েছিলে কেন? সরেজমিনে তদন্ত করে আসতে? তর্পণা চুপ।

-পুলিশ কিন্তু সব ফুটেজ পেয়ে গেছে। এবার আর তোমায় কেউ বাঁচাতে পারবে না।

-তাতে তোমার বিপদ কী কিছু কমবে প্রিয়াংশু?

-বাল ছেঁড়া যায় আমার বিপদের।

বলেই আচমকা তর্পণার গলাটা টিপে ধরল প্রিয়াংশু। টেবিলে রাখা কাটলারি স্ট্যান্ড উলটে পড়ল। দাঁতে দাঁত চেপে প্রিয়াংশু বলল, 'পুলিশ কী করবে জানি না। আমি তোমায় ছাড়ব না। একদম জানে মেরে দেব।'

-পাগলামো কোরো না প্রিয়াংশু। অক অক। ছাড়ো আমায় ৷ অক... চিৎকার করে উঠল প্রিয়াংশু, 'সুস্মিতাকে মারলি কেন বল তুই। এরপর থেকে টাকা তো দূর, আমি তোকে বাঁচতেও দেব না।'

-ফাক ইউ।

-ফাক ইউ খানকি শালি।

তর্পণা মুহূর্তের মধ্যে একটা কাঁটা চামচ তুলে প্রিয়াংশুর ওপর আঘাত করতে যায়। ঠিক তখনই দরজা খোলার শব্দ। দুজনেই একই অবস্থায় থেকে দরজার দিকে তাকায়। নন্দিনী এসেছে রুটি নিয়ে। ছাতাটা মাটিতে পড়ে গেছে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে। প্রিয়াংশুর

হাত তখনও তর্পণার গলা টিপে রয়েছে। আর তর্পণার হাতের কাঁটা চামচটা প্রিয়াংশুকে লক্ষ্য করে ওপরের দিকে তোলা। মেয়েটা কাঁপছে ভয়ে। প্রিয়াংশুর হাত মুহূর্তে আলগা হয়ে যায়। তপণার হাতও নেমে আসে। নন্দিনী গরম রুটিটাকে বুকে চেপে ঘরে ঢুকে আসে। বাচ্চা মেয়েটার মুখটা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতেই প্রিয়াংশু কয়েক পলকের জন্য অবশ হয়ে যায়। পরক্ষণেই মুখটা সরিয়ে নেয়। এই ছোট মেয়েটার সামনে আর কোনও হিসেব নিকেষ করতে মন চাইল না প্রিয়াংশুর। লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। পিছু ফিরে চাইল একবার। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই বাইক ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল প্রিয়াংশু।

আড়াল থেকে সামনে এসে দাঁড়াল স্বয়ম্ভু সেন। সঙ্গে শিবাঙ্গী। স্বয়ম্ভু চোখ তুলে দোতলার ফ্ল্যাটের দিকে তাকাল। শিবাঙ্গী জানে, স্বয়ম্ভুর এদিক ওদিক তাকানো মানে তার মাথায় কিছু একটা চলছে। এখনই হয়তো তর্পণার মুখোমুখি হতে চাইছে না স্বয়ম্ভু। এতদিন স্বয়ম্ভুর সঙ্গে থেকে ঠিক কতটা বুঝতে পেরেছে সেটা যাচাই করতেই প্রশ্নটা করল শিবাঙ্গী, 'তর্পণার ফ্ল্যাটে যাবেন নাকি?'

-লাভ নেই। এক গুচ্ছ মিথ্যে কথা এমন করে বলবে... তাছাড়া এখুনি সতর্ক করে দিলে মুশকিল।

-আপনার কী মনে হচ্ছে স্যার, তর্পণা কী খুন করতে পারে?

-পারে।

-তর্পণা কী মিশ্রঠাকুরকে চেনে?

-বুঝতে পারছি না। সুস্মিতাকে যে খুন করেছে তার সঙ্গে তর্পণার যোগসাজশ তো আছেই।

-শ্রীকুমার?

-সেই বা কে? কত বুদ্ধি আছে তার ঘটে? যে মেঘের আড়াল থেকে ইন্দ্রজিতের মতো লড়ে চলেছে। আমরা কোনও পদক্ষেপের কথা ভেবে স্টেপ নেওয়ার আগেই সে কাণ্ড ঘটিয়ে বসছে! আনপ্রেডিক্টেবল।

-শ্রীকুমারের সম্পর্কে তর্পণা কে হয়? শ্রীদেবীর কেসে তো তর্পণা নামের কোনও উল্লেখ নেই। তাহলে এই মহিলা এল কোথা থেকে?

নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে প্রশ্নগুলো করল শিবাঙ্গী। পাল্টা প্রশ্ন উঠে এল স্বয়ম্ভুর মুখ থেকে, 'মীনাক্ষী বলল, লোকটার বাঁ হাতের তালুতে সেলাইয়ের দাগ আছে। আমি যাকে সন্দেহ করে লোক পাঠালাম তার হাতে কোনও দাগ পাওয়া গেল না। তার মানে সে খুনি নয়। অন্তত সুস্মিতাকে সে খুন করেনি।'

-আরেকজনের হাত দেখা বাকি স্যার।

-ওই ভাগ্নেটি তো?

-হ্যাঁ।

-খোঁজ নিয়েছি। আজ সারাদিন সে দোকানেই ছিল।

-তৃতীয় ব্যক্তি?

-আজ কলেজ হাফ ডে। তিনটে পর্যন্ত

-খুনটা তো পৌনে চারটে থেকে চারটের মধ্যে হয়েছে। কলেজ গড়িয়াহাট চত্বরেই। সেখান থেকে এখানে আসতে...

- উঁহু।

সে কলেজেই ছিল।

স্বয়ম্ভু আপত্তি জানাল। 'একটা বিষয় ভুলে যাচ্ছ। সে মেক আপ করেছিল। কলেজে সেটা সম্ভব নয়। তার মানে মাঝপথে কোনও একটা শেল্টারে সে বাইক রেখে মেক আপ...'

হঠাৎ কী মনে পড়াতে কথা থামিয়ে দেয়। 'ও হো, আমরা ভেবে মরছি কেন? চলো

গাড়িতে চলো।' বলে দৌড়ে বোলেরোটায় উঠে পড়ল। ড্রাইভার কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করল, ‘যাব স্যার?’

-হ্যাঁ চলো। আগে ম্যাডামকে নামিয়ে আমায় ছাড়বে।

গাড়ি ছাড়ল। স্বয়ম্ভু মোবাইল কানে তুলল, ‘এই রঞ্জিত, আজ সারাদিনে দীপায়নের লোকেশন কোথায় কোথায় ছিল জানাও তো। অ্যাসাপ।'

মিনিট পনেরোর মধ্যে খবর চলে এল। ‘সকালে ফুলবাগান থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাট। দুপুর তিনটে পাঁচে সেখান থেকে বেরিয়ে বাসন্তী দেবী কলেজের কাছে। আর এখন সেটা রয়েছে বেনিয়াপুকুরে। কিছুক্ষণ আগে বেরিয়েছে বাসন্তী দেবী কলেজের কাছ থেকে।'

হাত উলটে ঘড়ি দেখল স্বয়ম্ভু, রাত সোয়া ন'টা। ‘ওকে রঞ্জিত। থ্যাংক ইউ।'

-ওয়েলকাম স্যার।

ফোনটা কাটতে কাটতে ভুরু দুটো ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে গেল স্বয়ম্ভুর।

-কী বলল স্যার?

-দীপায়ন সকালে কলেজ গেছে। সেখান থেকে পড়াতে বাসন্তী দেবী কলেজের ওখানে। সেখান থেকে এখন বাড়ি ফিরছে।

-তাহলে খুনটা করল কে?

দুহাতে মুখ ঢেকে একভাবে অনেকক্ষণ রইল স্বয়ম্ভু। শিবাঙ্গী খোঁচাল না। আর একটা প্রশ্নও করণ না। জায়গা মতো নেমে গেল। গাড়ি ছুটল স্বয়ম্ভুর বাড়ির দিকে।

২৬

ইংলিশ, বাংলা, হিন্দি মিলিয়ে পরপর ছ'টা খবরের কাগজ স্বয়ম্ভুর মুখের সামনে সাজিয়ে দিলেন জয়েন্ট সিপি শুভঙ্কর কাঞ্জিলাল। কোনও কথা বললেন না। শুধু বাঘের মতো চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইলেন স্বয়ম্ভুর দিকে। প্রথম কথাটা স্বয়ম্ভুই বলল, 'দেখেছি স্যার।'

-স্লোগানগুলো শুনেছে তো? কাল থেকে নিউজ চ্যানেলগুলোতে যেগুলো দেখাচ্ছে!

-ইয়েস স্যার।

বাঘের চোখে চোখ রেখেই বলল স্বয়ম্ভু। শুভঙ্কর যেমন লম্বা তেমনি পেটানো চেহারা। দুটো গালে শুধু বসন্তের দাগ। কথা বললে মনে হয় কোনও কেঁদো বাঘ তেড়ে একটা হালুম করার আগে গলা ঝেড়ে নিচ্ছে। সেই গলাটাই যতটা নরম করা যায় ততটা করেই সাপ খেলানো সুরে শুভঙ্কর বললেন, 'কী কী স্লোগান বলো তো। দেখি মনে আছে কিনা।' যেন কোচিং ক্লাসে আগের দিনের পড়া ধরছেন স্যার। স্বয়ম্ভু চোখ নামাল। বাধ্য ছাত্রের মতো বলল, 'ভুয়ো স্বয়ম্ভু দূর হটো। ফুটো গোয়েন্দার ফাটা মাথা, কোলকাতা পুলিশের ছেঁড়া কাঁথা। অপদার্থ প্রশাসনের মুখে থুতু।' আরও বেশ কয়েকটা বলার জন্য প্রস্তুত ছিল স্বয়ম্ভু কিন্তু তার আগেই শুভঙ্কর কাঞ্জিলাল নাটকীয় সুরে হাত তালি দিয়ে উঠলেন। দাঁতের পাটি বের করে খানিকটা উৎপল দত্তের আদলে বলে উঠলেন, 'ক্যায়া বাত ক্যায়া বাত। তুমি ক পেয়েছ স্বয়ম্ভু। গোয়েন্দা না হয়ে প্রফেসর হতে পারতে তো। এমন সুন্দর পড়া মুখস্থ করতে পারো।'

-স্যার প্লিজ।

করুণ সুরে বাজল স্বয়ম্ভু। ঠিক ততটাই নিদারুণ উত্তর ধেয়ে এল তার দিকে, 'তা এরপর কী করবে কিছু ভেবেছ?'

-হ্যাঁ স্যার। আমার প্ল্যান পুরো ছকা আছে।

-গুড। ভেরি গুড। না মানে দেখো, একটা মানুষ একটা বিষয়ে ফেল করেছে মানে তো এই নয় যে সে সব বিষয়ে ধ্যাড়াবে তাই না?

স্বয়ম্ভু ভেবেছিল সিপি হয়তো এই কেসের পরের প্ল্যান জানতে চেয়েছেন। কিন্তু না, সেটাও এক চরম ঠাট্টা। সিপি বললেন, 'তা কী করবে ভেবেছ? প্রশাসনের কোনও বিভাগে থাকবে? নাকি কলেজ টলেজে ট্রাই করবে?"

-প্রশাসনেই থাকব স্যার।

শুভঙ্করের একটা ভুরু উঠে গেল, 'হুঁ? কী করতে চাও বলো আমি রেকমেন্ড করে দিচ্ছি।' মেরুদণ্ড সোজা রেখে দৃঢ় স্বরে বলল, 'এখন যেটা করছি। সেটাই করব স্যার।' শুভঙ্করের মুখের পেশীগুলো শক্ত হল। চোখেমুখে যে তামাশার তাশা বাজছিল, সেটা ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল। স্বয়ম্ভু বলল, 'এই কেসটা আমি নিজে যেচে হাতে নিয়েছি। কিন্তু এখনও আমি কোনও সমাধান করতে পারিনি। তার মানে এটা দাঁড়াচ্ছে অরুণার পর আর যারা যারা মারা গেছে তাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী। স্বয়ম্ভু সেন দায়ী। এখানে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট কোনওভাবে দায়ী নয়। শুধু একটাই অনুরোধ স্যার। আমায় আর চারটে দিন সময় দিন। প্লিজ।'

-যাতে বাকি যে আছে তার লাশটাও খুঁজে পাওয়া যায়?

-কথা দিলাম স্যার, প্রয়োজনে আমার জবানবন্দি আপনি রেকর্ড করেও রাখতে পারেন।

-কী কথা?

-এই চারদিনে এই কেস সংক্রান্ত একটাও লাশ পড়বে না।

-চারদিন বাদে পড়তে পারে

-সে সম্ভাবনা এক শতাংশ।

-কী প্রমাণ আছে যে এতটা শিওর হয়ে বলছ?

-সরি স্যার, সেটা এই মুহূর্তে বলাটা সম্ভব নয়।

-আর যদি চারদিনে বাদেও তুমি ফেল করো!

-যা শাস্তি দেবেন মাথা পেতে নেব। এতগুলো খুনের দায় নিয়ে যদি হাজতবাস বা ফাঁসি

হয় সেটাও আমি স্বীকার করব।

শুভঙ্কর রিভলবিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে স্বয়ম্ভুর দিকে পিছন ফিরে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর ঝড়ের গতিতে আবার ঘুরে গিয়ে বললেন, 'বেশ। চারদিনই সময় দিলাম। যদি কোনও বিশেষ সাহায্য লাগে আমায় জানাতে হেজিটেড করবে না।'

-থ্যাংক ইউ স্যার।

বাঘের ডেরা থেকে বেরোতেই দেখল শিবাঙ্গী মুখ লাল করে দাঁড়িয়ে আছে। 'কী হল স্যার?' স্বয়ম্ভু অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে শিবাঙ্গী? এরকম সারা মুখ লাল করে ঘেমে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?'

-টেনশনে। কী বললেন?

-বোঝো। আমি দিব্যি বাঘের ডেরা থেকে গটগট করে বেরিয়ে এলাম। আর তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে.....

-বাঘের ডেরায় সিংহ গেলে তার কিছু হয় না স্যার।

-শিবাঙ্গী, তেলের দামটা কিন্তু অনেক বেড়েছে।

হেসে ফেলল শিবাঙ্গী। 'উফফফ ইয়ারকি ছাড়ুন। বলুন না কী বলল? অবশ্য যদি বলা যায়!'

-আমাদের হাতে চারদিন সময়। এর মধ্যে কেসটা সল্ভড না হলে আমায় জেলে কিংবা ফাঁসিতে লটকাতে হবে।

-মানে?

-এই শাস্তিটা আমিই চেয়ে নিয়েছি।

-কেন?

শিবাঙ্গীর পা দুটো টলে গেল।

-নইলে এখুনি সরে যেতে হত কেসটা থেকে। শোনো শিবাঙ্গী, এখন একমাত্র তুমিই আমায় বাঁচাতে পারো।

এতক্ষণ শিবাঙ্গী যে টেনশনে ছিল সেটা এখন চতুর্গুণ বেড়ে গেল। বুকের মধ্যে কোথাও একটা ভালো লাগার হাওয়াও লাগল। শিবাঙ্গী বুঝল কী?

-আমি কীভাবে বাঁচাব স্যার?

-মৃত্তিকাকে মরতে দেওয়া চলবে না। আজ থেকে তিনদিন তুমি ওদের ওপর শকুনের মতো নজর রাখবে। যদিও শমন মৃত্তিকার বাড়ির মধ্যেই আছে হয়তো! জানি না। যাই হোক, তুমি এক মুহূর্তের জন্য ওকে নজর ছাড়া করবে না। আমি বলেছিলাম না, আজ আমায় আউট অফ কোলকাতা যেতেই হবে।

-পারব স্যার।

উত্তরটা স্বয়ম্ভুর বুকে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারল। আগেরদিন স্বয়ম্ভুর না থাকার খবর শুনে যেরকম ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল শিবাঙ্গী আজ ঠিক তার উল্টো অভিব্যক্তি। সে কী স্বয়ম্ভুর মাথায় খাঁড়া ঝুলছে বলে?

-বাবা! তুমি কী আজকে বোর্নভিটা বা এনর্শিওর কিছু খেয়ে এসেছ নাকি?

-এই জন্যেই আপনাকে সিংহ বলেছি। শিয়রে শমন, অথচ দেখুন কেমন আমার পেছনে লাগছেন! ও হো, একটা খবর আছে স্যার।

-কী?

-দয়াময় সান্যাল।

নামটা শুনেই শিবাঙ্গীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল স্বয়ম্ভু।

-লাটাগুড়ি পুলিশ স্টেশনেই কাজ করতেন অ্যাজ আ কনস্টেবল।

-হোয়াট!

-হ্যাঁ স্যার। আজ থেকে দশ বছর আগে সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে যায় কেউ জানে না। পি এস থেকে ছবিও পাঠিয়েছে।

মোবাইলে ছবিটা খুলে স্বয়ম্ভুর দিকে বাড়িয়ে দেয়। স্বয়ম্ভু দেখে ভালো করে। চোখের সামনে একটা ঝড় ওঠে স্বয়ম্ভুর। মোবাইলটা শিবাঙ্গীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'ছবিটা আর্টিস্টকে দাও। বলো আমায় কল করতে। আর এই লোকটার হিস্ট্রি বের কর।'

-করেছি স্যার। দয়াময়ের রেকর্ড খুব ভালো ছিল। বউ আর ছেলেকে নিয়ে লাটাগুড়িতেই থাকত। বউটা বিহারী ছিল। নাম রামাইয়া। সামনেই একটা হোটেলে রান্নার কাজ করত। দুর্দান্ত রান্না করত রামাইয়া। হঠাৎ একটা অ্যাক্সিডেন্টে ওদের বাচ্চাটা মারা যায়। বউটা স্বাভাবিকভাবেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। শারীরিক ও মানসিক। তারপরে হঠাৎ একদিন রামাইয়া সুইসাইড করে। গলায় দড়ি।'

-ছেলের শোকেই নাকি অন্য কোনও কারণ?

-ওখানকার লোকে তো বলে ছেলের শোকেই।

--যদি ছেলের শোকের জন্যেই হয় তাহলে আগেই তো গলায় দড়ি দিত।

-তখন দয়াময় সঙ্গে ছিল। তাই হয়তো দিতে পারেনি। দয়াময় কাজের জন্য বাইরে যেতেই ...

-হুম!

ফোনটা বেজে উঠল স্বয়ম্ভুর। প্রাঞ্জল। 'হ্যাঁ প্রাঞ্জল উদ্ধার হল কিছু?' স্বয়ম্ভু জিজ্ঞেস করল। তারপর ওপার থেকে কিছু কথা ভেসে আসার পরই স্বয়ম্ভু থম মেরে গেল। বলল, 'আমি আসছি দাঁড়াও।' নিমেষের মধ্যে প্রাঞ্জলের কাছে এল স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী। প্রাঞ্জল একটা মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপ খুলে দেখাল। 'এই দেখুন, ঠিক দুদিন আগে এই নম্বর থেকে সুস্মিতার কাছে কিছু একটা আসে। যেটা ডিলিট হয় সুস্মিতার তরফেই।'

-নম্বরটা কোথাকার?

-আফ্রিকা।

স্বয়ম্ভু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। 'খুনি তো দেখছি ওয়ার্ল্ড ট্যুর করিয়ে ছাড়বে।' শিবাঙ্গী হেসে ফেলল। স্বয়ম্ভু বলল, 'এই মেসেজে কী এমন ছিল যেটা সুস্মিতা তার ফোনে রাখতে চায়নি?" প্রাঞ্জল বলল, 'এটা যে পাঠিয়েছে সেও ডিলিট করতে পারে স্যার।'

-পারে। বাট করেনি। কারণ জিনিসটা যাতে সুস্মিতা পড়ে বা দেখতে পায় খুনি তো সেই জন্যেই পাঠিয়েছে। ভুল করে তো আর পাঠায়নি। তার মানে একটা নির্দিষ্ট সময় অব্দি সেটা রাখতে হবে। ডিলিট করলে তারপরে করবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, খুনি কি এই সাইট খুলে বসেছিল নির্দিষ্ট সময় পরে সেটা ডিলিট করবে বলে? বা কোনও সাইট থেকে ভিডিয়ো পাঠালে সেটা কি আদৌ আর ডিলিট করা যায়? আমার মনে হয় না। সে খুব ভালো করে জানে আমরা সব সময় সজাগ আছি। মেসেজটা পাঠিয়েই সে সাইটটা থেকে বেরিয়ে গেছে। একবার যদি বেরিয়ে যায় পরেরবার এই সাইটে ঢুকে ডিলিট করা চাপ। কারণ ততক্ষণে নম্বর বদলে যায়। নয় তো, ধরা পড়ার চান্স থাকে। হতেই তো পারত সুস্মিতা ভয় পেয়ে সেটা পুলিশকে জানিয়ে দেবে। আর পুলিশ নম্বর ট্র্যাক করে ফেলবে কারণ খুনি তখন অনলাইন। আই পি অ্যাড্রেসটা একই থাকছে। খুনি এত বড় ভুল করবে না। তাই সুস্মিতাই ডিলিট করেছে। এক কাজ কর প্রাঞ্জল, এই ডিলিটেড মালটা বের করার চেষ্টা কর।'

-ওকে স্যার।

-কল লিস্টের কী খবর?

-লাস্ট তিনদিনের মধ্যে তিনবার ফোন এসেছে। রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া আর কেরালা।

-যাক একটা অন্তত দেশের মধ্যে রয়েছে।

শিবাঙ্গী বলল, 'তিনবার কল এসেছে মানে তিনবার ম্যাও?'

-সেটাই হ...

বলতে গিয়ে আটকে গেল স্বয়ম্ভু। অন্তর্চক্ষে কিছু একটা ছবি যেন চলকে উঠল। চুপ করে ভাবল।

-কী হল স্যার?

প্রাঞ্জল প্রশ্ন করল। স্বয়ম্ভু বলল, ‘একটা কাগজ আর পেন দাও তো।' সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। স্বয়ম্ভূ আঁকতে শুরু করল। প্রথমে একটা পাতা। যার দুপাশের দুটো রেখা বৃন্তের কাছে এসে মিলছে না। সেটা ডানদিকে কিছুটা হেলে আছে। হুবহু আরেকটা পাতা বাঁদিকে হেলিয়ে আঁকল। এরও বৃন্তের কাছটা জোড়েনি। মনে হচ্ছে কেউ পাতা দুটোর নীচের দিকটা কাঁচি দিয়ে কেটে দিয়েছে। তারপর পাতা দুটোর নীচে একটা বাটির নিম্নাংশের মতো অর্ধেক গোল রেখা টানল। যদিও গোলের নীচের দিকটা ঈষৎ ছুঁচলো। অনেকটা একটা মুখের অবয়বের মতো। দুপাশের গাল থেকে চিবুক পর্যন্ত নেমেছে। এবার ওপরে দুটো পাতা আর নীচের মুখের অবয়বের রেখাটির মাঝে দুটো গোল আঁকে স্বয়ম্ভু। দুটো গোলেরই মাঝে দুটো ছোট বিন্দু আঁকে একটু মোটা করে। ছবিটার দিকে তাকায় স্বয়ম্ভু। ঠোঁটের কোণে হাসির রেশ। দুটো পাতার মাঝে একটু ফাঁকা অংশ ছিল। সেটাকে একটা রেখা দিয়ে যুক্ত করে দিল। আঁকাটা ঘুরিয়ে প্রাঞ্জল আর শিবাঙ্গীর দিকে দেখাল। ‘বলো তো এটা কী?' শিবাঙ্গী আর প্রাঞ্জল প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল, ‘বেড়ালের মুখ?’

-কারেক্ট। শুধু গোঁফগুলো মিসিং।

প্রাঞ্জল জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ এটা আঁকলেন কেন?' শিবাঙ্গী বলল, 'আমি জানি।'

-বলে ফেলো।

স্বয়ম্ভু একটা ভুরু তুলে বলল।

-অরুণার পায়ের তলায় দুটো পাতা আঁকা ছিল। দুটো পাতারই নীচের অংশ ছিল না। আমরা পাতা ভেবে ভুল করেছিলাম। আসলে ও দুটো বেড়ালের কান।

স্বয়ম্ভুর ঠোঁটের হাসিটা একটু চওড়া হল। শিবাঙ্গী বলল, 'দিয়ার পায়ের পাতায় হাফ সার্কেল আঁকা ছিল। কিছুটা ইংলিশ ভি-এর মতো লেগেছিল নীচের দিকটা ছুঁচলো ছিল বলে। মুখের মতো লাগলেও বুঝতে পারিনি। যেটা বেড়ালের মুখের একটা স্কেচ বলা যেতে পারে। আর সুস্মিতার পায়ের নীচে বেড়ালের চোখ।' প্রাঞ্জল বেশ চোখ বড় বড় করে বলে উঠল, 'তার মানে গোঁফটা... ।'

-মৃত্তিকার পায়ে আঁকা হবে

শেষ পেরেকটা স্বয়ম্ভু পুঁতে দিল। ঘরের মধ্যে থমথমে নীরবতা। হাওয়াটা ক্রমে ভারী হয়ে উঠছে।

-কী অবস্থা তোমার তপন?

-আজ কিছুটা বেটার স্যার। জ্বর নেই। তবে মাথা তুলতে পারছি না। -হুম। এখন এরকমই হচ্ছে।

-কিছু কাজ ছিল স্যার?

-কাজ তো ছিলই। যাক, তুমি রেস্ট নাও। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। রাখলাম।

দুপুরে ভাত খেতে খেতে কথা বলছিল স্বয়ম্ভু। ফোনটা রেখে বলল, ‘এই তপনটা অসুস্থ হয়ে বড় বিপদ হল। আসলে ও আমাদের সঙ্গে সব সময় থেকে থেকে আমাদের মতো হয়ে গেছে। ওয়েভ লেন্থটা ম্যাচ করে খুব। শশার টুকরোটা মুখে পুরে শিবাঙ্গী বলল, ‘কী করবেন কৃষ্ণকে নিয়ে যাবেন?'

-অগত্যা। এই আবার মা ফোন করেছে। হ্যালো বাড়ি ঢুকেছ?

সুচিত্রা বললেন, ‘এই তো আধঘণ্টা হল।'

-মাসি মেসো?

-আছে একরকম। অভ্যেস তো করতেই হবে।

-হুম।

একটা ভারী নিশ্বাস বেরিয়ে এল স্বয়ম্ভুর। তখনই সুচিত্রা জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুই ঠিক আছিস?' গলাটা করুণ হয়ে স্বয়ম্ভুর কানে বাজল।

--আমি! হ্যাঁ! ঠিকই তো...

বলেই বুঝল মা কেন এই কথা জিজ্ঞেস করছে। মাকে শুনিয়ে হাসল স্বয়ম্ভু। বলল, ‘আমি বিন্দাস। কেন? তোমায় কেউ কিছু বলেছে?'

-লোকের কথায় আমি আবার কবে পাত্তা দিয়েছি? তুইও দিস না। যে যা খুশি বলে বলুক। তুই তোর কাজ করে যা। তোর যেটা ঠিক মনে হবে সেটাই করবি।

স্বয়ম্ভুর শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে কেউ যেন ভরসার নরম হাত বুলিয়ে দিল। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে সাহস দিল। ‘আমার তো চিন্তা তোমায় নিয়ে। বাড়িতে একা থাকবে তুমি!”

-তোর বাবা চলে যাবার পর আমি একা বাঁচতে শিখে গেছি। আমায় নিয়ে ভাবিস না তো। কাজে মন দে। শিবাঙ্গী যাচ্ছে তোর সাথে? -না না। মেয়েদের কেউ এসব কাজে নিয়ে যায়?

শিবাঙ্গী দিব্যি খাচ্ছিল। কোথা থেকে যেন মোক্ষম একটা অদৃশ্য খোঁচা এসে লাগাতে প্যাটপ্যাট করে তাকাল স্বয়ম্ভুর দিকে। সুচিত্রা বলল, 'নিশ্চয়ই সঙ্গে আছে তোর?'

-হ্যাঁ। লেজুড় আর যাবে কোথায়? সামনেই বসে।

এবার শিবাঙ্গী নিশ্চিত। কপট রাগে তাকাল স্বয়ম্ভুর দিকে।

গড়গড় ঢেঁকুর তুলে হাত দুটোকে মাথার ওপর ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল স্বয়ম্ভু। শিবাঙ্গী তাকাতেই স্বয়ম্ভু বলল, ‘পেটপুরে ভাত খেয়ে একটু শব্দ করে ঢেঁকুরই যদি না তুলি তাহলে বাঙালি হয়ে জন্মেছি কেন? ওসব সরি ফরি আমি বলতে পারব না।'

-কানা মনে মনে জানা।

শিবাঙ্গীও দিল পাল্টা। স্বয়ম্ভু হাসিটাকে লুকিয়ে নিয়ে বলল, ‘পান খাবে?’ এক গাল হাসি নিয়ে শিবাঙ্গীর উত্তর, ‘মিষ্টি পান।' মুখটা ব্যাজার হয়ে গেল স্বয়ম্ভুর। ‘না নেই না কোনও কিছুতে?'

-ও মা! কেউ ভালোবেসে পান খাওয়াতে চাইলে খামোকা না বলব কেন?

-সেই। চলো।

সামনেই একটা অল্প বয়সী ছেলের পানের দোকান। স্যান্ডো গেঞ্জি আর বার্মুডা পরে বসে পান সাজছে। স্বয়ম্ভুকে দেখেই ‘সেলাম সাব' বলে উঠল। ছেলেটির ওস্তাদি দেখে স্বয়ম্ভুও তামাশা করে দুহাত জড়ো করে বলল, ‘নমস্কার। দুটো মিষ্টি পান দিন।' ফ্যাক করে হেসে ফাজিল ছেলেটির জবাব, 'জো হুকুম মেরে আকা।' স্বয়ম্ভু সঙ্গে সঙ্গে একটা আদুরে চড় তুলে বলে উঠল, ‘মারব না এমন! '

-থার্ড ডিগ্রি?

-সব শিখে গেছিস না তুই?

-লালবাজারে পান বিক্কিরি করি। এসব না শিখলে চলে স্যার?

-বুঝেছি। ভালো করে সাজ। নইলে....

স্বয়ম্ভুর হঠাৎ চোখ পড়ে ছেলেটির হাতের দিকে। জাঁতি দিয়ে টকাস টকাস করে সুপুরি কাটছে। স্বয়ম্ভুর অবস্থার পরিবর্তন টের পায় শিবাঙ্গী কিছু প্রশ্ন করার আগেই স্বয়ম্ভু বলে ওঠে, ‘শিবাঙ্গী, কৃষ্ণকে ফোন কর। বলো এখুনি এখানে আসতে। বেরোবো।' বিনাপ্রশ্নেই কাজ হয়ে গেল। পান চিবোতে চিবোতে গাড়িতে উঠেই স্বয়ম্ভু বলল, ‘ফুলবাগান চলো।' শিবাঙ্গী হকচকিয়ে গেছে।

মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে গাড়িটা এসে দাঁড়াল একটা কামারশালার সামনে। সেখানে তখনও চ্যাঁ চোঁ করে কোনও ধাতব শরীরে শান দেওয়া চলছে। স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী হানা দিল সেই কামারশালায়। কামারের সামনে হাঁটু মুড়ে বসল স্বয়ম্ভু। লোকটি কাজ থামিয়ে অবাক চোখে চেয়ে রইল। ‘কিছু করাবেন বাবু?' স্বয়ম্ভু গোঁফের কাছটা একটু চুলকে বলল, 'হ্যাঁ দাদা। একটা বিশেষ জিনিস করাব।

-বলেন।

-একটা জাঁতি চাই আমার।

-অ। তা সে তো কিনতেই পাওয়া যায়। এই রাস্তা ধরে সোজা গেলেই দোকান।

-সুপুরি কাটার জাঁতিতে হবে না আমার।

-তবে?

স্বয়ম্ভু নিজের হাত দেখিয়ে বলল, ‘এই ধরুন আমার হাতের আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত হলে যেরকম মাপ হবে সেরকম একটা জাঁতি যদি হয়। -অ। বুঝেছি বুঝেছি। আপনি কি দীপুবাবুর কেউ হন?

-কে দীপু?

-দীপায়ন চ্যাটার্জি। এই তো এইখানে থাকে।

-কেন বলুন তো?

-এই হপ্তাদুয়েক আগে উনি এসে এরকমই একটা বিশাল জাঁতির অর্ডার দেন।

কথাটা শিবাঙ্গীরও কানে যায়। সেও স্বয়ম্ভুর পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। স্বয়ম্ভু বলে, 'আপনি ঠিক দেখেছেন যে ওটা দীপায়নবাবুই ছিল?’

-রাতের বেলা এসেছিল। বৃষ্টি পড়ছিল। একেবারে মাথা পর্যন্ত রেনকোটে ঢাকা। মুখে আবার মাস্ক। প্রথমে বুঝতে পারিনি। উনি নিজেই বললেন, আমাকে চিনতে পারছ না, তাই না? এতসব পরে আছি তো। আমি বললাম না। কে বলেন তো? দীপু গো দীপু। দীপায়ন চ্যাটার্জি। তখন বুঝলাম।

-মুখ তো দেখেননি। ওনার নাম করে অন্য কেউও তো হতে পারত।

-চোখের নীচে আঁচিল। অন্য লোকেরও একই কী করে হবে? -রাতের বেলা। রেনকোটে ঢাকা মাথা। মুখে মাস্ক। তারপরেও আপনি চোখের নীচে আঁচিল খেয়াল করলেন?

-প্রথমে করিনি। দীপুবাবু কেবলই চোখটা চুলকোচ্ছিল। আমায় জিজ্ঞেস করল, দেখো তো পলুদা, চোখে কিছু পড়েছে? আমি ভালো করে টর্চ মেরে দেখলাম। তখনই আঁচিলটা নজরে পড়ল। পরে একদিন সকালে এখান দিয়ে বাজার যাচ্ছিল। আমায় বলল, পলুদা আওয়াজটা একটু কম করতে পারো তো। কান তো এবার খসে যাবে। তখনও তো দেখলাম। চোখের নীচে আঁচিল।

স্বয়ম্ভুও দীপায়নের সঙ্গে কথা বলাকালীন খেয়াল করেছিল বাঁ চোখের নীচে ঠেলে ওঠা আঁচিলটা। তাই লোকটা যে ভুল কিছু বলছে না সেটা একদম প্রমাণিত।

-কবে দিলেন?

স্বয়ম্ভূ জানতে চাইল।

-তিনদিন পর। রাতের বেলা এসে নিয়ে গেলেন।

- কীসে করে নিলেন? ব্যাগ এনেছিলেন?

এবারের প্রশ্নটা শিবাঙ্গী করল।

-অই তো, জাঁতিটা কয়েকটা কাগজে মুড়ে নিলেন ভালো করে।

-কী কাগজ? খবরের কাগজ?

পলুদা হেসে ফেলল। বলল, ‘বাবা আপনারা তো গোয়েন্দার মত প্রশ্ন করছেন। অত কী দেখেছি ছাই?' বলে ভাবল খানিক। তারপর বলল, 'না, খবরের কাগজ ছিল না। সাদা পাতার ওপর কীসব যেন লেখা ছিল। তা সে দিয়ে মুড়েমাড়ে একটা সাদা নাইলনের বস্তা এনেছিল। সেটার মধ্যে পুরে নিয়ে গেল। তা আপনি সেরকমই চান তো?

স্বয়ম্ভু হাসল। বলল, 'আমি জাস্ট জানতে এসেছিলাম আপনি করেন কিনা। সময়মতো অর্ডার দিয়ে যাব। আজ আসি পলুদা।'

-অ্যাঁ! হ্যাঁ... আসেন।

কেন যে এল! কেনই বা হাজারটা প্রশ্ন করে চলে যাচ্ছে কিছুই ঢুকল না পলুর মাথায়। গাড়িতে উঠেই স্টার্ট দিতে বলল স্বয়ম্ভু। শিবাঙ্গী বলল, ‘একবার দীপায়নের কাছে গেলে হত না স্যার?”

-না। জিনিসটা ওর কাছে নেই।

-তাহলে?

-যে বা যারা পা থেকে আঙুল কাটার খেলায় মেতেছে তাদের কাছে আছে। তাই এখন

কিছু প্রমাণ করতে পারব না। উলটে সতর্ক হয়ে যাবে। ভয় পেয়ে তাড়াহুড়ো করে ওদের প্ল্যানের বাইরে গিয়ে মৃত্তিকাকে শেষ করে দেবে। যেমন সুস্মিতাকে করল।

-মৃত্তিকা তো দীপায়নের স্ত্রী।

-তবু তো ওই নৃশংস ভিডিয়োটা সে পেল। কেন পেল? শুধু ভয় দেখানো? নাকি মৃত্যুর সংকেত? মৃত্তিকাকে সরাবার প্ল্যান না থাকলে ভিডিয়োটা পেত না মৃত্তিকা।

-কিন্তু কেন?

-তার জন্যেই তো ওদের অতীতটা জানতে হবে শিবাঙ্গী। দীপায়ন কেন তার স্ত্রীকে খুন করতে চাইবে? শ্রীকুমার আর শ্রীদেবীর মধ্যে দীপায়ন এল কোথা থেকে? এদিকে দীপায়ন একটা ক্রাইম থ্রিলার লিখেছে। গল্পের সঙ্গে যদিও এই ঘটনার কোনও মিল নেই।

-আপনি পড়েছেন?

-হুম।

-গল্পের সঙ্গে বাস্তবের মিল না থাকলেও দীপায়নের মাথায় ক্রাইম থ্রিলারের প্লট ভালোই খেলে। তাই ওর পক্ষে আরেকটা কোনও... এই এই দেখে কৃষ্ণ !

গাড়িটা সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে। নইলে মহিলাটা এক্ষুনি গাড়ির তলায় চাপা পড়ত। মহিলাটি কোনওরকমে গাড়ির বনেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়। শিবাঙ্গী আর স্বয়ম্ভু দুজনেই দ্রুততার সঙ্গে নেমে যায়। মহিলাটি তাকাতেই স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী চমকে ওঠে।

-মৃত্তিকা!

স্বয়ম্ভু বলে ওঠে। কৃষ্ণকে গাড়ি সাইড করতে বলে মৃত্তিকাকেও রাস্তার পাশে নিয়ে আসে। 'এইভাবে কেউ রাস্তা পেরোয়? দেখে পেরোবেন তো?''

-সরি স্বয়ম্ভুবাবু, আসলে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

-সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কেন? রাস্তায় বেরিয়ে এত কীসের ভাবনা?

-কিছু না। আমি আসি।

-দাঁড়ান। আমায় বলতে পারেন। মানে প্লিজ বলুন। নিশ্চয়ই সুস্মিতার খবরটা...

কথাটা না শুনেই দুটো হাত দিয়ে কান চাপা দিল মৃত্তিকা। অসম্ভব ভয় পেয়ে আছে সে। 'আমি শুনতে চাই না। দেখতে চাই না। খবরটা শোনার পর থেকে আমি ভয়ে সিঁটিয়ে আছি। আবার যদি ওইরকম নৃশংস ভিডিয়ো পাঠায়!

-না। এই খুনের কোনও ভিডিয়ো হয়নি মৃত্তিকা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। -একে একে সবাই চলে গেল। বাকি শুধু আমি। ওই বেড়ালের ডাকটা... -বেড়ালের ডাক!

স্বয়ম্ভূ আর শিবাঙ্গী প্রায় সমস্বরে বলে উঠল। স্বয়ম্ভু জানতে চাইল, ''ওই ফোনটা আপনিও পেয়েছেন?'

-গতকাল রাতে।

-দীপায়নবাবুকে বলেছেন?

-হ্যাঁ।

-উনি কী বললেন?

-গা করল না। বলল, তুমি সারাদিন ওইসব ভাবছ বলে ওরকম শুনেছ। নেটওয়ার্কের প্রবলেম ছিল তাই হয়তো কথা শুনতে পাওনি। ও আমায় ভুলিয়ে রাখবে বলে জোর করে পার্লারে পাঠাল জানেন।

- পার্লারে!

-হ্যাঁ। দুদিন বাদেই তো দেবীর অন্নপ্রাশন। তাই পার্লার বুক করতে এসেছিলাম।

-আপনার মেয়ের নাম দেবী?

-ওটা আমি ডাকি। ওর বাবা ডাকে শ্রীদেবী।

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে হলেও গাড়িঘোড়ার শব্দগুলো স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গীর কান থেকে লুপ্ত হয়ে যায়।

-উনি কী শ্রীদেবীর ফ্যান?

-হ্যাঁ। ছোট থেকে। আমার ভীষণ আপত্তি ছিল। ওই নামটা আমি সহ্য করতে পারি না।

- স্বাভাবিক।

স্বয়ম্ভুর প্রত্যুত্তরে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল মৃত্তিকা। চোখ নামিয়ে নিল। শিবাঙ্গী প্রশ্ন করল, 'তা শ্রীদেবী কি আপনার মেয়ের ভালো নাম?''

-না। দেবোত্তমা। আমি আসি। থ্যাংক ইউ।

-একটা কথা সত্যি করে বলবেন?

মৃত্তিকা দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘুরে তাকাল। স্বয়ম্ভু বলল, 'শ্রীদেবীর সঙ্গে বেড়ালের কী সম্পর্ক? খুনি কেন ফোন করে বেড়ালের ডাকই শোনাচ্ছে আপনাদের?'

-পাপ! যে পাপের কোনও তদন্ত হয় না। আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না প্লিজ।

গলায় কান্না জড়িয়ে আছে মৃত্তিকার। শিবাঙ্গীর প্রশ্ন আবারও পথ আটকাল মৃত্তিকার, 'পার্লারটার নাম জানতে পারি?' মৃত্তিকা ঘুরে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে বলল, ''কে...কেন?'

২৭

বৃদ্ধার পক্ককেশে জানলা দিয়ে ঠিকরে পড়েছে সকালের আলো। পাখি ডাকছে। শ্রাবণের মেঘ এখানে ছাড়পত্র পায়নি বোধহয়। বেশ গরম। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। দুধ-চিঁড়ে খাচ্ছেন বৃদ্ধা।

-অ মা, ইনি একটু তমার সাতে কথা বলবেন।

ছেলের গলা শুনে তাকালেন বৃদ্ধা। মুখের মধ্যে দু-চারটি দাঁতই অবশিষ্ট আছে। গলার শির ফুলে চামড়ার ওপর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। 'ক্যাআআ ?' শুধোলেন বৃদ্ধা। মাঝবয়সী ছেলে বলল, 'শহর থেকে এসচেন। সেই কলকাতা!' বৃদ্ধা এবার চোখ তুলে শহরের বাবুকে দেখার চেষ্টা করলেন। সব ঝাপসা। চিঁড়ের বাটিটা সামনের টেবিলে রেখে বিছানায় বালিশের পাশে শিরাফোলা হাত দিয়ে হাতড়াতে থাকেন। ছেলেই চশমাটা খুঁজে মায়ের চোখে পরিয়ে দেয়। এবার পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শহরের বাবুকে।

-কী চাই?

-একটু কথা বলব মাসিমা।

-কী ব্যাপারে?

বৃদ্ধার বয়স হলেও কানে খাটো নন। স্বয়ম্ভুর বলা কথাগুলো একবারেই কানে গেছে। 'শ্রীদেবীর ব্যাপারে।' নিমেষে পালটে গেল বৃদ্ধার মুখ। কুঞ্চিত চামড়ার ওপর অজস্র বলিরেখার মতো আরও কুঞ্চন ফুটে উঠল। বৃদ্ধার ছেলে স্বয়ম্ভুকে বেতের মোড়া এগিয়ে বসতে বলল।

-মাসিমা, আপনি যা যা জানেন সব বলুন। শ্রীদেবী কেমন ছিল? কী করত?

-এতকাল পরে আবার কেনে খুঁচাতে এলে বাছা?

-খুব দরকার মাসিমা। এটা না জানলে অনেক মানুষের প্রাণ চলে যাবে। বৃদ্ধার চোখদুটো যেন চকচক করে উঠল। স্বয়ম্ভুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জানলার বাইরে তাকালেন বৃদ্ধা।

অনেকরকমের গাছের ছায়ায় ঢাকা জায়গাটায় ধুপ ধাপ শব্দ হচ্ছে। সামনের টেবিলের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'অ্যাই, ক্যা র‍্যা? ক্যা' চিৎকার করে উঠলেন বৃদ্ধ মহিলাটি। নড়বড়ে শরীর নিয়ে এগিয়ে গেলেন জানলার দিকে। স্বয়ম্ভু অবাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। বৃদ্ধা তার আগেই জানলার লম্বা লম্বা লোহার গ্রিল ধরে চ্যাঁচ্যাতে লাগলেন, 'তুই আবার এসচু মুকপুড়ি? নাম বলচি। নাম।'

আমবাগানটা খিলখিলে হাসিতে ভরে উঠেছে। বুড়ি যত চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসে, ডালের ওপর ঠ্যাং ঝুলিয়ে সেই মেয়ে তত হেসে কুটোপাটি যায়। বৃদ্ধা একসময় আমগাছটার তলায় এসে হাতের লাঠি মাথার ওপর তুলে দেখিয়ে চ্যাঁচ্যাতে থাকে। 'দাঁড়া তোর মাকে বলচি। আদ্দামড়া ধ্যাতালা মেইছানা। ল্যাখাপড়া চুলায় দিয়ে গাছে উঠেচু? আমার সাদের আমগুলার পিণ্ডি চটকাচ্ছু?'' কোঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে গাছের ডাল ধরে সেই মেয়ের কী হাসি। বুড়িকে আরও রাগিয়ে দিতে গান ধরল, 'কে বলে ঠাকমা তোমার বয়স পেরিয়ে গেছে আশি! মনে তো হয় না দেখে তোমায় দুটি দাঁত বাঁধানো হাসি।'

- তুই একবার মাটিয়ে পা দে ছেমড়ি। তাপর দেকবি বাঁধানা দাঁতের জোরটা কত। গাচের ডাল দিয়ে মেরে তোর দাঁতকপাটি যদি না ফেলেচি ত...

কথা শেষ হতে না হতেই এক লাফে মাটিতে ল্যান্ড করল মেয়েটি। ঝাঁকড়া চুলগুলো মুখের সামনে থেকে সরিয়েই টপাটপ আম কুড়িয়ে নিল। কিন্তু সে বুড়ি লাঠি তুলে তাড়া করেই চলল। এক সময় বাগান ছেড়ে ছুট্টে পালিয়ে গেল ঝাঁকড়াচুলো দামড়া মেয়ে। বুড়ি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

তুড়ুক তুড়ুক লাফাতে লাফাতে বাড়িতে ঢুকেই থমকে গেল মেয়েটা। ছিপছিপে চেহারায় গালে হালকা দাড়ি ওঠা ছেলেটা চোখ পাকিয়ে ভুরু কুঁচকিয়ে প্রশ্ন করল, 'সরযু ঠাকমা কেন চ্যাচাচ্ছিল রে?' মেয়েটি আবার তুড়ুক তুড়ুক লাফিয়ে উঠে ঘরের দিকে এগোতে এগোতে

বলল, 'মাথার ব্যামো হয়েছে।'

-ব্যামো সরযু ঠাকমার নয়। তোর আছে। জন্ম থেকে।

মেয়ে এমন পাজি, টুক করে গলা তুলে রান্নাঘরের দিকে আড়চোখে চেয়ে বলে উঠল, 'ও মাআআআ, দ্যাকো আমার জন্ম তুলে কথা বলছে তপাদাআআআ।'

-ভুলটা কী বলেচে শুনি? পাগলিকে পাগলি বলেচে বেশ করেচে।

মা নয়, তিন বছরের ছোট গ্যাঁড়া ভাইটা ধুপধাপ করে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। 'এই তোকে কে কথা বলতে বলেচে রে? একে রামে রক্ষে নাই তায় আমার সুগ্রীব দোসর।' তপার দিকে তাকিয়ে খ্যাঁকখ্যাঁক করে বলল মেয়েটা, 'ভালোই তো দলে টেনেছ দেখছি। বলি ভাইটা কার? আমার না তোমার?' গুহা থেকে যেমন গরিলা বেরিয়ে এসে তাড়া করে, তেমনি করে মেয়েটির মা হুড়মুড় করে মুড়ো ঝ্যাঁটা হাতে বেরিয়ে এলো। লক্ষ্য তার এই বাচাল দামড়া মেয়ের ভূত ছাড়ানো। 'হারামজাদি, শয়তান মেয়ে। -ও মা গো...

বলেই ছিপছিপে তপাকে ঘিরে গোল গোল করে ঘুরতে লাগল। মা তার চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে। 'আজ বাদে কাল উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরাবে আর এখনও তুই গাছে উঠে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ধ্যাতালাপনা করে বেড়াচ্চু?' এবার ছোট ভাইটাকে ঘিরে গোল করে দৌড়তে শুরু করল মেয়েটা। ভাইও আরেক কাঠি, 'সর, সরে যা। আমায় ধরেচিস কেন? দিদি ছাড়' বলে সারা শরীর ঝাঁকিয়ে নাচিয়ে দিদিকে মায়ের হাতে তুলে দিতে চাইছে। ওদিকে তপা 'ও কাকিমা, ছাড়ো ছাড়ো। আমি দেখছি। এত বড় মেয়েকে মেরো না। ছাড়ো।' মহিলা হাঁফিয়ে ফুঁপিয়ে চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, 'অ্যাত বড়! কে বড় তপা? শ্রীদেবী? উ কুনুদিন বড় হবে নি। আমার হাড় মাস করে দিবে তাও শান্তি পাবেনি উ। আমাকে একবারে চিতায় তুলে তবে যদি শান্ত হয়।' কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে জিভ বার করে পাড়ার লালুর মতো হাঁফাচ্ছে। তপা মশকরা করার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। চোখের কোলে চলকে ওঠা হাসি নিয়ে বলল, 'কী সব বলছ কাকিমা! শ্রীদেবীকে জন্ম দিয়েছ তুমি। তোমার মেয়ের কত্ত নাম বলো তো চারদিকে। সেলিব্রেটি।'

-হ্যাঅ্যাঅ্যাঅ্যা... ওই নামেই শ্রীদেবী। না আছে শ্রী, না আছে কিছু হাসলে তো মনে হয় শাঁকচুন্নিতে ঠাট্টা করছে। মাথার চুলগুলো দেখ, কাকের বাসা। পাখিতে কম্ম কত্তেও ঘেন্না পাবে। ছ্যাঃ!

মুড়ো ঝ্যাঁটাটা উঠোনের মধ্যে ঝপাস করে আছাড় মেরে ফেলে রান্নাঘরে ঢুকে গেল শ্রীদেবীর মা। শ্রীদেবীর দামালপনা, বাচালতা সব কিছু ঠাণ্ডা হয়ে যায় ওর রূপ নিয়ে কেউ কিছু বললে। ছোট থেকেই জেনে এসেছে ওকে দেখতে নাকি ভালো না। না, ঠিক ভালো নয় কথাটা বলা ঠিক হবে না। দাঁতগুলো বেশ সুন্দর সাজানো। কিন্তু হাসলে দুপাশের গালদুখানা ফুলে কেমন কুমড়োর মতো হয়ে যায়। লোকের মাথায় চুল থাকে না বলে কত কাণ্ড করে। সোজা চুল হলে পার্লারে গিয়ে কোঁকড়া করে সুন্দর হয়। শ্রীদেবীকে এসব কিছুই করতে হয় না। ভগবানই ওকে সব কিছু দিয়ে পাঠিয়েছে। অথচ এগুলোর জন্যেই ওকে কথা শুনতে হয়। কেউ কেউ ওকে ঝাঁকড়া পাগলি বলে। শ্রীদেবী এসব যত শোনে তত ওর হাসি পায়। কারণে অকারণে হেসে লুটিয়ে পড়ে। এমন কপাল, এটা নিয়েও মুখঝামটা খেতে হয় বেচারিকে। কত লোকে হাসতে পারে না বলে মরেই যায়। আর একে দেখো। ও নিজেও জানে না কেন ওর এত হাসি পায়। আপন মনে হাসে। ওর নাম কিন্তু অনায়াসেই হাসি কিংবা খুশি হতে পারত। কিন্তু হয়নি। বাপ সাধ করে নাম রেখেছিল শ্রীদেবী। দেবী তো দূর, শ্রী-এর কণামাত্র নেই নাকি তার শরীরে। মুখটা অনেকক্ষণ ভিজে ন্যাতার মত হয়ে গেছে শ্রীদেবীর। তপা এগিয়ে যায়। শ্রীদেবীর চেয়ে কিছুটা লম্বা। তাই সামনের দিকে ঝুঁকে মেয়েটার মুখের দিকে চাইল তপা। শান্ত গলায় বলল, 'কেন এমন করিস বল তো? আজ বাদে কাল তুই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে যাবি। এখনও যদি...!' বলতে বলতে থেমে কপট ভীতি মুখে এনে বলে, 'হ্যাঁ রে, সত্যিই পাশ করবি তো? নাকি আমার মুখ পোড়াবি?'

-তোমার কীসের চিন্তা? মুখ পুড়লেও তোমায় কেউ বলতে যাবে না তোমার কোনও শ্রী

নেই। তুমি বিচ্ছিরি। ডানা কাটা পরির মত বউ হবে তোমার।

কথাটা শোনামাত্রই হো হো করে হেসে উঠল তপা।

-হাসো হাসো। সবাই হাসে। তুমিই বা বাদ যাবে কেন?

তারে গামছা ঝুলছিল। সেটাকে টেনে গটগট করে হাঁটতে শুরু করল বাইরেমুখো হয়ে। আবার কোথা থেকে মা এসে হাজির। 'কার পুখুরে ডুবতে যাওয়া হচ্চে শুনি?'

-আমি যে পুখুরে যাই, সেখেনেই।

দরজার দিকে তাকিয়েই ঝাঁঝ দেখাল শ্রীদেবী।

- ইসসস! লাটের বেটি এলেন রে। যে পুখুরে যাই! কটা পুখুরে নাম আছে এখেনে? অ্যার পুখুরে তার পুখুরে যাবি আর লোকে ঘর বয়ে এসে কথা শুনি যাবে। কুথাও যাবি নি। কুয়ার জল তুলা আছে, তায়েই চান করবি যা।

তপা এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁ রে শ্রী, তুই নাকি এইচ এস পাশ করে কোলকাতায় গিয়ে সেখেনকার কলেজে পড়বি! তা কোলকাতায় কোথায় পুকুর পাবি শুনি?'

-ও ঠিক জোগাড় করে নেব।

-মুখে নুড়া জ্বেলে শহর থেকে দূর করে দিবে এই বলে দিচ্চিI ব্যস, ঝাঁকড়া পাগলি আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল। হাসতে হাসতে তপার গায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, "মা কী বলে দেখো তপাদা। যেন রাজামশাই গুপীকে গাধার পিঠে চাপিয়ে গ্রাম ছাড়া করে দিচ্ছে।' আরও কিছু আবোল তাবোল হাসির পরে বলল, 'ওফফফ মা, ওটা শহর। ছোট্ট গ্রাম নয়। এই শ্রীদেবীকে শহর ছাড়া করা অত্ত সোজা না।' হেহেহেহে হিহিহিহিহি করতে করতে গামছা কাঁধে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। শ্রীদেবীর মা পিছু পিছু ধেয়ে গেল দরজা অব্দি, 'শ্রী যাবিনি বলচি। দাঁড়া। কথা শোন শ্রী। তপা দ্যাখ তো.... আমি আর পারবুনি। কোনদিন একটা অঘটন ঘটবে দেখে লিবি।'

তপাও ফিক করে হেসে বেরিয়ে গেল।

সন্ধে হলে সরযু রামায়ন খুলে বসেন। সাপ খেলানো সুরটা সারা বাড়িময় ছড়িয়ে পড়ে। সরযুর ছেলের বউ রাতের ভাত চাপিয়েছে তখন। উঠোনের দরজা খুলে ঢুকে এল শ্রীদেবী। হাতে একটা কাচের শিশি ভর্তি আমতেল। 'কই গো কুচুটে বুড়ি। বাড়ি আছ নাকি?' রামায়ন পড়তে পড়তেই ঘরের বাইরে তাকালেন সরযু। ঘোড়ার মতো ডিঙি মেরে উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে শ্রীদেবী আর ইতিউতি চাইছে। রান্নাঘর থেকে ছেলের বউ গলা তুলে বলল, 'অ্যাই দেবী। কতবার বলেছি না মাকে ওইভাবে ডাকবি না?"

-ও মা! কুচুটেকে কুচুটে বলা যাবে না?

-না। উনি গুরুজন।

-তা সে কই?

-স্বগগে চলে গেছি রে ছেমড়ি।

ঘর থেকে সরযু গলা তুললেন। গালের ওপর চপাট করে হাত রেখে শ্রীদেবী বলল, 'মা গো মা! যমের কী আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই নাকি যে তোমায় তুলতে আসবে!' লাফিয়ে লাফিয়ে সোজা সরযুর ঘরে ঢুকে এল শ্রীদেবী। সরযু বললেন, 'কী ধান্দায় এসচু?" শ্রীদেবী মুখের সামনে ঠকাস করে শিশি ভর্তি আমতেলটা রাখল। চশমার গোল গোল কাচের আড়ালে চোখদুটো চিকচিক করে উঠল। ফোকলা দাঁতে বাল্বের আলো ঝিকমিক করে উঠল। গদগদ হয়ে বুড়ি বলল, 'আমতেল এনেচু? আয় বোস বোস।

-সেদিন গাছে উঠে যে আমগুলো পাড়লুম সেগুলো দিয়েই....

বুড়ি গলার শির ফুলিয়ে ডাক দিল, 'অ বউমাআআআআ।' রান্নাঘর থেকে উত্তর এল, 'যাই মা।'

-চুলগুলার কী হাল করেচু বল দেকি! একটু তো যত্ন কত্তে পাত্তিস। অয় ওখেন থেকে চিরুনিটা এনে দে দেকি।

ঘরের দেয়ালে একটা ছোট আয়না ঝুলছিল। তারই সামনে রাখা ছিল চিরুণি৷ শ্রীদেবী নিয়ে এল। ততক্ষণে বউমা ঘরে এসে গেছে। বুড়ি বলল, 'শ্রী এসচে। আমার আর অর জন্যে

একটু মুড়ি মাখো না বউমা। আমতেল আর চ্যানাচুর দিয়ে।

-দিচ্চি মা।

বউমা আমতেলের শিশিটা নিয়ে গেল। সরযু শ্রীদেবীর চুলে চিরুণি দিয়ে চুল আঁচড়ে দিতে লাগল। জট পড়ে থাকা জায়গাগুলোতে টান পড়লেই শ্রীদেবীর মুখখানা প্যাঁচার মতো হয়ে যাচ্ছে। সরযু জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে তোর কবে রেজাল্ট রে?

-কী জানি? ডেট বলেনি গো ঠাকমা। সামনের মাসে বেরোবে বোধহয়।

-পাশ করবি তো?

-কবে আমি ফেল করেছি শুনি?

-না সেটা করুনু। তা বাদে তপা তোকে খুব যত্ন করে পড়ায়।

-পড়ায় কম, ধমক দেয় বেশি। যেন ওই আমার গুরুঠাকুর।

সরযু হাসে। বলে, 'ঠাকুর না হোক। গুরু তো। শিক্ষে দেয় বলে কথা।'

-মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে। বাড়িতে মায়ের খ্যাচখ্যাচ। পড়তে গিয়ে তপাদার। এখন আবার শ্রীকুমারও ধমকাচ্ছে আমায় জানো। কী সাহস ভাবো। আমার থেকে তিইইইন বছরের ছোট ভাই সে নাকি আমায় ধমকাচ্ছে।

-হ্যাঁ রে, তুই কলকাতা চলে যাবি না রে?

-কে বলল তোমায়?

-তোর মা। দুক্কু কচ্চিল।

-দুঃখ করছিল? কী যে বলো। এই তো দিনরাত বলে আমি বিদেয় হলে নাকি হাড়মাস জুড়োয়।

-ছেমড়ি একটা। ওইটা কী রাগ নাকি। অভিমান করে বলে। তুই সারাদিন যা দৌরাত্ম্য করে বেড়াউ।

গার্ডার দিয়ে চুলটা গুছিয়ে বেঁধে দিল সরযু। 'এদিকে ফের দেখি।' শ্রীদেবীও সরযুর দিকে ফিরে তাকাল। সরযু মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'দ্যাখ দেখি, মুখখানা কী পরিষ্কার লাগছে। এমন সুন্দর চোখ দুখানা দেখাই যায় নি চুলের ঠ্যালায়।'

পাগলি আবার হেসে খুন। 'উফ এত হাসির কী বললম রে ছেমড়ি?'

-তোর চোখে ছানি পড়েছে বুড়ি। নইলে আমার চোখ সুন্দর দেখিস?

-আমরণ। তোর মুখে পোকা পড়েছে। কথার ছিরি দ্যাখো।

-আমতেল দিয়েছি বলে তেল দিচ্ছ না ঠাকমা?

-এক চড় দুব। এই তিন কুড়ি বয়সে এসে তোকে তেল দুব কেনে বের দু-দিনের ছুড়ি?

বউটি দুবাটি মুড়িমাখা দিয়ে যায়। খসখসাখস শব্দ করে ঠাকমা আর নাতনি পরমানন্দে মুড়ি চিবোতে থাকে।

--আআআআহ! আমতেলটা কী ভালো হইচে রে।

বুড়ির প্রশংসায় ছুঁড়ি আনন্দে দুলে ওঠে। এইভাবেই প্রায়দিনই সন্ধেবেলা সরযুর সঙ্গে আড্ডা চলত শ্রীদেবীর।

-মেইছ্যানাটা যা লিত তার দুগুণ ফ্যারত দিয়ে যেত। খালি হাসত। কারণে অকারণে হেসে চলেচে।

শ্রীদেবীর কথা বলতে বলতে বৃদ্ধা সরযুর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। স্বয়ম্ভু এক দৃষ্টে চেয়েছিল। সরযুর ছেলে বলল, 'আপনি চা খান তো?' স্বয়ম্ভূ হেসে বলল, 'হ্যাঁ। অল্প চিনি।'

-আচ্চা। আপনারা কথা বলুন। আমি আসচি।

-আচ্ছা।

বৃদ্ধার ছেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে স্বয়ম্ভু প্রশ্ন করল, 'তারপর? শ্রীদেবী পাশ করল?

-হ্যাঁ হ্যাঁ। পাশ করবে না কেনে? ওর ইচ্ছে ছিল শহরের কলেজে গিয়ে লেখাপড়া করবে।

-কেন? এখানে কী ওর সাবজেক্ট ছিল না? মানে যে বিষয় নিয়ে পড়েছে সেটা কী....

-আমি নয় ক্লাস অব্দি পড়েছি বাবা। সাবজেক্ট মানে জানি।

স্বয়ম্ভুর মুখটা মুহূর্তে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সরযু বলতে শুরু করল, 'সব ছিল। কিন্তু উ চায়নি। আসলে ছোটর থেকেই ওই মেইছ্যানাটাকে সবাই বুইতে পারত নি। লোকে কত কী বলত, বাচাল, ধ্যাতেলা, অসব্য আরও কত! তোকে কেউ অর ভিতরটা দেকত নি বাবা। আমিও কম মুক করেচি নাকি? ওই ছেমড়ি সবার কথায় রাগ করলেও আমার কথায় রাগ করত নি। উ জানত, উসব আমার মনের কথা লয়। আমিও জানতম, ওই মেয়ে আমায় যখন তুই-তকারি করে তখনই উ আমাকে সবথেকে বেশি ভালোবাসে। কিন্তু লোকে বুইত নি। খালি বলত অর দ্বারা কিসসু হবে নি। নীলিমাও বলত। আমি বারণ...।'

-নীলিমা কে?

-অর মা। আসলে অল্প বয়সে বাপ চলে যাওয়ার পর বাধ্য হয়ে নীলিমা টাউনের একটা কারখানায় কাজ লেয়। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটনি, রাতে এসে ব্যাগ সেলাই, লোকের শাড়িতে ফলস পাড় বসানা সব করত। খিটখিটা হয়ে গেইল।

কাঁধের ব্যাগটা দাওয়ায় রেখেই এক ঘটি জল গলায় ঢালল নীলিমা। ঢুকবি তো ঢোক মায়ের সামনে দিয়েই নাচতে নাচতে সন্ধে করে বাড়ি ফিরল মেয়ে। শ্রীকুমারের পড়ার আওয়াজ ঘর থেকে পাওয়া যাচ্ছে। ও বরাবরই সিরিয়াস। নিজের পড়াশুনো নিজেই করে। তবে মাথাটা অতটা উর্বর নয় বলে ক্লাসে স্ট্যান্ড করতে পারে না। কিন্তু ভালোভাবেই পাশটা করে যায়। ব্যস, নীলিমাও লেগে পড়ল। 'সন্ধ্যা তো সেই কখন হইচে। এতক্ষণ কুথায় চড়ে বেড়াচ্ছিলি?'

-চড়ে বেড়াব কেনে? সকাল থেকে যে পড়াগুলা করেচি সেগুলাই তো ক্ষেন্তিদের পুখুর পাড়ে বসে ঝালাচ্ছিলম।

নীলিমার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে প্রায়। 'পুখুরপাড়ে বসে পড়া ঝালাচ্ছিলি? কেনে ঘরে জায়গা নাই?'

-তা হবে নি কেনে?

দাওয়ায় উঠে বসে তুরতুরিয়ে পা দুটো নাচাতে নাচাতে বলল, ''ঘরে গুমসানি গরম। মাথা খুলে নি। পুখুর পাড়ে সুন্দর হাওয়া। সব পড়া মনে পড়ে যায়।'

-কতবার বলেচি এইরকম ঠ্যাং লাচাবি নি।

মায়ের ধমকের চোটে পা দুটো আপনা থেকেই থেমে যায়। 'ব্যানার্জিদের মেইছ্যানাটাকে দ্যাখ, কলকাতা চলে গেল পড়তে। আর তুই? এখেনে থেকেই লোকের বাগানের ফল আর পুখুরের মাছ চুরি করবি। উঠতে বসতে যে মিথ্যা কথা বলে তার কিচ্ছু হবে নি। আমি একটাবার চোখটা বুজি, কত ধানে কত চাল বুজবি।'

-আহ নীলিমা বউ!

মা-মেয়ের মাঝে কে যেন কথা বলে উঠল। দুজনের চোখই সদরের দিকে। মাথায় ঘোমটা দিয়ে সরযু ঢুকে এসেছে। নীলিমা উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠল, 'এ কী কাকিমা, আপনি এই সন্ধেবেলা এলেন কেনে?''

-তা করবটা কী? তমরা ঘরে টিকতে দিলে তবে না ঘরে থাকব। সেই তখন থেকে শুনচি মেইছ্যানাটাকে দাঁতে পিষচ। ভর সন্ধ্যাবেলা আবোল তাবোল কথা বলচ।

নীলিমা আকাশ থেকে পড়ল। 'এখান থেকে আপনার বাড়ি অব্দি কথা শুনা যাচ্চে?' বুড়িও তেড়ে বলে উঠল, 'তা যাবে নি? সন্ধেবেলা সব চুপচাপ তো।'

-এই মেয়েকে লিয়ে আমি আর পেরে উঠচি নি কাকিমা। সেই কখন সন্ধ্যা হইচে এখন বাড়ি ফিরল দেখুন। সামনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, পড়ার নামগন্ধ লাই।

-ওমা! ছেমড়ি তো আমার ঘরেই ছিল। বলল ঠাকমা আমি তোমার সঙ্গে বসে পড়ব।

ছ্যাঁক করে কালী ঠাকুরের মতো জিভ কাটল শ্রীদেবী। চোখ পাকাল। কিন্তু সে বুড়ির চোখে পড়লে তবে না! বুড়ি বলেই চলেছে, 'মিছিমিছি মেয়েটাকে দুষচ। এ তোমার ভারি বাজে স্বভাব হইচে নীলিমা বউ।'

-আপনার ঘরে ছিল? এই যে বলল পুখুরপাড়ে বসে পড়া ঝালাচ্ছিল নাকি?

চোখ পাকিয়ে মেয়ের দিকে তাকাল নীলিমা। টুক করে বেরিয়ে আসা জিভটা ঢুকে গেল শ্রীদেবীর। সরযুও পড়ল ফাঁপরে। গোল গোল চশমার ওপর দিয়ে চোখের মণি উল্টিয়ে শ্রীদেবীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'অ, তুই এ কথা বলেচিলি বুজি? তাই হবে। আসলে বয়স হচ্চে তো আমার সব ঠিকঠাক মনে থাকে নি।' নীলিমা আর একটাও কথা বলল না। ধপধপ করে মাটির বুকে গোড়ালি ফেলে উঠে ঘরে চলে গেল। টুকটুক করে আদরের ছেমড়ির কাছে এগিয়ে এল সরযু। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'ছিলিস কই?'

-পুখুরপাড়েই ছিলম।

-রাম রাম রাম রাম, এই ভর সন্ধেবেলা একা পুখুরপাড়ে কেনে গেইলি? তাও আবার এরকম খুলা চুলে!

খিলখিল করে হেসে দুলে উঠল শ্রীদেবী। ‘কেনে? আমায় ভূতে ধরবে? এত সাহস আছে?' কাঁধের কাছে একটা আদুরে চড় কষিয়ে সরযু বলেন, ‘চুপ কর মুখপুড়ি! বেশি সাহস হয়েচে তোর! আর কুনুদিন সন্ধ্যাবেলা একা পুখুরধারে যাবি নি।'

-একা লয় গো।

-তবে?

-তপাদা ছিল তো।

সঙ্গে সঙ্গে সরযুর চোখ মুখ বদলে গেল। ‘তপা!' চোখের কোণে চটুল সন্দেহ। 'কী এত কথা কইছিল তপা?'

-সে ওই জানে। ওর আদ্দেক কথার মানে বুইতে পারিনি।

সরযু বুড়ির চশমাটা আরও কিছুটা নাকের ওপর নেমে এল।

নিঝঝুম পুকুর ঘাটে হাতের ওপর মুখ রেখে বসে আছে শ্রীদেবী। এক ঘাট উঁচুতে তপা বসে। কয়েক হাত দূরত্বে জামরুল গাছটা ঝাঁকড়া হয়ে ঝুঁকে আছে পুকুরের ওপর। তার নীচের জমাট অন্ধকারটা আলো করে রেখেছে দু-তিন ডজন জোনাকি। স্বপ্নের মত ওরা জ্বলছে নিভছে। একভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শ্রীদেবী বলে উঠল, 'কী ভালো আছে ওরা!'

-কারা?

তপা জিজ্ঞেস করল।

-ওই জোনাকিরা। ওদের কেউ বলছে না, সন্ধে হয়েছে ঘরে যা। তপা হাসল। ‘সাধে কী লোকে তোকে পাগলি বলে’'

-কেন? এতে পাগলামির কী হল?

কে? -অন্ধকার হলে ওরা যদি ঘরের ভেতর বসে থাকে তাহলে আলো দেবে

-না দিলেই বা কী? ওদের ওইটুকু আলোতে কতটুকুই বা অন্ধকার দূর হয়?

-সেটা আমরা ভাবছি। ওরা ভাবে ওদের আলোতেই অন্ধকার সরে যায়। অন্ধকারও ওদের আদর করে বুকে জড়িয়ে রাখে। ওরা যে অন্ধকারের বন্ধু।

-তুমি যে মাঝে মাঝে কী বলো তপাদা মাথামুণ্ডু বুইতে পারি নি।

-অ্যাই, বুইতে পারি নি কী কথা? তুই না শিক্ষিত মেয়ে। ওসব ঠাকমারা বলে বলুক। তুই বলবি না। তাছাড়া তোর মুণ্ডু থাকলে তো বুঝবি। অমনি কুরকুর করে হেসে ঝাঁকড়া খোলা চুলগুলো ঝাঁকিয়ে নিল। ‘আমি কী স্কন্দকাটা নাকি?'

-তোর সাহস তো ভারি। এই অন্ধকারে পুকুরের ধারে বসে তেনাদের নাম কচ্ছিস।

-এহ বাবা! তুমি তো সরযু ঠাকমার মতো কথা বলছ। তেনাদের আবার কী? ভূত আমার পুত পেত্নি আমার ঝি...

-হয়েছে হয়েছে। থাম দিকি।

তপার গা-টা শিরশির করে উঠল। কিন্তু শ্রীদেবী একেবারে মারকাটারি। ভয়ডর নেই মোটে।

-তোর ভূতে ভয় করে না?

-না। মানুষকে ভয় করে।

-মানুষকে! কেন?

-তুমি নিজে দেখেছ না শুনেছ যে অমুক ভূতে এসে তমুক মানুষের ঘাড় মটকেছে? বলো শুনেছ?

-উমম না তা শুনিনি।

-অথচ দেখো প্রতিদিন টিভি খুললে, খবরের কাগজ পড়লে কত মানুষের খুন হয়ে যাবার খবর পাই। সেগুলো তো মানুষই করে। তাই মানুষের চেয়ে ভয়ংকর আর কিচ্ছু নেই।

কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায় তপা। শ্রীদেবীকে দেখতে পুকুরের মতো। কিন্তু আদতে ও একটা গভীর নদী। মনে মনে ভাবল। মুখে প্রকাশ করল না। কারণ এই কথা বোঝার মতো মানসিক স্থিতি শ্রীদেবীর নেই। উলটে এমন হেসে গড়িয়ে পড়বে যে সামলানো দায় হবে। তপা এক ধাপ নেমে শ্রীদেবীর পাশে বসল। শ্রীদেবীও খপ করে তপার হাতখানা জাপটে ধরে বলল, 'এই নাও। আমি তোমায় ধরে আছি। আর ভয়ের কিছু নেই।'

-ও। শুধু আমার ভয়টাই দেখলি?

-এই অন্ধকারে আর কিচ্ছু দেখতে পাচ্চি নি। ও, সরি। পাচ্ছি না। এবারে তপা রাগ করল না। ভুল বলে ফেলাটা শুনতেও পেল না বোধহয়। ভাবের ঘোরেই বলতে থাকল তপা, 'আচ্ছা শ্রী।'

-হুম?

-আমাকে কেমন লাগে তোর?

-মন্দের ভালো।

-মারব কানচাপাটি। সত্যি করে বল না।

-এই যে আমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করছ এখন তোমায় খুব ভালো লাগছে। কিন্তু যখন পড়াও তখন বিরক্ত লাগে।

-কেন?

-এত বকো।

-বাহ পড়া না করলে বকব না?

-না। পৃথিবীতে এমন একজনও তো থাকুক যে আমায় বকবে না। মুখঝামটা দেবে না।

কথাগুলো অন্য কোনও মেয়ে বলল যেন। তপার চেনা শ্রীদেবী নয়। অজান্তেই তপার হাতটা শ্রীদেবীর হাতের ওপর চলে গেল। তপার বুকের ভেতর তোলপাড় করে উঠল। নরম সুরে বলল, 'আচ্ছা বেশ। আর বকব না তোকে।'

-সে তুমি এখন বলচ। যেই বই বগলে চেপে সামনে গিয়ে বসব অমনি তুমি গুরুঠাকুর হয়ে যাবে।

-বলছি তো, হব না।

অন্ধকারের মধ্যেই তপার দিকে প্যাটপেটিয়ে চায় শ্রীদেবী। 'সত্যি?'

-সত্যি।

ঝপাৎ করে তপাকে জড়িয়ে ধরে শ্রীদেবী। চমকে ওঠে তপা। শিরাগুলোর মধ্যে রক্তের চলাচল অতি দ্রুত হতে থাকে। শ্রীদেবীকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে তপার। হাত দুটো মেলেও দেয় শ্রীদেবীর দিকে। ঠিক তখনই শ্রীদেবী ঝটকা দিয়ে বলে ওঠে, 'ওমা! জলের ওপর ওটা কে?' সব আবেশ ভেঙেচুরে তছনছ। আচমকা ভয়ে তপা অন্ধকারেই যতটা সম্ভব চোখদুটোকে ঠেলে বের করে চারপাশ খুঁজতে থাকে, 'কে কে? কই' ততক্ষণে পুকুরের জল তোলপাড় করে, জোনাকিগুলোর বুকে কাঁপন ধরিয়ে হো হো করে হেসে উঠেছে শ্রীদেবী। 'কী ভীতু রে বাবা! তুমি না পুরুষ মানুষ?' তপার সম্বিত ফিরতে ক্ষেপেই গেল, 'তুই কি কখনও সিরিয়াস হবি না শ্রী? পাজি মেয়ে একটা! মেরে তোর দাঁতকপাটি ভেঙে দেব!'

-দেখেছ তো? এক্ষুনি বললে তুমি আমায় বকবে না।

উদগ্রীব হয়ে গলা বাড়িয়ে বলে ওঠে, 'আমি তোকে কিছু বলতে চাইছিলাম শ্রী। সেটা কী বুঝেছিস?'

-হ্যাঁ। বুঝেছি তো। ঘেঁচু আর কচুউউউউ!

এক দৌড়ে সন্ধের অন্ধকার পেরিয়ে বাড়ির উঠোনে এসে থেমেছিল মেয়েটা। আর তার পরেই মায়ের দাঁত খিঁচুনি।

চায়ের কাপে চুমুক দিল স্বয়ম্ভু। বলল, 'রেজাল্ট বেরোবার পরে শহরে একাই গেল শ্রীদেবী?' বৃদ্ধা সরযু দুপাশে ঘাড় নেড়ে বলল, 'না না। সঙ্গে উর ভাই আর তপা গেল। নীলিমা বউ ছুটি পেল নি।'

নীলিমা সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে আঁচল ভিজিয়ে ফেলল। সর্দি লেগে গেল তার। ছেলেমেয়েগুলোর খাবার বাঁধতে বাঁধতে শেষ মুহূর্তেও গজগজ করে চলেছে। 'মেয়ে আমার দ্বিগগজ হবে। এত লোকে মিদনাপুরের কলেজে পড়ছে তারা কেউ মানুষ হচ্চে নি। ওনাকে কলকাতা যেতিই হবে। অনেকক্ষণ ধরে মায়ের গজগজানি শুনছিল শ্রীদেবী। এবার ঘাড়সমেত ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, 'ভূতের মুখে রাম নাম! এই তো এদ্দিন ধরে মাথা খেয়ে এলে আমার। অমুকের ছেলে শহরে গেল। তোর কিছু হল না। ব্যানার্জিদের মেইছ্যানা কোলকাতা গেল, তোর কিসসু হবে না। তুই খালি চড়েই বেড়াবি। এখন বুক চাপড়ে কেঁদে মরছ কেন?'

-তুই কী বুজবি হতচ্ছাড়ি। যেদিন মা হবি সেদিন বুজবি।

ব্যস, সুযোগ পেয়েই দাওয়ার পিলারটা ধরে হেসে গড়িয়ে নিল খানিক আমার ছেলে আমার চেয়েও বিষ হবে মা। তোমার যেকটা দাঁত আছে সব কটা ও একাই ফেলে দেবে। দেখব তখন কেমন করে গজগজ কর।'

-চুপ কর তুই। সব সময় কথা। অ্যাই শ্রীকুমার, দিদিকে ভালো করে সব দেখিয়ে দিস।

ভাইটা সকালের খাবার খাচ্ছিল। একটু পরেই টাউন থেকে বাসে চাপবে। ঘাড় নাড়ল শ্রীকুমার। ওদিকে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে নীলিমার কথা শুনতে পেল তপা। 'এত চিন্তা কেন করছ কাকিমা? আমরা সব ঠিক করে দিয়ে তবে আসব। বাড়িও পেয়ে গেছি।'

-ও মা! তাই নাকি?

নীলিমার বুকে যেন একটু স্বস্তির হাওয়া লাগল। 'কার বাড়ি রে তপা ?তোর চেনা কেউ?'

-চেনা লোকের বাড়ি না। তবে আমার এক বন্ধুর বাবা ওই বাড়িটা ঠিক করে দিয়েছে। কিন্তু মুশকিল হল, শ্রীদেবীর সঙ্গে আমাদের থাকতে দেবে না একদিনের বেশি।

-সে কি কথা?

-হ্যাঁ। আসলে ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে ওখানে থাকতে পারে না৷ বাড়িওয়ালার আপত্তি আছে। আজ গিয়ে সব দেখিয়ে বড় জোর কাল পর্যন্ত অ্যালাও করবে আমাদের।

যাও বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল নীলিমা তাও ঘুচে গেল। শ্রীকুমার টিপ্পনি কাটল, 'চিন্তা কোরো না মা। তোমার শ্রীদেবী চাবুক মেয়ে। একাই সব সাল্টে নেবে।' তপা ফ্যাক করে হেসে ফেলল। শ্রীদেবী চড় তুলে তেড়ে গেল। নীলিমার মুখ থেকে তবু ভয় গেল না।

মাকে প্রণাম করে চোখের জলে বিদায় নিচ্ছিল শ্রীদেবী। না না, ঝাঁকড়া পাগলির চোখে জল নেই। যত আষাঢ় শ্রাবণ নীলিমার চোখে। সবে বেরোতে যাবে, ঠিক তক্ষুনি আরেকজন এসে হাজির হলেন বড় একটা হলুদ রঙের ডালডার কৌটো নিয়ে। হলুদের ওপর সবুজ রং দিয়ে নারকেল গাছের ছবি। সরযু ঠাকমা। 'এইটে লিয়ে যা ছেমড়ি। কটা নারকেল লাড়ু আছে। খাস।' শ্রীদেবী তো বেজায় খুশি। দুবার লাফিয়ে নিয়ে কৌটোটা একপ্রকার ছিনিয়েই নিল। তারপর দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সরযুকে। বুড়ির ভাঙা গালে চুকুত করে একটা চুমু খেল। নীলিমা পিছন থেকে বলল, 'প্রণাম কর। বুড়ি অমনি প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'তুই থাম দিকি বউ৷ অনেক শিক্ষে দিয়েছিস মেয়েটাকে।' শিরায় জড়ানো হাত দুটো শ্রীদেবীর মাথায় রাখলেন সরযু। 'খুব ভালো হোক তোর। সাবধানে থাকিস মুখপুড়ি। শহরে গে অত

ধ্যাতালপানা করিসনি মা।'

-ধুস! আমার মতো লক্ষ্মী মেয়ে কটা আছে বল তো বুড়ি?

নীলিমা অমনি পিঠের ওপর চপাট করে একটা চড় কষাল। সরযুর চশমা ঝাপসা হয়ে এল। শাড়ির আঁচলটা চশমার ভিতর ঢুকিয়ে দুচোখের জল ঝরার আগেই সেটাকে মুছে নিলেন।

স্বয়ম্ভূ একভাবে তাকিয়ে ছিল সরযুর দিকে। চোখের জল মুছে বৃদ্ধা নিজেই বিড়বিড় করতে লাগলেন, ‘চলে গেল। মেয়েটা চলে গেল।' বাইরে থেকে ভেসে আসা কয়েকটা পাখির ডাক ঘরের নীরবতাকে যেন আরও বেশি থমথমে করে তুলল। স্বয়ম্ভু বলল, 'তারপর?'

শ্মশান থেকে ফিরতে দুপুর হয়ে গেল প্রিয়াংশুর। চোখ মুখ লাল। ফ্ল্যাটের দরজাটা খুলতেই খাঁ খাঁ করে উঠল ডাইনিংটা। কে যেন কেঁদে উঠল করুণ স্বরে। নাকি পুষি ডাকল! দরজাটা বন্ধ করে খাবার টেবিলের দিকেও এগোতে ইচ্ছে করছে না প্রিয়াংশুর। ফ্ল্যাটটা নেওয়ার পর নিজে হাতে সাজিয়েছিল সুস্মিতা। সোফার কভার, ওয়াল কালার, কিচেনের খুঁটিনাটি সবকিছু নিজে হাতে করেছিল সুস্মিতা। প্রিয়াংশু সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছে শুধু। কলেজের সেই উড়নচণ্ডী বন্ধুত্ব এমন করে ঘর বসাবে কে জানত? নিজেরাই নিজেদের দেখে অবাক হয়ে যেত। সময়, পরিবেশ, জীবনবোধ সবকিছু ওদের শিখিয়ে দিয়েছিল কীভাবে গোছাতে হয় জীবনটাকে। যখন গুছিয়ে বসার লগ্ন এল তখনই সব ছারখার। আবারও কে কেঁদে উঠল কুঁই কুঁই করে। পুষি তো সামনেই আছে। জুলজুল করে দেখছে। তাহলে কাঁদছে কে? কান্নার শব্দটা বাড়ছে। ক্রমশ বাড়ছে। বাচ্চা কাঁদছে। ধীরে ধীরে সেটাই পরিত্রাহী চিৎকার হয়ে সোজা প্রিয়াংশুর কানে এসে আঘাত করছে। এক সময় বুঝতে পারে শব্দটা ওর বেডরুম থেকেই আসছে। বন্ধ ফ্ল্যাটে কে ঢুকে বসে আছে? বাচ্চাই বা এল কোথা থেকে? শোকে দুঃখে ভয়টাকে ভুলেই গিয়েছিল প্রিয়াংশু। অ্যামিবার মতো গুড়ি মেরে সেটা কখন আবার বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। প্রিয়াংশু ঘরের দিকে এগোতে থাকে। পায়ে পায়ে যত এগোচ্ছে ততই শরীরটা তার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চার কান্নাটা প্রিয়াংশুকে কালা করে দেবে এবার। দরদর করে ঘামছে। ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে ও কী ভয়ানক কিছু দেখতে চলেছে? সুস্মিতার পর এবার কী প্রিয়াংশুকে টার্গেট করেছে সে? ঘরের মধ্যে উঁকি দিতেই কোনও একটা ভারি পাথর এসে সজোরে বুকের ওপর লাগে। দমটা বন্ধ হয়ে যায় প্রিয়াংশুর। নগ্ন শরীরে ঝাঁকড়া চুলের একটা মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। তার যোনিদ্বার থেকে সরু নাড়ি বেরিয়ে বিছানার ওপর ঝুলে আছে আর সেই নাড়িটা সদ্যজাত রক্তমাখা একটা বাচ্চার নাভির সঙ্গে লেগে রয়েছে। সদ্য জন্ম নেওয়া বাচ্চাটি পরিত্রাহী চিৎকার করছে৷ মৃত মায়ের পেট থেকে নিজেই যেন বেরিয়ে সে ঝুলে পড়েছে বিছানার ওপর। ঝুলে থাকা মেয়েটার কোমরের কাছ থেকে রক্তাক্ত। মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ যেন মুখের ওপর ঝুলে থাকা কোঁকড়ানো চুলগুলো দমকা হাওয়ায় উড়ে যায়। বিস্ফারিত চোখে ঘাড় ভেঙে জিভ বেরিয়ে আসা মুখটাকে চিনতে পারে প্রিয়াংশু।

এক ঝটকায় ঘুম থেকে উঠে বসে প্রিয়াংশু। ঘামে শরীর ভিজে গেছে।

মাথার ওপরে সিলিং ফ্যানের দিকে তাকায়। নাহ, কেউ তো ঝুলছে না। বিছানাতেও কোনও বাচ্চা নেই। বাচ্চার কান্নার মত স্বরে পুষিটা ডেকে ডেকে সারা হচ্ছে। কী হবে ডেকে? যে ফিরবে না কোনওদিন! প্রিয়াংশু বুঝতে পারে ওর মাথার মধ্যে সব কিছু ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। কিচ্ছু মাথায় থাকছে না তার। বিশেষ করে সুস্মিতাকে দাহ করে আসার পর ওর আরও পাগল-পাগল লাগছে। পুষি কাউকে খুঁজছে না। ওর খিদে পেয়েছে। সকাল থেকে বেচারিকে কেউ খেতে দেয়নি। প্রিয়াংশুর তো এসব অভ্যেসই নেই। চট করে বিছানা ছেড়ে উঠে ফ্রিজ খোলে। কালকের ভাত রয়েছে। দুধও আছে। খুব দ্রুততার সঙ্গে সেটা মেখে পুষির মুখের সামনে ধরে। পুষি পারলে বাটিটাকেই কামড়ে খেয়ে নেয়। কান্না পেয়ে যায় প্রিয়াংশুর। কেন? কার জন্য মন খারাপ ওর? সুস্মিতা? নাকি সুসের সঙ্গে আরও কারও জন্য! যে ওর একান্ত নিজের! কিন্তু অনেক দূরের!

-একটু আসবেন আমার ফ্ল্যাটে?... আসলে আমার শরীরটা একদমই ভালো লাগছে না। কিন্তু এখুনি আমায় অনেক কথা বলতে হবে আপনাকে। যদি আসেন...

কথাগুলো ভীষণ ক্লান্ত স্বরে ওপারের মানুষটির কানে পৌঁছোয়। উত্তর ভেসে আসে। প্রত্যুত্তর যায়, 'থ্যাংক ইউ সো মাচ।' সোফায় শরীরটা ছেড়ে দিয়েছে প্রিয়াংশু। কান থেকে মোবাইলটা সরাতেই হাতটা সোফার ওপর ঝপ করে পড়ে গেল। প্রিয়াংশুর চোখ ঝাপসা। বিন্দু বিন্দু স্মৃতিগুলো কীভাবে যেন প্রকাণ্ড এক সিন্ধুতে পরিণত হয়েছে।

কলেজ ক্যান্টিন। টেবিল যেখানে ড্রামস বা তবলা, চেয়ার হল থুম্বা। মাইকবিহীন অমায়িক

কণ্ঠগুলো সেখানে সুরে-বেসুরে যুদ্ধ লাগিয়ে একেবারে সঙ্গীতের কুরুক্ষেত্র বানিয়ে ফেলে। অরুণা, মৃত্তিকা, সুস্মিতা চারটে চেয়ার দখল করে বসে। একটা চেয়ার ওদের বাজনা। অন্য টেবিল থেকে একটি ছেলেকে তুলে দিয়া টেনে এনেছে আরেকটা চেয়ার। প্রিয়াংশু ওসবের ধারধারেনি। সটান দিয়ার কোলে ধপাস হতেই চটপটাপট চড় চাপ্পড় দিয়ে তুলে দিল। 'আইস্যালারে, তোর হাত না ছন্টি?' দিয়াকে বলে উঠল প্রিয়াংশু, দিয়া একটু ভাও খেল। গলার শির ফুলিয়ে ছম্মা ছম্মা গাইছিল সুস্মিতা। টেবিলে তাল দিচ্ছিল অরুণা। দুজনেই হেসে ফেলল। সুস্মিতার গান গেল নড়ো৷ মৃত্তিকা ডেভিলে কামড় দিয়ে বলল, 'ওপাশ থেকে একটা চেয়ার নিয়ে আয় না।'

-সব তো ভর্তি।

-তাতে কী? একটাকে তুলে নিয়ে আয়। দেখিস ভাই, কোনও সুন্দরীকে তুলে ফেলিস না।

-তেমন সুন্দরী আর কই?

গলাটা চুলকে নিয়ে বলল প্রিয়াংশু।

সুস্মিতা চিৎকার করে উঠল, 'ছম্মা ছম্মা। এই ম দিয়ে। ম দিয়ে কর। এবার অরুণার টার্ন। ওদিকে প্রিয়াংশুর চেয়ার খুঁজতে খুঁজতে একজনের ওপর চোখ আটকে গেছে। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। এক হাতে পাউরুটি ধরা, অন্যহাতে ডিমসেদ্ধ। সমানতালে দুটোতে কামড় বসিয়ে যাচ্ছে। মাঝেমাঝে ঝাঁকড়া চুলগুলো মুখের সামনে পড়লে ডানহাতের কবজি দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। রীতিমত গপগপ করে খাচ্ছে। অরুণা গান ধরেছে, 'মেরে দিলকা উও শাহেজাদা, মেরা দিলবর মেরা প্রেমী।' প্রিয়াংশু এগিয়ে যায়। মেয়েটার সামনে দাঁড়ায়। কিচ্ছু বলে না। শুধু ঘাড় কাত করে তাকিয়ে থাকে। পিছন থেকে দিয়া হাঁক পাড়ে, 'এই প্রিয়াংশু, আয়।' ডিমসেদ্ধ দিয়ে পাঁউরুটি চিবোতে চিবোতে ঝাঁকড়া চুলো মেয়েটার এবার নজর পড়ে প্রিয়াংশুর দিকে। থমকে যায়। এইরকম হ্যাংলার মতো তাকিয়ে আছে কেন রে বাবা? খিদে পেয়েছে নাকি ?

-কী নাম?

রেলা নিয়ে প্রশ্ন করে প্রিয়াংশু। অমনি এক গাল হেসে মেয়েটি বলে, 'শ্রীদেবী মণ্ডল।' নাম বলা মাত্রই যেন হ্যালির ধুমকেতু আছড়ে পড়ল। সামনে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'বাওয়া, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন!' প্রতিবাদ করে উঠল প্রিয়াংশু, 'হেই, চোখে দেখতে পাস না? ও কী ছেলে? ও তো মেয়ে।' ছদ্মভয়ে রসিকতার ছলে কান মুলে ছেলেটি বলল, 'উপস! সরি প্রিয়াংশুদা। গলতি মাফ কর দিজিয়ে।' আবারও রেলা নিয়ে উত্তর দিল প্রিয়াংশু, 'ঠিক আছে ঠিক আছে।' শ্রীদেবী কিছু বোঝার আগেই প্রিয়াংশু বলল, 'শোনো শ্রীদেবী, কেউ তোমায় কোনও ডিস্টার্ব করলে আমায় বলবে কেমন?' খিলখিল করে হেসে ঘাড় নাড়ল শ্রীদেবী।

-বাহ! হাসলে তো একদম শ্রীদেবীর মতো লাগে তোমায়। সার্থক নাম। লজ্জায় শ্রীদেবী চোখ নামাতেই টুক করে অন্যান্য ছেলেগুলোর দিকে চোখ মারে প্রিয়াংশু। বেশ একটা মজার খোরাক পাওয়া গেছে। 'যাক গে, এবার ওঠো তো।' হকচকিয়ে যায় শ্রীদেবী। ছেলেটা কী বলে? -খাচ্ছি তো।

-তাতে কী? আমার চেয়ারটা লাগবে। দাও। অন্য কোনও চেয়ার নিয়ে নাও প্লিজ। দাও দাও। আরে ছাড়।

প্রায় শ্রীদেবীকে সুদ্ধু চেয়ারটা টানাটানি করতে থাকে প্রিয়াংশু। উঠে পড়তে বাধ্য হয় শ্রীদেবী। প্রিয়াংশু সিটি দিতে দিতে চেয়ারটা নিয়ে তার বন্ধুদের মধ্যে চলে যায়। দুহাতে খাবার ধরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে শ্রীদেবী।

এর মধ্যে এখানে প্রায় অর্ধেক বলিউড শেষ হতে চলেছে। হঠাৎ শ্রীদেবী তার খাবারটা নিয়ে অরুণা, মৃত্তিকা, প্রিয়াংশুদের টেবিলের ওপর উঠে বসে। সকলেই হতভম্ব। সবার একটাই প্রশ্ন, 'এটা কে? কোত্থেকে এল?' শ্রীদেবীর ভ্রুক্ষেপ নেই। সে মহানন্দে ডিম খাচ্ছে আর ঠ্যাং দোলাচ্ছে। অরুণা খিঁচিয়ে উঠল, 'এ হ্যালো, দেখছিস না আমরা এখানে বসে গান

করছি।'

-আমিও তো আমার জায়গায় বসে খাচ্ছিলাম।

সটান জবাব শ্রীদেবীর। প্রিয়াংশু হতভম্ব। ভাবতেও পারেনি মেয়েটার এত সাহস হবে। ‘ফার্স্ট ইয়ার তো?' প্রিয়াংশুর প্রশ্নে শ্রীদেবী ঘাড় নাড়ল। -আমরা থার্ড ইয়ার। রেসপেক্ট দিতে শেখো।

-তুমিও

-মানে?

-ভেবেছিলে বার খাইয়ে ক্ষুদিরাম করে আমার চেয়ারটা গেঁড়িয়ে নেবে আর আমি কিছু বলব না। মিদনাপুরের মেয়ে আমি। ভালোবেসে বলতে দিয়ে দিতাম। কিন্তু তুমি তো জোর করে কেড়ে এনেছ।

-এই চপ।

ধমকায় প্রিয়াংশু। ঝট করে মুখটা হাঁড়ির মতো করে ভেবলে যাবার ভান করে শ্রীদেবী। তারপরেই সেই খিলখিলে গুড়গুড়ে হাসি। ‘ভয় পেয়ে গেছে। হে হে হে! নইলে এত ধমকায় নাকি?' প্রিয়াংশুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল। দিয়ার মুখের সামনে পেছন পেতে বসেছে শ্রীদেবী। তার ওপর হাসতে হাসতে ঢলে পড়ছে। বিরক্ত হয়ে উঠেই পড়ল দিয়া। ‘হোয়াট দ্য ফাক? এ মালটা কে?' ঝট করে ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে বলল, 'শ্রীদেবী। শ্রীদেবী মণ্ডল।' মৃত্তিকা ভুরু কুঁচকে ফুট কাটল, ‘বাবা! বাপ মা আজকাল এমন নামও রাখে?' মুখের সামনে থেকে চুল সরিয়ে শ্রীদেবী জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার নাম কী গো' ব্যাজার মুখে উত্তর দিল, 'মৃত্তিকা।'

-বাহ! মৃত্তিকা আর শ্রীদেবী।

নিজের নামে দেবী শব্দটার ওপর একটু জোর দিল। ফস করে বলে উঠল, ‘জানো, তোমাকে দিয়ে আমাকে গড়া হয়।' মৃত্তিকা অবাক। ‘তুমি মাটি আমি দেবী।' এরপর আবার সেই ক্যান্টিন কাঁপানো হে হে হে হি হি হি ‘কী মিল গো তোমার আমার!' অরুণা বলে উঠল, ‘এই পাগলিচুদি নাম তো টেবিল থেকে। আমাদের গাইতে দে।'

-গাও না গাও। তোমরা গাও। আমি শুনি।

বলেই পাঁউরুটিতে কামড় বসাল শ্রীদেবী। উদ্ভট আচরণে সকলেই বিরক্ত। কেবল প্রিয়াংশুর বেশ মজা লাগল। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে সে। দিয়া রেগেমেগে বলে উঠল, ‘এই তুই নামবি টেবিল থেকে? -হ্যাঁ নামব। আমার চেয়ার দিয়ে দাও। আমি চলে যাচ্ছি।

দিয়া বলল, ‘চল ফোট। ফোট ফোট ফোট।' আবারও হেসে গড়িয়ে পড়ল শ্রীদেবী, 'আমি কী ফুল যে ফুটব? চেয়ার দিলে আমি উঠব। নইলে এখানেই ফুটে থাকব।' সকলেরই কান গরম হয়ে যাচ্ছে রাগে। সুস্মিতা রাগের মাথায় ঘাড় ধরে শ্রীদেবীকে নামিয়ে বেশ জোরে একটা ঠ্যালা মারল। কয়েকটা খারাপ কথা বলে দূর করে দিল। অবস্থা বেগতিক দেখে শ্রীদেবীও আর মুখ লাগাল না। খাওয়া তার শেষই হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে কেটে পড়ল। তবে খালি হাতে নয়। প্রিয়াংশুর পাশ থেকে ঝট করে টেনে নিল চেয়ারটা। সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল যেখানে আগে সে বসেছিল। কিন্তু বসল না। চেয়ারটাকে যথাস্থানে রেখে কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল নাচিয়ে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেল শ্রীদেবী। সবাই হাঁ। অরুণা বলে উঠল, ‘প্রিয়াংশু তুই কিছু বললি না?' ব্যাঁকা হাসি ঠোঁটে নিয়ে প্রিয়াংশু বলল, 'ক্লাস নিতে হবে।'

-দেখো, আমরা সবাই বলি ইতিহাস পড়ছি। কিন্তু এই ইতিহাস তো শুধু একটা শব্দ। এর মানেটা কী? কোথা থেকে এল? সেটা আগে আমাদের জানতে হবে।

মাঝবয়সী এক মহিলা প্রফেসর পড়াচ্ছেন। ব্ল্যাক বোর্ডে লেখা অজস্র নোট। ক্লাস ভর্তি ছেলে মেয়েরা এক মনে শুনছে। কিন্তু কোথা থেকে যেন মাঝেমাঝেই টুকরো হাসির শব্দ ভেসে আছে। প্রফেসর পড়াতে পড়াতেই এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। প্রায় সাঁইত্রিশ জন

ছেলেমেয়ে। এর মধ্যে মুখ চাপা হাসির আওয়াজ খুঁজে বের করা মুশকিল। পাত্তা না দিয়েই প্রফেসর তাঁর কথা চালিয়ে যাচ্ছেন। ‘দুটো শব্দের সংমিশ্রণে হিস্ট্রি শব্দের উৎপত্তি। একটা হিস্টর আরেকটা হিস্টরিকা। একটা ল্যাটিন আরেকটা গ্রিক। একটার মানে জ্ঞান, আরেকটার মানে অনুসন্ধান।' আবারও ছেঁড়া ছেঁড়া হাসির শব্দ। কাউকে সন্দেহ হল প্রফেসরের। কিন্তু কিছু বললেন না। পড়াতে লাগলেন। 'আমরা তো যা খুশি গল্প বানিয়ে বলতে পারি। প্রাচীনকালে এই ছিল। সে অমুককে মারল। তারপরেই সৃষ্টি হল তমুকের। বাট এটা কী ইতিহাস? না, এটা ইতিহাস নয়। ইতিহাস সেটাই যার প্রমাণ আছে। অর্থাৎ এভিডেন্স। এই যে মাটি খুঁড়ে কত কিছু বেরিয়ে এসেছে। শিলমোহর থেকে একটা গোটা সভ্যতার ধ্বংসস্তুপ। এগুলো একেকটা সময়ের দলিল। যথার্থ প্রমাণ। তাই এইগুলোই...।' বলতে বলতেই থামলেন প্রফেসর। ‘এই মেয়ে, এই যে তুমি, কোঁকড়া চুল। ওঠো ওঠো।' ঘাবড়ে গেল শ্রীদেবী। আশেপাশে বাকি ছাত্রছাত্রীরা ওর দিকেই তাকাল। অগত্যা উঠে দাঁড়াতে হল।

-আমি দিদিমণি?

-দিদিমণি?

সারা ক্লাস হো হো করে হেসে ওঠে। প্রফেসর ডাস্টার দিয়ে টেবিলে আঘাত করে সবাইকে চুপ করান। ‘তখন থেকে খেয়াল করছি তুমি হেসে চলেছ। কী ব্যাপার? হাসছ কেন?”

প্রশ্নটা হাটের মাঝে পড়তেই আবারও খিলখিলে হাসি পেট গুলিয়ে বেরিয়ে এল শ্রীদেবীর। প্রফেসর তো ক্ষেপে আগুন। ‘আরে, তুমি পাগল নাকি? এমনি এমনি হাসছ?”

-না দিদিমণি। আসলে ...

-এই ম্যাডাম বলো, তুমি কি গাঁয়ের স্কুলে পড়েছ নাকি? দিদিমণি আবার কী?

-না দিদি...এই ম্যাডাম। মিদনাপুর গ্রাম কেন হবে? ওটা টাউন।

-ডিসগাস্টিং। হাসার কারণটা বলো। আমাকে দেখে হাসি পাচ্ছে?

বেশ তেজ নিয়ে প্রশ্নটা করলেন প্রফেসর। উত্তরটাও তেমনি এল সপাটে, 'হ্যাঁ ম্যাডাম।' প্রফেসর তো অবাক হয়ে আগে নিজের জামাকাপড় ঠিক আছে কিনা দেখে নিলেন। তারপর তুতলিয়ে বললেন, 'কী... কেন হাসছ?”

-আমাদের চন্দ্রকোণায় একবার খুব ঝড় হয়েছিল। আর আমাদের ঘরের পাশে একটা গাছ ছিল। সেখানে একটা লাউডগা সাপ থাকত।

এ যেন রূপকথার গল্প ফেঁদে বসেছে। প্রফেসর ম্যাডাম তো অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছেন। শ্রীদেবী মনের আনন্দে গল্প বলে চলেছে। ‘সেই ঝড়ে হঠাৎ দেখি লাউডগা সাপটা ঝুলছে। খাবি খাচ্ছে। কিছুতেই ডালের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখতে পারছে না। ঝড়েতে একবার এদিক আর ওদিক করছে।

-এতে হাসির কী হয়েছে?

-ম্যাডাম, আপনার মুখের পাশে যে চুলটা ঝুলছে সেটা পাখার হাওয়ায় ওই লাউডগা সাপটার মতোই দুলছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

মেয়ে কথা বলবে কী, নিজেই হেসে খুন। সঙ্গে সারা ক্লাস একই তালে কেঁপে উঠছে। ম্যাডাম বেচারি খুব স্টাইল মেরে চুল ঝুলিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু একটা গেঁয়ো ছাত্রী যে এইভাবে তাঁর খিল্লি করবে কল্পনাও করতে পারেননি। ঝট করে মুখের পাশের চুলটা কানের পাশে গুঁজে নিলেন। তারপর চিৎকার করে বললেন, ‘এই মেয়ে তুমি ক্লাসের বাইরে যাও তো। বেরোও। তোমায় ক্লাস করতে হবে না।' এইবার শ্রীদেবীর মুখটা শুকিয়ে গেল।

-কেন ম্যাডাম? আমি তো সত্যি কথাই বললাম। মিথ্যে তো বলিনি। তাহলে আমায় শাস্তি দিচ্ছেন কেন?

-শাট আপ। গেট আউট ফ্রম মাই ক্লাস। এতটুকু শিক্ষাদীক্ষা নেই। তুমি প্রফেসরের সঙ্গে ফাজলামি করছ?

-‘ম্যাডাম মিদনাপুর যে।‘ একটি ছেলে টোন কাটল। আবারও গুমগুমে হাসিতে ভরে

উঠল ক্লাস। ম্যাডাম তেড়ে ক্ষেপে উঠলেন, 'বেরিয়ে যাও নয় তো আমি বেরিয়ে যাব।' বাধ্য হয়ে দরজার দিকে এগোতে লাগল শ্রীদেবী।

-এই তোমার নামটা বলে যাও তো।

কাঁচুমাচু মুখটা ম্যাডামের দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'শ্রীদেবী মণ্ডল।' অবাক লাগল শ্রীদেবীর। ওর নাম শুনেও হাসি পেল সব্বার! কই স্কুলে তো কেউ হাসত না? বরং এত সুন্দর করে তার নামটা বলত সকলে যে নিজেকে মাঝে মাঝে দেবীই ভাবত শ্রীদেবী। শহরের সবই যেন উল্টো।

ক্লাসের বাইরে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। যেন কিছুক্ষণ বাদেই ম্যাডাম তাকে ডেকে নেবে ক্লাসে এই ভেবে সে বাইরে দরজার ঠিক পাশটাতেই অপেক্ষা করল। স্কুলে ক্লাস থেকে বের করে দিলে এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকত সবাই। কান ধরতে বললে কান ধরত। এখানে তো আর সেসব কিছু বলেনি।

দূর থেকে ফোর মাস্কেটিয়ার্স অরুণা, দিয়া, সুস্মিতা আর মৃত্তিকা দেখতে পেল শ্রীদেবীকে। হেঁটে আসতে আসতে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। অরুণা কাকে যেন ফোন করে কী বলল। ক্লাস শেষ হল। ম্যাডাম বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ল কয়েকটা বিচ্ছু পঙ্গপাল। কয়েকজন ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে যাচ্ছিল। অরুণা, সুস্মিতা, দিয়া, মৃত্তিকা, আর প্রিয়াংশু সবাইকে বসতে বলল। এদের দেখেই শ্রীদেবীর মনটা কু গেয়েছিল। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। 'গাইস, এবার আমরা তোমাদের ক্লাস করাব।' দিয়ার কথা শুনে যথারীতি ফার্স্ট ইয়ারের সকলেই ঘাবড়ে গেল। কলেজের র‍্যাগিং সম্পর্কে সকলেরই কম বেশি জানা আছে। কিন্তু শ্রীদেবীর আছে কী? সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে দেখে অরুণা বলে উঠল, 'এ কী সবার মুখ শুকিয়ে গেল কেন? আমরা কী বাঘ না ভাল্লুক?' সুস্মিতা অমনি বলে উঠল, 'আরে না না। পড়াফড়া ধরব না। আমরা জানি এই ফার্স্ট ইয়ারের ব্যাচে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী আছে যারা হেব্বি ট্যালেন্টেড। এই যেমন আমরা। সুস্মিতা আঁকতে পারে। বিউটিফুল নকশা করতে পারে। অরুণা দুর্দান্ত প্রেম করতে পারে। ফিক করে হেসে ফেলে চোখ মারল অরুণাকে। 'মৃত্তিকা দারুণ টেক স্যাভি। প্রিয়াংশু খুব ভালো খেলতে পারে। যেমন এখন ওর খেলার প্রস্তুতি চলছে।' কপট লজ্জায় হাসল প্রিয়াংশু।

-আর আমি দিয়া, একটু একটু গান গাইতে পারি। ঠিক তেমনি এখানে যারা যারা ট্যালেন্টেড আমরা তাদের সঙ্গে একটু আলাপ করে ট্যালেন্টগুলো চেক করব। আর সঙ্গে কিছু প্রশ্ন থাকবে।' অরুণা বলল, 'সঠিক উত্তর দিলে পার। নইলেই মার।

-এই ধ্যাত, বাচ্চাগুলোকে ভয় কেন দেখাচ্ছিস?

সুস্মিতা বলল। প্রিয়াংশু কিন্তু চুপ করে একজনকেই দেখে চলেছে। সুস্মিতা সেটা খেয়াল করেই অরুণাকে ঠেলা দিয়ে ফিসফিস করে বলে ওঠে, 'প্রিয়াংশু কি লটকে গেল নাকি?''

-ও লটকাবার ছেলে নয়। খেলোয়াড়।

-তাহলে আগে কার পালা?

প্রশ্নটা ক্লাস ভর্তি ছেলেমেয়েগুলোর দিকে ছুড়ে দিয়েই অরুণা একটি মেয়েকে তুলে আনল। নাম ধাম জিজ্ঞেস করে তাকে কীর্তন গাইতে বলা হল। সে যা কীর্তন গাইল তাতে রাধা কৃষ্ণ প্রেম করাই ভুলে যাবে। দিয়া ধমক দিল, 'ওই, বাঙালি হয়ে জন্মেছিস একটা কেত্তন গাইতে পারিস না' সেই মেয়েটি বেচারি মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'গাইলাম তো দিদি।' -হ্যাঁ, এটা তোর বাপের ছেরাদ্দে গাস।

মেয়েটি বিরক্ত হলেও কিছু বলতে পারল না। মৃত্তিকা বলে উঠল, 'তুমি চন্দ্রবিন্দুর চাঁদ পেয়েছ। তাই এবার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও দিকি।' মেয়েটি ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে তাকাল।

-বলো তো মা, বাচ্চা কীভাবে হয়?

ক্লাসের ছেলেগুলোর পেট গুড়গুড়িয়ে হাসি উঠে এল। সুস্মিতা বলে উঠল, 'কী রে বল। বাচ্চা কীভাবে হয়?' প্রিয়াংশু ফিক করে হেসে উঠল। মুখে হাত চাপা দিয়ে আড়চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে প্র্যাক্টিকাল ক্লাস লাগবে।'

-তার আগে কান ধরে ওঠবোস কর।

অরুণা বলে উঠল। পঙ্গপালের গোটা দলটাই সায় দিল। মেয়েটিও বাধ্য হল কান ধরে দশবার ওঠবোস করতে।

-এবার নাচ দেখার পালা।

প্রিয়াংশু বলল। অরুণা ঢেউ তুলল, 'হোক হোক। সিল্পী কে ভাই?' শ-এর উচ্চারণটা ইচ্ছে করেই স-এর মতো করল। দিয়া আঙুল নেড়ে চটুল হাসি দিয়ে বলল, 'আমি জানি আমি জানি।'

-এই কে রে দিয়া?

'বম্বে সুস্মিতার প্রশ্ন। দিয়া গাইতে শুরু করল, 'ম্যায় খোয়াবো-কি শেহেজাদি ম্যায় হু হর দিল পে ছায়ি। বাদল হ্যায় মেরি জুলফে, বিজলি মেরি অংড়াই।' প্রিয়াংশু, সুস্মিতা, অরুণা, মৃত্তিকা সবাই মিলে হোওওওও করে হাততালি দিয়ে উঠল। ঘটা করে নাম ঘোষণা হল তার। মৃত্তিকা ঘোষক, কাঁপিয়ে ভারত নাচিয়ে এখন আমাদের মধ্যে নেত্য পরিবেশন করবেন শ্রীদেবীইইইই।' সকলেই অট্টহাসির সঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল। শ্রীদেবীর কানে সেগুলো পিশাচের খোলকরতালের মত বাজল। বারবার ডাকার পরেও যখন গেঁয়ো মেয়েটি তার আসন ছেড়ে নড়ছে না তখন দিয়া আর সুস্মিতা গিয়ে টেনে তুলল। আগেরদিন প্রিয়াংশুর থেকে যেভাবে চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়েছিল কতকটা সেইভাবেই শ্রীদেবীকে পঙ্গপালের হাটে এনে দাঁড় করাল ওরা। প্রিয়াংশু চুপ। বাকিরা শ্রীদেবীকে ঘিরে ঘুরতে লাগল। অরুণা বলল, 'লে লেড়কি নাচ।' সুস্মিতা গাইল, 'হাওয়া হাওয়াই, হাওয়া হাওয়াই।' সঙ্গে সঙ্গে দিয়া বলে উঠল, 'এই না না, এই গানটা নয়।' বলেই গাইতে শুরু করল 'ম্যায় তেরি দুশমন, দুশমন তু মেরা, ম্যায় নাগিন তু সাপেরা।' সবাই সমস্বরে হো হো করে সমর্থন করল। শ্রীদেবী ঘাবড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই আবারও খিলখিল করে হেসে উঠল। ওর হাসি দেখে বাকিরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

-ধুস। ওসব নাচতে-ফাচতে আমি পারি না।

-এই, পারিস না মানে? আমরা যখন বলেছি তখন নাচতে হবে। সুস্মিতা ধমকে উঠল। দিয়া গান ধরল। অরুণা শ্রীদেবীকে ধরে ঘুরিয়ে দিল। মাথার কোঁকড়া চুলগুলো ঝড়ে ওড়া কাকের বাসার মত ছড়িয়ে পড়ল। সুস্মিতা দুহাতে ঘেঁটে দিল শ্রীদেবীর মাথার চুল। শ্রীদেবী এবার যেন আর তল পাচ্ছে না। পঙ্গপালের দল থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে দিয়া পথ আটকে দাঁড়ায়। খপ করে ওর দুটো হাত ধরে নেয়। মাতালের মতো নাচতে শুরু করে। দুহাত মাথায় তুলে পিশাচিনীদের মতো খলখল করে হাসতে হাসতে উন্মাদের মতো ঘুরতে থাকে সুস্মিতা, দিয়া, মৃত্তিকা আর অরুণা। অসহায়কে জ্বালাতন করার যে বিপুল মজা সেটা এই মুহুর্তে তারা উপভোগ করছে। নাচতে নাচতেই দিয়া প্রশ্ন করে, 'শ্রীদেবী, মেরি জাআআআন, বলো তো বাচ্চা কীভাবে হয়? কী হল বলো বলো!' শ্রীদেবী প্রায় কাঁদো কাঁদো। কে বাঁচাবে ওকে? এখানে তো ভাই, তপাদা কেউ নেই। এতগুলো ছেলে মেয়ের সঙ্গে ও একা পেরে উঠবে না। দিয়া একটা হ্যাঁচকা টানে গোল করে ঘুরিয়ে ছুড়ে দেয় শ্রীদেবীকে। ঠিক সেই মুহূর্তে ফিল্মি হিরোদের মতো শ্রীদেবীকে লুফে নেয় প্রিয়াংশু। এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে ঝলসে ওঠে, 'স্টপ ইট। অনেক হয়েছে।' সবাই ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে যায়। প্রিয়াংশুর হঠাৎ কী হল কেউ বুঝতে পারে না। অবাক হয় শ্রীদেবীও। পড়তে পড়তে কোনও রকমে নিজেকে সামলে গায়ের ওড়নাটা ঠিক করে নেয়। ঘেমে গেছে। চোখ লাল। প্রিয়াংশু রাগত স্বরে বলে ওঠে, 'আমরা মজা করতে এসেছিলাম দিয়া। কিন্তু এবার সেটা অসভ্যতামি হচ্ছে। আর কেউ শ্রীদেবীকে বিরক্ত করবে না। জোড়া ভুরু হেনে প্রিয়াংশুর দিকে তাকায় শ্রীদেবী। প্রিয়াংশু নরম সুরে বলে, 'সরি শ্রীদেবী।' শ্রীদেবীকে দুহাতে ধরে প্রিয়াংশু। সিটের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে বসিয়ে দেয়। শ্রীদেবী কাঁপছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এমন হয় শুনেছিল। কিন্তু শহরের এই কলেজেও যে এরকম র‍্যাগিংয়ের শিকার হতে হবে সে ভাবেনি। এই জন্যেই মানুষকে ভয় পায় সে। ভীষণ ভয় পায়। শ্রীদেবীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস

করে বলে প্রিয়াংশু, ‘এরকম আর হবে না। কেউ যদি এরকম করে আমায় বোলো। নির্দ্বিধায়।' ভয় পেয়ে শুকিয়ে আসা ঠোঁটে খুব নরম একটা হাসি ছিদ্র দিয়ে ঠিকরে আসা সূর্যের আলোর মতো চকচক করে ওঠে। -শালা কী ঢ্যামনা রে!

দিয়া বিড়বিড় করল অরুণার কানে।

-শেষে কিনা এই বুনো মাল! ছি ছি ছি।

অরুণার উত্তর। প্রিয়াংশু কাছে এসে দাঁড়াতেই দিয়া বলে ওঠে, 'কী ব্যাপার বল তো? হঠাৎ বিবেকানন্দ হয়ে গেলি?' প্রিয়াংশু একবার কড়া দৃষ্টিতে তাকায়। বলে, ‘মেয়েটা গ্রাম থেকে এসে শহরে একা একটা বাড়িতে ভাড়া থাকে। নিজে রেঁধে বেড়ে খায়। কেউ করে দেবারও নেই। তোদের লজ্জা করে না? ওকে নিয়ে এইভাবে খিল্লি করছিস!' কথাগুলো খুব আস্তে আস্তে বলেই গলা তুলল সকলের উদ্দেশে, ‘এই চল সবাই। চল চল চল।'

-যাঃ শালা। এই তোর হল কী?

দিয়া অবাক হয়ে প্রশ্ন করল বটে। কিন্তু উত্তর পেল না। প্রিয়াংশু গটমট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দেখাদেখি বাকিরাও। শ্রীদেবীর চোখটা ভিজে এল।

একা একা বাড়ি ফেরার পথে ফোন করল সরযু ঠাকমাকে। ছেমড়ির ফোন পেয়ে সরযু তো বেজায় খুশি। অলি গলি ধরে হাঁটতে হাঁটতে শ্রীদেবী ঠাকমাকে বলল, ‘তুমি ঠিকই বলেছিলে ঠাকমা, যখন কেউ একা বিপদে পড়ে। কেউ বাঁচাবার থাকে না। তখন ভগবান ঠিক তাকে বাঁচিয়ে দেয়। নইলে যে ছেলেটা আগেরদিন আমায় বিরক্ত করেছিল। খুব খারাপ মনে হয়েছিল সেই ছেলেটাই কেন আমায় বাঁচাবে বলো? ভগবানই তাকে পালটে দিয়েছে বলো ঠাকমা?’’

-তাই তো তাই তো। ছেলেটার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবি। ও হয়তো ওর ভুলটা বুঝতে পেরেচে।

শ্রীদেবী খেয়াল করেনি ওর পেছন পেছন প্রিয়াংশু আসছিলই। দেখতে পেয়েই তড়িঘড়ি ফোনটা রেখে দিল।

-একটা জরুরি কথা বলতে এলাম।

-বলো।

-তুমি কোনও প্রফেসরের কাছে ভর্তি হয়েছে? মানে প্রাইভেট টিউশন?

-না না। ওসব লাগবে না। ও আমিই পড়ে নেব।

-পাগল নাকি?

শ্রীদেবী আবার কুরকুরিয়ে হাসল। ‘চন্দ্রকোণায় লোকে আমায় ঝাঁকড়া পাগলি বলে।' বলেই আবার হাসতে শুরু করে। ফিক করে হেসে ফেলে প্রিয়াংশুও। বলে, ‘একা একা তো অনার্স পড়ে পাশ করতে পারবে না।

-অ্যাঁ! কেন?

-পড়তে পড়তে বুঝবে কত শক্ত।

-তাহলে কার কাছে যাব! তাছাড়া কত টাকা নেবে তাও তো জানি না। বেশি পয়সা আমি দিতে পারব না।

-কিচ্ছু লাগবে না।

-মানে?

-আমারও তো হিস্ট্রি। আমার সব নোটসগুলো দিয়ে দেব তোমায়। বুঝতে অসুবিধে হল বোলো, আমি বুঝিয়ে দেব।

-তাই সত্যি?

নেচে উঠল শ্রীদেবী। প্রিয়াংশুও হেসে বলল, 'হ্যাঁ সত্যি। তবে এটা কাউকে বলা যাবে না। কেমন?'

-একদম।

-কালকে নোট নিয়ে আসব।

-আচ্ছা।

-তুমি থাকো কোন বাড়িতে?

-এই তো সোজা গিয়ে ডানদিকে। চলো না যাবে?

-হ্যাঁ চলো।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীদেবীর মুখটা ছোট হয়ে গেল। 'এ মা! না গো তোমায় নিয়ে যেতে পারব না।'

-কেন?

-বাড়িউলি অ্যালাও করবে না। সবার প্রবেশ নিষেধ। এমনকি আমার ভাই আর তপাদাকেও থাকতে দেয়নি।

-তপাদা কে?

-আমায় পড়াত। পাড়াতে থাকে।

-ও। ঠিক আছে। নো প্রবলেম। তোমার বাড়ি অব্দি এগিয়ে দিই। তারপর চলে যাব।

-আচ্ছা। এই আমি না সরি।

-কেন?

-আমি সেদিন তোমায় খুব খারাপ ছেলে ভেবেছিলাম। মানে খুব বাজে বিচ্ছিরি ভেবেছিলাম তোমায়।

-সেটাই তো স্বাভাবিক। আমি তো খারাপ কাজই করেছিলাম।

-তোমার বন্ধুরা ওরকম কেন?

-ওদের কথা ছাড়। ওরা ওরকমই। হিহিহিহি... আবার হাসি। ওরা দুজন হেঁটে চলল, পাশাপাশি। শ্রীদেবী বাড়িতে ঢুকে যাবার পর হাত নেড়ে প্রিয়াংশুও বাড়ি ফেরার পথ ধরে।

২৯

হুড়মুড় করে ক্যান্টিনে ঢুকতে গিয়ে মারল ধাক্কা।

-কানা নাকি?

আরেকটি মেয়ে গাল দিয়ে চলে গেল। তাতে কী? দাঁত বের করে হাসতে হাসতে করালবদনী দেবী জিভ কাটলেন। মেয়েটি যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে আরও একটা সুধাবচন ঝেড়ে গেল, ‘ইডিয়ট'।

-একটা ম্যাগি দাও না কাকু।

ক্যান্টিনের লোকটাকে খাবার অর্ডার করা মাত্রই পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, 'তোর তো মাথা ভর্তি ম্যাগি। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে নে।' আশেপাশের সকলে হেসে উঠল। শ্রীদেবী দেখে এখানেও দুই মূর্তিমান হাজির। দিয়া আর সুস্মিতা। শ্রীদেবী পাত্তা দিল না। ম্যাগিটা নিয়ে সবে টেবিলে বসেছে সে। অরুণা টেবিল থেকে জলের বোতলটা তুলে নিল। কোণের টেবিল থেকে মৃত্তিকা ডাকল, 'কীরে আয় এখানে।'

-দাঁড়া জলটা খেয়ে নিই।

কাঁটা চামচে ম্যাগি তুলে ফুঁ দিয়ে মুখে তুলল শ্রীদেবী। যে যা করছে করুক। তাতে ওর কী? বোতলের ছিপি খুলে অরুণা গলায় জল ঢালল। না, গলা অব্দি পৌঁছল না। গালের মধ্যেই জড়ো হয়ে রইল। সেই জলটাই হঠাৎ ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ল শ্রীদেবীর ম্যাগির বাটির ওপরে। বেশ কিছুটা ছিটকে এসে কামিজটা ভিজিয়ে দিল। ঝট করে উঠে পড়ল শ্রীদেবী। ‘এ কী করলে? ইসসস!'

-উপস, সরি রে, ভিজে গেল? যাক গে, খেয়ে নে না। বেশ স্যুপ স্যুপ লাগবে।

আবারও চাপা হাসি চারপাশ থেকে। কারণে অকারণে শ্রীদেবী হাসে বলে গাঁয়ের লোকে ওকে পাগল বলে। কিন্তু শহরের লোক তো আরও ভয়ানক পাগল। মানুষের ক্ষতি করে হা হা করে হাসে। সেদিনের মতো খাওয়া ঘুচে গেল শ্রীদেবীর। কারণ টিফিনের বরাদ্দ পয়সা আজকের মতো শেষ। মুখ শুকিয়ে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কলেজ থেকে বেরোলেই বাস রাস্তা। বই ভর্তি ব্যাগটাকে পেটে চেপে একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে রইল শ্রীদেবী। হঠাৎ মুখের সামনে একটা কেকের প্যাকেট চলে এল। চমকে তাকাতেই দেখে প্রিয়াংশু। ‘আমি সব দেখেছি। ওরা তোমায় খেতে দেয়নি।' শ্রীদেবীর হাসতে ইচ্ছে করল। হাহা বা হিহি করে নয়। নীরবে। ‘নাও। এটা খাও।' সরল শ্রীদেবী প্রিয়াংশুর হাত থেকে কেকটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে খেতে লাগল। প্রিয়াংশুও সেই সুযোগে পাশে এসে বসল। ব্যাগ থেকে একটা খাতা বের করে বলল, 'এটা থার্ড পেপারের খাতা। পেপারটা বেশ টাফ। হাতের লেখা বুঝতে না পারলে বোলো।'

-না না। তোমার হাতের লেখা বেশ ভালো। আগের যে নোটসগুলো দিলে সেগুলো তো দিব্যি পড়া যাচ্ছে।

-তাই। বাহ। তাহলে তো ভালো। তাও যদি কিছু বুঝতে না পারো বোলো। টুক করে এক সময়ে তোমার বাড়িতে গিয়ে বুঝিয়ে দেব। ঘণ্টাখানেকের জন্য বন্ধু গেলে বাড়িউলি কিচ্ছু বলবে না। আমি ম্যানেজ করে নেব।

-তোমার কথা আমি ঠাকমাকে, ভাইকে বলেছি জানো। ঠাকমা বলেছে সব সময় তোমার কথা শুনে চলতে। শহরে এসে এমন ভালো বন্ধু পাওয়া নাকি ভাগ্যের ব্যাপার।

প্রিয়াংশু হাসে। কিছু বলে না। শ্রীদেবী আরও বলে, ‘তবে ভাইটা তো আমার একটু বেশিই পাকা তাই জ্ঞানও দিয়ে দিয়েছে।'

-কী জ্ঞান?

-বলে কিনা, শোন দিদি, শহরে এমন অনেক ছেলে মেয়েদের পটাবার জন্য ভালোমানুষির ভাব করে। খবরদার পটিস না। সব সময় যাচাই করে নিবি।

প্রিয়াংশু এবার হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, ‘তোমার ভাইয়ের সঙ্গে একদিন আলাপ করতে হবে তো। কীসে পড়ে ভাই?'

-এই তো ইলেভেন হল। ভাবখানা চাকরি করা বাবুদের মতো। আসলে বাবা মারা যাবার পর আমাদের বাড়িতে ছেলে বলতে ভাই। মা খালি ওকে বলে, শোন শ্রীকুমার, তুই একমাত্র এই বংশের বাতি। তোকেই সব সামলে রাখতে হবে। এতবার বলেছে যে ওর মধ্যে বেশ একটা বাবা বাবা ভাব এসে গেছে।

আবারও হাসল প্রিয়াংশু। 'বেশ কথা বলো তুমি।'

-তোমার ভালো লাগে আমার কথা?

-হ্যাঁ লাগে তো।

--সব্বোনাশ। আমার মা, সরযু ঠাকমা সবাই তো বলে আমার গলায় নাকি বাঁশ পুরে দেবে। এত কথা বলা ঘুচে যাবে। এই প্রথম তুমিই বললে আমি ভালো কথা বলি।

-ভালো মেয়েরা ভালো কথা তো বলবেই।

-এই প্রথম কেউ আমায় ভালো মেয়ে বলল। তবে সরযু ঠাকমা অন্যরকম। আমায় খুব ভালোবাসে।

-আমিও তো বাসি।

- অ্যাঁ?

-হ্যাঁ। ভালো না বাসলে তোমায় এত হেল্প করি বলো?

একটু ভেবে বেশ সিরিয়াস মুখে বলে ওঠে শ্রীদেবী, 'হ্যাঁ, এটা তো ভেবে দেখিনি। যাক বাবা, শহরে তাহলে একজন কেউ আছে যে আমায় ভালোবাসে। নিশ্চিন্দি। আবারও একটা বোকাবোকা হাসি হেসে কেকটা পুরোটা সাবাড় করে দেয় শ্রীদেবী। প্রিয়াংশুর মুখটাও কীরকম যেন ভ্যাবলাকুমারের মত হয়ে যায়।

তেড়ে বৃষ্টি পড়ছে সেদিন। কারেন্ট নেই। নিজের ঘরে বাতি জ্বেলে বেশ দুলে দুলে জোরে উচ্চারণ করে পড়ছে শ্রীদেবী। কম দামী মোবাইলটা ঝনঝনিয়ে উঠল। অচেনা নম্বর।

-হ্যালো।

-আমি মৃত্তিকা বলছি শ্রীদেবী।

-কে?

-মৃত্তিকা। প্রিয়াংশুর বন্ধু।

-ও হ্যাঁ বলো।

শ্রীদেবী একটু হকচকিয়ে গেল। আবার কোন বদ মতলবে ফোন করেছে কে জানে? মৃত্তিকা বলল, 'প্রিয়াংশুর একটা বিপদ হয়েছে শ্রীদেবী। একমাত্র তুমিই হেল্প করতে পারো।'

-বিপদ! কী হয়েছে প্রিয়াংশুদার?

এতক্ষণ চেয়ারে হেলে বসেছিল। বিপদের কথা শুনেই সটান উঠে বসেছে। মৃত্তিকা বলল, 'ওর ধুম জ্বর। বাড়িতে ওর বাবা মা কেউ নেই। দেশের বাড়ি গেছে। উঠে খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত করতে পারছে না। তুমি একটু গিয়ে ওকে ওষুধ খাইয়ে দাও। ওষুধ নেবার ক্ষমতাটুকুও নেই। রাতে বাড়ির লোক চলে আসবে। তুমি তখন চলে এসো। আমি তো অনেক দূরে থাকি তাই যেতে পারছি না।' মহা ফাঁপরে পড়ল শ্রীদেবী। 'কিন্তু এই বৃষ্টিতে যাব কী করে? কালকে তো পরীক্ষাও আছে।'

-বেরোলেই অটো পেয়ে যাবে।

-আসলে আমি তো চিনি না কিছু।

-অটোয় বলো সুগম পার্ক যাব। ছ'টাকা ভাড়া নেবে। তোমার বাড়ির কাছে।

-কিন্তু... এইভাবে...

আমতা আমতা করছে শ্রীদেবী। কী করবে বুঝতে পারছে না। শেষে মৃত্তিকাই বলল, 'তুমি যদি না যেতে পার তাহলে অরুণাকে বলব।'

-হ্যাঁ মৃত্তিকাদি, তুমি সেটাই বরং কর।

-বেশ।

ফোন কেটে গেল। বাইরে বাজ পড়ল। বৃষ্টির ঝাটে বাইরের ছোট্ট বারান্দাটা ভিজে যাচ্ছে।

শ্রীদেবীর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। প্রিয়াংশুদা এত খেয়াল রাখে ওর। আর তারই বিপদে ও যেতে পারল না!

খানিকবাদে আবার ফোন। এবারে আরেকটা অচেনা নম্বর

-হ্যালো।

-অরুণাদি বলছি রে।

-হ্যাঁ বলো।

-মৃত্তিকা আমায় ফোন করেছিল। কিন্তু আমিও তো যেতে পারছি না। পা মচকে পড়ে আছি। এদিকে সুস্মিতা বা দিয়া যে আসবে তারও উপায় নেই। অনেক দূরে থাকে। একমাত্র তুইই কাছে থাকিস। একটু যা না সোনা।

-আমি মানে... অরুণাদি...।

-দ্যাখ, সময়ে অসময়ে প্রিয়াংশু তোর পাশে থাকে। শহরে এসে তোকে একটা টিচারও নিতে দেয়নি। সব নোটস দিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ও তোকে ভালোওবাসে। প্রিয়াংশুর জন্য এইটুকু করতে পারবি না? রাতে ফিরে এসে বাকি পড়া করে নিবি। ছেলেটা নইলে মরে যাবে রে। কী জানি কীভাবে পড়ে আছে জানি না।

অরুণা শ্রীদেবীর নরম জায়গায় খুঁচিয়ে দিয়েছে। বুকের মধ্যে ভয় থাকলেও রাজি হল সে।

কাশতে কাশতে প্রিয়াংশু দরজা খুলে দেখল শ্রীদেবী এসেছে। ভিজে একশা হয়ে গেছে। এত বৃষ্টি কী আর বাঁধ মানে? সঙ্গে এলোপাথাড়ি হাওয়া। ‘আরে তুমি! এসো এসো! ইসসস পুরো ভিজে গেছ তো।' শ্রীদেবী ঘরে ঢুকে এল। অবাক হয়ে দেখল প্রিয়াংশু কাশছে ঠিকই। কিন্তু দিব্যি হেঁটে চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ‘ওরা যে বলল তুমি উঠতে পারছ না!

-আগে বোসো তো। ওরা ঠিকই বলেছে।

শ্রীদেবী অতি সংকোচে সোফায় বসল। প্রিয়াংশু পাশের সোফাটায় এসে বসল। শ্রীদেবীর ভেজা হাতে হাত রেখে বলল, 'আমার সত্যিই খুব শরীর খারাপ। উঠতেও পারছিলাম না। কিন্তু কোনওরকমে ওষুধ খুঁজে খেয়ে এখন একটু বেটার লাগছে।'

-তাহলে আমি যাই প্রিয়াংশুদা।

-পাগল নাকি? এই বৃষ্টিতে একে ভিজে এসেছ। তার ওপর যদি ঠাণ্ডা লেগে যায় পরীক্ষা দেবে কী করে? বৃষ্টিটা একটু ধরুক। বাবা-মাও এসে যাবে। ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। তারপর আমাদের ড্রাইভার তোমায় নামিয়ে দিয়ে আসবে। তার আগে এক কাজ কর জামাকাপড় ছেড়ে ফেলো।

-এ মা! সে কী করে হবে? আমি তো কিছু আনিনি।

-চিন্তা নেই। আমার মায়ের চুড়িদার আছে। দাঁড়াও।

সংকোচ সত্ত্বেও বাথরুমে ঢুকে জামাকাপড় ছাড়ল শ্রীদেবী। বাথরুমে দুটো মোমবাতি জ্বেলে দিয়েছে প্রিয়াংশু। তাই শ্রীদেবীর কোনও অসুবিধেই হল না। ঘরে এসে বসতেই প্রিয়াংশু সরবত এনে দিল।

-না না, এসবের দরকার নেই।

-মা বলে বাড়িতে অতিথি এলে কখনও তাকে খালি মুখে ফেরাবি না। খেয়ে নাও। আমার ফেবারিট সরবত।

বলেই নিজের গ্লাসে চুমুক দিল প্রিয়াংশু। এক গাল হেসে শ্রীদেবীও চুমুক দিল। ‘ইসসস চুলগুলো ঠিক করে মোছনি? জল পড়ছে তো।' কথাটা বলতে বলতেই সরাসরি শ্রীদেবীর চুলের ভিড়ে প্রিয়াংশুর হাত ঢুকে যায়। শ্রীদেবী বেশ অস্বস্তিতে পড়ে। মাথা সরিয়ে বলে, ‘আমি ঠিক আছি।’

-মাথায় জল বসলে তোমার শরীর খারাপ হবে শ্রী। আমার সেবা করতে এসে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লে আমার খারাপ লাগবে।

প্রিয়াংশুর ফোনটা বেজে ওঠে। শ্রীদেবীর চুল থেকে হাত সরিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে যায়। ফোনটা একটু দূরে রাখা ছিল। হাতে তুলে দেখে। তারপর ফোনটা কেটে দেয়। ‘যতসব ভুলভাল নম্বর থেকে ফোন আসে। ততক্ষণে ঢকঢক করে সরবত প্রায় শেষ করে ফেলেছে শ্রীদেবী। খুব ক্লান্ত লাগছে ওর। শরীরটা ছেড়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। সোজা হয়ে বসতে চাইলেও পারছে না। চোখ টেনে আসছে। এই সময় ঠোঁটের কোণে আলতো হাসি নিয়ে শ্রীদেবীর পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় প্রিয়াংশু। দুটো হাত শ্রীয়ের মাথার মধ্যে চালিয়ে দিয়ে মাসাজ করতে থাকে। শ্রীদেবীর শরীরটা আরামবিলাসী হয়ে ওঠে। নেতিয়ে পড়ে সে। তারপর ঘুম নেমে আসে। গভীর ঘুম।

ভোর রাতে ঘুম ভাঙে শ্রীদেবীর। তলপেটের কাছে খুব ব্যথা। ভালো করে চোখ খুলে সে নিজেকে খুঁজে পায় একটা ঘরের বিছানায়। গায়ের ওপর শুধু একটা চাদর ছাড়া একটা সুতোও নেই। আঁতকে ওঠে সে। পাশে এলোগায়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে প্রিয়াংশু। তার গায়েও জাঙ্গিয়া ছাড়া কোনও বস্ত্র নেই। ওর জামাকাপড় দূরে মাটিতে ছড়িয়ে আছে। পেটের ব্যথায় কুঁকড়ে উঠছে থেকে থেকে। সরল সাধাসিধে শ্রীদেবী আর হাসতে পারছে না। তার কান্না পাচ্ছে। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

-ওই শালা, ট্রিট কবে দিচ্ছিস?

অরুণা বলে উঠল। কলেজের পাশে জড়ো হয়েছে পঙ্গপালের দল। সবকটা মাথা একসঙ্গে আছে। প্রিয়াংশু বলল, ‘ট্রিট কীসের?'

-কী হারামি রে তুই?

দিয়ার কথার ওপর দিয়ে সুস্মিতা ফুট কাটল, 'আমাদের মধ্যে সবার আগে অ্যাডাল্ট হলি তুই। তাও আবার আমাদের দয়ায়।'

-একদমই তাই।

সায় দিয়ে মৃত্তিকা বলল, 'এই এতদিন ধরে আমরা যদি ভিলেনের অ্যাক্টিংটা না করতাম তুই হিরো হতে পারতিস?

-ইসসসসস! তোরা যেন কত ভালো হিরোইন সব। কলেজের সব প্রফেসর তোদের চারটেকে তো এমনি এমনি ফোর মাস্কেটিয়ার্স বলে ডাকে তাই না? চোখ পাকিয়ে মৃত্তিকা বলে উঠল, 'দেখ দেখ, কীরকম বেইমান শালা। এই জন্যে বলে কারও ভালো করতে নেই।

-আরে বাল খাওয়াব খাওয়াব। একটু ব্যাপারটা বুঝে নিতে দে।

প্রিয়াংশু বেশ সিরিয়াসলিই বলল কথাটা। দিয়ার কীরকম যেন খটকা লাগল। বলল, 'হ্যাঁ রে প্রিয়াংশু, কন্ডোম নিয়েছিলি তো?' প্রিয়াংশু মুখে পুচ করে একটা শব্দ করে ওঠে।

-এই পুচ করছিস কী রে? নিসনি?

-শেষ মুহূর্তে শালা কী যে হল। ইচ্ছেই করল না।

-গাঁড় মেরেছে বাঁড়া!

দিয়ার মাথায় হাত। অরুণা, সুস্মিতা আর মৃত্তিকা এক পা করে পিছিয়ে গেল। দিয়া দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'শালা নিজের তো কেনার মুরোদ ছিল না। লজ্জায় বাবু মরে যাচ্ছিলেন। আমরা চাঁদা তুলে সবথেকে বেস্ট মালটা কিনে দিলাম আর তুই ইউজই করলি না? এই বাল, তোকে আমাদের খাওয়াতে হবে না। তুই ফুটে যা। বছরখানেক বাদে একেবারে মুখেভাতের নেমন্তন্ন করিস গিয়ে। খেয়ে আসব।'

-দূর বালটা দাঁড়া তো। কবে কী হবে তার ঠিক নেই....

প্রিয়াংশুকে দেখে বোঝাই যাচ্ছে কাজটা নিয়ে সে নিজেও বেশ ভয়ে আছে। 'কিচ্ছু হবে না। তেমন কিছু হলে খসিয়ে দেব।'

-আর তিনি যদি হাসতে হাসতে বাওয়াল করেন তখন? এবার প্রিয়াংশুর ঠোঁটে খুনে হাসি।

-পারব না। কিছুতেই পারব না।

গলাটা কেঁপে উঠল শ্রীদেবীর। এই কয়েক মাসে আমুল বদলে গেছে সে। আগের মতো

অকারণে সে আর হাসে না। কোনও কারণ ঘটলে ঠোঁটে তার নকল একটা হাসি দেখতে পায় সবাই। রেজাল্ট ভালো হচ্ছে না। সামনেই ফার্স্ট ইয়ারের ফাইনাল পরীক্ষা। ভরদুপুরবেলা গলির মুখে দাঁড়িয়ে প্রিয়াংশুকে শুনিয়েছে ভয়ানক কথাটা। মা হতে চলেছে সে। প্রিয়াংশু একটু টলে গিয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়েছে। অ্যাবরশনের প্রস্তাব রাখতেই শ্রীদেবী খারিজ করে দেয়।

-কেন পারবে না? কত লোকে তো করছে।

-আর পাঁচজন খুন করছে বলে আমাকেও করতে হবে? তাছাড়া সাড়ে তিনমাস হয়ে গেছে। দুদিন বাদে লোকে বুঝতে পারবে। তুমি বাড়িতে বলো। আমরা বিয়ে করে নিই I

-আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি সত্যিই বদ্ধ উন্মাদ। সবে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করব। এর মধ্যে বিয়ে?

-ও। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট না করে বন্ধুদের দিয়ে মিথ্যে বলিয়ে আরেকটা মেয়ের সর্বনাশ করা যায়, নষ্টামি করা যায়, কিন্তু বিয়ে করা যায় না? বেশ। তোমায় কিচ্ছু করতে হবে না। আমি তোমার আর ওই চারজনের নামে কালকেই কমপ্লেন করব প্রিন্সিপালের কাছে।

-পাগলামো কোরো না।

-আমি তো পাগলই। তুমি তো জানো। আমার যা সর্বনাশ করার তা তো করেইছ। দুদিন বাদে এমনিতেও সবাই জানতে পারবে। তার আগে আমিই সবাইকে জানাব।

প্রিয়াংশুর মুখটা রোদ্দুরে ঝলমল করছিল। হঠাৎ করেই যেন সেটা আলো-ছায়ার খেলায় একটা রহস্যময় মুখোশ হয়ে যায়। বলে, 'যেদিন আমার নেওয়া চেয়ারটা টেনে নিয়েছিলে। সেদিনই বুঝেছিলাম তুমি সহজে সিধে হবে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, চেয়ারের মতোই তেমার পায়ের তলার মাটিটা আমি সরিয়ে দেব।' কথাটা বলতে বলতে নিজে মোবাইলটা শ্রীদেবীর মুখের সামনে ধরে। একটা ভিডিয়ো চলছে। বাথরুমে দুটো মোমবাতি জ্বলছে। শ্রীদেবীর নগ্ন শরীরটা আগুন তাতে গনগন করছে। ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে টাওয়েল দিয়ে ভালো করে গায়ে বসে থাকা জল মুছে নিচ্ছে। শেষে প্রিয়াংশুর মায়ের চুড়িদার গায়ে চাপিয়ে নিল। শ্রীদেবী ভয়ে লজ্জায় থরথর করে কাঁপতে থাকে। সত্যি সত্যি পায়ের তলার মাটি কেঁপে ওঠে।

-এই সুন্দর ভিডিয়োটা সবার মোবাইলে ছড়িয়ে দেব। বলব, শ্রীদেবী গ্রাম থেকে এসে শহরে একা থাকে। এইসব ভিডিয়ো বানিয়ে ঘরে ছেলে ঢোকায়। আর এইভাবেই পয়সা কামায়।

মুখে হাত চাপা দিয়ে পিছনে সরে গেল শ্রীদেবী। প্রিয়াংশু বলে, 'বাচ্চা রাখো আর না রাখো, আমার নাম যদি কোথাও উচ্চারণ কর সবার সামনে তোমায় বেশ্যা প্রমাণ করে ছাড়ব। তাতে শুধু তুমি নয়, তোমার পরিবার গ্রামে মুখ দেখাতে পারবে না। কারণ গ্রামের প্রতিটা লোকের মোবাইলে এই ভিডিয়ো চলে যাবে। বলা যায় না, তোমার মা হয়তো গলায় দড়ি দিল। ছোট ভাইটা পুকুরে ডুবে মরল। সরযু ঠাকুমার হার্ট ফেল করল। তোমাদের বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিল সবাই। অনেএএএক কিছু হতে পারে শ্রীদেবী। খবরদার আমার নাম উচ্চারণও করবে না।' শ্রীদেবী দুহাতে মুখ চেপে, দুচোখ ভর্তি জল নিয়ে পিছোতে পিছোতে মুখ ঘুরিয়ে দৌড়তে থাকে।

প্রিয়াংশু সামনের দিকে ঝুঁকে দুচোখে হাত চাপা দেয়। বসে থাকে নীরব হয়ে। তখন ফোন করে শিবাঙ্গীকে ডেকে পাঠিয়েছিল প্রিয়াংশু। স্বপ্নের ভয়াবহতা সহ্য করতে পারেনি। উলটোদিকের সোফায় বসে থাকা শিবাঙ্গী বলে ওঠে, ‘এই লজ্জাটা যদি সেদিন পেতেন তাহলে আজকের প্রাণগুলো অকালে চলে যেত না। সুস্মিতাকে এইভাবে মরতে হত না।'

-তখন আমাদের বয়স কম। মাথায় উল্টোপাল্টা চিন্তা। তখন ভাবতাম, শালা আমরাই দুনিয়াটাকে পালটে দেব। আমাদের কথায় সবাই ওঠবোস করবে। এমনই আরও কত ভুলভাল ভাবনা।

-তারপর? শ্রীদেবী তো বলেনি আপনাদের নাম।

-সেদিন দুপুরে আমায় যখন প্রথম মা হওয়ার কথা বলল, ও তার আগেই ওর ভাইকে বলেছিল। কাউকে বলতে বারণ করেছিল। কিন্তু ওর ভাই শোনেনি। শ্রীদেবীকে যে পড়াত, তপা না কী নাম তাকেও বলেছিল। কিন্তু সে কখনও সামনে আসেনি। ওর ভাই শ্রীকুমার সোজা এসে প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করে। তখন শ্রীদেবীকে দেখে যে কেউ বলে দেবে ও প্রেগনেন্ট। প্রিন্সিপাল আমাদের ডেকে পাঠান। মৃত্তিকার খুব শরীর খারাপ ছিল বলে ও আসতে পারেনি। আমরা যাই। কলেজের সব প্রফেসরদের সামনে শ্রীদেবীকে আনা হয়। প্রিন্সিপাল প্রশ্ন করেন....

-তোমার এই অবস্থার জন্য কে দায়ী?

শ্রীদেবী চুপ। চোখের তলায় কালি। পেট ঈষৎ ফুলে আছে। পাশে দাঁড়িয়ে শ্রীকুমার। সারা গালে হালকা দাড়ি। নাকের নীচে গোঁফের রেখা। গালদুটো চ্যাপ্টা। চোখে আশঙ্কা। 'দিদি বল সত্যিটা। কিচ্ছু লুকোস না।' অরুণা, দিয়া, প্রিয়াংশু, সুস্মিতা আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে যেন। তিনটে মেয়ে শ্রীদেবীর দিকে তাকিয়ে। প্রিয়াংশুর চোখ মাটির দিকে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে প্রিয়াংশুকে দেখে নিচ্ছে। প্রিন্সিপাল বলেন, ‘তোমার কোনও ভয় নেই। নির্দ্বিধায় বলো। তোমার এই অবস্থার জন্য কে দায়ী?' শ্রীদেবী এখনও চুপ। শ্রীকুমার বলল, 'দিদি গত দুদিন ধরে কোনও কথাই বলছে না। এমনকি খিদে পেলেও নয়। আমি বলছি স্যার, এই চারজন আমার দিদিকে ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।'

-এটা শুধু তুমি বললে হবে না। যার ওপর এই অন্যায়টা হয়েছে তাকেই বলতে হবে। শ্রীদেবী মুখ বন্ধ করে থাকলে আমরা ধরে নেব দোষটা সম্পূর্ণ তোমার দিদির। এরা নিরাপরাধ।

-না স্যার।প্রতিবাদ করে উঠল শ্রীকুমার। এরা শুরু থেকে আমার দিদিকে নানাভাবে জ্বালাতন করেছে। অপমান করেছে। সেদিন মৃত্তিকা, অরুণা এরাই ফোন করে দিদিকে প্রিয়াংশুর বাড়ি পাঠিয়েছিল।

-ওরা পাঠাল আর তোমার দিদিও চলে গেল? শ্রীদেবী কি বাচ্চা মেয়ে?

-না স্যার। আমার দিদি ভীষণ সরল। মনে কোনও প্যাঁচ নেই। প্রিয়াংশু অসুস্থ শুনে দৌড়ে গিয়েছিল।

ঠিক তখনই অরুণা মুখ খুলল, 'স্যার, প্রিয়াংশু অসুস্থ হলে ওকে পাঠাব কেন? প্রিয়াংশুর বন্ধু তো আমরা। ও দু'বছরের জুনিয়র।'

-তাছাড়া কেউ যদি বলেই থাকে তাহলে ওর কীসের এত গরজ পড়েছে সিনিয়র ছেলের বাড়ি ছুটে যাবার? তাও আবার রাতে! কথাগুলো বলল সুস্মিতা। সুযোগ পেয়ে দিয়াও তাল ঠুকল। ‘স্যার আমরাও তো মেয়ে। আরেকটা মেয়েকে বিপদে ফেলে আমাদের লাভটা কী? আসলে স্যার, শ্রীদেবী গ্রামের মেয়ে তো। শহরে এসে মাথা ঘুরে গেছে। একা একা থাকে। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন স্যার, বাড়িওয়ালি নাকি কাউকে বাড়িতে আসতে দেয় না। বিশেষ করে ছেলে বন্ধুদের তো নয়ই। নিশ্চয়ই ওর চরিত্র সম্পর্কে জানে তাই। বাধ্য হয়ে ও বাইরে বেরিয়ে...'।

-শাট আপ। সব মিথ্যে কথা।

তড়পে ওঠে শ্রীকুমার। প্রিন্সিপাল কড়া গলায় বলে, 'গলা নামিয়ে শ্রীকুমার। এটা একটা কলেজ।'

-সরি স্যার। তবে এরা সবাই মিথ্যে বলছে।

আরেক প্রফেসর বলে ওঠেন, 'তাহলে তোমার দিদি মুখ কেন খুলছে না? শ্রীদেবী তোমার কিছু বলার আছে কী?'

-দিদি এইভাবে ভয় পেয়ে হেরে যাস না। তুই বল দিদি ওরা কী কী করেছে।

শ্রীকুমার ঝাঁকিয়ে দেয় শ্রীদেবীকে। শ্রীদেবী যেন মাটির মূর্তি। প্রাণ নেই কোনও। মুখ নিচু

করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু চোখ ফেটে টপটপ করে জল পড়ল। ঘরে আরও কিছু সময়ের নীরবতা। তারপর প্রিন্সিপাল বললেন, 'সরি, আমাদের হাতে আর সময় নেই। আমরা ধরে নিচ্ছি এই চারজন এবং মৃত্তিকা নির্দোষ। কারণ কোনও কিছুই প্রমাণ হল না।'

-হবে স্যার। প্রমাণ হবে।

ঘরের মধ্যে সকলেই কমবেশি চমকে ওঠে। শ্রীকুমার এখনও বলে চলেছে! প্রিন্সিপাল প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কীভাবে?'

-ডি এন এ টেস্ট।

ঘরের মধ্যে শব্দ হল একটা। আসলে শব্দটা প্রিয়াংশুর মাথায় মধ্যে বজ্রপাত হবার শব্দ। ভাইয়ের কথা শুনে শ্রীদেবীও যেন সাড় ফিরে পেল। কী সর্বনাশ করতে চলেছে ভাই! এমনিতেই তো জন্ম ইস্তক সকলের হাড়মাস কালি করে দিয়েছে শ্রীদেবী। সেরকমটা শুনেই বড় হয়েছে সে। তার পরে এই সত্য প্রমাণ হলে তো বাড়িতে আগুন জ্বলবে। প্রিয়াংশুর হয়তো শাস্তি হবে। কিন্তু তাতে শ্রীদেবীর কলঙ্ক কিছুমাত্র কমবে কি? ভরা সভায় এই প্রথম কথা বলে উঠল শ্রীদেবী, 'না। কোনও টেস্ট হবে না।' সবাই শ্রীদেবীর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকায়। শ্রীদেবী নিচু কণ্ঠে প্রিন্সিপালের চোখে চোখ রেখে বলে, 'সব দোষ আমার। কারও কোনও দোষ নেই।'

-দিদি কি বলছিস তুই? তুই আমায় এদের নাম না বললে আমি জানব কোত্থেকে?

-আমার মাথার ঠিক ছিল না রে ভাই। আসলে ওদের ওপর আমার রাগ ছিল। ওরা সত্যিই আমায় জ্বালাত। তাই আমি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছি।

প্রিন্সিপাল রেগে বললেন, 'এটা কি তামাশা হচ্ছে? জানো এর জন্য তোমার কি শাস্তি হতে পারে?''

-আমাকে কলেজ থেকে বের করে দেবেন তো? তাই দিন। শহরের কলেজে পড়ার সাধ আমার মিটে গেছে।

চোখ নামিয়ে নেয় শ্রীদেবী। প্রিন্সিপালের চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে একটা গ্রামের মেয়ের এতটা স্পর্ধা দেখে। 'বেশ। অপরাধ প্রমাণ না হওয়ায় অরুণা দত্ত, দিয়া চৌধুরি, সুস্মিতা মুখার্জি, মৃত্তিকা ভট্টাচার্য এবং প্রিয়াংশু বড়ালকে ছেড়ে দেওয়া হল। আপনারাও এক মত তো?' শেষ কথাটা বাকি প্রফেসরদের উদ্দেশ্যে বললেন প্রিন্সিপাল। সবাই সম্মতি জানালেন। তারপর প্রিন্সিপাল বললেন, 'কিন্তু উই আর সরি শ্রীদেবী, তোমাকে সত্যিই আর এই কলেজে রাখতে পারছি না।' শ্রীদেবী শুধু নীরবে চোখ বুজল। শেষ অশ্রুটা গড়িয়ে পড়ল চোখের কোল বেয়ে। শ্রীকুমার প্রচণ্ড রাগে দুটো হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে রইল। উপস্থিত চারজন অপরাধীর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিয়ে তাকাল। সবার সামনে দিয়ে অপমানে লাল হয়ে দিদিকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল শ্রীকুমার। শহুরে হায়নাগুলো চোখ তুলে তাকাতে পারেনি সেদিন।

ফিরে যায়?

-কোনও খোঁজ রাখিনি। আট-ন মাস পর খবর পাই শ্রীদেবী মারা গেছে।

-কীভাবে? মেন্টাল অ্যাসাইলামে ছিল। সেখানেই গলায় দড়ি দেয়।

-আর বাচ্চাটা?

-ওরা কী তারপর গ্রামে . . .

কিছুক্ষণ চুপ থাকে প্রিয়াংশু। আজ তারও চোখ দিয়ে নোনতা জলের ধারা।

-শুনেছিলাম, একটা মেয়ে হয়েছিল।গলাটা কেঁপে উঠল প্রিয়াংশুর।

-সে কোথায়?

-আর কিচ্ছু জানি না। কিচ্ছু না।

-একটা কথা বলুন তো প্রিয়াংশুবাবু, হঠাৎ আজ আমায় ডেকে এই কথাগুলো কনফেস করছেন কেন? বিবেকের দংশন! নাকি ভয়?

শিবাঙ্গী জিজ্ঞেস করল। সোফায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে সিলিংয়ের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে

প্রিয়াংশু বলল, 'একটা ভয়ানক স্বপ্ন!'

পাখির ডানায় সন্ধে নামছে। আশেপাশের বাড়ি থেকে এখনও শাঁখের শব্দ ভেসে আসে চন্দ্রকোণায়। তুলসীতলায় গঙ্গাজলের ছড়া দিল বৃদ্ধা সরফুর ছেলের বউ। শাঁখ বাজাল। গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করল। বৃদ্ধা দাওয়ায় বসে প্রণাম সারলেন। স্বয়ম্ভু অপেক্ষা করছিল। উমা সন্ধে দিয়ে ঘরে চলে যেতে বৃদ্ধা বললেন, 'এবার রামায়ণ পাঠ করব আমি। তুমি আজ রাতে খেয়ে যেও বাবা। '

-না মাসিমা। এমনিতেই দুপুরে যা খাইয়েছেন তাতে পেটে জল খাবারও জায়গা নেই।

-বোঝো। এই তোমাদের এখন যে কী রোগা হবার বাই উঠেছে বুজি নি বাপু। জুয়ান তাগড়া ছ্যানা। দুহাতে খাবে। শক্তিশালী হবে তা না।

-পরে এসে আবার খাব। এখন শুধু দু-তিনটে প্রশ্ন করেই বিদেয় হব!

-কী প্রশ্ন?

-বাচ্চাটা কোথায়?

-শুনেছিলাম পাগলা গারদ থেকেই তাকে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেয়। শ্রীকুমার জানত হয়তো। বলেনি। আমি দেখতে চেয়েছিলাম একবার। দেখায়নি। তারপর তো মেয়েটাও চলে গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বৃদ্ধা বললেন, 'আর দেখতেও চাইনি।'

-শ্রীদেবীদের বাড়ি কি এখন বন্ধই থাকে? নাকি কেউ আসে? স্বয়ম্ভু জিজ্ঞেস করল।

-বেশিরভাগ সময় বন্ধই থাকে। তবে মাজে মাজে শ্রীকুমার এসে ঝাড়পোঁছ করে যায়।

-শ্রীকুমার কোথায়?

-কলকাতায়। কোন একটা দকানে কাজ করে বলেছিল।

-কোন দোকানে?

-বই-টই হবে।

-বই!

স্বয়ম্ভূ একটু থমকে গেল। মনের মধ্যে যাকে নিয়ে সন্দেহ ছিল তার সঙ্গে কোথায় যেন গরমিল হল! 'আচ্ছা এই তপা কে? কোথায় থাকে?''

-তপাও কোলকাতায়। এই পাড়ায়েই অর মা থাকে। বাবা গেল বছর মারা গেচে।

-তপার পুরো নাম কী?

বৃদ্ধার স্মৃতি আর কাজ করল না। ছেলেকে ডাকলেন। ছেলে বলল, 'ওর নাম বোধহয় ত্রিদিব অধিকারী।'

-ত্রিদিব অধিকারী!

-হ্যাঁ। উ তো প্রভা বউয়ের ছেলে।

বৃদ্ধার কথার রেশ ধরে তার ছেলে বলল, 'কাকিমার পুরো নাম সুপ্রভা অধিকারী।' স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্বয়ম্ভু। সুপ্রভা নামটা দুবার মনে মনে আওড়ে নিল সে। সঙ্গে আরও কয়েকটা নাম মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে গেল কয়েক সেকেন্ডে। যেদিন সুস্মিতা তার বুটিকে খুন হয় সেদিন ঘটনাস্থল থেকে একটি মেয়ে ও একটি ছেলেকে মিশ্রঠাকুরের বাড়ি সরেজমিনে তদন্ত করতে পাঠায় স্বয়ম্ভু। কারণ তার আগেই জানতে পেরেছিল সে বাড়িটি সুপ্রভা অধিকারী নামক একজন মহিলার। কর্পোরেশন থেকে পুরনো বাড়ির খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে বলে দুজনে গিয়ে জানতে পেরেছিল পঙ্কজ মিশ্রর দিদি সুপ্রভা অধিকারী। এটা মনে পড়তেই ঝট করে প্রশ্ন করে স্বয়ম্ভু, 'আচ্ছা এই সুপ্রভা অধিকারীর কোনও ভাই আছে? যে সুপ্রভারই কোলকাতার বাড়িতে থাকে?' বৃদ্ধা ছেলের দিকে তাকাল। ছেলেও দুপাশে মাথা নেড়ে বলল, 'এটা জানি না। তবে তপার মুখে তার কোনও মামার কথা তো শুনিনি কখনও। মাঝে মাঝে মাসির কথা বলত।' ঝট করে আবার চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকে স্বয়ম্ভু। ছদ্মবেশে পাঠানো ছেলে ও মেয়েটির থেকেই জানতে পেরেছিল, মিশ্রঠাকুরের ভাগ্নের নাম

ত্রিদিব মণ্ডল। এই তো, নামটা মিলে যাচ্ছে। কিন্তু তপাই যদি ত্রিদিব হয় তাহলে মণ্ডল কেন? মিশ্রঠাকুর বলেছিল তার ছোড়দির ছেলে ত্রিদিব। যার ডাকনাম তিরু। তাহলে তপা কি তিরু নয়? এদিকে তপা সুপ্রভারই ছেলে। কিন্তু মিশ্র সেটা বলেনি। স্বয়ম্ভু আবার জিজ্ঞেস করে, 'আপনাদের কাছে তপা অর্থাৎ ত্রিদিবের কোনও ছবি আছে? সঙ্গে শ্রীকুমার আর শ্রীদেবীর?' ঠোঁট উলটে বৃদ্ধা আবার তার ছেলের দিকে তাকায়।

বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে রাত আটটা বেজে যায় শিবাঙ্গীর। অপর্ণা মেয়েকে দেখেই কীরকম যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে একভাবে।

-কী গো মা কী দেখছ?

-তোর কী শরীর খারাপ?

-না তো? কেন? দেখে মনে হচ্ছে?

-না না। এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি তাই।

-উফ মা!

শিবাঙ্গী টাওয়েলটা কাঁধে নিয়ে সবে ফ্রেশ হতে ওয়াশরুমে যাবে অমনি ফোনটা টুংটাং শব্দ করে উঠল। হোয়াটসঅ্যাপ। স্বয়ম্ভু।

-সরষের মধ্যেই ভূত। আমাদের বড্ড ভুল হয়ে গেছে শিবাঙ্গী।

শিবাঙ্গী বেশ ধাক্কা খেল। ভুল হয়েছে মানে? ঘুরিয়ে ফোন করতেই ফোনটা কেটে দিল স্বয়ম্ভু। আবার হোয়াটসঅ্যাপ টোন বেজে উঠল।

-গাড়িতে আছি। কথা বলা যাবে না। আজই ফিরছি। রাত হবে। কাল কথা বলছি। গুড নাইট।

শেষের এই গুড নাইট, তাও আবার রাত আটটার সময়! এটাই বেশ ভাবাচ্ছে শিবাঙ্গীকে। বিছানায় বসেই পড়ল। বুকের মধ্যেটা ধুকপুক করছে। এমনিতেই স্যারের মাথায় খাঁড়া ঝুলছে। তার ওপর ভুল! আর গাড়িতে যখন আছেন তখন কথা কেন বলতে পারবেন না? পুলিশের গাড়ি নিয়েই তো গেছেন। কোনও বিপদ হল না তো?

৩০

দিব্যি সিনেমাটা জমে উঠেছিল। মুখপোড়া কারেন্টটা দিল সব বিগড়ে। এই সময়েই যেতে হল। সুচিত্রা যেখানে বসে টিভি দেখছিলেন সেখান থেকে মোমবাতিটা অনেকটাই দূরে। মোবাইলটাও হাতের কাছে রাখেন না। এই নিয়ে ছেলে কম মুখ করেছে তাকে। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন সুচিত্রা। কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকতেই খটকা লাগল। জানলা দিয়ে দিব্যি তো রাস্তার আলো ঘরে ঢুকছে। এই রে! নির্ঘাত এই ফেজটা গেছে। নিজের মনেই মুখ দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে রান্নাঘরে তাকের ওপরে হাত বুলিয়ে মোমবাতি খুঁজতে লাগলেন। ঠিক সেই সময় কী একটা যেন শব্দ হল। দরজা খোলার শব্দ কী? 'কে রে ভোলা এলি?' গলা 'তুললেন সুচিত্রা। উত্তর এল না। কোনওরকমে মোমবাতি খুঁজে পেলেন। কিন্তু দেশলাই! সেটা যে কোথায় রেখেছেন! অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটু মনে করতে চেষ্টা করলেন। শেষ উনি কী কাজের জন্য দেশলাই ব্যবহার করেছেন! মনে পড়েছে, ধূপ জ্বালিয়েছিলেন। তার মানে টিভির টেবিলেই আছে। রান্নাঘর থকে বেরিয়ে এলেন সুচিত্রা। বসার ঘরে টিভি। তাই সেদিকেই এগোলেন। সামনে আসতেই আধো আঁধারে একটা অবয়ব যেন বসে আছে বসার ঘরের চেয়ারে। প্রথমে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলেও সামলে নিলেন। এর আগে তার ভোলা এরকম কম শয়তানি করেনি। মা যখন প্রায় ভিরমি খায়-খায় অবস্থা ঠিক তখনই দাঁতকপাটি বের করে আবির্ভূত হতেন। আবার শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে বলত, 'দেখছিলাম ভাবী গোয়েন্দা স্বয়ম্ভু সেনের মা কেমন সাহসী!'

-ভোলা তুই আর বড় হবি না, না? মায়ের সাথে এখনও শয়তানি করবি? কিন্তু তুই যে বললি রাত হবে ফিরতে। ঢুকলিই বা কোথা থেকে? ভোলা....

ভোলার মুখে কুলুপ। ছায়াটাও নড়ছে না। একটা বিচ্ছিরি পচা গন্ধ এসে নাকে লাগে সুচিত্রার। নাক কুঁচকে অন্ধকারে দেশলাই খুঁজতে খুঁজতেই বলে ওঠেন, 'ইসস ভোলা, তোর মোজা দিয়ে কী বিচ্ছিরি গন্ধ বেরচ্ছে রে। আগে কাচতে দে। উমহ! কতবার বলেছি একদিন অন্তর মোজা কাচবি। কীরকম চুপ করে বসে পচা গন্ধ শোঁকাচ্ছে দেখো। দাঁড়া বাতিটা জ্বালি তারপর দেখাচ্ছি।' ছেলে একদিন বাড়ি না থাকেলেই অনেক কথা জমে থাকে সুচিত্রার। তাই বাড়ি ফিরলে একভাবে বলে চলেন। সে ছেলের কানে ঢুকুক আর না ঢুকুক। 'এই তো পেয়েছি।' বাক্স থেকে দেশলাই জ্বেলে ঘুরতেই আঁতকে উঠলেন সুচিত্রা। তারপরেই গলা চিরে খানিকটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলেও বাকিটা গোঙানি হয়ে মিলিয়ে গেল। কালো অবয়বটা সজোরে আঘাত করল সুচিত্রার মাথায়। ধাতব শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার।

রাত একটা বেজে গেছে। ড্রাইভার কৃষ্ণ স্বয়ম্ভুকে বাড়ির সামনে নামিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়ি নিয়ে। লোহার ছোট গেটটা খুলে দরজার কাছে এসে কলিং বেল বাজাল স্বয়ম্ভু। একবার, দুবার, তিনবার। স্বয়ম্ভুর সন্দেহ হল। ছেলে ফেরেনি অথচ মা ঘুমিয়ে পড়েছে। এ অসম্ভব। কিন্তু আজ কী হল? শরীর খারাপ করল না তো? পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে মায়ের ফোনে ফোন করল। ঘর থেকে ফোন বাজার শব্দ নিস্তব্ধ রাত্রিতে সহজেই বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে। 'মা নীচে! অথচ ফোন তুলছে না। দরজাও খুলছে না!' আপন মনে বিড়বিড় করে বারকয়েক ডাকল। কোথাও থেকে কোনও উত্তর নেই। বাধ্য হয়ে দরজার লকে চাপ দিতে সহজেই খুলে গেল। তার মানে ভেতর থেকে দরজাটা খোলাই ছিল। বাড়িতে ঢুকতেই প্রথমে যেটা খটকা লাগে সেটা হল গোটা বাড়িটাই এত অন্ধকার কেন? কারেন্ট তো আছে। দরজা দিয়ে ঢুকতেই সিঁড়ির তলা। সেখানেই মেন সুইচ। মোবাইলের টর্চ জ্বেলে সেখানে আলো ফেলতেই দেখল মেন সুইচ অফ। স্বয়ম্ভুর চট করে কখনও ভয় করে না। কিন্তু এখন করল। ঝপ করে ভয়দানবটা যেন ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে একটা পচা গন্ধ। এই গন্ধটাই আরও যেন বেশি করে কোনও সর্বনাশের বার্তা বয়ে আনছে। মেন সুইচটা তুলে দিতেই সারা বাড়িতে আলো জ্বলে উঠল। বসার ঘর থেকে ভেসে এল টিভির সাউন্ড। 'মা মা' বলে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে বসার ঘরে ঢুকতেই থমকে গেল। টিভির সামনের

মাটি থেকে একটা রক্তের মোটা দাগ বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছে। চমকে ওঠে স্বয়ম্ভু। রক্তের দাগ লক্ষ্য করে এগোতে থাকে সে। রক্তটা বসার ঘর পেরিয়ে ডাইনিং হয়ে নীচের শোবার ঘরে ঢুকে গেছে। -মাআআআআআআ...।

প্রচণ্ড চিৎকার করে ঘরে ঢোকে স্বয়ম্ভু। কাছে যেতেই আরও ভয়ানক কিছু দেখে চোখ-মুখ কুঁচকে ওঠে। বমি উঠে আসে। সুচিত্রার গলায় কারও পায়ের আটটা আঙুল মালার মতো গেঁথে পরিয়ে দেওয়া। আঙুলগুলো পচে গেছে। পোকা ঘুরছে সুচিত্রার মুখের পাশে। সুচিত্রার হাত-পা বাঁধা। মুখে কাপড়ের বাঁধন। মাথা দিয়ে রক্তের ধারা মাটি লাল করে দিয়েছে। স্বয়ম্ভু ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের মুখের বাঁধন সবার আগে খোলে। তারপর মালাটা গলা থেকে খুলে ফেলে দেয়। অনেকবার ডাকে ভোলা। কিন্তু সুচিত্রা সাড়া দেয় না। এক মুহূর্ত দেরি না করে কৃষ্ণকে ফোন করে। 'কৃষ্ণ এখুনি গাড়ি ঘুরিয়ে আনো। হসপিটাল যেতে হবে। মায়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।' ফোনটা রেখেই মায়ের হাত-পায়ের বাঁধন খোলে। নাড়ি টিপে দেখবে বলে সুচিত্রার ডানহাতটা তুলে ধরতে যায়। একটা চিরকুট। ভাঁজ খুলে দেখে সেখানে নীল কালিতে লেখা fuck you.

-বাস্টার্ড।

স্বয়ম্ভুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কথাটা।

হাসপাতালের সব ঝামেলা মিটিয়ে একটু বেলা করেই লালবাজারে ঢুকছে স্বয়ম্ভু। ঢোকার মুখেই ছুটে এল তপন। দাঁড়িয়ে পড়ল স্বয়ম্ভু আর শিবাঙ্গী। 'এ কী তপন! তুমি সুস্থ হয়ে গেছ?"

-হ্যাঁ স্যার। আজ থেকে জয়েন করছি।

-বাহ!

-বলছি স্যার, মাসিমার খবরটা শুনলাম। আমি তো ভাবতেই পারছি না।

-আমিও না।

-স্যার, আমাকে যদি কোনও কাজে লাগে প্লিজ বলবেন। আসলে স্যার, মাসিমা আমায় খুব ভালোবাসেন। আপনাকে আনতে গেলে আলাদা করে আমার জন্য খাবার দিয়ে যায় গাড়িতে। সবাই তো আমায় ড্রাইভারই ভাবে। কেবল মাসিমা ছাড়া। তাই বলছি স্যার, যদি কোনও কাজে লাগে....

-যদি নয় তপন। তোমাকেই লাগবে। আর আজ থেকে তুমি আমার ডিউটি করবে।

এক গাল হেসে সহজ মানুষটা কৃতজ্ঞতা জানাল। চলে যেতে গিয়েও ঘাড় ঘুরিয়ে তপনকে ডাকল, 'একটা হেল্প করবে?"

-হ্যাঁ স্যার বলুন না।

-সঙ্গে কাগজ পেন আছে?

-হ্যাঁ স্যার।

বলেই জামার পকেট থেকে একটা ছোট নোটবুক আর একটা পেন বের করল। ড্রাইভারদের কাছে এগুলো থাকেই। ফোন নম্বর লিখে রাখে। কখন মোবাইল যন্ত্রটি খারাপ হয়ে যায় বা চার্জ চলে যায় তখন ফোন নম্বর পেতে সাহায্য করে। স্বয়ম্ভু বলল, 'একটা নম্বর লেখো। ইংলিশে লিখবে। ডব্লিউ বি জিরো এইট এ নাইন থ্রি ফাইভ এইট। লিখেছ?'

-হ্যাঁ স্যার।

-এবার লেখো ফুলবাগান টু ফালাকাটা। এটাও ইংলিশে। এফ ডাবল ও এল বি এ জি এ এন। এইভাবেই বাকিটা লিখে কাগজটা ছিড়ে আমায় দাও। তপন চট করে পুরোটা লিখে কাগজটা ছিড়ে স্বয়ম্ভুকে দিল। স্বয়ম্ভূ একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর তপনকে শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে লেখাটা পকেটে পুরে লালবাড়িটার অন্দরে হাঁটা দিল।

দৃপ্ত পায়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে গিয়ে বেশ কয়েকজনকে হাঁক পাড়ল স্বয়ম্ভু। 'অভিনব...'

-ইয়েস স্যার।

-প্রাঞ্জল, রঞ্জিত, বিকাশ আর সোহম মানে আর্টিস্ট সোহম সবাইকে নিয়ে আমার কেবিনে এস। ফাস্ট।

-শিওর

স্যার।

ঘরের দিকে এগোতে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়তে হল স্বয়ম্ভুকে। উল্টোদিক থেকে হেঁটে আসছেন জয়েন্ট সিপি শুভঙ্কর কাঞ্জিলাল। স্বয়ম্ভু বলল, 'মর্নিং স্যার।'

-আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। এসব কী হচ্ছে? তোমার মাকে মারতে চাইছে খুনি?

-না স্যার। মারতে চাইলে মারতেই পারত। কিন্তু সেটা সে করেনি। আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছে। আর সেইজন্যেই মায়ের জন্য কষ্টের সঙ্গে ভেতর ভেতর একটা আনন্দও হচ্ছে।

শুভঙ্কর হতবাক! প্রশ্ন করার আগেই আনন্দের কারণটা বলল স্বয়ম্ভু নিজেই। 'আমার মনে ভীষণ সংশয় ছিল কাল সন্ধে পর্যন্ত। কিন্তু রাতে বাড়ি ফেরার পর বুঝতে পারলাম আমি একদম ঠিক রাস্তায় আছি। সেটা আততায়ীই কনফার্ম করে দিল।'

-বেস্ট অফ লাক, এ ছাড়া কিছুই বলার নেই।

-থ্যাংক ইউ স্যার।

-কিন্তু তোমার মা আছেন কেমন?

-কপালে চারটে স্টিচ পড়েছে। কারণ ওই পেস্টিংয়ে হবে না। ডিপলি ফেটেছে।

-কী দিয়ে মেরেছে?

-পেতলের ফুলদানি। জ্ঞান ফিরেছে। ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। প্রচণ্ড পেইন হচ্ছে।

-স্বাভাবিক। না না আর আটকাব না, তুমি কাজে যাও।

-ওকে স্যার।

নিজের কেবিনে আসতেই শিবাঙ্গী প্রশ্ন করল, 'একটা কথা তো আপনাকে জিজ্ঞেসই করা হয়নি। আততায়ী ঢুকল কীভাবে?"

-ছাদের দরজা দিয়ে।

-ভেঙে?

-উঁহু। আমার বীরাঙ্গনা মা ওটা খুলেই রাখেন। রাতে শোবার আগে বন্ধ করেন। আসলে অনেক সময়ে মা ছাদে পায়চারি করে সন্ধেবেলায়।

-কী অবস্থা। এই সময় জেঠিমার মোটেও দরজা খুলে রাখা ঠিক হয়নি।

-বহুবার বলেছি। বললেই লেকচার। স্বয়ম্ভু সেনের মায়ের গায়ে হাত দেবে এমন বান্দা জন্মেছে নাকি?

শিবাঙ্গী হেসে ফেলল। বলল, 'তবে স্যার আপনি আর আমি যা যা এভিডেন্স পেয়েছি বা পাস্ট হিস্ট্রি জেনেছি তার সঙ্গে কোত্থাও, কোত্থাও বেড়াল নেই। অথচ এই বেড়ালের ডাক আর ওই গান, আজ না ছোড়ুঙ্গা তুঝে দম দমাদম, এসবের তো কোনও লিঙ্কই নেই। এগুলো তাহলে কী? কেন?"

-স্যার আসব?

স্বয়ম্ভু যাঁদের ডেকেছিল তাঁরা সবাই হাজির।

-এসো। ছবি এঁকেছ সোহম?

কাঁধের ঝোলা থেকে দুখানা ছবি বের করতে করতে ঘাড় নাড়ল। 'এই যে স্যার।' ছবি দুটো দেখে স্বয়ম্ভু হাসল। শিবাঙ্গী উশখুশ করছিল দেখার জন্য। কিন্তু স্যার না দিলে তো আর দেখা যায় না। স্বয়ম্ভু ছবি দুটো দুহাতে ধরে আওড়াল, 'ওহে দয়াময়, নিশ্চিন্ত আশ্রয়, বুঝি ঘুচে যায়!'

-স্যার ওটা নিখিল আশ্রয়। তারপর এ ধরা পানে চাও।

শিবাঙ্গী শুধরে দিল। মুখের সামনে থেকে ছবি সরিয়ে স্বয়ম্ভু উত্তর দিল, ‘এটা স্বরচিত রবীন্দ্রসংগীত। নাও দেখো।' শিবাঙ্গী হাতে ছবি দুটো নিয়েই চমকে উঠল।

-বাওয়া! একেবারে মাধুরী দীক্ষিতের মতো ভুরু নাচালে তো। শিবাঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল স্বয়ম্ভু। এই লোকটা এইরকম পরিস্থিতিতেও কী করে যে রসিকতা করে কে জানে? শিবাঙ্গী এদিকে হাইপার, ‘স্যার এটা তো...।'

-ধৈর্যং রহু ধৈর্যং।

শিবাঙ্গীকে চুপ করিয়ে দিয়েই প্রাঞ্জলের দিকে ছুড়ে দিল প্রশ্ন, 'ভিডিয়োটা উদ্ধার করা গেছে প্রাঞ্জল?'

-দুবার করেছিলাম স্যার। কিন্তু চালানো যাচ্ছে না কিছুতেই। কোরাপ্ট করছে।

ঠোঁটদুটোকে চিপে চিন্তায় মগ্ন হল স্বয়ম্ভু। তাও বলল, 'যেভাবে হোক ভিডিয়োটা আমার চাই প্রাঞ্জল।'

-আমি আবারও ট্রাই করছি স্যার।

-বিকাশ তোমার জন্য আরেকটা কাজ আছে।

বলে একটা চিরকুট বাড়িয়ে দিল স্বয়ম্ভু। বিকাশ দেখেই বলল, 'এটা?' -আততায়ীর প্রেম নিবেদন, আমার প্রতি।

-এটা তো স্যার আগেরগুলোর মত নয়। আমি দেখছি। বাট আমি শিওর এ লোক আলাদা।

-কারেক্ট।

-কিন্তু কে?

-ধৈর্যং রহু ধৈর্যং।

এবার শিবাঙ্গী হালকা করে ঠেস দিল, 'স্যারকে কী আজ চণ্ডীদাসে পেয়েছে?'

-এটা গোকুলচন্দ্র। নট চণ্ডীদাস।

বাকিদের দিকে তাকিয়ে স্বয়ম্ভু বলল, 'অভিনব, আগামীকাল আমাদের মহাসংগ্রাম। মৃত্তিকা ও দীপায়ন চ্যাটার্জির মেয়ের অন্নপ্রাশন। আর সেখানেই আততায়ী খেলবে তার মোক্ষম খেলা।' কাল সকাল থেকে ওদের বাড়ি এবং ভাড়াবাড়ি মানে যেটা ওরা অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া করেছে সেটার ওপর নজর রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, শিবাঙ্গী, বিকেল হলেই আমরা কয়েকজন হাতে উপহার নিয়ে অতিথি হয়ে পৌঁছে যাব দীপায়নবাবুর বাড়ি। যেটা দীপায়ন, মৃত্তিকা কেউ জানবে না। একেবারে সারপ্রাইজ ভিজিট।'

-না স্যার। আমরা সেখানে কেউ যাব না।

স্বয়ম্ভু সমেত সবাইকে চমকে দিয়ে কথাটা বলে উঠল শিবাঙ্গী। স্বয়ম্ভুর মুখের ওপর 'না' আজ পর্যন্ত শিবাঙ্গী বলেনি কোনওদিন। কিন্তু আজ হল কী? স্বয়ম্ভু অবাক।

-মানে?

-বউদি, ঠাকুরের থালাবাসন, কোশাকুশি যা আছে সব তেঁতুল দিয়ে ভালো করে মেজে উপুড় করে রেখেছি। কাল সকালে এসে গুছিয়ে তুলে দেব কেমন?

মৃত্তিকা আগামিকালের জন্য শাড়ি-ব্লাউজ সব গুছিয়ে রাখছিল। সকালে জলসইতে যাওয়ার একখানা, দুপুরে মেয়েকে ভাত খাওয়াবার সময় একটা আর সন্ধেবেলা রিসেপশনের জন্য আরেকটা। গুনগুন করে গান গাইছিল কালকের আনন্দের কথা চিন্তা করে। তখনই দীপা এসে বলল কথাগুলো। “থ্যাংক ইউ দীপা। তুমি আজ অনেক বড় উপকার করলে গো।'

-ধুস, কী যে বলো। বাড়িতে এত বড় একটা কাজ।

-শোনো দীপা, কাল কিন্তু পারলে একটু তাড়াতাড়ি এসো।

-হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি সাতটার মধ্যে চলে আসব।

মৃত্তিকার মুখে হাসি। ‘যাবেও কিন্তু দেরিতে।' দীপা হেসে ঘাড় নাড়ল। ‘তুমি অত টেনশন কোরো না তো। সব হয়ে যাবে। আসি এখন।'

-এসো। ও দাদা কোথায় গো?

-ঘরে তো। ডেকরেটার্সের লিস্ট মেলাচ্ছে বোধহয়। ডেকে দেব?

-না না থাক।

দীপা চলে গেল। শাড়িগুলো ওয়্যারড্রবের একটা তাকে গুছিয়ে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলটা বেজে উঠল। আননোন নম্বর। কাজ করতে করতেই ফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলল মৃত্তিকা। ওপারে নীরবতা। সারাদিন আজ যা ফোন আসছে তাতে সকলের পাগল হবার জোগাড়। 'হ্যালো কে বলছেন? মৃত্তিকা আবার প্রশ্ন করল।

-ম্যাওওওও!

ওপার থেকে খুব মিহি গলায় একটা বেড়ালের কান্না। চমকে উঠল মৃত্তিকা। আবার 'ম্যাও'। এবার কান থেকে ঠকাস করে পড়ে গেল ফোনটা। কে কেঁপে উঠল। ফোনটা তখনও কাটেনি। ওপার থেকে হঠাৎ একটা গান। স্পিকার দিয়ে খুব অল্প হলেও মৃত্তিকার কানে ভেসে আসছে গানটা। সহ্য করতে পারছে না। এক ঝটকায় ফোনটা তুলে কেটে দিল। বিছানায় বসে পড়ল। বিভীষিকার স্মৃতি খুব চেষ্টা করেছিল ভুলে থাকবার। মৃত্তিকা ভেবেছিল অন্তত মেয়ের অন্নপ্রাশনে সব ভুলে খুব আনন্দ করবে। কিন্তু এই ফোনটা সেটা হতে দিল না। আবার ফোনে টকাস করে একটা পয়সা পড়ল। হোয়াটসঅ্যাপ এল। কাঁপা হাতে লক খুলে দেখল একটা অচেনা নম্বর থেকে ভিডিয়ো এসেছে। না না না, কিছুতেই না। ও আর কোনও ভিডিয়োতে ক্লিক করার সাহস পাচ্ছে না। চোখ ফেটে জল আসছে। মাথা ঘুরছে। আবার যদি সেই বীভৎস নারকীয় দৃশ্য সে দেখে তাহলে হার্ট ফেল করে মরেই যাবে। কিন্তু বেশিক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারল না মৃত্তিকা। পাশের দোলনায় শুয়ে মেয়েটা ঘুমোচ্ছে। তবু সে ভিডিয়োতে ক্লিক করল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল সেই গান, 'আজ না ছোড়ুঙ্গা তুঝে দমদমাদম।' বাঁহাতে মোবাইল ধরে ডানহাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল। এ কী! এই ভিডিয়ো কে করল? কীভাবে পেল? চোখ সরিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে মৃত্তিকার। কিন্তু পারছে না। বেড়ালটা কাঁদতে কাঁদতে আর্তনাদ করে উঠছে। কাঁপতে কাঁপতে হাত থেকে মোবাইলটা আবারও পড়ে যাচ্ছিল। মৃত্তিকা ফোনের ওপর কোনওরকমে একের পর এক ট্যাপ করে বন্ধ করে বিছানায় ফেলে দেয়। গা গুলিয়ে বমি উঠে এল মৃত্তিকার। দৌড়ে গেল বেসিনের দিকে। কল খোলার সময়ও পেল না। তার আগেই পেটের ভেতর থেকে গুলিয়ে উঠে এল। বমির আওয়াজ পেয়ে ছুটে এল দীপায়ন। 'কী হল মৃত্তিকা? এই...।'

ঘরে এসে হাপুস নয়নে কেঁদেই চলেছে মৃত্তিকা। পাশে দীপায়ন অধৈর্য। 'কী হয়েছে কী বলবে তো? কালকে বাড়িতে এত বড় একটা কাজ আর আজ তুমি এইভাবে কাঁদছ। বমি করছ! কেন?' পাল্টা ঝাঁঝ দেখাল মৃত্তিকা, 'তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ? সারাদিনে একটু সময় হয় না আমার পাশে থাকার! এত কাজ তোমার?"

-বোকার মত কথা বোলো না। ঘটা করে মেয়ের অন্নপ্রাশন হচ্ছে আর মেয়ের বাপ বউয়ের পাশে বসে বসে তার মুখ দেখবে সারাদিন? কাজগুলো কী ও পাড়ার রামধন এসে করে দেবে?

-হ্যাঁ কথা তো শোনাবেই আমাকে। তোমার তো ইচ্ছেই ছিল না লোকজন আসুক। আনন্দ হোক।

-বাজে কথা কেন বলছ বলো তো? কী হয়েছে সেটা তো বলবে!

-কিচ্ছু হয়নি।

ঝাঁঝের পরিমাণটা কমে এল মৃত্তিকার গলায়। 'কিচ্ছু যদি না হবে তাহলে কাঁদছ কেন?"

-আচ্ছা দীপায়ন, আমরা স্বয়ম্ভুবাবু, শিবাঙ্গী আর কিছু পুলিশকে নিমন্ত্রণ করতে পারি না? ওদেরকে বলতে পারি না যে কাল সকাল থেকে আমাদের যেন পুলিশী পাহারা দেওয়া হয়?

মুহূর্তে মুখ পালটে গেল দীপায়নের। মৃত্তিকার পাশ থেকে উঠে পড়ল। গম্ভীর গলায় বলল, 'না, এ হয় না।'

-কেন হয় না?

-ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর। আমরা কোনও সেলিব্রেটি নই যে ওরা আমাদের অনুষ্ঠানে পুলিশি পাহারা বসাবে।

-কোনও সাধারণ মানুষ বিপদে পরলে পুলিশ প্রোটেকশন চাইতে পারে না?

-বিপদ মানে? আবার নতুন করে কী হল?

-কিচ্ছু হয়নি?

-ওই তোমার বন্ধু খুন হল যে তার জন্য বলছ?

-কাল তো আমিও খুন হতে পারি দীপায়ন।

দীপায়ন এবার মৃত্তিকাকে জড়িয়ে ধরল। 'এসব কী আবোল তাবোল বলছ? তোমার মাথাটা কী পুরো গেল?'

-না দীপায়ন। আমার মনে ভীষণ কু ডাকছে। কাল কিছু একটা হবেই।

-তোমার মুণ্ডু। বাড়ি ভর্তি লোক। আত্মীয় স্বজন। তার ওপর পায়েল চক্রবর্তী আসছে গান গাইতে। নিশ্চয়ই তার বডিগার্ড-ফার্ড থাকবে। এর মধ্যে কে তোমার ক্ষতি করবে? আর কেনই বা করবে?

-তুমি প্লিজ ওদের আসতে বলো।

-না মৃত্তিকা। বাজে আবদার কোরো না। তাছাড়া তুমি তো মিশ্রঠাকুরকে দিয়ে বিপদভঞ্জন পুজো করালে। তাতেও এত ভয়? চলো, খেয়ে শুয়ে পড়ি। কাল ভোর-ভোর উঠে অনেক কাজ।

-আমার আজকাল খালি মনে হয় এই বাড়িতে আমরা ছাড়াও আরও কেউ আছে জানো? আমাদের ফলো করছে। কিন্তু আমরা তাকে দেখেও দেখতে পাচ্ছি না।

দীপায়নের বুকটা শুকিয়ে গেলেও মুখ ফুটল না।

৩১

এক জনে ছবি আঁকে এক মনে, ও মন
আরেক জনে বসে বসে রং মাখে, ও মন
ও আবার সেই ছবিখান নষ্ট করে
কোন জনা, কোন জনা,
তোমার ঘরে বসত করে কয় জনা মন জানো না
তোমার ঘরে বসত করে কয় জনা।

ভাড়াবাড়ি সংলগ্ন মাঠ। বর্ষাকাল তাই কাপড় আর ত্রিপল দিয়ে ভালো করে মাথাটা ঢাকা। তার মধ্যেই আলোর চাঁদোয়া। বেলুন দিয়ে সাজানো প্রবেশ তোরণে উল্টোনো আধখানা চাঁদের মতো স্টাইলে ইংলিশে লেখা রাইস সেরিমনি, তার নীচে নকশা করে লেখা দেবোত্তমা। ইতিউতি ছড়িয়ে আছে গোল টেবিল ও তার চারপাশে চারটে করে চেয়ার।

একটা দিকে নিয়ে ও ঘরেই তো খাওয়ালাম। ওদিকে কেউ যাচ্ছে না। তুমি যাও। একটু নিরিবিলিতে রেস্ট কর। দাদা এই জন্যে তোমায় খেতে বলে। রোগা হতে গিয়ে এবার শরীরটাই না খারাপ হয়।

-আমি যাচ্ছি।

দীপার কপালে চিন্তার ভাঁজ। সাজানো দোলনায় শোয়ানো মেয়েটা আপনমনে খেলা করছে। মৃত্তিকা যেতে যেতে একটু টলে গেল। কেউ দেখল না।

যাবার আগে দীপায়নের কাছে অনুমতি নিতে এলেন মিশ্রঠাকুর। দীপায়ন জিজ্ঞেস করল মৃত্তিকার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা। ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। উনি ওইদিকে আছেন। ওনাকে বলেছি। আচ্ছা আসি হ্যাঁ? অনেক রাত হল।'

-আসুন আসুন।

-ভালো থাকবেন।

সহাস্যে ঘাড় নেড়ে ভদ্রতা করে আবার অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দীপায়ন।

মেন রোড থেকে বেশ খানিকটা ঢুকে এই ভাড়াবাড়ি। রাস্তার মুখ থেকে টিমটিমে স্ট্রিট লাইট ছাড়া আলো নেই অনেকটা পথ। তারপর থেকে আলোয় সাজানো। এদিকে ভাড়াবাড়ি সংলগ্ন এত আলো যে স্ট্রিটলাইটের আলো ভরা পথটা তার তুলনায় বেশ অন্ধকার লাগছে। অতিথিদের গাড়িগুলো পরপর লাইন দিয়ে রাখা। বেশ কিছু গাড়ি চলে গেছে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। রাস্তার মোড়ের অন্ধকার ভেদ করে একটা সুইফট ডিজায়ার এসে দাঁড়াল সবকটা গাড়ির পিছনে। ঠিক অন্ধকারটা যেখানে শেষ হয়ে আলোর রাস্তা শুরু হয়েছে গাড়িটা ঠিক সেইখানে এসেই দাঁড়াল।

সবার অলক্ষ্যে হইহুল্লোড়ের বাইরে ভাড়া বাড়ির কোণের একটা ঘরে বিছানায় পড়ে আছে অচৈতন্য মৃত্তিকা। বিছানার পাশেই কালো পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে আগন্তুক। আরেকজন ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে দিয়ে দিল। তার গায়ে কালো বোরখা। কালো বোরখার আড়াল থেকে চটপট বেরিয়ে এল বড় সাদা বস্তা। পুরোটাই নাইলনের। আরেকজন কষে বেঁধে দিল মৃত্তিকার মুখ। বোরখা পরা মানুষটা মৃত্তিকার পা দুটো ধরে হাঁটু থেকে ভাঁজ করিয়ে পেটের কাছে নিয়ে গেল। মৃত্তিকা এখন একটা কুণ্ডলী পাকানো শরীর। আরেকজন তখুনি শরীরটার নীচ থেকে বড় বস্তাটাকে গলিয়ে দিতে চেষ্টা করল। বোরখা পরা মানুষটা সাহায্য করছে।

-এই দীপায়ন, ওয়াশরুমটা কোথায় রে?

-এই বারান্দায় ওঠ। সোজা ডানদিকে চলে যা। একদম কোণায় পাবি। লোকটি দীপায়নের সঙ্গেই কাজ করে। দীপায়ন নির্দেশিত পথেই এগিয়ে চলল সে।

ওদিকে কোণের ঘরেই চলছে মরণখেলার প্রস্তুতি। মৃত্তিকার অর্ধেক শরীর চেপেচুপে ঢুকিয়ে নিয়েছে প্রায়। ঠিক সেই সময়েই কোণের ঘরকে ওয়াশরুম ভেবে দরজা ঠেলতে যায়

লোকটি। শব্দ হয় দরজায়। ঘরের ভেতরের আগন্তুক দুজন থমকে যায়। বাইরের লোকটি দরজা খোলা না পেয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে ওয়াশরুম। চোখে পড়ে যায়। আরেকটু এগোতে হবে। লোকটা এগিয়ে যায়। জুতোর শব্দ সরে যেতে ঘরের ভেতরের কাজটা আরও হাত চালিয়ে হতে থাকে। একটা সময় মৃত্তিকার শরীরটা পুরোটাই বস্তার মধ্যে ঢুকে যায়। বাইরে দিয়ে আবার পায়ের শব্দ। থমকে গেল ঘরের ভেতরের সব কাজ। লোকটা ফোনে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। কথাগুলো দূরে হারিয়ে যেতেই পিছনের দরজা খুলে গেল। বস্তাসমেত শরীরটা বোরখার কাঁধে চেপে সুইফট ডিজায়ারের দিকে চলল। সকলের চোখের আড়ালে উঠে গেল গাড়ির মধ্যে। কালো পোশাক পরা লোকটি ড্রাইভারের সিটে বসে তৎক্ষণাৎ গাড়ি ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল।

-এই দীপায়ন কী ভালো খেলাম রে। ক্যাটারারের নম্বরটা দিস তো আমার ভাইয়ের বিয়েতে এদেরকেই বলব ভাবছি।

বেশ গদগদ হয়ে বললেন প্রফেসর শিউলি। দীপায়ন বলল নম্বরটা হোয়াটসঅ্যাপ করে দেব। আরেক কলিগ বলে উঠলেন, ‘এই তোর গিন্নি কই? যাবার আগে একবার দেখা করে যাই।'

-সে কী আর এখানে আছে। হাওয়ায় ভাসছে। সন্ধে থেকে সাজগোজের যা সুখ্যাতি করছে সবাই।

শিউলি অমনি পাশেরজনকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে রসিকতা করলেন 'দেখেছিস প্রবুদ্ধ, ঠারেঠোরে কেমন বউয়ের রূপের প্রশংসা করতে হয় শিখে নে।' দীপায়ন লজ্জা পেল, ‘তুৎ। আরে আমিও অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছি। এই দীপাআআআ...।' মেয়েকে কোলে নিয়ে ঘুরছিল দীপা। এগিয়ে এল দীপায়নের ডাকে। ‘হ্যাঁ দাদা বল।'

-তোমার বউদি কোথায় বলো তো?

-বউদির শরীরটা একটু খারাপ করেছিল।

-সে কি! কখন?

-না না। ভয় পাওয়ার মতো কিছু না। ওই মাইগ্রেন, যেমন হয়। আমি বললাম একটু ঘরে গিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকো।

সঙ্গে সঙ্গে কলিগরা বলে উঠলেন যে তাঁরা আর দেখা করবেন না। রেস্ট নিক। পরে আরেকদিন না হয় কথা হবে। দীপায়ন সৌজন্যের হাসি হেসে সকলকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এল৷ একবার মৃত্তিকার খবর নিয়ে আসা দরকার। বেচারির মনের ওপর দিয়ে যা চলছে তাতে মাথাব্যথা হওয়াটাই স্বাভাবিক। সবে পা বাড়িয়েছিল ভিতরের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে আবার কে যেন ডাকল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল শিল্পী পায়েল চক্রবর্তী। দৌড়ে সেদিকেই গেল দীপায়ন।

মুখের কাছটা এত ব্যথা করছে কেন বুঝতে পারছে না। মুখ দিয়ে শব্দ বেরিয়ে আসতে গিয়েও গালের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে গলার কাছে ফিরে যাচ্ছে। চোখটা টেনে খুলতে চেষ্টা করছে। হাত-পাগুলো কে যেন ধরে রেখেছে। ইচ্ছেমতো নাড়াতে পারছে না। ঝাপসা চোখেই দেখল মৃত্তিকা, সামনে এসে দাঁড়াল দুটো কালো অবয়ব। চোখ কচলে ঝাপসা ভাব কাটাতে চাইছে। কিন্তু পারছে না। বারবার মাথাটা ঝাঁকাচ্ছে। হঠাৎ চোখ বরাবর দুটো আঙুল এগিয়ে এসে কচলে দিল মৃত্তিকার চোখদুটো। এবার সব পরিষ্কার। মৃত্তিকা বুঝতে পারল তাকে আধো অন্ধকার একটা ঘরে বেঁধে রাখা হয়েছে। এমন একটা ঘর যেখানে আলো-বাতাসের চিহ্নমাত্র নেই। একটা ঝুল পড়া হলুদ আলোর বাল্ব জ্বলছে মিটমিট করে। একজনের মুখ বোরখায় ঢাকা। আরেকজনের মুখে মাস্ক। দুজনেরই কালো পোশাক। মাথা ঘুরিয়ে দেখতে চাইছে মৃত্তিকা, কোথায় এসে পড়েছে সে। মুখ দিয়ে বোবার মতো শব্দ করছে। লোকগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিচ্ছু বলছে না কেন? কারা এরা? হঠাৎ সেই গান, ‘আজ না ছোড়ুঙ্গা তুঝে দমদমাদম।' না কোনও মেয়ের রেকর্ডেড ভয়েজ নয়। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দামড়া লোকদুটো আবরণের আড়াল থেকে গাইছে। আতঙ্কে শিউরে উঠছে মৃত্তিকা। কিন্তু বড্ড

অসহায় সে। কিচ্ছু করার নেই। গান থেমে যায়। বোরখার আড়াল থেকে পুরুষকণ্ঠ বলে ওঠে, 'দারুণ খেয়েছি মৃত্তিকা মা। একেবারে কবজি ডুবিয়ে।' গলাটা চেনা। আজই সন্ধেল্লো এই গলাটাই কবজি ডুবিয়ে খাবার কথা বলেছিল মৃত্তিকাকে। বিস্ফারিত হয়ে গেল মৃত্তিকার চোখ। এ কী শুনছে সে! সেই গলাটাই আবার বলল, 'কিন্তু আমার খিদেটা একটু বেশি জানো তো মা। বারবার খিদে পায়। সঙ্গে আবার আমার ভাগ্নেটাও আছে। তারও খিদে। জন্মের খিদে।' মৃত্তিকা মাথা ঝাঁকাচ্ছে দুপাশে। পা ঝটকাচ্ছে। 'লাভ নেই মা। যত ছটফট করবে তত ব্যথা লাগবে। অরুণা আর দিয়াও এইরকম ছটফট করেছিল। বাঁচতে চেয়েছিল। তোমার মতোই মুখ দিয়ে উঁ উঁ শব্দ বের করেছিল। কথা বলতে পারেনি বেচারিরা। অবলা তো। তাই বেড়ালের মতো উঁ উঁ মিউ মিউ করে ডেকেছিল। কিন্তু আমরা বুঝতেই পারিনি তখন যে ওরা বাঁচতে চায়। ঠিক যেমন তোমরা বোঝোনি আমার আলোক বাঁচতে চেয়েছিল। কতবার পালাতে চেয়েছিল। তোমরা তাকে ধরে বেঁধে পিঠের ওপর লাফিয়ে পিষে চটকে মেরে ফেলেছিলে। মনে পড়ে মা?' মৃত্তিকা হাউহাউ করে কাঁদছে। শরীরটাকে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁকাচ্ছে। কিন্তু দড়ির বাঁধন তো খুলছেই না। বরং আরও কষে গিঁট পাকিয়ে যাচ্ছে।

-তোমরা যেভাবে মেরেছিলে আলোককে। আমিও ঠিক সেইভাবে মেরেছি অরুণা আর দিয়াকে। সুস্মিতার কপাল ভালো। ওদের মতো অত কষ্ট সে পায়নি কারণ তাকে অজ্ঞান করতে হয়েছিল। আর এই যে বেচারি ভাগ্নে আমার, তার দিদিকে তোমরাই মরতে পাঠিয়েছিলে তাই না?

মাস্কটা খুলে ফেলে ত্রিদিব ওরফে তিরু ওরফে শ্রীকুমার। কিন্তু মৃত্তিকা খুব একটা বুঝতে পারে না। তাই দেখেও চিনতে পারল না।

উনি সেদিন অসুস্থ ছিলেন। আমাকে দেখেননি। তাই চিনতে পারছেন না। মামা, আর দেরি কেন? কাজটা সেরে ফেলি। শ্রীকুমার বলল কথাগুলো।

-সেই ভালো। তুই কী আজকেও ড্রাম পেটাবি নাকি?

-না মামা! শেষ ভোজটা কীভাবে রাঁধো আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই। বাকিগুলোয় তো ড্রাম পিটিয়ে হাত ব্যথা করে ফেলেছি। আজ একটু দেখিই না হয়।

-সেই ভালো। সেই ভালো।

-আজ আর স্ট্যান্ডে রেখে ভিডিয়োও করব না। আমি নিজে করব। নিজের চোখে দেখব মৃত্তিকার তিলে তিলে তড়পে তড়পে মরাটা। আমি যত একে মরতে দেখব তত আমার দিদিটা শান্তি পাবে।

মিশ্রঠাকুর মুখের আড়াল সরিয়ে ফেলেন। ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে যান। স্টিলেটো দুটো পায়ে গলিয়ে নেন। আরেক জোড়া ভাঙা স্টিলেটো পাশে পড়ে আছে। গায়ে তার রক্ত শুকিয়ে লেগে আছে। পাশেই রাখা বড় ধারালো জাঁতির মতো লোহার যন্ত্রটা হাতে তুলে নেন। স্টিলেটোতে খটখট করে শব্দ তুলে এগিয়ে আসেন মৃত্তিকার সামনে। মৃত্তিকা প্রাণপনে চিৎকার করতে চায়। কিন্তু পারে না। মুখ দিয়ে শুধু তীক্ষ্ণ সরু স্বরে আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে থাকে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। মিশ্রঠাকুর মৃত্তিকার মুখের সামনে জাঁতিটা দুহাতে খুলে ধরে। পরক্ষণেই ঝট করে বন্ধ করতেই ধাতব শব্দ হয়। তিরু মোবাইল হাতে তৈরি। মৃত্তিকা দেখতে পায় ওর শরীরের ঠিক ওপরেই দুটো লোহার শিকলের সঙ্গে গোল রিংয়ের মত কব্জা ঝুলছে।

দিয়ার খুনের ভিডিয়ো সে দেখেছে। তাই আন্দাজ করতে পারছে মিশ্রঠাকুর এখন ওই কব্জা ধরে তার শরীরের ওপর ঝুলে স্টিলেটো পড়ে লাফাবেন।

-কী করি বল তো তিরু? আগে কী পায়ের আঙুলগুলো ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে কেটে ফেলব?

মৃত্তিকা দুপাশে মাথা ঝাঁকিয়ে না বলতে থাকে। মিশ্র বলেন, 'ম্যাডাম কী না বলছেন? বেশ তাহলে বুকের কয়েকটা হাড় আর পেটের চামড়াটা ফুটো করে দিয়ে আঙুলগুলো কাটব না হয়। তারপর বাকিটা সেরে ফেলতে বেশি সময় লাগবে না। যতই হোক, বলির পাঁঠার শেষ

ইচ্ছেটা তো মানতেই হবে।' মৃত্তিকা আবারও গলা চিরে শব্দ করে ওঠে। মিশ্রঠাকুর জাঁতিটা মাটিতে নামিয়ে রাখেন। মৃত্তিকার পেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। স্টিলেটোতে শব্দ হয় খটখটখট। ওপর থেকে নেমে আসা সিঁড়ির নীচে ঝুলতে থাকা লোহার রিং দুটোকে শক্ত মুঠোয় ধরেন মিশ্রঠাকুর। তাঁর মুখে হাসি। চোখে কামারশালার আগুনের ফুলকি। মৃত্তিকা জীবনের শেষ শক্তি দিয়ে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে।

-জয় গ্রহরাআআআআজ।

বলে সবেমাত্র হাতের মুঠোয় চাপ দিয়ে শরীরটাকে শূন্যে ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন মিশ্রঠাকুর। আঘাত হানার আগেই একটা ফাঁকা গুলির শব্দ হুড়মুড় করে কতগুলো লোক নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। তিরুর হাত থেকে পড়ে গেল মোবাইল।

-খেল খতম মিশ্রঠাকুর। চুপচাপ চলে আসুন।

স্বয়ম্ভুর হাতের রিভলবার তাক করা মিশ্রর দিকে। শিবাঙ্গীর হাতেরটার লক্ষ্য তিরু। মাটির তলার ঘরে নেমে এসেছে স্বয়ম্ভু, শিবাঙ্গী, অভিনব ও আরও চারজন পুলিশ।

-সরে আসুন মৃত্তিকার কাছ থেকে।

ধমক দিল স্বয়ম্ভু। মিশ্র বিস্ফারিত চোখ দুটোকে নামিয়ে নিলেন মাটিতে। ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন। স্বয়ম্ভুর হুকুমে তিনজন পুলিশ মৃত্তিকাকে বাঁধনমুক্ত করতে ব্যস্ত হয়ে গেল।

-তাহলে মিশ্রঠাকুর নাকি দয়াময় সান্যাল, লাটাগুড়ি পুলিশ স্টেশনের কনস্টেবল! ওদিকে মূর্তিমান ত্রিদিব মণ্ডল ওরফে তিরু ওরফে শ্রীকুমার মণ্ডল। ভালোই খেলার ভেনুটা বেছেছেন। একদম থ্রিলার সিনেমার মত। এতদিন আপনারা শুট করেছেন। ভিডিয়ো বানিয়েছেন। ভেট পাঠিয়েছেন। আমার মাকেও রেহাই দেননি। আজকের ফাইনাল শুটিংটা আমরা করেছি। ওই দেখুন।

স্বয়ম্ভূ ওপরের দিকে আঙুল দেখাল। সবাই ঘাড় তুলে দেখল মাথার ওপর ছোট্ট একটা ক্যামেরা লাগানো।

-পালাবার পথ নাই। এতদিন তো আপনি গ্রহরাজের পুজো করলেন ঠাকুরমশাই। শনিঠাকুর কীসের দেবতা সেটা নিশ্চয়ই জানেন? সত্যের দেবতা। ন্যায়ের দেবতা। এবার চলুন, আমরা আপনার পুজো করি। এই নিয়ে যাও এদের। দেখো, কষ্ট যেন না পায়।

অনুষ্ঠানবাড়িতে এতক্ষণে তুলকালাম শুরু হয়ে গেছে। মৃত্তিকাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দীপায়নের পাগল-পাগল অবস্থা। মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে দীপার কোলে। সবাই টেনশন করছে। এত রাতে যে কজন আত্মীয় রয়েছেন তাঁরা সকলেই সমস্বরে মত দিয়েছেন থানায় যাবার জন্য। দীপায়ন প্রথমেই থানায় যেতে রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু সকলের চাপে রাজি হতে বাধ্য হয়। ঠিক তখনই বাইরে থেকে একজন এসে খবর দেয় পুলিশ আসছে এখানে। সবাই হতভম্ব। স্বয়ম্ভু সেন সমেত সকলেই ঢুকে এলেন। পুলিশের লোক রীতিমতো ঘাড় ধরে সকলের সামনে নিয়ে এলেন মিশ্রঠাকুর ও তিরুকে। দীপা চমকে উঠল। এপাশ ওপাশ চোখ চালিয়ে সে মৃত্তিকাকে খুঁজতে লাগল। স্বয়ম্ভু সোজা স্টেজে রাখা মাইক হাতে তুলে নিল। ‘সবাইকে একটা অনুরোধ যে সকল আত্মীয় স্বজনদের খাওয়া হয়ে গেছে তাঁরা প্লিজ আজকের মত চলে যান। আর যাঁরা যাঁরা এখনও খাননি বা খাচ্ছেন তাঁরা শান্তিতে খেয়ে প্লিজ এই জায়গাটা খালি করে দিন। দীপায়নবাবু এরকম কী কেউ বাকি আছেন?'

-না না। সবাই মোটামুটি চলে গেছেন। এখন শুধু আমরা বাড়ির লোকেরাই...

-বাহ! খুব ভালো। তাহলে প্লিজ এই জায়গাটা খালি করে দিন।

দীপা এগিয়ে এসে দীপায়নকে বলল, 'দাদা আমি দেবীকে নিয়ে ঘরে যাচ্ছি।' দীপায়ন সম্মতি দিলেও কড়া হুকুম ভেসে এল মাইকে। ‘না দীপা। আপনি এখানেই থাকবেন।' দীপার মুখটা শুকিয়ে গেল। অসহায় চোখে দীপায়নের দিকে তাকাল। দীপায়ন বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'মৃত্তিকা কোথায় স্বয়ম্ভুবাবু?’'

-ওই তো।

দেখা গেল শিবাঙ্গী মৃত্তিকাকে নিয়ে ঢুকছে। ঠিক মত হাঁটতে পারছে না। দীপায়ন ছুটে যায়। 'মৃত্তিকা কী হয়েছে তোমার? কোথায় ছিলে তুমি?'' আবারও মাইকে উত্তর আসে, 'ওনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল দীপায়নবাবু।' দীপায়ন চমকে ওঠে। 'মানে? এসব কী বলছেন?'

-ওই যে দেখুন দুজন মূর্তিমান দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাদের পেয়ারের মিশ্রঠাকুর আর তার নকল ভাগ্নে তিরু।

মিশ্রঠাকুরকে দেখে দীপায়ন আকাশ থেকে পড়ল। তিরুকে বেশ চেনা লাগল। স্বয়ম্ভু মাইক ছেড়ে মাঠে সবার মধ্যে নেমে এল। 'আশা করি আত্মীয় স্বজন সবাই চলে গেছেন!' দীপায়ন চারপাশ তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

-ব্যস। তার মানে এবার শুরু করতে পারি। এই শিবাঙ্গী, প্রিয়াংশু, তর্পণা আর মীনাক্ষীকে এখানে নিয়ে এস। আর কাউকে নয় কিন্তু। বাকিদের কড়া পুলিশি প্রহরায় রাখবে।

-ওকে স্যার।

শিবাঙ্গী তৎপরতা দেখিয়ে তিনজনকে সবার মাঝে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রিয়াংশুর মুখে অজস্র প্রশ্ন থাকলেও সে চুপ। তড়পে উঠলেন তর্পণা, 'এইভাবে একজন মহিলাকে রাতে তুলে আনা যায় না স্বয়ম্ভুবাবু।'

-তুলে তো আনিনি। গাড়ি করে সসম্মানে নিয়ে এসেছি এখানে। আপনি নাইট শোয়ে সিনেমা দেখতে যাননি কোনওদিন? কী হলো গেছেন?

তর্পণা রাগত চোখে কড়া গলায় বললেন, 'না।' স্বয়ম্ভুর মুখে হাসি। 'ওই জন্যেই তো নিয়ে এলাম। আজ নাইট শোয়ে সিনেমা দেখব আমরা সবাই।'

-রাত এগারোটা বেজে গেছে। এখন রসিকতা করছেন?

-শাট আপ। অনেক বলেছেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন।

স্বয়ম্ভু তার কমনীয় মূর্তিটা মুহূর্তে পালটে ফেলল। হাটের মাঝে ঝাড় খেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তর্পণা। মীনাক্ষীর মুখ চুন হয়ে গেছে। 'স্যার, আমি কী করলাম যে আমায় এভাবে ধরে নিয়ে আসা হল?' খুব নরম স্বরেই কথাটা জিজ্ঞেস করল মীনাক্ষী। স্বয়ম্ভুও নরম সুরে জবাব দিল, 'একটু অপেক্ষা করুন। আপনাকে নিয়ে আসার কারণ নিশ্চয়ই জানতে পারবেন।' বলেই গলা তুলল স্বয়ম্ভু, 'ইলেক্ট্রিশিয়ান কে আছেন ভাই, ওই বড় স্ক্রিনটা একটু এগিয়ে নিয়ে আসুন তো।' বলার সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে গেল। মঞ্চ প্রস্তুত। দর্শকও উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে কিম্বা বসে আছে। এবার জমজমাট একটা থ্রিলিং নাটকের আখ্যান শুরু হবে। .,

-রবিঠাকুরের একটা গান আছে। গানটির সুর পাওয়া যায় না। এখন অবশ্য এক শিল্পী তাতে সুর করেছেন বলে শুনেছি। গানটি হল, 'ঝাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা কাউকে বলিনি, কোন দেশে যে চলে গেছে সে চঞ্চলিনী।' স্বয়ম্ভুর মুখে কথাগুলো শুনে তিরু চোখ তুলে তাকায়। চেনা মানুষটার সঙ্গে বড্ড মিল যে গানটার। স্বয়ম্ভু পরের চরণগুলো বলতে থাকে, 'সঙ্গী ছিল কুকুর কালু, বেশ ছিল তার আলুথালু / আপনা-‘পরে অনাদরে ধুলায় মলিনী। হুটোপাটি ঝগড়াঝাঁটি ছিল নিষ্কারণেই, দীঘির জলে গাছের ডালে গতি ক্ষণে ক্ষণেই। পাগলামি তার কানায় কানায় খেয়াল দিয়ে খেলা বানায়, উচ্চহাসে কলভাষে কল-কলিনী। রবিঠাকুরের এই গানটার সঙ্গে কী ভয়ানক মিল আমার গল্পের মেয়েটার। মেয়েটার নাম শ্রীদেবী মণ্ডল।' মৃত্তিকা লজ্জায় মুখ নামিয়ে নেয়। পাশেই বসে দীপায়ন। মৃত্তিকাকে দুহাতে ধরে আছে।

-মেদিনীপুরের গ্রামের একটা সাধারণ মেয়ে শ্রীদেবী। ছোট থেকেই সে ভীষণ চঞ্চল। প্রাণখুলে হাসে। কারণে কিংবা অকারণে।

প্রিয়াংশু মুখে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বয়ম্ভু সবার মাঝে নিজের মতো হাঁটছে আর বলছে। ‘শ্রীদেবীর মা তাকে মুখ ঝামটা দিত। সেটা কতকটা ভালোবেসেই। কিন্তু তার মধ্যেও তার মাথায় কাকের বাসার মত ঝাঁকড়া চুল, গায়ের রং চাপা, বাচালের মত হাসি এই নিয়ে খোঁটাও লুকিয়ে থাকত। সারা পাড়ার লোক মেয়েটাকে ঝাঁকড়া পাগলি বলে ডাকত। ওর একটা পাড়াতুতো ঠাকুমা ছিল। তার সঙ্গে সম্পর্কটা অনেকটা ওই কাঁচা মিঠে আমকে যখন তেল নুন মরিচ দিয়ে মাখা হয় তখন তার যেমন স্বাদ হয় সেরকম। শ্রীদেবীর মরা পৃথিবীতে একমাত্র ওই মানুষটাই ওর প্রাণবায়ু। ওর বন্ধু। শ্রীদেবীর এক ভাই ছিল। বছর তিনেকের ছোট। নাম শ্রীকুমার। দিদিকে খুব ভালোবাসত। আরেকজন ছিল। ওদের পাড়াতেই থাকত। যার নাম তপা। শ্রীদেবীর চেয়ে বয়সে বড়। পড়াশুনোতেও বেশ ভালো। তাই তার ওপরেই ভার ছিল এই ঝাঁকড়া পাগলিকে পড়াবার। কিন্তু ছেলেটি মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলে। অনেকবার ঠারেঠোরে বলতে চায়। কিন্তু শ্রীদেবী এতটাই সরল যে ভালোবাসার কথা সে বোঝেই না। মেয়েটি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর শহরে চলে আসে পড়বার জন্য। কারণ ওর মা কেবলই বলত অমুকের ছেলে বাইরে গেল, তমুকের মেয়ে কোলকাতা গেল পড়তে। তোর কিসসু হবে না। এটা ভালো লাগত না মেয়েটার। জেদ চেপে গেল। ও শহরে গিয়েই পড়বে। হিস্ট্রি অনার্স নিয়ে ভর্তি হল কলেজে। একা থাকতে শুরু করল একটা বাড়িতে। ভাড়ার অনেকটাই দিত তপা। কারণ শ্রীদেবীদের অবস্থা ভালো ছিল না। সে তুলনায় তপাদের অবস্থা বেশ ভালো। তপা টিউশন পড়িয়ে শ্রীদেবীর বাড়ি ভাড়া দিত। ওই যে বললাম, ভালোবাসত। কিন্তু কলেজে পাঁচটি বিচ্ছু ছেলেমেয়ের নজরে পড়ল গাঁয়ের এই ঝাঁকড়া পাগলি।'

মৃত্তিকা ডুকরে ওঠে। দীপায়ন অবাক হয়ে তাকায় স্ত্রীর দিকে। কিছুই বুঝতে পারে না। স্বয়ম্ভু কলেজের গোটা ঘটনাটাই বর্ণনা করে নাম উল্লেখ না করে। শেষে বলে, ‘অপমানিত, লজ্জিত হয়ে মেয়েটি স্বেচ্ছায় নির্বাসন নেয় ।

কিন্তু ছোট ভাইটির চোখে সেদিনই প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। বাড়িতে ফেরার পর গাঁয়ের লোকের হাজারটা প্রশ্ন, কুৎসা প্রতিদিন ছিঁড়েখুঁড়ে খেতে থাকে মেয়েটাকে। সরযু ঠাকুমা বুদ্ধি দেয় নীলিমাকে। বলেন, গ্রামে রটিয়ে দাও শ্রীদেবী শহরের একটি ছেলেকে বিয়ে করে মন্দিরে গিয়ে। তারপর সেই ছেলেটি শ্রীদেবীকে ঠকিয়ে ভেগে যায়। এই সন্তান তারই। অন্তত কুমারী মায়ের অপমানের হাত থেকে তো রেহাই পাওয়া যাবে। তাতেও বিশেষ ফল হয় না। গর্ভবতী অবস্থাতেই মেয়েটি পাগল হয়ে যায়। শ্রীকুমার আর তপা পরিচিত একটা মেন্টাল অ্যাসাইলামে রেখে আসে শ্রীদেবীকে। মেয়েটি সেখানেই একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। মেয়েটি বুঝতেও পারে না সে মা হয়েছে। শ্রীকুমার আর তপা দুজনে মিলে বাচ্চাটিকে একটি অনাথ আশ্রমে রেখে আসে। তার কিছুদিন পরে শ্রীদেবী গলায় দড়ি দেয়।'

অনেকক্ষণ কান্নাটা চেপে ছিল তিরু। কিন্তু পারে না। চোখে হাত চাপা দিয়ে কেঁদে ফেলে

সবার সামনেই। স্বাভাবিকভাবেই সকলের নজর পড়ে তার দিকে। স্বয়ম্ভু তিরুর দিকে চেয়ে বলে ওঠে, 'আমরা যাকে মিশ্রঠাকুরের ভাগ্নে বলে চিনি সেই ত্রিদিব মণ্ডলই হল শ্রীদেবীর ভাই শ্রীকুমার ওরফে তিরু। আর যে পাঁচজনের জন্য একটা সরল মেয়েকে মরতে হয় সেই পাঁচজন হল, অরুণা, দিয়া, সুস্মিতা, মৃত্তিকা আর প্রিয়াংশু।' দীপায়নের দুটো হাত মৃত্তিকার কাঁধ থেকে ধীরে ধীরে সরে যায়। মৃত্তিকা দীপায়নের দিকে তাকায়। চোখ ভর্তি জল। দীপায়ন উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বাঁধভাঙা কান্না যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে মৃত্তিকার বক্ষবিদীর্ণ করে। স্বয়ম্ভু কিছুক্ষণের বিরতির পর বলে, 'আর সেই ছেলেটা, যার জন্য শ্রীদেবীর গর্ভে সন্তান এসেছিল। তার নাম প্রিয়াংশু। শ্রীদেবীর সন্তানের বাবা। যদিও প্রিয়াংশুর বয়ান অনুযায়ী উনি জানেন না মেয়েটা তার বেঁচে আছে না মরে গেছে। তাই তো প্রিয়াংশুবাবু?' এতক্ষণ মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রিয়াংশু। স্বয়ম্ভুর প্রশ্নের উত্তর দিতে মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নেয়। কিন্তু নীরব থাকে। স্বয়ম্ভু হাসে। ‘এরপর এই গল্পটার প্রথমার্ধের শেষ অংশটায় আসি। যেটা আমি নয়। নিজের মুখে বলবে শ্রীকুমার। কী তিরুভাই, আর তো লুকোবার কোনও জায়গা নেই বুঝতেই পারছ। এবার বাকিটা অন্তত তুমি বলো।

চোখের জল মুছে বলতে শুরু করল তিরু, ‘দিদিকে দাহ করার পর শ্মশানে বসেই তপাদা আমায় বলে এর প্রতিশোধ নেবার কথা। আমি এক কথায় রাজি হয়ে যাই। কিন্তু আমরা দুজনেই বুঝতে পারি না ঠিক কীভাবে প্রতিশোধ নেব। তপাদাই বলে আমায়, ওই চারটে মেয়ে আর প্রিয়াংশুর

ওপর আমাদের নজর রাখতে হবে। আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতেও হবে। নজর রাখার দায়িত্বটা আমি নিলাম। তপাদা এমনিতেই পড়াশুনায় ভালো ছিল। তাই ও লেখাপড়া চালিয়ে গেল। আমি পড়াশুনো ছাড়লাম। দিদির কাছ থেকে কয়েকজনের ঠিকানা আমি জেনেছিলাম। বাকিদেরটা জোগাড় করতে অসুবিধে হল না। আমি কোলকাতায় শিফট করলাম। তপাদার মায়ের নামে সুরি-লেনের বাড়ি। সেখানেই থাকতে শুরু করলাম। দোকানে কাজ করতাম। মাঝেমধ্যে লুকিয়ে যাঁদের বাড়ি চিনতাম তাদের বাড়ির সামনে লক্ষ্য রাখতে শুরু করলাম। এই চারটে মেয়ের একে অপরের বাড়িতে যাতায়াত ছিলই। তাই যাদের বাড়ির ঠিকানা জানতাম না তাদের ফলো করে আমি চিনে নিয়েছিলাম সব। পাড়ার দোকানগুলোতে মাঝেমধ্যেই জিনিস কিনতে যেতাম। যাতে পরিচয় জমে ওঠে। গল্প করা যায়৷ নইলে ওদের খবর পাব না। ওদিকে তপাদা লেখাপড়া করতে শুরু করল পুলিশে চাকরি করবে বলে।'

-মানে তুমি খোচরের ট্রেনিং নিতে শুরু করলে আর ও নিজে পুলিশ হবার জন্য উঠেপড়ে লাগল? বেশ। তারপর?

গল্পের মাঝে সোজাসাপ্টাভাবে একটা লাইন যোগ করে দিল স্বয়ম্ভু।

-এরপর হঠাৎ করেই একটা সুযোগ হাতে এসে যায়।

বলতে শুরু করল শ্রীকুমার, ‘খবর পাই অরুণা, দিয়া, সুস্মিতা আর মৃত্তিকা ডুয়ার্স বেড়াতে যাচ্ছে। তপাদাকে জানাই। তপাদা সঙ্গে সঙ্গে আমার টিকিট কেটে দেয়। ওদের পৌঁছোবার আগেই আমি পৌঁছে একটা হোটেলে উঠি। একদিন বাদে ওরা আসে। ওরা কোন হোটেলে উঠেছে সেটা জানতাম না। ওরা যখন গিয়েছিল তখন সবে সিজন শুরু হচ্ছে। খুব বেশি ভিড় ছিল না। তাই ওদের চারজনের খোঁজ পেতে অসুবিধে হল না।'

-কীভাবে পেলে? হোটেলে হোটেলে খোঁজ করলে?

-না। তাহলে ওরা জেনে যেত। ওরা ডুয়ার্স যখন গেছে তখন জঙ্গল ট্রেইল করবেই। আর তার জন্য ওদের লাটাগুড়ি টিকিট কাউন্টারে আসতেই হবে। ঠিক তাই হল। ওরা এল। ওদের ড্রাইভারের কাছ থেকে গল্প করে জেনে নিলাম ওরা কোথায় উঠেছে? আমিও চট করে আমার হোটেল বদলে নিলাম৷

-আর ঠিক সেইখানেই, সেই হোটেলেই রান্নার কাজ করত রামাইয়া। স্বয়ম্ভুর কথায় চমকে উঠল মিশ্রঠাকুর। কতদিন বাদে নামটা কানে এল তার।

-কী মিশ্রঠাকুর? নামটা খুব চেনা, কাছের মনে হল না?

মিশ্র চুপ। 'ক্যারি অন শ্রীকুমার।' স্বয়ম্ভু বলল।

সদ্য পড়া শীতের উষ্ণীষ গায়ে জড়িয়ে সন্ধে নেমেছিল জঙ্গলের রাজত্বে। বাইরে সমবেত ঝিঁঝিঁর ডাক। ঘরে সন্ধের চা আর পকোড়া দিয়ে গেছে। হোটেলের ঘরে পায়চারি করছে আর মোবাইলে কথা বলছে শ্রীকুমার। 'ইচ্ছে করছে আজ রাতেই চারটেকে একদম শেষ করে দিই। তুমি যে কেন প্রিয়াংশুকে ছেড়ে রেখেছ জানি না। সবার আগে তো ওই জানোয়ারটাকে মারা উচিত। তারপর এই মেয়েগুলো।' কথাটা শেষ করতে না করতেই বাইরে থেকে একটা হইচইয়ের শব্দ ভেসে এল। একটা মেয়ে চিৎকার করছে।

-তপাদা এখন রাখছি। বাইরে কীসের যেন ঝামেলা হচ্ছে।

ফোনটা কেটে দরজা খুলল শ্রীকুমার। গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিল দিয়া আর অরুণা মাতাল অবস্থায় বেরিয়ে এসে বাওয়াল করছে। কথা শুনে মনে হল কোনও একটা বেড়াল ওদের দামী মদের বোতল ভেঙে দিয়েছে। হোটেলের ম্যানেজার হাত-পা নেড়ে অনেক কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। ওদের শান্ত করার চেষ্টা করছে। দিয়া আর অরুণা সেই এঁড়ে তর্ক করেই যাচ্ছে। শেষে ম্যানেজার গলা তুলল। বেশ রেগেই ডাকল, ‘এ রামাইয়া, রামাইয়া। বাহার আ।' তড়বড় করতে করতে বেরিয়ে এল এক বিহারী মহিলা। ম্যানেজার ধমকাল। ‘নিজের বেড়ালকে সামলে রাখতে পারিস না যখন পুষিস কেন? টুরিস্টদের কত ক্ষতি করে দিয়েছে। এবার ক্ষতিপুরণ দেবে কে?' মহিলাটি মাথায় ঘোমটা টেনে অসহায় মুখে দৌড়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে একটা বেড়াল বাচ্চা হাতে করে নিয়ে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অরুণা হুমকি দিল ম্যানেজারকে, ‘আর একবার যদি বেড়ালটাকে এখানে দেখি না শেষ করে দেব একেবারে।' নেশার চোটে টলে পড়েই যাচ্ছিল অরুণা। ম্যানেজার হাত দিয়ে সামলে নিল।

পরেরদিন রাত। সামনের ফাঁকা রাস্তাটায় একটু হাঁটতে বেরিয়েছিল শ্রীকুমার। ঠাণ্ডাটা প্রতিদিন বেশ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। জ্যাকেটের হুডিটা মাথায় দিয়ে ঘরে ফিরছিল। হঠাৎ একটা গান শুনতে পায় সে। দাঁড়িয়ে পড়ে। নিজের ঘর টপকে ভিতর দিকে ঢুকে যায়। অরুণাদের কটেজ থেকেই গানের আওয়াজ আসছে। ‘আজ না ছোড়ুঙ্গা তুঝে দমদমাদম' গানটা গেয়েই চলেছে। কখনও একজন। কখনও সবাই মিলে। সঙ্গে একটা বেড়ালের গলার আওয়াজ। সন্দেহ হয় শ্রীকুমারের। চারবন্ধুর উল্লাস দেখলেই ওর শিরায় আগুন ছোটে। জানলাটা ভেজানোই ছিল। অল্প একটু ফাঁক করতেই চমকে ওঠে শ্রীকুমার। পকেট থেকে তৎক্ষণাৎ মোবাইলটা বের করে ভিডিয়ো রেকর্ডিং করতে থাকে। দেখতে দেখতে কান গরম হয়ে ওঠে। হাতও কাঁপতে থাকে। বেড়ালের আওয়াজটা বন্ধ হলে শ্রীকুমারও মোবাইলটা বন্ধ করে দৌড়ে নিজের ঘরে চলে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। কিছুক্ষণ চুপ করে বিছানায় বসে রাগে দুঃখে ফুলতে থাকে। অবশেষে কেঁদে ফেলে।



সেদিন রাতে ঘুমোয় না শ্রীকুমার। ঘুম আসে না তার। ভোরের দিকে একটা ডাক শুনতে পায় সে। ‘আলোওওওওক, এ আলোওওওক। কাঁহা গয়ে রে? আজা বেটা। আলোওওওওক!' ঘর থেকে বেরিয়ে উঁকি দিল শ্রীকুমার। দেখল চোখ কচলাতে কচলাতে গ্রিন জাঙ্গল রিসর্টের ম্যানেজার বেরিয়ে এল। ভুরুর মাঝে এক রাশ বিরক্তি। গায়ের চাদরটা এক ঝাপটায় ডান কাঁধে ছুড়ে গলা তুলল, ‘আরে এ রামাইয়া! পাগল হয়ে গেলি নাকি? অভি ভি ট্যুরিস্ট লোগ সো রহে হ্যায় অউর তু...'। কথা শেষ করতে না দিয়েই বিহারী বউটা বলে উঠল, 'দেখো না সুখেনদা, কাল শাম সে আলোক ঘর মে নেহি আয়ে। কব সে ঢুন্ড রাহা হুঁ! কৌন জানে কিসকে ঘর মে ছুপ কর ব্যাঠে হ্যায় বদমাশ।'

-কারও ঘরে থাকলে এতক্ষণে রিসর্টে হুজ্জোত বেঁধে যেত। সেটা যখন হয়নি তখন নিশ্চিন্ত থাক আশেপাশে কোথাও আছে। এখন ঘর যা। সময় মতো চলে আসিস।

-উস দিনভি ইয়েহি বোলে থে না আপলোগ। আলোক আশপাশ আছে!

সবে শীতার্ত কুয়াশা আর জঙ্গলের অন্ধকার ভেদ করে কয়েক রেখা আলো এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ছিল। ঠিক তখনই রামাইয়ার গলাটা গুমরে ওঠা মেঘের মতো গুমগুম করে উঠল। সুখেন যেন একটু গুটিয়েই গেল। রামাইয়া ফিরসে গলা তোলে, ‘আলোওওওওক, এ আলোওওওক, কাঁহা গয়ে রে। আজা আজা।' এরপরেও বেশ কিছুক্ষণ রিসর্টের চারপাশে রামাইয়ার স্বর ভেসে বেড়াতে লাগল। রামাইয়ার সুর করে ডাকটা এক সময় রাস্তা পেরিয়ে পাশের জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সুখেন। জ্যাকেটটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল শ্রীকুমার। রামাইয়াকে দূর থেকে ফলো করাটা খুব একটা অসুবিধে হল না। কারণ ওর গলাটা শুনতে পাচ্ছিল।

এক জায়গায় আটকে গেল রামাইয়া। গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল শ্রীকুমার। খুব সন্তর্পণে দুটো পা এগিয়ে গেল রামাইয়া। তারপরেই সারা জঙ্গল কেঁপে উঠল রামাইয়ার ভয়ার্ত আর্তনাদে। আগাছার ওপরেই লুটিয়ে পড়ল সে। শরীর, মস্তিস্ক বা চেতনা তাকে কাঁদবার সুযোগটুকুও দিল না। ছুটে গেল শ্রীকুমার। রামাইয়া অচেতন হয়ে পড়ে আছে। তার কিছু হাত দূরেই মদের বোতলের বাক্সের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আছে মাটির সাথে চেপ্টে মরে থাকা তুলতুলে সাদা বেড়াল ছানাটা। মুখটা হাঁ করা। খুদে খুদে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে যন্ত্রণায়। শ্রীকুমারও তাকাতে পারেনি আর।

আজকেই চেক আউট করবে চারটে মেয়ে। কথা ছিল আরও একদিন থাকার। হঠাৎ করে কেন এমন সিদ্ধান্ত বদল সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না শ্রীকুমারের।

-আপনাদের আজকের রান্নাটা কিন্তু মোটেই আগের দুদিনের মতো হল না।

ম্যানেজার সুখেন বলল, 'আসলে ম্যাডাম যে মেয়েটি আমাদের মেন রান্নাটা করে সে আজ আসেনি। সকাল থেকে ফোনটাও তুলছে না।

-এসব বাজে এক্সকিউজ। আপনাদের এত বড় হোটেল। এত এক্সপেনসিভ ঘর। সেখানে একজন মাত্র কুক? তার তো শরীর খারাপ হতেই পারে। আর কোনও ভালো অপশন রাখবেন না তা বলে?

সুখেন গলা তুলে রান্নাঘরের দিকে মুখ করে বলে উঠল, ‘এই বাপন রামাইয়াকে ফোন করেছিলি আর?' রান্নাঘর থেকেই উত্তর এল, ‘করেছিলাম। বেজে গেল।'

-দয়াকে কল করে জিজ্ঞেস কর। ওর বউ এল না কেন? এভাবে হলে তো লোক পাল্টাতে হবে। ওদের জন্য আমায় কেন কথা শুনতে হবে? গলায় বেশ ঝাঁঝ নিয়ে কথাগুলো বলল সুখেন।

টাকাপয়সা মিটিয়ে মেয়েগুলো টেবিল থেকে ব্যাগগুলো তুলতে গেল। দূরে আরেকটা টেবিলে বসে এক মনে খেয়ে চলা শ্রীকুমার জ্যাকেটের হুডিটাকে মাথায় তুলে দিল। রিসেপশনে সুখেনের কাছে রান্নাঘর থেকে একটা ছেলে বেরিয়ে এসে জানাল, দয়া লাটাগুড়িতে নেই। রাজাভাতখাওয়া গেছে কী একটা কাজে। মেয়েগুলো হেলতে-দুলতে,

নাচতে-নাচতে বেরিয়ে গেল। গাড়ি ছাড়ার শব্দ হল। সুখেন বলল, 'একবার কাউকে রামাইয়ার বাড়ি পাঠাত। দ্যাখ গিয়ে ছেলের শোকে আবার মুচ্ছো গেল কিনা! যত জ্বালা আমার।'

-বাপন গিয়ে ভয়ানক একটা খবর আনল। রামাইয়ার ঘরের দরজা খোলাই ছিল। ঢুকে দেখে মাটিতে দুটো বেড়াল ম্যাও ম্যাও করে ডেকেই চলেছে। আর সিলিং থেকে ঝুলছে রামাইয়ার মৃতদেহ।

-আপাতত তোমায় একটু পজ করছি শ্রীকুমার

স্বয়ম্ভূ বলল। শ্রীকুমার চুপ করে গেল। 'ঠাকুরমশাই...' ডাকল স্বয়ম্ভু। মিশ্রঠাকুর মুখ তুললেন।

-এবার তো আপনার পালা। দয়া করে দয়াময় সান্যাল যেন আর কিছু না লুকোয়। কারণ তাতে লাভ নেই। বরং ক্ষতিই। আমিই বলতে পারি। কিন্তু মুশকিলটা হল আমি বললে একটা শোনা, প্রমাণ পাওয়া গল্প বলব। কিন্তু আপনি যদি আপনার গল্পটা বলেন তাহলে সেখানে আপনার অনুভূতিটাও বেরিয়ে আসবে। দয়াময় সান্যাল কী করে, কেন পঙ্কজ মিশ্র হল সে কথায় পরে আসছি। সবার আগে আপনার বয়ানটা শোনা যাক।

চশমা খুলে চোখের জল মুছলেন মিশ্রঠাকুর ওরফে দয়াময় সান্যাল। 'রামাইয়া, আমার ভালোবাসা। আমার স্ত্রী।' মিশ্রঠাকুর শুরু করলেন তার জীবনের গল্প বলা। 'আমি বিহারী মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম বলে আমার বাড়ি থেকে কেউ মেনে নেয়নি। বাবা ত্যাজ্য করেছিলেন। রামাইয়া আমার জীবনের লক্ষ্মী ছিল। ও আসার পরই আমার কনস্টেবলের চাকরি পাওয়া। লাটাগুড়িতে ট্রান্সফার হওয়া। নিজেদের সংসার বসাই। সুখের সংসার। রামাইয়ার হাতের রান্না ছিল অমৃতের মতো। বছর ঘুরতেই আমাদের একটা ছেলে হয়। নাম রাখি আলোক। ও আমাদের দুজনেরই নয়নের মণি। ছেলেটার পাঁচ বছর বয়স হয়। রামাইয়া চেয়েছিল ওর পাঁচ বছরের জন্মদিনটা বড় করে করতে। তাই হয়েছিল। ছেলেটা আমার সে কী খুশি! এত্ত গিফট পেয়ে ঘুমই উড়ে গেল তার। জন্মদিনের ঠিক দুদিন পর আমি সকালে কাজে বেরিয়ে যাই। লাস্ট এক বছর ধরে রামাইয়া লাটাগুড়ির গ্রিন জাঙ্গল রিসর্টে রান্নার কাজ করে। সুখেনই ডেকে নেয়। ওরও একটা কাজ হয়। সারাদিন বাড়িতে থাকতে ওরও আর ভালো লাগছিল না। ছেলেটাও বড় হচ্ছিল। খরচা বাড়ছিল। তাই রামাইয়াও কাজটা আনন্দ করেই করছিল। সেদিনও হোটেলে রান্নার কাজ করছিল রামাইয়া। ছুটির দিন ছিল বলে সঙ্গে করে ছেলেকে হোটেলেই নিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা সময়ে খেয়াল করে আলোক নেই। খুঁজতে শুরু করে। ম্যানেজার বলে কারও ঘরে ঢুকে বসে আছে দ্যাখ। কিন্তু ছেলেটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এদিকে থানায় খবর আসে লাটাগুড়ি জঙ্গলের পাশে একটা লরি নাকি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। আমরা সবাই ছুটে যাই। গিয়ে দেখি...!' গলা বুজে আসে মিশ্রঠাকুরের। 'ছেলেটার ওপর দিয়ে লরির চাকা চলে গেছে। রক্তাক্ত থ্যাঁতলানো নরম শরীরটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।'

রামাইয়াকে সামলানো যাচ্ছে না কিছুতেই। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তার ওপরেই আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে। দয়াময় জাপটে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু গায়ের জোরে পিছলে ছেলের মৃতদেহের কাছে ছুটে যাচ্ছে বারবার। দয়াময়ও রামাইয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

এক সময় লাশটাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল। রামাইয়া তখনও সাপের মতো এঁকেবেঁকে শরীরটাকে দুমড়েমুচড়ে দিচ্ছে আর নিজেকে দায়ী করে বিলাপ করে চলেছে। রামাইয়াকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল সবাই মিলে। ঠিক তখনই রামাইয়ার কানে ভেসে আসে আরও একটা কান্না। তাকিয়ে দেখে রাস্তার ওপরেই একটা বেড়ালের পিষে যাওয়া দেহ। তার সামনে বসে ছোট্ট একটা সাদা বেড়ালছানা মিউ মিউ করে কেঁদেই চলেছে। রামাইয়া দাঁড়িয়ে পড়ে। আঙুল দিয়ে বেড়ালটার দিকে দেখায়। পাশ থেকে একজন স্থানীয় লোক বলেন, 'ওই লরিতে এ বেড়ালটাও চাপা পড়েছে। এই বাচ্চাটা বোধহয় ওরই।' আরেকজন বলে ওঠেন, 'ইসসস আহা

রে! মাত্র কয়েকদিন আগেই হয়েছে বোধহয়।' আরেকজন বলেন, 'কে জানে, তোমার আলোক হয়তো এই বেড়ালটাকেই ধরবে বলে দৌড়োচ্ছিল। তারপর দুজনেই একসাথে...!' ফুঁপিয়ে ওঠে রামাইয়া। হাত ছাড়িয়ে বেড়ালছানাটার দিকে এগিয়ে যায়। দয়াময় বলে ওঠে, 'রামাইয়া, কী করছ? চলে এসো।' বেড়ালছানাটাকে মৃত মায়ের পাশ থেকে কোলে তুলে নেয় রামাইয়া। আদর করে চুমু খেয়ে বলে, 'মেরা আলোক।'

-তারপর থেকে ওই বেড়ালছানাটা নিয়েই ছেলের শোক ভুলেছিল রামাইয়া। ক'দিন বাদে কাজেও জয়েন করে। আমায় একটা বিশেষ কাজে রাজাভাতখাওয়ায় পাঠানো হয় দুদিনের জন্য। ওখানেই খবরটা পাই। ছুটে এসে দেখি রামাইয়ার নিথর শরীরটা বিছানায় শোয়ানো। টেবিলে হিন্দিতে লেখা একটা চিঠি। 'ম্যায়নে ফিরসে আলোক কো খো দি। ম্যায় তুমহারা লকশমি নেহি। অলকশমি হুঁ। মুঝে ভুল যাও।' আমি তখন কিছুই জানতাম না। রামাইয়াকে দাহ করে ফিরে নিজের ঘরে যখন একা বসে তখন আমার বাড়ি খুঁজে শ্রীকুমার আসে। ও ভিডিয়োটা দেখায় আমায়। রাগে আমার মাথায় আগুন জ্বলে যায়। রামাইয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ওই ছোট্ট ছানাটাকে আলোক বলেই ডাকতাম। যখনই ডাকতাম উত্তর পেতাম, ম্যাও। মনে হত আমার আলোক বেটাই সাড়া দিচ্ছে। তাকেও ওরা বাঁচতে দিল না। কী নৃশংসভাবে মেরেছে বেড়ালের বাচ্চাটাকে। ওই চারটে মেয়ের জন্য আমি আমার লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো স্ত্রীকে হারিয়েছি। শপথ নিই, আমি ওদের ছাড়ব না। কিছুতেই ছাড়ব না। আমার জীবনে তো হারাবার আর কিছু নেই। তাই ভয়ও করেনি।

মিশ্রকে থামিয়ে এবার স্বয়ম্ভূ বলতে শুরু করে। 'শ্রীকুমারও তার প্রতিশোধ নেবার কথা আপনাকে জানায়। তখন আপনি, শ্রীকুমার আর তপা মিলে প্ল্যান করেন ঠিক কীভাবে এগোবেন। কিন্তু নাম বদলের বুদ্ধিটা আপনাদের মধ্যে কার মাথায় আসে প্রথম?' মিশ্রঠাকুর বলেন, 'আমিই বলি। আমরা কেউ খুনি নই। কিন্তু ওই চারটে মেয়েকে আমরা খুন করতে চাই। হ্যাঁ, আমরা ওদের খুন করতেই চেয়েছি। কারণ আমি জানি, আমি আমার স্ত্রীয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছি, একটা অসহায় প্রাণের বলি হয়ে যাওয়ার প্রতিশোধ নিচ্ছি, একটা সহজ সরল মেয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছি।' কথাগুলো বলতে বলতে রাগে কাঁপতে থাকেন মিশ্রঠাকুর। 'আমার পুলিশের ট্রেনিং নেওয়া আছে। তপাকে আমিই যাবতীয় হেল্প করেছি। বেশ করেছি। কাজটা যাতে বাধা ও প্রমাণহীনভাবে করতে পারি তার জন্যে নামবদলের খেলাটা আমিই শুরু করি।'

-খেলাটা ভালোই ছিল। শুধু নাম বদলই নয়, নিজেদের মধ্যে নামের অদলবদলও করলেন। যাতে পুলিশ যদি কখনও খোঁজ নিতে শিকড়ে পৌঁছে যায় তাহলে যেন তারাও ঘেঁটে ঘুঘনি হয়ে যায়।

শিবাঙ্গী জিজ্ঞেস করল, 'এত বছর সময় লাগল আপনাদের প্রতিশোধ নিতে?'' স্বয়ম্ভূ বলল, 'নাম বদল কী আর একদিনে হয় শিবাঙ্গী? ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে সবকিছু পালটানো। তারপর একটা এলাকায় বাস করে লোকের বিশ্বাস অর্জন করা, স্থানীয় বাসিন্দা হয়ে ওঠা। যাতে বিশ্বাসযোগ্যতাটা আরও বাড়ে। এর ভেতরেও রহস্য আছে। সেখানে পরে আসছি। তার আগে সেই ভয়ানক ভিডিয়োটা দেখে নিই একবার।

মৃত্তিকা চিৎকার করে ওঠে, 'নাআআআআ, প্লিজ না।' দীপায়ন বলে, 'প্লিজ স্বয়ম্ভুবাবু, ওই ভয়ানক ভিডিয়োটা আপনি চালাবেন না।'

-আপনি যেটা ভাবছেন এটা সেই ভিডিয়ো নয় দীপায়নবাবু। এটা এমন একটা ভিডিয়ো যেটা খুনি সুস্মিতাকেও পাঠিয়েছিল। সুস্মিতা ভয় পেয়ে সেটা নিজেই ডিলিট করে। দুবার ট্রাই করেও সেটা রিট্রিভ করা যায়নি সম্ভবত এই ভিডিয়োটাই দিয়াকেও সেন্ড করা হয়েছিল। অবশেষে গতকাল রাতে খুনি আমাদের সেই ভিডিয়ো দেখার সুযোগ করে দেয় মৃত্তিকার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে।

মৃত্তিকা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মৃত্তিকার হোয়াটসঅ্যাপে কী ভিডিয়ো এসেছে সেটা

ওঁরা জানলেন কোত্থেকে? মনের কথা পড়তে পেরে স্বয়ম্ভু বলল, ‘সরি মৃত্তিকা, সুস্মিতার খুনের পর থেকেই আমরা আপনার মেল, হোয়াটসঅ্যাপ সব হ্যাক করেছিলাম। ফোন কলও ট্যাপ করা ছিল। নইলে আজ আপনাকে বাঁচাতে পারতাম না। এবার ভিডিয়োটা চালানো যাক।'

বড় স্ক্রিনে চলতে শুরু করল শ্রীকুমারের মোবাইলে রেকর্ড করা ভিডিয়োটা। চারটে মাতাল মেয়ে দিয়া, অরুণা, সুস্মিতা আর মৃত্তিকা গোল করে ঘুরে ঘুরে নাচছে। প্রথমে দিয়া গাইছে, ‘আজ না ছোড়ুঙ্গা তুঝে…’ তারপর বাকিরা সমবেত স্বরে বলছে, ‘দমদমাদম'। আবার পরের লাইনটা একইভাবে। না, এই দৃশ্যে মেয়েদের হাতে মদের বোতল ছাড়া আর কিছু নেই। যা কিছু সর্বনাশ হয়ে চলেছে সেটা তাদের পায়ের নীচে। একটা ছোট্ট তুলতুলে সাদা বেড়ালছানা। গানের তালে নাচের ছন্দে চারবন্ধু এক এক করে ছানাটাকে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। বেড়ালছানাটা কেঁদে উঠে পালাতে চাইছে বলে অরুণা গোড়ালি দিয়ে মারল ছোট্ট ছানাটার পিছনের কচি পায়ে। মিউউউ করে যন্ত্রণায় কেঁদে উঠল। কচি পা-টা ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। আর টানতে পারছে না নিজেকে। তাও চেষ্টা করছে। মৃত্তিকার ভারী পা এসে বেড়ালছানাটার ঘাড়ের কাছে ধপ করে লাফিয়ে উঠল। ঘাড় ভেঙে গেল কিনা বোঝা গেল না। বাচ্চাটা আবার কোঁকিয়ে উঠল। মাকে ডাকল বোধহয়! চারবন্ধু উত্তাল আনন্দে নারকীয় উল্লাসে নেচে চলেছে। দিয়ার পায়ের আঘাতে পিছনের আরেকটি পাও মুচড়ে গেল ছানাটার। প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করে নুইয়ে পড়ল। মা তুমি কোথায়? এরা যে আমায় বাঁচতে দিল না মা! চারটি মেয়ের সাধ আর মেটে না। গানের লয় বাড়িয়ে দিল। সঙ্গে বেড়ে গেল মৃতপ্রায় বেড়ালছানাটার পিঠের ওপর উঠে নাচানাচির ধুম। কথায় বলে বেড়ালের কান্না ভীষণ অশুভ। তাকে বেশিক্ষণ কাঁদতে দেওয়া যায় না। তাই দিয়া, অরুণা শুতি তিনজনে একবার করে সাদা ছানাটার পিঠে জোড়া পায়ে লাফিয়ে উঠে ডিঙি মেরে টুইস্ট করতে থাকে। ছোট্ট শরীরটার ভিতর নাড়িভুঁড়ি যা যা ছিল সবই মাটির সঙ্গে পিষে গেল। বেড়ালছানাটা শেষবারের মতো তার মাকে ডেকে উঠল। মুখটা হাঁ হয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁতগুলো বেরিয়ে এল। তারপরেও লাফালাফি চলল। কিন্তু বেড়ালটা আর ডাকল না যখন তখন বন্ধ হল চারবন্ধুর উল্লাস। মদের বোতল হাতে নিয়ে হো হো করে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল তারা। ভিডিয়োটা এখানেই শেষ।

-ছিঃ মৃত্তিকা ছিঃ। তুমি না মা? তোমরা এইভাবে একটা অবলা প্রাণীকে .... দীপায়নের তিরষ্কার বজ্রপাতের মতো আছড়ে পড়ল মৃত্তিকার মাথায়। 'আমার ঘেন্না করছে তোমায়। তোমার মা হওয়ার কোনও যোগ্যতাই নেই।' মৃত্তিকা কাঁদতে কাঁদতে দীপায়নের হাত চেপে ধরল, ‘আমি অন্যায় করেছি। মানছি। কিন্তু আমরা সবাই নেশার ঘোরে ছিলাম।

-শাট আপ। শাক দিয়ে মাছ ঢাকছ? কাল যদি আমি নেশা করে এসে তোমায় খুন করি তাহলে সেটা দোষ নয়? আইন ছেড়ে দেবে আমায়? লোকে ভুলে যাবে সব। ছিঃ! আমার ঘেন্না করছে তোমার পাশে বসতে।' দীপায়ন সরে যায় মৃত্তিকার পাশ থেকে। মৃত্তিকা কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার পাশে এসে সান্ত্বনা দেবার মত কেউ নেই। মুখ দেখাবার উপায়ও নেই।

-দীপায়নবাবু, মানুষই ভুল করে আবার মানুষই সেটা শুধরে নেয়। সুস্মিতার মনেও এটা নিয়ে যথেষ্ট অনুশোচনা ছিল আশা করি। নইলে যে মেয়েটা এইভাবে একটা বেড়ালছানাকে মারতে পারে সে নিজে কেন বেড়াল পুষবে?

স্বয়ম্ভুর কথার রেশ ধরেই প্রিয়াংশু বলে ওঠে, 'আজ আমারও তাই মনে হচ্ছে স্বয়ম্ভুবাবু। ও হঠাৎ করেই বেড়াল পোষার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। আমি বলেছিলাম কুকুর পোষো। কিন্তু ও বেড়ালটাই চেয়েছিল।'

-আসলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ম্যাচিওরিটি আসে। ভাবনা চিন্তার বদল ঘটে। মানুষ আরও সহনশীল হয়। অরুণার মধ্যেও পরিবর্তন এসেছিল কিন্তু সেটা অন্য কারণে। আজ এসে মনে হচ্ছে সেই কারণটাও ম্যান মেড। শেষ কথাটা মিশ্রঠাকুর আর তিরুর দিকে তাকিয়ে বলল স্বয়ম্ভু। দুজনেই সেই ইঙ্গিত বুঝে চোখ সরিয়ে নিল।

-অভিনব নিয়ে এস।

স্বয়ম্ভুর হুকুম হওয়া মাত্রই অভিনব আদেশ পালন করল। গালভর্তি দাড়ি, মুখে মাস্ক, পরনে পুলিশের খাঁকি পোশাক। চোখে কালো চশমা লোকটা এসে দাঁড়াতেই স্বয়ম্ভু জিজ্ঞেস করে, 'মীনাক্ষী দেখো তো চিনতে পারো কিনা।' দেখামাত্রই মীনাক্ষী আঁতকে ওঠে, 'হ্যাঁ স্যার, এই এই তো। এই লোকটাই এসেছিল বুটিকে। ওর হাতে একটা কাটা দাগও আছে।' স্বয়ম্ভু হাত উলটে সবাইকে দেখায়। বাঁহাতে সেলাইয়ের দাগ। স্বয়ম্ভু নিজের হাতে লোকটার নকল দাড়িগোঁফ, চশমা সব খুলে দেয়। পুলিশের কেউ কেউ চমকে যায়। কারণ সবাই এই রহস্য জানে না। বেরিয়ে আসে লোকটার আসল চেহারা। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে বলে স্বয়ম্ভু তার চিবুক ধরে ওপরের দিকে তুলে ধরে আর বলে, 'এই আমার বিশ্বস্ত চালক তপন অধিকারী।' শিবাঙ্গীর চোখে অপার বিস্ময়! কত প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মনের মধ্যে। কিন্তু শিবাঙ্গীও প্রশ্ন করার শক্তি হারিয়েছে কিছুক্ষণের জন্য।

-মাথা নিচু কেন তপন? এত ভালো খেলা সাজিয়েছ! আমাদের বিশ্বাস নিয়ে একেবারে পাকাপোক্তভাবে খেলেছ। তোমায় প্রাইজ দেওয়া উচিত। বলেছিলাম না শিবাঙ্গী, সরষের মধ্যেই ভূত!

শিবাঙ্গী এখনও সবটা জানে না। অবশেষে মুখ থেকে শব্দ বের করে জিজ্ঞেস করল, 'তপন! কীভাবে? মানে কেন?

-আরে বাবা, তপনই তো তপা। পুরো নাম তপন অধিকারী। যদিও এটা পরিবর্তিত নাম। আসল নাম ত্রিদিব অধিকারী। সুপ্রভা অধিকারীর ছেলে। যে সুপ্রভা অধিকারীর বাড়িতে তার ভাইয়ের পরিচয়ে থাকেন মিশ্রঠাকুর ওরফে দয়াময় সান্যাল এবং তার পাতানো ভাগ্নে তিরু। যার আবার ভালো নাম ত্রিদিব মণ্ডল। এটাও তার পরিবর্তিত নাম। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যেই এরা নামের আদানপ্রদান সেরেছেন যাতে প্রশাসনকে ধোঁকা দিতে পারেন। ওদের এই কাজটা করার জন্য এমন একটা বাড়ির দরকার ছিল যেখানে গুপ্তকক্ষ আছে। এমন একটা ঘর যেখান থেকে মানুষ মারার কোনও শব্দ পাবে না। আর উত্তর কোলকাতার বা মফস্বলের বেশ কিছু বাড়িতে এখনও আন্ডার গ্রাউন্ড রুম আছে। সুপ্রভা দেবীর বাড়ির গুপ্তকক্ষটা দারুণ। কেউ বুঝতেই পারবে না চট করে দেখে। সবাই ভাববে ওটা বাথরুমের তাক। আসলে পুরনো দিনের এমন একটা বাথরুমে এত বড় তাক থাকাটাই আশ্চর্যের লেগেছিল। কর্পোরেশন থেকে পাঠানো লোকের ছদ্মবেশে ওরা দুজন আমারই লোক ছিল মিশ্রঠাকুর। ওদের তোলা ছবি দেখেই আমি আপনার বাড়িতে হিসু করতে যাই। গিয়ে তাকটা ফাঁক করতেই দেখি একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। এই গুপ্তকক্ষেই যে আপনাদের হত্যালীলা চলে সেটা নিশ্চিত হয়ে যাই। শুধু ঢুকতে পারি না ভেতরে। তাহলে আপনি আবার বাইরে দাঁড়িয়ে সন্দেহ করতেন। আমার জলঢালার শব্দ পেয়ে একটা ছায়া সেদিন বাথরুমের সামনে থেকে সরে যায়।'

স্বয়ম্ভুর চোখে চোখ রাখতে পারে না মিশ্র

-মৃত্যুর শব্দ যাতে বাইরে কোনওভাবেই না আসে তাই শ্রীকুমার মাঝরাতে মাঝে মাঝেই ড্রামস বাজাত। তাই তো শ্রীকুমার

উত্তর আসে না। তাও হাসে স্বয়ম্ভু। বলতে থাকে, 'আর এই সব বুদ্ধির কারিগর ছিল তপা ওরফে তপন অধিকারী। মনে কর শিবাঙ্গী, কলেজস্ট্রিট থেকে আমরা যেদিন বৃষ্টির রাতে ফিরছিলাম, এগারোটা বেজে গিয়েছিল। তপনই কিন্তু আমাদের বলেছিল গাড়িটা ঘুরিয়ে সুরি-লেনের মধ্যে দিয়ে শিয়ালদায় বেরোবে। কারণ সামনের রাস্তায় জ্যাম। আসলে জ্যাম নয়। তপন দুটো কাজ সরেজমিনে তদন্ত করতে চেয়েছিল। এক, দিয়ার অচৈতন্য শরীরটা আনা হয়েছে কিনা আর দুই, দীপায়নবাবু সময় মতো সুরি-লেনে পৌঁছতে পেরেছিলেন কিনা!

-তার মানে সেদিন গাড়ি থেকে গাঁঠরি নয়। দিয়াকে নামানো হচ্ছিল মারবে বলে? -রাইট।

শিবাঙ্গী আফশোসে চোখ বন্ধ করে ফেলে। 'সেদিন একবারের জন্যেও যদি আমরা নেমে দেখতাম স্যার!'

-নিয়তি। সবটাই নিয়তি। আচ্ছা দীপায়নবাবু, দিয়া যে রাতে খুন হয় সেই রাতে আপনি তো জোড়া গির্জার কাছে দাঁড়াননি। তাহলে মিথ্যে বলেছিলেন কেন? আর কেনই বা অত রাতে

আপনি মিশ্রঠাকুরের বাড়ি গিয়েছিলেন?

মিথ্যে বলার জন্য দীপায়ন বেশ অস্বস্তিতে পড়ে। কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলে, 'বলা বারণ ছিল!'

-কার?

-মিশ্রঠাকুরই বারণ করেছিলেন। আমি যেদিন মিশ্রঠাকুরকে আমাদের বাড়ি আসতে বলি সেদিন উনি আসতে পারেননি। উনি যেদিন আসবেন বলেন সেদিন আবার আমি বাড়িতে থাকতে পারিনি। ওই যেদিন শিবাঙ্গী ম্যাডাম যান মৃত্তিকার সঙ্গে দেখা করতে সেদিনই উনি প্রথম আসেন। অন্নপ্রাশনের নানান কথা বলার ফাঁকে উনি হঠাৎ বলেন.....

-তুমি কি কোনও কারণে খুব ভয় পেয়ে আছ মা?

অচেনা একটা লোক হঠাৎ করে মন পড়ে ফেলাতে চমকে যায় মৃত্তিকা। লুকোতে পারে না। 'হ্যাঁ ঠাকুরমশাই। কেন জানি না মনে হচ্ছে কোনও বিপদ আসতে চলেছে। '

-ঠিকই মনে হচ্ছে মা। তোমার সামনে বিপদ আছে।

-আপনি ভাগ্য বলতে পারেন?

মৃত্তিকা লাফিয়ে ওঠে। মিশ্র লাজুক হাসি ছড়িয়ে বলেন, 'না না, অত বড় কেউ নই। তবে কিছু বুঝতে পারি।'

-আপনি কিছু একটা করুন না ঠাকুরমশাই। আমার একেক সময়ে পাগল-পাগল লাগছে।

-চিন্তা কোরো না। মেয়ের অন্নপ্রাশনের আগে তোমার বিপদ কাটানোর দরকার। তাই বিপদভঞ্জন পুজো দাও।

-সেটা কীভাবে কোথায় দেব?

-দিনক্ষণ একটু দেখতে হবে মা। আমি জানিয়ে দেব। তবে খুব শিগগিরিই হবে।

পরেরদিনই মৃত্তিকা ফোন করে ঠাকুরমশাইকে। 'আপনি ফোন করেননি দেখে আমিই করলাম ঠাকুরমশাই। ওই পুজোটার ব্যাপারে যদি বলেন।

-শোনো। গ্রহরাজের বিশেষ পুজো তো। এর কিছু নিয়ম আছে। অন্যথা হলে অনর্থ হবে।

-আপনি বলুন না, আমি সব মানব।

-পুজোটা তোমার আর তোমার স্বামীর নামে হবে। এই পুজোর নিয়ম হল, যাঁদের নামে পুজো হবে তাঁদের মধ্যে অন্তত একজনকে পুজোর সামগ্রী কিনে দক্ষিণা সমেত পুরোহিতের হাতে তুলে দিতে হবে। আর সেটা করতে হবে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের শেষ লগ্নে। দ্বিতীয় প্রহর কখন জানো?

-না ঠাকুরমশাই।

-রাত এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। আর এই সম্পূর্ণটা করতে হবে অত্যন্ত গোপনে।

দীপায়ন আরও বলতে থাকে, 'আমি সেদিন রাতে পুজোর সামগ্রী তুলে দিতেই ঠাকুমশাইয়ের কাছে যাই। কারণ তার পরেরদিন ভোরবেলাতেই পুজোটা ছিল।'

-আর ফোন? ঠিক ওই সময়েই ওই লোকেশনেই সুইচড অফ হল?

-ঠাকুরমশাই আমায় ঘরে ডেকে নিয়ে যান। তারপর হাতের ঘড়ি, কোমরের বেল্ট সব খুলে বিছানায় রাখতে বলেন। এমনকি মোবাইলটাও। কারণ চামড়ার কোনও জিনিস অঙ্গে রাখা যাবে না।

-আপনার মোবাইল কী চামড়া দিয়ে তৈরি নাকি?

-না তা নয়। তবে বাইরের কোনও দ্রব্যই কাছে রাখা যাবে না।

-বুঝলাম। তারপর?

-উনি আমায় নিয়ে পাশের ঘরে যান। ঠাকুরের সিংহাসনের সামনে দাঁড়াতে বলেন। তারপর মন্ত্র পড়ে আমার সারা গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেন। এরপর উনি সব পুজোর জিনিসপত্র আমার হাত থেকে গ্রহণ করেন।

-আর এই ফাঁকে ঠাকুরমশাইয়ের সহযোদ্ধা তার আদরের ভাগ্নে তিরু আপনার মোবাইলটি সুইচড অফ করে দেন। যাতে লোকেশন ট্র্যাক করলে সুরি-লেনের বাড়ির ঠিকানাটাই দেখায়। এখানে অনেকের মনে হতেই পারে এতে তো মিশ্রঠাকুর আর তিরুই ফেঁসে যাচ্ছে।

লাভ কী হচ্ছে? কিন্তু না। এক্ষেত্রে বেশ গভীর একটা সাইকোলজিক্যাল প্ল্যান আছে। এই যে সুরিলেনের বাড়ির ওপর পুলিশের নজর পড়ল, এই বাড়িটাতে কারা থাকে? একেবারেই নিরীহ এক ঠাকুরমশাই। যে কিনা চারপাশে বলে বেড়াচ্ছেন, ভয়-ভয় মুখ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই কথা রটিয়ে যে তিনি নাকি পুলিশের ভয়ে জড়োসড় হয়ে আছেন। দয়াময় সান্যাল পুলিশে চাকরি করতেন বলে এটা উনি খুব ভালো করেই জানেন অপরাধী যদি বুক ফুলিয়ে নিষ্পাপ মুখে অকুতভয় হয়ে ঘুরে বেড়ান তাহলে তার ওপরেই নজরটা বেশি থাকে। আর যে সব সময় সবার সামনে ভীত হয়ে ঘুরে বেড়ান নিজের অসহায়তা শোকেস করে তাহলে পুলিশের নজর তাদের প্রতি থাকলেও সেটা খুব কম। এক্ষেত্রে তার ভাগ্নেটি এই রটিয়ে বেড়াবার কাজটি করেছেন। শাড়ির দোকান থেকে পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব সবাইকে বলে বেড়িয়েছেন যে তার মামার নাকি ঘুম হচ্ছে না। তিনি নাকি খাচ্ছেন না। সুগার প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ যে খুন হয়েছে সে সর্বশেষ তার সঙ্গেই কথা বলেছে আর এটা তিনি ভান করছেন পুলিশের কাছ থেকে লুকিয়ে যাবার। কিন্তু আদপে লুকোতে চাইছেন না। তাই পুরুতমশাইও কায়দা করে প্রথমদিনই আমাদের এইসব ভয়ের কারণ শুনিয়ে দিয়ে বলেছিলেন আমরা যেন পুলিশকে না বলি। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কী, উনি নিজে মুখেই বললেন, কিন্তু বললেন না। এতে ওনার নিষ্পাপ হওয়াটাই পোট্রে হল। অথচ উনি ভালোই জানতেন যে আমরা পুলিশই। তাই প্রথম দেখাতেই অমন চমকে উঠেছিলেন। ভুল বলছি ঠাকুরমশাই?”

মিশ্রপুরোহিত নির্বাক। কোথায় কোনদিকে তাকাবেন বুঝতে পারছেন না। স্বয়ম্ভু আবার বলতে শুরু করে, ‘তাহলে এখান থেকে বেঁচে গেল তপন। কারণ যেভাবে ওরা ছক সাজিয়েছে তাতে এই দুজনের পিছনে যে একজন তৃতীয় ব্যক্তি যে আছে সেটা বোঝা যেতেই পারে। যদি সেটা যায় তাহলে সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি কে হবে? অনেক ভেবে মৃত্তিকার স্বামী দীপায়নকে বাছা হয়। এদিকে দীপায়ন আবার কলেজের প্রফেসর। সমাজে ভদ্র ভালোমানুষ বলেই পরিচিত। তাই চট করে দীপায়নের নামে অ্যালিগেশনও আনা যাবে না। আবারও পুলিশ ধন্দে। অথচ মৃত্তিকার সুখের সংসারও ছারখার করে দেওয়া যাবে। আচ্ছা দীপায়নবাবু আপনার একটা পেনড্রাইভ হারিয়ে গেছে তো?

-বিশ্বাস করুন, ওটা আপনাদেরকে দিয়ে দেবার পর আমি বুঝতে পারি আমার ওইরকমই একটা পেনড্রাইভ ছিল যেটা মিসিং। কিন্তু আমি ভয়ে কিছু বলতে পারিনি। যদি আপনারা আমাকেই সন্দেহ করে বসেন।

-প্রথমে দেখে বুঝতে পারেননি?

-কী করে বুঝব? একইরকম তো অজস্র পেনড্রাইভ আছে। একই কোম্পানির। তাছাড়া আমার জিনিসে কেউ হাত দেয় না। মৃত্তিকাও না। তাহলে আমার পেনড্রাইভ ওভাবে বারান্দায় পড়ে থাকবে এটা অবিশ্বাস্য লেগেছিল।

-বুঝলাম।

স্বয়ম্ভু তরতর করে এগিয়ে যায় দীপার দিকে। দীপা অনেকক্ষণ বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বয়ম্ভূ বাচ্চাটাকে দীপার কোল থেকে নিয়ে কপালে চুমু খায়। তারপর সোজা মৃত্তিকার কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, ‘ধরুন তো।'

-না। ও আমার বাচ্চার গায়ে হাত দেবে না।

বাচ্চাকে কেড়ে নিতে আসে দীপায়ন। স্বয়ম্ভু প্রতিবাদ করে, ‘না দীপায়নবাবু। দুজন মায়ের কাছ থেকে তাদের সন্তানদের সরিয়ে দিয়ে যে ভুল মৃত্তিকারা করেছেন সেই একই ভুল আপনি করবেন না। মানুষ ভুল করলে তাকে শোধরাবার সুযোগটা দিতে হয়। আর আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারছি এই মৃত্তিকা আর আগের মৃত্তিকার মধ্যে বিস্তর ফারাক। ওই কবিতাটা জানেন নিশ্চয়ই, বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। তাই বাচ্চাকে মায়ের কাছেই থাকতে দিন। নিন মৃত্তিকা ধরুন।' কাঁদতে কাঁদতে অসীম কৃতজ্ঞতায়

স্বয়ম্ভুর দিকে চেয়ে মেয়েটাকে কোলে তুলে নেয় মৃত্তিকা। স্বয়ম্ভু গলা নামিয়ে বলে, 'সেদিন খুব ভালো একটা কথা বলেছিলেন। পাপ। যে পাপের তদন্ত হয় না। একটি বেড়ালের মৃত্যুর সত্যিই কোনও তদন্ত হয় না। শাস্তিও হয় না।

এবার আবার সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় স্বয়ম্ভু। বলে, 'দীপায়নবাবুর ওপর যাতে সহজেই সন্দেহ গিয়ে পড়ে সেই কারণেই তাঁর ব্যবহৃত পেনড্রাইভটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কারণ পুলিশ আততায়ীরা যেহেতু পুলিশের কাজ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল তাই তারা জানত যে পুলিশ ডিলিটেড ফাইল এখান থেকে উদ্ধার করবেই। আর সেটা উদ্ধার করলেই যার পেনড্রাইভ তার জিনিসপত্রই পাওয়া যাবে। হলও তাই। ডিলিটেড ফাইল থেকে দীপায়নবাবুর বিয়ের ছবি, মেয়ে হবার পর একসাথে সবাই মিলে একটা ছবি এবং দীপায়নবাবুর প্রকাশিতব্য উপন্যাসের পিডিএফ কপিটি পাওয়া যায়। সঙ্গে মৃত্তিকার ইউ এস জি রিপোর্ট। অতএব পুলিশের সন্দেহ খুব সহজেই দীপায়নবাবুর ওপর গিয়ে পড়ে। সবাই ভাবে আসল কালপ্রিট দীপায়ন চ্যাটার্জি। আমিও তার মধ্যে একজন। আমি ভাবি, যাতে দীপায়নের ওপর সন্দেহ না হয় তাই এই খুন করার ভিডিয়ো নিজের স্ত্রীকে দেখিয়ে ঘাবড়ে দিতে চেয়েছেন। পুলিশও ভুলভাল ভেবে তদন্ত করবে। আর ওদিকে আসল কালপ্রিট নিজেদের কাজ সাঙ্গ করে বেপাত্তা হয়ে যাবে।' দীপায়নের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। ঘাম ভাঙছে শরীর থেকে।

-সঙ্গে আরও একটি জিনিস সরানো হয়েছিল। দীপায়নবাবুর প্রকাশিতব্য উপন্যাসের চারটি পাতা। যেখানে দীপায়নবাবুর হাতের লেখায় নীল কালিতে প্রুফ দেখা হয়েছিল।

-আমার উপন্যাসের কথা আপনি জানলেন কী করে? ওটা তো এখনও বেরোইনি।

দীপায়ন প্রশ্ন করল। স্বয়ম্ভু দুটো ভুরু তুলে বলল, "ওইজন্যেই তো বললাম প্রকাশিতব্য। আর গোয়েন্দারা এইটুকু জানবে না?"

শিবাঙ্গী প্রশ্ন করল, 'কিন্তু খুনি কী করে সরাল? কখন বাড়িতে ঢুকল?"

-খুনি কেন ঢুকবে? তার সহকারী ঢুকবে। কী দীপা দেবী? তাই তো? ঝট করে কথাগুলো ক্ষীপ্র বাঘের মতো আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল দীপা ওপর। ঘাবড়ে গিয়ে তুতলে উঠল সে। 'মা... মানে? আমি কী করে জানব?"

-আপনার স্বামীর নাম কী দীপা দেবী? কবে থেকে আয়ার কাজ করছেন? -আমি... মানে অনেকদিন হল। মনে নেই।

-স্বামীর নামও মনে নেই?

দীপা একদম চুপ। যতই হোক মেয়ে তো। স্বামীর নাম কী করে ভুল বলবে?

-ও বুঝেছি। হিন্দু নারীরা স্বামীর নাম মুখে আনেন না। তার ওপর তিনি যদি আপনার মত পতিব্রতা নারী হন। আমি বলে দিচ্ছি, আপনার স্বামীর নাম ত্রিদিব ওরফে তপন অধিকারী। কিন্তু আপনি বাপের বাড়ির পদবীই ব্যবহার করেন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে। দীপা দেবনাথ। আর আপনি এই প্রথম আয়ার কাজ করেন। আপনার নামটা সেন্টারে এন্ট্রি করতে তপনই সাহায্য করে। যতই হোক পুলিশে চাকরি করেন আপনার স্বামী।

দীপা কেঁদে ফেলে। আঁচলে মুখ ঢেকে নেয়। মৃত্তিকা আর দীপায়নের চোখের সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুলে উঠছে। আর কী কী রহস্যের উন্মোচন হতে চলেছে সেটা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। শিবাঙ্গী বলে, 'তার মানে স্যার তপনই মুখে মাস্ক দিয়ে ওই বড় জাঁতি তৈরি করাতে গিয়েছিল?'

-একদমই তাই। গায়ে রেনকোট, মুখে মাস্ক। তার ওপর এত নিখুঁত অভিনেতা যে দীপায়নের চোখের নীচের আঁচিল আছে সেটা যাতে কামারশালার লোকে নোটিস করে সেটার জন্য বারবার চুলকেছে। শুনলে না লোকটা বলল সেদিন। মুখে মাস্ক দিয়ে গেছে বলেই প্রথম চোটে লোকটা চিনতে পারেনি। তাই ঘটা করে দীপায়নের নাম বলেছে তপন। তার ওপর আঁচিল। ব্যস! কেল্লাফতে। আর ওই জাঁতিটা দীপায়নবাবুরই বইয়ের প্রুফ দিয়ে

ভালো করে র‍্যাপ করে বস্তায় পুরে নেয়। অরুণাকে খুন করে খুনি শুধু লাশটাই পার্কসার্কাসের লাইনের ধারে ফেলেনি। ইচ্ছে করেই প্রুফের কাগজটাও ফেলে রেখেছিল। চোখে না পড়লে, না পড়ল। যদি পড়ে যায় তাহলে পুলিশ খোঁজ করে ঠিক প্রকাশনায় পৌঁছে যাবে। পুরো লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ছবি। নিখুঁত দৃশ্য এঁকেছে। যত দূর যা এভিডেন্স পেয়েছি তাতে টোটাল চারটে পাতা সরিয়েছিল। একটি অরুণার বড়ির পাশে লাইনের ধারে, বাকি তিনটে সুরিলেনের বাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে উদ্ধার করি। আর একটি আমরা সরিয়েছিলাম হিসেব মেলাবার জন্য। যেটা দীপায়নবাবুর বাড়িতে সার্চ করতে করতে ওনার পড়ার টেবিলের ওপর পাই। জিজ্ঞেস করছিলে না শিবাঙ্গী, এতদিন বাদে এসব কেন? এই যে বিপুল প্ল্যান, তার মধ্যে পুলিশের চাকরি পাওয়া, শ্রীকুমার আর দয়াময় সান্যালের নতুন নামের এস্ট্যাবলিশমেন্ট সবকিছু করতে গিয়েই এতগুলো বছর কেটে গেল। শুধু তাই নয়, ওরা বোধহয় অপেক্ষা করছিল এই পাঁচজনের সুখের সময় আসার। যখন সবাই সুখী হবার পথে, জীবনে স্থিতি আসছে ঠিক সেই সময় ঝড়ের মতো এসে সবকিছু তোলপাড় করে দেবে। এটাই ওদের মোটো ছিল। শ্রীকুমার খুঁজছিল এই চারবন্ধুর করা আরও কোনও অঘটন যেটা ওদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়। সেটা ডুয়ার্সে গিয়েই পেয়ে যায়। যদিও এসব আমার অ্যাসাম্পশন। ভুল হলেও এই কেসে কিচ্ছু যায় আসে না।

তপনের মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় স্বয়ম্ভু। সোজাসুজি তাকিয়ে বলে, 'চন্দ্রকোণায় সরযু দেবীর ছেলের কাছে শ্রীদেবী, শ্রীকুমার আর তপার ছবি না থাকলে এই ঘটনা হয়তো আরও দীর্ঘায়িত হত। শ্রীদেবী কোলকাতায় চলে যাবার আগে তোলা হয়েছিল ছবিটা। ভাগ্যিস। নইলে সরষের মধ্যেই যে ভূত সেটা তো জানতামই না। আমরা গাড়িতে বসেই কত কিছু আলোচনা করেছি। আমাদের প্রত্যেকের বাড়ি তপন চেনে। এমনকি আমার বাড়িতে ঢুকেছে, খেয়েছে। তাই আমার বাড়িতে এসে ফুলের স্তবক দিয়ে যাওয়া বা অরুণার পায়ের কাটা আঙুল গিফট করা কিংবা আমার মাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে তার গলায় দিয়ার পায়ের কাটা আঙুলের মালা পরিয়ে দিয়ে যাওয়া এত সহজ হয়েছে। এমনকি শিবাঙ্গীর বাড়িতে লাশ ফেলতেও কোনও বেগ পেতে হয়নি। খুব সুন্দর সাজিয়েছ তপন। আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি তোমার কাজ দেখে।' তপন নিরুত্তর। মাথা নিচু। স্বয়ম্ভূ আরও বলে, 'শ্রীকুমারকে দিয়ে সব সময় নজর রাখিয়েছ কে কীরকম আছে। কার জীবনে কী ঘটছে। অরুণা যখন সেটল করল তখন আবির্ভাব হল তর্পণা ম্যাডামের।' স্বয়ম্ভুর মুখটা ঘুরে গেল তর্পণার দিকে। এগিয়ে গেল এক পা দু-পা করে। বলতে থাকল রহস্যের কথকতা। 'আচ্ছা তর্পণা ম্যাডাম, আপনি দুম করে আই আই জে টি-র চাকরিটা ছাড়লেন কেন?'' চমকে উঠলেন তর্পণা। 'কে বলল আপনাকে?'

-গোয়েন্দা স্বয়ম্ভু সেন কীভাবে তার খবর জোগাড় করেছে সেটা তো আপনাকে জানাতে বাধ্য নয় মিসেস তর্পণা মিত্র মণ্ডল।

নাম আর পদবী বেশ ভেঙে ভেঙে বলল স্বয়ম্ভু। তর্পণা নিজেরই অজান্তে ক্ষণিকের জন্য ঈষৎ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ফেলেছিলেন। ঠিক সেই সময়েই স্বয়ম্ভুর চোখের মণি খুব দ্রুততার সঙ্গে মেপে নেয় তিরু ওরফে শ্রীকুমারের মুখের অভিব্যক্তি। তারও একই অবস্থা। যদিও তর্পণা সঙ্গে সঙ্গে ভোলবদল করেন। যেটা সে এতকাল করে এসেছেন। স্বয়ম্ভু তর্পণার উত্তরের অপেক্ষা না করে বলে, 'এতদিন আপনাকে অনেক সময় দিয়েছি। আর দেওয়া সম্ভব নয়। রাত ক্রমে বেড়েই চলেছে। আমি বলছি আপনি শুনুন। আপনি হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কিং, আই টির অ্যাডভান্স কোর্স সবকিছু করেছেন। এবং যথেষ্ট ভালো র‍্যাঙ্ক করেছিলেন। জয়েন করেছিলেন আই আই জে টি-র মতো কম্পিউটার এডুকেশনাল ইন্সস্টিটিউশনে। সুনামের সঙ্গে পড়াচ্ছিলেন। সেখানেই একদিন শিক্ষার্থী হিসেবে যান শ্রীকুমার মণ্ডল। আপনারই ছাত্র ছিল শ্রীকুমার। এইসব এডুকেশনে ছাত্রকে যে বয়সে ছোট হতে হবে এমনটা মোটেও নয়। আপনারা একই বয়সী। সাধারণ মানের ছাত্র শ্রীকুমার ক'দিনের মধ্যেই বুঝতে পারে যে এসব পড়া তার কম্ম নয়। কিন্তু কিছু করার নেই। তপাদা ওকে ভর্তি করিয়েছে। এমনকি সেখানে শ্রীকুমারের অভিভাবক হিসেবে তপনের সইও আছে। লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে এথিক্যাল

হ্যাকিং থেকে শুরু করে অনেক কিছুই শিখতে হবে। কিন্তু শ্রীকুমার ফেল করছে। তাহলে কী তপার সব পয়সা, প্রচেষ্টা জলে? উঁহু! শ্রীকুমার সাধারণ মানের ছাত্র হতে পারে। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধি তার। দেখতেও মন্দ না। বেশ একটা আলুথালু রোমিও ভাব আছে। তাই টিচারকে পটাতে বেশি সময় লাগেনি তার। তর্পণাও প্রেমের জালে ফেঁসে যায়। কে জানে? হয়তো জীবনের দুঃখ কষ্টের গল্প, শ্রীকুমারের দিদির ট্র্যাজিক কাহিনি শুনে তর্পণার মনটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তড়িঘড়ি ওরা বিয়ে করে নেয়। কিন্তু গোপনে জাস্ট রেজিস্ট্রি। যুক্তি ছিল একটাই, তর্পণার অসুস্থ মাকে শান্তি দিতে এই বিয়ে। তাই লোকজনকে ডাকা সম্ভব হয়নি। মা তো জেনে গেলেন যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে। এরপর শ্রীকুমার ইন্সটিটিউশন ছাড়ে। তর্পণাও জব ছাড়েন। কারণ ততদিনে শ্রীকুমার তর্পণাকে জানিয়ে দিয়েছে তার জীবনের উদ্দেশ্য। তর্পণা স্বামীকে সঙ্গ নাও দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি দিলেন। তিনিও ভালোবেসে অন্ধ হয়ে গেলেন। তার ওপর তপা পুলিশে কাজ ক'রে সে যখন ওদের পাশে আছে তখন ভয়ের খুব একটা কিছু নেই। তাছাড়া শ্রীকুমার নিজে হাতে তো কিছু করছে না। করবে অন্য লোকে। ও শুধু খবর দেবে। যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবে। বাজার করে এনে দেবে আর বাড়িতে বসে রেঁধেবেড়ে খাবে অন্য লোক। আবারও তপার প্ল্যান অনুযায়ী আলাদা হল তর্পণা আর শ্রীকুমার। তর্পণা অবিবাহিত হয়েই রইল তার ফ্ল্যাটে। আজ থেকে মাত্র আড়াই বছর আগে ফুলের দোকান খুলল। ওদিকে শ্রীকুমার প্রথমে একটা প্রকাশনীতে কাজ নিল। সেখানে বছর দেড়েক করে শাড়ির দোকানে কাজ নিল। কাকতালীয়ভাবে যে পাবলিশারের কাছে শ্রীকুমার কাজ করত সেখানেই গিয়েছিলেন দীপায়নবাবু। মৃত্তিকা এবং তার স্বামীকে চিনত শ্রীকুমার। কিন্তু দীপায়নকে চাক্ষুষ করে প্রথম ওই পাবলিশারের কাছে। শ্রীকুমার তপাকে জানায়। তপা ভাবে শিকারি এবং শিকার একই জায়গায় কাজ করলে কোনও না কোনওদিন পুলিশ ঠিক ধরে ফেলবে। পুলিশের কাজটাও সহজ হয়ে যাবে। তাই তপাই শাড়ির দোকানে ব্যবস্থা করে দেয় শ্রীকুমারের কাজের। যদিও একটু ঘুরপথে। শাড়ির দোকানের পাশের গলিতেই একটা কার্ডের দোকান ছিল। সেই দোকানের মালিকের চেনা ছিল তপন। সেই লোকটিই শাড়ির দোকানের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। মনে আছে দীপায়নবাবু, আপনারা যেদিন মেয়ের অন্নপ্রাশনের জন্য আপনার স্ত্রীর শাড়ি কিনতে গেছিলেন তখন সেখান থেকেই আপনাকে পাশের একটা কার্ডের দোকানের রেফারেন্স দেওয়া হয়।'

দীপায়ন একটু হতবাকই হয়ে যায়। মনে করতে সময় লাগে না বিশেষ। 'হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। একজন বয়স্ক মানুষ ছিলেন যিনি আমাকে মিশ্রঠাকুরের সন্ধান দেন।'

-কারেক্ট। চারপাশে এত ঠাকুরমশাই থাকতে উনি কেন মিশ্রঠাকুরের কথাই বললেন বলুন তো? নিশ্চয়ই কেউ চুপিচুপি গিয়ে ওনাকে বলে দিয়েছিল কথাগুলো বলার জন্য। তাই উনি আগবাড়িয়ে এই কথা বলেন। কী শ্রীকুমার? তাই তো? এক বাক্স মিষ্টিও খাইয়ে এসেছিলে দিয়ার মৃত্যুর পরের দিন।'

শ্রীকুমার চুপ। শুধু চোখের পাতাটা চঞ্চল হয়ে উঠল।

-তুমি আমায় দেখোনি। কিন্তু আমি তোমাকে দেখেছিলাম। সেই সময় আমি কয়েকটা পাবলিকেশনে নিজে খোঁজ নিতে কলেজস্ট্রিট গিয়েছিলাম মৃত্তিকার বাড়ি থেকে ঘুরে। ওই কার্ডের দোকানের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলাম আমি। ওই বয়স্ক মানুষটা যখনই তোমার কাছ থেকে মিশ্রঠাকুরের ফোন নম্বর চান তখনই নিশ্চিত হই তুমিই তার সেই ভাগ্নে। আর তুমিই কোনওভাবে লোকটাকে বলো যে মৃত্তিকা ও দীপায়নদের যেন তোমার মামার কথা বলা হয়। আর তর্পণা আপনি জানতে চাইছিলেন না, আমি কীভাবে জানলাম আপনার কীর্তিকলাপ? গতকাল রাতে আপনি যদি মৃত্তিকাকে বেড়ালের ম্যাও ডাক আর গান শোনাবার জন্য ফোন না করতেন তাহলে আমরা হাতেনাতে ধরতে পারতাম না আপনাকে। লালবাজারের সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্ট আপনার কল চলাকালীনই আসল আই পি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করে ফেলে। আর সেই আই পির লোকেশন আপনার ফ্ল্যাটের ঠিকানা। অরুণার মৃত্যুর পর থেকে লালবাজারের সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্ট একটা রাতও ঘুমোয়নি। শুধু অদৃশ্য

বেড়ালটাকে ধরবে বলে।’

আর চুপ থাকতে পারে না শিবাঙ্গী! প্রবল উত্তেজনায় বলে ওঠে, তার মানে ঝুলির মধ্যে লুকিয়ে থাকা বেড়ালটা তর্পণা?”

স্বয়ম্ভুর মুখে আবার সেই হাসি। মৃত্তিকা, প্রিয়াংশু, দীপায়ন প্রবল আক্রোশে পারলে তর্পণাকে গিলেই নেবে।

-বারবার ভিপিএন নম্বর পাল্টে, নতুন নতুন আই পি অ্যাড্রেস ধরে নানান দেশ বিদেশ থেকে ফোন করতেন তর্পণা। সবই করলেন, শুধু গোয়েন্দাদের গাধা ভেবে সবচেয়ে বড় ভুলটা করে বসলেন। লালবাজারে যাঁরা বসে থাকেন তাঁরা কী বসে বসে ঘাস কাটেন বলে মনে হয়?'

এবার অভিনবর কৌতূহল, 'কিন্তু স্যার তর্পণা ম্যাডাম যে আই আই জে টিতে পড়াতেন সেটা কী করে জানলেন?' স্বয়ম্ভু মাথা নিচু করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ‘একটা অডিয়ো রেকর্ডিং শুনে। ইলেক্ট্রিশিয়ান ভাই...।' পাতলা ছেলেটা দৌড়ে এল। স্বয়ম্ভু হাত বাড়িয়ে একটা পেনড্রাইভ দিয়ে চালিয়ে দিতে বলল। ছেলেটি বড় স্ক্রিনের সঙ্গে লাগানো সাউন্ড বক্সে পেনড্রাইভটা লাগিয়ে দিল। একটা ফোন বাজার শব্দ হল। তারপরেই একটা মেয়ের গলা বেশ নেকিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ নন্দিনী বলো।' উল্টোদিক থেকে একটা ছেলের হাসি। ছেলেটি বলল, 'ফাজলামো রাখো। জরুরি কথা আছে।' মেয়েটির গলায় অভিমান, ‘আমরা তো সবসময় জরুরি কথাই বলছি শ্রীকুমার। কতদিন হয়ে গেল একান্তভাবে আমাদের কোনও কথা নেই। ভালোবাসার কথা নেই। কেবলই মানুষ মারার প্ল্যান হয়ে চলেছে।' ছেলেটির উষ্ণ ধমক, ‘কী করছ কী তর্পণা! ফোনের মধ্যে এত এক্সপ্ল্যানেশন দিয়ে কথা বোলো না।' তর্পণা বলল, ‘তুমি হয়তো ভুলে যাচ্ছ এটা আমার সেকেন্ড ফোনটা। এর নম্বর কেউ জানে না। শুধু তুমি আর আমি ছাড়া।'

-নন্দিনীও না?

-ও ফোনটা আছে জানে। নম্বর-টম্বর জানে না।

-শোনো তর্পণা, আমাদের নেক্সট এবং লাস্ট টার্গেট মৃত্তিকা। -কবে?

-দুদিন বাদেই। মৃত্তিকার মেয়ের অন্নপ্রাশনের দিন।

-ইসসস! বেচারি মেয়েটাকে অন্নপ্রাশনেই মাতৃহারা করবে?

-এসব সেন্টিমেন্ট মনেও এনো না। তৈরি থেকো। অ্যাস সাচ তোমায় কিছু করতে হবে না এটার ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি কিছু দরকার হয় তোমায় লাগতে পারে।

-আমি সবসময় তৈরি আছি।

-লাভ ইউ।

-এটা হয়ে গেলে আমরা আবার একসাথে থাকব তো শ্রীকুমার? আমরা নতুন করে সংসার পাতব তো?

-অবশ্যই। আমি তো দিন গুণছি মনে মনে। শুধু আমায় একটা ভালো চাকরি দেখতে হবে। এইসব শাড়ি-ফাড়ির দোকানে টাকা এত কম।

-চিন্তা কী? আমি তো আছি। আমি আবার আই আই জে টিতে কাজ নেব। ওখানে খারাপ মাইনে দেয় না। ততদিনে তুমিও খুঁজে নেবে। তারপর শুধু তোমার আর আমার সুখের সংসার হবে তাই না?

-নন্দিনীও থাকবে। ওকে আমি ছাড়তে পারব না। মনে রেখো, তুমি আর আমি দুজনেই ওকে দত্তক নিয়েছি অরফ্যানেজ থেকে।

-জানি। আমার মনে আছে।

-এখন রাখি তর্পণা। খুব ঘুম পাচ্ছে।

-গুড নাইট।

স্বয়ম্ভু আঙুলের ইশারায় বন্ধ করতে বলে। শ্রীকুমার চোখে হাত চাপা দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। মাঠের মধ্যেই অসহায়ের মতো বসে পড়ে। তর্পণা কিন্তু এখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। শুধু দুচোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে নামছে নোনতা জলের ধারা। ভাঙবে তবু মচকাবে না এই মহিলা। কিছুক্ষণের জন্য ভাড়াবাড়ির লনটায় পিন পতনের নিস্তব্ধতা। আত্মহত্যা আর হত্যার ভাগাড়ে চাপা পড়ে থাকে কত সুখের স্বপ্ন! স্বপ্নালু চোখগুলো শুধু পথ চিনে নিতে পারে না। ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহা তাদের সঠিক পথ থেকে ঠেলে দেয় পাপের অন্ধকারে।

-পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই মিসেস তর্পণা। আপনার ইচ্ছে যদি সৎ হয় তাহলে ঠিক কোনও না কোনও পথ আপনি পেয়ে যাবেন। ঠিক সেইভাবেই আমি আপনার গোপন ফোনের নম্বর পেয়েছি। এই ফোনটার হদিশ আপনার দোকানে যেদিন দ্বিতীয়বার গিয়েছিলাম সেদিনই পেয়েছিলাম। প্যাকেটের মধ্যে ফোনটাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই সময় কেউ একজন আপনাকে ফোন করাতে স্ক্রিনের আলোটা প্যাকেটের ভিতর থেকেই ব্লিঙ্ক করছিল। নম্বরটা ইচ্ছে করেই সেদিন চাইনি। তাহলে আপনি সচেতন হয়ে যেতেন আর আমিও এই রেকর্ডিং পেতাম না।

তর্পণা বিস্মিত। যে নম্বর তর্পণা আর শ্রীকুমার ছাড়া কেউ জানে না সেটা স্বয়ম্ভূ জানল কী উপায়ে? নন্দিনীর জানার তো কোনও প্রশ্নই নেই। তাছাড়া নন্দিনী জানলেও বলবে কখন? সর্বক্ষণ তো তর্পণার চোখের সামনেই ঘুরঘুর করে মেয়েটা। কথাও বলতে পারে না যে ফোন করে নম্বরটা দিয়ে দেবে।

-জানি আপনি অনেক কিছুই ভাবছেন। কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাকে দিতে বাধ্য নই। যাই হোক, এতক্ষণ তো পূর্ব ইতিহাস থেকে শুরু করে কীভাবে প্ল্যানটা সাজালেন সবাই মিলে সেটা বললাম। এবার আসি খুনের ধারাবিবরণীতে। কীভাবে খুনগুলো করলেন।

অনেকেই নিজেদের ইচ্ছেমত চেয়ার নিয়ে বসে পড়েছে। এবার স্বয়ম্ভূ একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে। 'সরি, আমি একটু বসলাম। সেই কাল রাত থেকে ঘুম নেই তো। আজও তো রাত দুটো বাজতে চলল।' শিবাঙ্গী বলে উঠল, 'হ্যাঁ স্যার প্লিজ। আপনি বসুন।' আবারও একটু চুপ করে ভাবল স্বয়ম্ভু। তারপর বলতে শুরু করল শুরু থেকে। ‘আমরা জানি যে তমালের সঙ্গে তর্পণা সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুত্ব পাতায় এবং তারপরেই ওদের ঘনিষ্ঠতা। বন্ধুত্ব থেকে তমালের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে প্রেম। যে অসহায়তা এবং অসহ্য হয়ে ওঠাটা অনেকটাই তর্পণার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিল। আর এটাই ছিল লক্ষ্য। সূচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনো। অরুণা দেখল তমাল আস্তে আস্তে ওর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যে তমালকে অরুণা সুস্মিতার জীবন থেকে চুরি করে নিয়েছিল। তমালও সাড়া দিয়েছিল। তখন মানসিক যন্ত্রণা কাটাতে তার মা সুমিত্রা দেবীকে সব কথা বলে অরুণা। তিনি বলেন, একটা বাচ্চা নিতে। অরুণা পাগল হয়ে ওঠে একটা বাচ্চার জন্য। কিন্তু স্বামীর মনই নেই যার প্রতি তার কাছ থেকে সন্তান পাওয়ার আশাও বৃথা। তাও চেষ্টা করে দুজনেই। কিন্তু সন্তান হয় না। তমালের কাছে ধীরে ধীরে অরুণা অসহ্য হয়ে ওঠে। অরুণাও খিটখিটে হতে থাকে। ঝগড়া অশান্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে তমাল রাগের মাথায় অরুণাকে বলে খুন করে ফেলবে। সেই সময় তর্পণা শান্তিদায়িনী রমণী হয়ে প্রেমের আঁচলে বেঁধে ফেলে তমালকে। ইতিমধ্যে যে মেয়েটা কোনওদিন জ্যোতিষে বিশ্বাস করত না। ঠাকুর দেবতাও সেভাবে মানত না সে সুরি-লেনের শনিমন্দিরে যেতে থাকে। কারণ লোকের মুখে শোনে মিশ্রঠাকুর নাকি যাই বলে তাই ফলে যায়। শিবাঙ্গী, অভিনব খেয়াল কর, এই যে মানুষের বিশ্বাস অর্জন এটার জন্যেই কিন্তু দয়াময় সান্যাল আর শ্রীকুমার এত বছর অপেক্ষা করেছিল। শুরু থেকে তো আর কেউ জানত না অরুণা বিয়ে হয়ে কোথায় উঠবে বা কে কী অবস্থানে থাকবে। কিন্তু দয়াময় যেহেতু নিজের বাড়িতেও পুজোয়াচ্চা করতেন তাই সেটাকেই প্রফেশন করে নেন। আর খবর রাখতে থাকেন শিকারের অবস্থান কীরকম। কপাল ভালো এদের। তাই অরুণা বিয়ে করে সুরি-লেনের পাশের গলিতেই আসে। আর বাকিরা ইতিউতি ছড়িয়ে। সবাই একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সেটল হবার পর এরা ফাইনাল প্ল্যান করে। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, লোকের মুখে শুনে অরুণার দুর্বল মন প্রতি শনিবার করে ছুটে যেতে থাকে শনিমন্দিরে মিশ্রঠাকুরের কাছে। যেকোনও

মানুষের মনের প্রকাশ সবার আগে তার মুখের অভিব্যক্তিতে ঘটে। যেটা অরুণারও ঘটেছিল। পাশাপাশি শ্রীকুমার এবং তর্পণার কাছ থেকেই মিশ্রঠাকুর ওরফে দয়াময় জেনে যেতেন অরুণার জীবনে ঠিক কী কী ঘটে চলেছে। সেটার ভিত্তিতেই তিনি একেবারে মুখ দেখে অরুণার ইহকাল পরকাল সব বলে যেতেন। অবিশ্বাসী অরুণার মনে খুব সহজেই জন্ম নেয় বিশ্বাস। মিশ্রঠাকুর আশা দেন। বলেন সময় এলেই ঠিক হবে সব। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অরুণা অপেক্ষা করে। এর মধ্যেই প্রতিদিন রাত্রে একটা অচেনা নম্বর থেকে কেউ ফোন করে বেড়ালের ডাক শোনাতে থাকে। অরুণার সন্দেহ হয়। বুঝতে পারে না কে ফোন করছে। কিন্তু সম্ভবত ওরও লাটাগুড়িতে ঘটিয়ে ফেলা অপরাধটার কথা মনে হতে থাকে। কিন্তু তার জন্য যে তাকে খুন হতে হবে বুঝতে পারেনি। এক সময় জানতে পারে সুস্মিতা বেড়াল পুষছে। এদিকে প্রেমঘটিত কারণে সুস্মিতার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো নয় অরুণার। তাহলে কী সুস্মিতা কোনওভাবে অরুণাকে মেন্টাল টর্চার করতে চাইছে? সুস্মিতাকে ফোন করে অরুণা। কিন্তু কোনও লাভ হয় না। অরুণা আরও ঘেঁটে যায়। দিনটা শনিবার। ঝিরঝির করে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। বাড়ি ছাড়ে অরুণা। ওদিকে মামার শরীর খারাপ বলে আগেভাগে শাড়ির দোকান থেকে ছুটি নিয়ে নেয় ত্রিদিব ওরফে তিরু কারণ তর্পণা তমালের কাছ থেকে ততক্ষণে খবর পেয়ে গেছে যে অরুণা আজ বাড়ি ছাড়ার জন্য ব্যাগ গোছাচ্ছে। ক্যাব বুক করে অরুণা। তিরু জানত শনিবার একবার না একবার সে আসবেই মন্দিরে। যদি না আসত তাহলে হয়তো তিরুবাবু তপাদার সঙ্গে আলোচনা করে অন্য প্ল্যান করতেন। কিন্তু না, অত কষ্ট তাকে করতে হয়নি। অরুণা রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নামল। রাস্তা পেরিয়ে শনিমন্দিরে এল। মিশ্রঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছে আর ওদিকে তিরুবাবু করলেন ক...
'

দুম করে চুপ করে গেল স্বয়ম্ভু। তিরুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তিরুবাবু, কী করলেন বলুন একটু। ক্লোরোফর্ম দিয়ে যে ড্রাইভারকে ঘায়েল করেছেন সে তো জানি। কিন্তু প্রসেসটা কীভাবে হল?' এবারের এই আপনিআজ্ঞে সম্বোধনটা গায়ের জ্বালা থেকেই করল স্বয়ম্ভু। তিরু মাটিতে বসেই গালের ওপর ঝরতে থাকা জল মুছে স্বয়ম্ভুর দিকে তাকাল। স্বয়ম্ভু ঘাড় গুঁজে একটা ভুরু তুলে অদ্ভুতভাবে হাসছে।

৩৩

ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা বাড়ছে। ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তার ওপারে শনিমন্দিরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে মহিলা কাস্টমারটা। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হতে এসিটাও ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই একটু জানলা খুলে দিয়েছে ড্রাইভার। এমনিতেই ক্যাবের ড্রাইভারগুলো এসি চালাতে না পারলেই বাঁচে। চোদ্দবার বলে বলে চালাতে হয়। বিরক্ত লাগছে ড্রাইভারের। তার ওপর আবার কে যেন পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ফস করে মুখে কী একটা স্প্রে করে বেরিয়ে গেল। স্প্রেটা বেশ অনেকটাই ধেয়ে এসেছে মুখের ওপর। আচমকা চোখ বুজে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড খাবি খেয়েছে ড্রাইভার। তারপর মুখের সামনে হাত নেড়ে কাশতে কাশতে ধাতস্থ হয়ে তড়পে উঠতে সময় লেগেছে তার। ততক্ষণে বেয়াড়া লোকটা ভ্যানিশ। ড্রাইভার মুহূর্তে মুখ বাড়াল বাইরের দিকে। 'এই কে রে শালা বানচোদ?' খিস্তিটা বৃষ্টিতে ভিজে ঝুপুস করে নেতিয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিল। বৃষ্টিতে না পারল বেরোতে আর না পারল লোকটার টিকি দেখতে। ড্রাইভারের বান কোথা দিয়ে কার গায়ে গিয়ে লাগল সে শুধু দুটো স্ট্রিটলাইটের মাঝের অন্ধকারটাই জানে। কাউকেই এখানে দেখা যাচ্ছে না।

বৃষ্টিটা আবার বাড়ল। সিটে মাথা হেলিয়ে মিনিট চারেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে ড্রাইভার। কালো বোরখা পরা একটা মানুষ খোলা জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। ড্রাইভারের দিকে জানলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দরজা খুলল। ড্রাইভারকে গাড়ির সামনের পাশের সিটে ঠেলে দিয়ে নিজে তাড়াতাড়ি উঠে ড্রাইভারের সিট দখল করল। ড্রাইভারকে সামনের সিটের ফাঁকা অংশতে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু চট করে সেটা পারল না। ওদিকে রাস্তা পেরোবার জন্য এগিয়ে এসেছে অরুণা। বোরখা পরা তিরু ঝট করে সামনের সিটটাকে পিছনের দিকে ঠেলে দিতেই অচৈতন্য ড্রাইভার সিটের সামনে পড়ে গেল। পা দুটোকে হাঁটুর কাছ থেকে মুড়ে ভাঁজ করে কোনওরকমে চেপে ঢুকিয়ে দিল চোখের আড়ালে। বোরখার নীচ থেকে দুটো সাদা বস্তা বের করে চাপা দিয়ে দিল লোকটাকে। যাতে চট করে কেউ খেয়াল না করে। অরুণা পিছনের গেট খুলে উঠে বসল। বসতে বসতে বিরক্ত হয়ে বলল, 'সামনের সিটটা পিছিয়ে এল কীভাবে? এগিয়ে দাও।'

-সরি ম্যাডাম, ওটার লকটা আটকে গেছে। আপনি একটু এইদিকে চেপে বসবেন প্লিজ।

-খারাপ গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরোও কেন? যতসব।

গজগজ করতে করতে ড্রাইভারের সিটের পিছনে সরে বসল অরুণা। ঠিক সেই সময় ডানহাতটাকে বাঁহাতের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে পিছনের সিটের দিকে স্প্রে করে দিল ক্লোরোফর্ম। রাগের মাথায় কিছুই বুঝল না অরুণা। শব্দ হল না যে। বোরখার আড়ালে তিরুর নাকে দু-তিনটে মাস্কের পট্টি। যাতে ক্লোরোফর্ম কোনওভাবেই তাকে না বশ করে ফেলতে পারে। গাড়ি ছেড়ে মৌলালি পৌঁছতে না পৌঁছতেই অরুণা অজ্ঞান। গাড়িটা মৌলালি থেকে ডানদিকে ঘুরে এস এন ব্যানার্জি ধরে . . . .

-তার পরের অংশটা আমার জানা তিরু। রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড থেকে আবার গাড়ি ঘুরে জানবাজার হয়ে সুরি-লেন। রাস্তায় একটা বাসের আড়ালে চলে যাবার পর আর সিসিটিভি পাওয়া যায়নি ঠিকই। কিন্তু পরের যা খুনের ইতিহাস তাতে এইটুকু বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। সেই রাত্রেই নৃশংশভাবে হত্যা করা হয় অরুণাকে। পায়ে এঁকে দেওয়া হয় বেড়ালের দুটো কান। যেটা চট করে দেখলে গাছের পাতার মতো লাগবে। গাড়িতেই বস্তা ছিল। ক্যাব এসে দাঁড়াল তোমাদের বাড়ির পিছনের দরজায়। যার দেয়ালে আমি ব্লাডের ট্রেস পেয়েছিলাম। ওই লাশ নিয়ে যাবার সময় হয়তো কোনওভাবে লেগেছিল। খেয়াল করনি তোমরা। খুনের বর্ণনাটা আর নাই বা দিলাম। ওটা তো নিজেরাই রেকর্ড করে মৃত্তিকাকে সেন্ড করেছ। কিন্তু খুনটা করল কে? দুজনে মিলে? নাহ। একজন তো ড্রামস বাজিয়ে লোকের কানকে ধোঁকা দিতে ব্যস্ত। তার ওপরে বাইরে বৃষ্টি। তাহলে বাকি থাকে একজনই।'

সকলের চোখের মণিগুলো আতঙ্কের পর্দা ভেদ করে দেখতে থাকে মিশ্রঠাকুরকে। পঙ্কজ মিশ্র ওরফে দয়াময় সান্যাল নিতান্ত ভদ্র মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। হাত দুটো তার

পেটের কাছে জড়ো করা। স্বয়ম্ভু এগিয়ে এল দয়াময়ের সামনে। দয়াময় চোখ তুলল। তার চোখে চোখ রেখে স্বয়ম্ভু বলল, ‘আপনার পায়ে সেলাই পড়েছিল কেন?' দয়াময়ের পাথর হয়ে যাওয়া চোখের পাতাগুলো কেঁপে ওঠে। বলেন, ‘পায়ে অপারেশন হয়েছিল। একটা জং ধরা লোহার শিকের অংশ ঢুকে গিয়েছিল।

-ভিডিয়োটা করেই সবথেকে বড় ভুল করেছেন দয়াময় ঠাকুর। আপনি যখন স্টিলেটো পড়ে দিয়ার পেটের ওপর লাফাচ্ছিলেন তখন আপনার পায়ের ওই সেলাই করা অংশটা এক ঝলক বেরিয়ে পড়েছিল। আপনার লাফানোর সময় বোরখাটা উঠে গিয়েছিল। প্রথম যেদিন আপনার মন্দিরে যাই সেদিনই খেয়াল করেছিলাম আপনার পা-টা।

মুখ নামিয়ে নেয় দয়াময়। স্বয়ম্ভু এবার তিরুর সামনে এসে দাঁড়ায় তারপর হাঁটু মুড়ে বসে তিরুর মুখের সামনে নিজের মুখ এনে বলে, ‘ভিডিয়োতে আরও একটা গণ্ডগোল ছিল। ভিডিয়োটা যখন এডিট করলেই তখন আরও একটু নিখুঁত করতে পারতে। কিন্তু করবে কী করে? বাইরে তপাদা যে ওয়েট করছিল। এডিট করে পেনড্রাইভে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি যে মৃত্তিকার বাড়ির বারান্দায় ফেলতে হবে। তারপরে লাশ ফেলার তাড়াও ছিল। একই ভাড়া করা গাড়িতে তিরু আর তপন বেরিয়ে প্রথমে দিয়ার লাশ ফেলে শিবাঙ্গীর বাড়িতে। তপন, মোবাইলটা অফ করে না। কারণ পুলিশের মোবাইল যখন তখন অফ করা যায় না সেটা ও জানে। এমার্জেন্সি কিছু হতেই পারে। তাছাড়া ও শিওর ছিল তপনকে কেউ সন্দেহ করবে না। যাই হোক, শিবাঙ্গীর বাড়ি থেকে সেই গাড়ি যায় মৃত্তিকার বাড়ি। বারান্দায় পেনড্রাইভ ফেলতে। মানে সত্যি আপনাদের কুর্নিশ করতে ইচ্ছে করছে আমার। কী খাটুনিটাই না খেটেছেন আপনারা। কিন্তু ওই, এত খেটেও শেষ রক্ষা হল না। এডিট যখন করলেন তিরুবাবু তখন তো একটু দেখে করবেন, একদম শেষে যে আপনার ড্রাম বাজানোর শব্দ চলে এসেছে এক কুচি।' ডানহাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনির মাথা জুড়ে এক কুচি শব্দটা দেখাল স্বয়ম্ভু। ‘প্রথমে তো আমি বুঝিনি। পরে যখন আমার পাঠানো ছেলেটি ছবি তুলে আনল তখনই অনেকটা শিওর হয়ে যাই হত্যালীলা সুরি-লেনের বাড়িতেই ঘটে চলেছে। তার ওপর দিয়ার খুনের ভিডিয়োতে মিশ্রঠাকুরের পায়ে সেলাইয়ের দাগ। মিশ্রঠাকুর আমায় বেমালুম মিথ্যে বলে গেলেন যেদিন আমরা ওনার বাড়িতে গেলাম। ভাগ্নে নাকি বাড়িতে নেই। এদিকে তিরু ওপরের সিঁড়িতে লুকিয়ে দিব্যি আমাদের সব কথা শুনছিল। বাড়িটা অন্ধকার হলে হবে কী? সিঁড়ি দিয়ে তো সূর্যের আলো ঢোকে। আর আলো যেখানে সেখানে ছায়া তো পড়বেই। তাই তো আবার উলটোপথে ঘুরে ঢুকলাম। আর শিবাঙ্গীকে পাঠালাম সামনের দরজা দিয়ে। ও মা! ভাগ্নেবাবাজি নাকি তার মধ্যেই সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে এসেছেন। এদিকে শিবাঙ্গী ওখানেই ছিল। মিশ্রঠাকুর দেখছিলেন আমরা কদ্দুর গেলাম। যেই বাঁক নিয়েছি অমনি ঘরের ভিতর সেঁধিয়ে গেলেন। শিবাঙ্গীও দৌড়ে সামনের দরজায় আর আমি পিছনে।

-ঠাকুরমশাই আরও একটা মিথ্যে বলেছিলেন স্যার।

শিবাঙ্গীর কথা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় স্বয়ম্ভু। ‘উনি আমাদের বলেছিলেন বাড়িটা নাকি ওনার পিতৃপুরুষের। এদিকে কর্পোরেশনের লোককে বলেন সুপ্রভা অধিকারী ওনার দিদি। এই বাড়িটা তাঁরই। তিরু নাকি আরও এক দিদির ভাগ্নে।'

-আসলে শিবাঙ্গী একটা মিথ্যে ঢাকতে গেলে আরও হাজারটা মিথ্যে বেরিয়ে পড়ে। যেদিন আমরা প্রথম মিশ্রঠাকুরের বাড়ি যাই সেদিন আমাদের সঙ্গে ড্রাইভার ছিল তপন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা তপনের সামনেই সবকিছু আলোচনা করে ফেলি। জঙ্গলের কথা, মিশ্রঠাকুরের নেপালি জানার কথা। ওনাকে যে আমরা সন্দেহ করছি সেকথাও বলাবলি করি। তপনের মাধ্যমে সেগুলো আমাদের পরম পূজনীয় ঠাকুরের কানে আসাতে সচেতন হয়ে যান। তাছাড়া কর্পোরেশনের লোক বলে যাঁদের পাঠিয়েছিলাম তারা শুরুতেই বলেছিল এটা সুপ্রভা অধিকারীর বাড়ি কিনা! তাই আর সেটা অস্বীকার করার জায়গা ছিল না। যাই হোক, আমি আবার লাইন থেকে সরে গেলাম। এবার দিয়ার খুন হবার পালা।

-না স্যার, ওই ক্যাব ড্রাইভার আর তমাল।

-ও হো। দেখেছ। উফফফ একসাথে এতগুলো হোমওয়ার্ক দিয়েছেন না ঠাকুরমশাই। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। অরুণাকে বাড়িতে ঢোকাবার আগেই ক্যাব ড্রাইভারকে আরও ক্লোরোফর্ম স্প্রে করা হয়। যাতে লোকটার ঘুম না ভাঙে। তার আগে মোবাইলটা তো সুইচড অফ করেইছে। এরপরে আরও একবার স্প্রে করলেও করতে পারে। একেই মদ খেত লোকটা। তার ওপর এতবার ক্লোরোফর্মের ঠ্যালায় বেচারার প্রাণপাখিটাই বেরিয়ে যায়। এরপর তমাল! শিবাঙ্গী, তর্পণার দুটো ফোন নিয়ে নাও তো।'

শিবাঙ্গী এগিয়ে যায় তর্পণার কাছে। কড়া চোখে হাত পাতে। জল শুকিয়ে যাওয়া চোখ তুলে তর্পণাও তাকায়। তারপর দুটো মোবাইল দিয়ে দেয়। দ্বিতীয় গোপন মোবাইলটি ব্লাউজের ভিতর থেকে বের করে আনে। স্বয়ম্ভু ততক্ষণে অভিনবর কাছ থেকে হাতে তুলে নিয়েছে শ্রীকুমারের মোবাইল।

-পাসওয়ার্ড কী শ্রীকুমার?

স্বয়ম্ভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকুমার বলে, 'নন্দিনী।' স্বয়ম্ভু ঠোঁট উল্টে মোবাইলের লক খোলে। তারপর পকেট থেকে নম্বর লেখা একটা কাগজ বের করে ডায়াল করে। তর্পণার দ্বিতীয় মোবাইল ভাইব্রেট করে ওঠে। শিবাঙ্গীর ভুরু কুঁচকে যায়। বিস্মিত মুখে ফোনের স্ক্রিনটা স্বয়ম্ভুকে দেখায়। স্বয়ম্ভুর ঠোঁটে আবারও সেই বিজয়ীর হাসি। এবার প্রথম ফোনটায় রিং করে। এবারও সেই একই নাম। তিরু, শ্রীকুমার, ত্রিদিব কিচ্ছু নয়। শ্রীকুমারের নম্বরটা তর্পণার দুটো ফোনেই নন্দিনীর নামে সেভ করা।

-এইবার বুঝলাম, সেদিন ক্যাফেতে তমাল আপনার ব্যাগ থেকে ফোন নিয়ে কেন স্থির হয়ে বসেছিল খানিকক্ষণ। আসলে তমাল প্রথমে ভেবেছিল নন্দিনী একটা বোবা মেয়ে হয়ে কীভাবে ফোন করবে? তাই অন্যের ফোন হওয়া সত্ত্বেও তমাল তর্পণার এই ফোনটা ধরে। ধরার পরেই চমক। ক্যাফের সিসিটিভিতে তমালকে ফোন ধরে একটাও কথা বলতে দেখা যায় না। বরং ও বেশ শকড হয়ে যায়। তাড়াহুড়ো করে ফোনটা আপনার ব্যাগে রেখে দেয়। আপনি আসার পরেই কী একটা বলে তমাল বেরিয়ে যায়। ক্যামেরাতে আপনারও অবাক করা মুখের ছবি ধরা পড়েছে তর্পণা ম্যাডাম। সেদিন যেন কত তারিখ ছিল!' বলে একটু ভাবে স্বয়ম্ভু। 'ইয়েস ছাব্বিশে জুলাই, মঙ্গলবার।' মোবাইলে কী যেন খুঁজতে শুরু করে স্বয়ম্ভু। পরক্ষণে নিজেই বলে ওঠে, 'ধুর, আমি এত খাটছি কেন? তর্পণা ম্যাডাম, এতদিন ধরে তো ঢপের পর ঢপ দিয়ে এসছেন। এবার একটা সত্যি কথা বলুন তো। তমাল ফোনে কী শুনেছিল? ও শ্রীকুমারবাবু, আপনি কী এমন টপ্পা গাইলেন ফোনের মধ্যে যে তমাল বেসামাল হয়ে ভেগে গেল?'

দুজনকেই চুপ থাকতে দেখে ধমকে উঠল শিবাঙ্গী। 'কী হল কী? বলুন?" মনমিন করে শ্রীকুমার বলল, 'পরের টার্গেট সুস্মিতা। ওর বাড়িতে কাটা আঙুলগুলো আমাকেই পৌঁছতে হবে। এবার আর তপাদা পারবে না।'

-ও হরি! আমি তো ভাবছিলাম তুমি বুঝি আমার বাড়িতে ওগুলো....

থামল স্বয়ম্ভু। আদুরে চোখে তপনের দিকে তাকিয়ে আহ্লাদি সুরে বলল, 'তপন, ভেরি নটি। কিন্তু শ্রীকুমারভাই...।' স্বয়ম্ভুর তীর আবার ঘুরে যায়। 'হাতের লেখাগুলো তোমার তাই না? বেস্ট অফ লাক, ফুলকারি, গিফট এই তিনটেই তো তোমার লেখা ভাই। এফ অক্ষরগুলো একদম একইরকম। শুধু শেষের এই 'ফাক ইউ' শব্দটা আমাদের তপন বাবাজির। তোমার প্রেমপত্রটা যখন পাই না তপন, তখনই বুঝেছি এ লেখা আগেরগুলোর চেয়ে আলাদা। তার আগেই মেদিনীপুর থেকে ঘুরে এসেছি সব প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে। আবার সেদিনই লালবাজারে ঢোকার সময় তোমার বিনয়ী মুখ দেখে মনে হল একটা পরীক্ষা করেই নিই। তাই তো ফুলবাগান থেকে ফালাকাটা লেখালাম। সেই আবার 'এফ' লেটারেই ফাক হয়ে গেলে।' সকলের দিকে তাকিয়ে ভদ্রতা করল স্বয়ম্ভু, 'সরি ফর মাই ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা না বললে অংকটা সবার কাছে পরিষ্কার হত না।' বড় করে একটা নিশ্বাস নিয়ে স্বয়ম্ভু বলল, 'তার মানে তমাল সেদিনই জেনে ফেলেছিল খুনি কে? না না সরি, খুনি কে জানতে পারার কথা নয়। খুনির সঙ্গে

তর্পণা যে জড়িয়ে সেটা জেনেই ভড়কে গিয়েছিল। কারণ শ্রীকুমার নিশ্চয়ই ফোনে নিজের নাম বলবে না তাই না? সেটা যেই তর্পণা বুঝে গেলেন অমনি জানিয়ে দিলেন শ্রীকুমারকে। প্ল্যান হয়ে গেল সেদিনই কিছুক্ষণের মধ্যে তমালকে মেরে ফেলার। অথচ তপন আমাদের সঙ্গে ছিল। শ্রীকুমার সেদিনও সারাদিন শাড়ির দোকানেই ছিল। বাকি রইলেন, জয় বাবা মিশ্রঠাকুর। বড়ঠাকুরের বড় ভক্ত। তিনি তো আবার কনস্টেবল ছিলেন। তাই সেই পোশাক ওনার কাছে রয়েইছে। খাটের তলায় রাখা থাকে আট নম্বরের বুট জুতো সেটাও আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। নকল দাড়ি, গোঁফ আর বাকি যা যা জিনিসপত্র সব সুরি-লেনের খণ্ডহর থেকেই আমরা উদ্ধার করেছি। ও হ্যাঁ, শ্রীকুমার, তোমার ল্যাপটপটাও নিয়ে নিয়েছি ভাই। ওই আজ তোমরা যখন বাড়িতে ছিলে না তখন সামনের দরজার তালা খুলে পুলিশের লোক ভিতরে ঢোকে। তারপর বাকি লোক বাইরে থেকে আরেকটা তালা মেরে দেয়। কারণ আমরা সবাই জানি তোমরা পিছনের দরজা দিয়েই ঢুকবে। তাই আর ওদিক দিয়ে ঢোকার রিস্ক নেয়নি কেউ। তারপর চিলেকোঠায় সেই সন্ধে থেকে অপেক্ষা করছিল আমাদের লোক। খুব মশা কামড়েছে ওদের জানো তো? যাই হোক, আবার ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে যাই। মিশ্রঠাকুর তড়িঘড়ি মেক আপ নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরোলেন। ভিতরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে পৌঁছে গেলেন তমালের বাড়ি। দরজা খুলল। থানা থেকে আসছি বলে ঢুকে গেলেন। কোনও একটা কথা বলে তমালকে ভিতরে পাঠালেন। সেই ফাঁকে জলের গ্লাসে পটাশিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে দিলেন। তমাল এমনিতেই টেনশনে ছিল। আপনাকে দেখে আরও টেনশনে পড়ে গেল। কী জানি, খুনের সাথে তর্পণার জড়িয়ে থাকার ব্যাপারটা হয়তো আপনাকে বলেছিল। তার পরে জল খেল। ভোগে গেল। আপনিও একটা ক্যাব বুক করে টুক করে চলে এলেন। না, আমরা সেই ক্যাবের হদিশ পাইনি ঠিকই। তবে আপনাদের এক প্রতিবেশী দুপুরে একজন খাঁকি পোশাক পরা পুলিশের লোককে আপনাদের বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল। সে চিনতে পারেনি আপনাকে। আপনি হয়তো জানেন যে এখন কোলকাতা পুলিশের পোশাক সাদা। কনস্টেবলদের পোশাক খাঁকি। আর বেঙ্গল পুলিশ এবং আর পি এফের পোশাক খাঁকি। কিন্তু সুরি-লেন, শিয়ালদা এগুলো তো কোলকাতা পুলিশের আন্ডারে। তাহলে তো সেখানে খাঁকি পোশাকের পুলিশ যাবে না। কোনও কনস্টেবলও তদন্ত করতে যাবে না। তবুও আপনার কিছু করার নেই। মুহূর্তের মধ্যে আপনি কী করে সাদা পোশাক জোগাড় করবেন? তাই এইটুকু রিস্ক আপনি নিয়েই নিলেন। ক'জন সাধারণ মানুষ আর এতসব জানেন? সবাই জানে খাঁকি মানেই পুলিশ। তার ওপরে দুপুরবেলা উত্তর কোলকাতার পাড়ায় বেশিরভাগটা নিঝঝুম থাকে। তাই মুখে মাস্ক দিয়ে চলেই গেলেন খুন করতে। ফিরে এসে আবার আপনার পুজো আছে। শ্রাবণ মাসের পুজো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। তিরুও সুস্মিতার বাড়ি পার্সেল ডেলিভারি করতে গিয়েছিল একই মেক আপ করে। দাড়ি, গোঁফ, মুখে মাস্ক। এই কোভিডটা এসে আপনাদের বেশ ভালোই হয়েছে। চট করে নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু তিরু সেদিন খেয়ালই করেনি নকল দাড়িটা কানের পাশ থেকে একটু খুলে ঝুলছিল। এই ঘটনা যদি আরও দুটো খুনের পর ঘটত তাহলে সেদিনই তিরুকে আমরা নজরবন্দি করে নিতাম। কিন্তু তখন সন্দেহ হলেও কে কোথায় কেন নকল দাড়ি আটকে ঘুরছে তার জন্য নজরবন্দি করা সম্ভব ছিল না। আমি বাইকটার নম্বরও নিইনি। ডেলিভারি অফিসে গিয়ে খুঁজেও পাইনি। তপন তুমি জোগাড় করে দিয়েছিলে বাইকটা?'

তপন কোনও উত্তর দিল না। স্বয়ম্ভু জোরও করল না। 'যাক গে, ওসব নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। দিয়াও খুন হয়ে যায় জন্মদিনের দিন। সেদিন পার্টিতে ভিড়ের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল শ্রীকুমার। সেদিনও বৃষ্টি। আসলে বৃষ্টিটা যেদিন-যেদিন হয়েছে ঠিক সেদিন-সেদিনই খুন হয়েছে। কারণ বৃষ্টিতে সিসিটিভির ছবি ঝাপসা থাকে। লোক কম থাকে। বেশিরভাগ লোক বাড়ির মধ্যেই থাকে। কোনও শব্দ হলে সেটা চাপা পড়ে যেতে পারে। এরকম অনেক

সুবিধে। শ্রীকুমার দিয়ার ড্রিংকসে আগে থেকেই ওষুধ মিশিয়ে দেয়। যাতে একটা সময় পর দিয়া ঘুমিয়ে পড়ে। গভীর ঘুম। অনেকটা অচেতন হয়ে যাবার মত। এদিকে মদ খেয়ে মাতাল দিয়া। সেই সময় ডিজেকে হাত করে ওই ভয়ানক ভিডিয়োর অডিয়োটা বাজিয়ে দেয়। যাতে দিয়া প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায়। সেটাই হল। দিয়ার পার্টনার কিয়ারা দিয়াকে নিয়ে গাড়িতে ওঠে। আর সেই গাড়িটাও শ্রীকুমার চালিয়েছিল। শ্রীকুমারই ওদের নিয়ে যায়। একদিকে দিয়া অজ্ঞান হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে পার্টি চলছে সবমিলিয়ে চূড়ান্ত ক্যায়োস। এর মধ্যে একজন সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। তাই তাকে বিশ্বাস যেকোনও মানুষ করবে। কেউই তখন লোকটির পরিচয় বা তার গাড়িটা পার্কিং থাকতেও কেন সাউথ সিটির সামনে রাস্তায় রাখা সেটাও জিজ্ঞেস করবে না। কিয়ারাও করেনি। শ্রীকুমার আবারও ক্লোরোফর্ম স্প্রে করে কিয়ারাকে অজ্ঞান করে। গাড়ি ঘুরিয়ে ট্যাংরার কাছে নিয়ে গিয়ে ফাঁকা জায়গা দেখে ফুটপাথে ফেলে দেয় কিয়ারাকে। ফেলার আগে ভারি কিছু দিয়ে হাঁটুর কাছে মেরে পা-টা ভেঙে দেয় বেচারির। এই অব্দি ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করা গিয়েছিল। কারণ শ্রীকুমার কিয়ারা বা দিয়ার ফোন সুইচড অফ করতে ভুলে গিয়েছিল। এরপর থেকে আর লোকেশন ট্র্যাক করা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে তারা কোথায় এনে তুলেছিল। আমরাও সাক্ষী। তপন আমাদের সাক্ষী বানিয়েছিল। যাই হোক, এইভাবে দিয়াকেও আমরা হারাই। তার পায়ের নীচে এঁকে দেওয়া হয় বেড়ালের মুখের অবয়ব। কিয়ারা আজও হাসপাতালে ভর্তি। সুস্মিতার খুনটাও সবাই জানো। আলাদা করে আর প্রমাণ করার কিছু নেই। এক্ষেত্রে বেড়ালের দুটো চোখের ছবিও আমরা পাই। এখানেও তর্পণা ম্যাডামের অবদান কম নয়। সকালে গিয়ে ভালো করে দেখে আসেন কোথায় কোথায় সিসিটিভি আছে। ভিতরের ঘরে নেই তাই খুনটা সেখানেই হয়। মীনাক্ষী বলেন, খুনির বাঁহাতে কাটা দাগ। সেটাও আমি খেয়াল করি তপন যখন পকেট থেকে নোটবুক বের করে তখন। আবার আমাকে যখন কাগজটা দেয় তখনও। হাতে কী হয়েছিল তপন? যদিও এতেও কিছু যায় আসে না। তাও বলো শুনি।'

তপন মুখ তোলে। চোখের কোলে লেগে থাকা জলটা মুছে নেয়। মাথা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে একটা শ্বাস নেয়।

তখনও সন্ধে হয়নি। পাখিদের কলকাকলিতে চন্দ্রকোণা সরগরম। আকাশে রক্তমেঘের নির্মম ইশারা। চাইলেও আর একটুও আলো দেবে না আকাশ। সন্ধে নামবে ঝুপ করে। সবার চোখ এড়িয়ে পোয়াতি শ্রীদেবী বেরিয়ে পড়েছে বাড়ির বাইরে। হুঁশ খেয়াল নেই তার। নিজের নাম ভুলে যায়। আপনজনদের চিনতে পারে না। নিজের মনে বকতে থাকে। সেদিন হাঁটতে হাঁটতে কোথায় কত দূর চলে গিয়েছিল খেয়ালই ছিল না ওর। ওদিকে বাড়িতে দিদিকে খুঁজে না পেয়ে তপাদার কাছে ছুটে গিয়েছিল শ্রীকুমার। তারপর দুজনে মিলে শ্রীদেবীর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে সারা গ্রাম চষতে থাকে। কে জানে কী সব্বোনাশ ঘটিয়ে বসে আছে মেয়েটা। এমনিতেই সারা গ্রামে এখন চর্চার বিষয় ঝাঁকড়া পাগলি পোয়াতি হল কীভাবে? কে বিয়ে করল তাকে? সরযু ঠাকমার বুদ্ধিতে খুব একটা কাজ হয়নি। হঠাৎ এক জায়গায় দেখে কয়েকটা ছেলে ও বউ শ্রীদেবীকে ঘিরে ধরেছে। দ্রুত পায়ে কাছে যেতেই দেখতে পায় এক বউ শ্রীদেবীর কাঁধে ধাক্কা মেরে জিজ্ঞেস করছে, 'এই মাগী, কোথায় গিয়ে মুখ পোড়ালি?' সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ছেলে বলে উঠল, 'পেটে করে কজনের বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস?' আরেক মহিলা ঠেলে দিল পাশের মেয়েটাকে, 'সত্যি বাবা, এই পাগলিকে কী আর একজন সামলাতে পারবে? ডজনখানেকের দরকার।' উচ্চ অট্টহাসিতে যে পাখিগুলো ঘরে ফিরছিল তারাও মুখ ঘুরিয়ে অন্যত্র উড়ে গেল।

-সত্যি করে বল তো, আদৌ বিয়ে হয়েছে তোর?

-না।

বেশ জোরে উত্তরটা দিল তপা। ফ্যালফ্যাল করে শ্রীকুমার চেয়ে রইল তপাদার মুখে। এসব কী বলছে তপাদা? সবাই দেখল তপার চোখ দুটো রাগে লাল। হাতে একটা কাচের

বোতল। গাছের তলায় বেশ কয়েকটা বোতল এখনও পড়ে আছে। সেখান থেকেই একটা তুলে নিয়েছে তপা। 'শ্রীদেবীর বিয়ে হয়নি।'

-তপা তুই!

-শ্রীদেবীর বিয়ে হয়েছে না হয়নি তাতে তোমাদের কী? তোমরা ওর বাচ্চার দায়িত্ব নেবে?

-এই, তুই এত উর হয়ে সালিশী করছিস কেনে রে? পাড়ার একটা ছেলে মহিলাদের ভিড় থেকে এগিয়ে এসে বলল।

-তোমরাই বা একটা অসহায় মেয়েকে নিয়ে খিল্লি করছ কেন? লজ্জা করছে না?

-ইসসস! এ মাগীর মারিয়ে আসতে লজ্জা করল নি আর আমাদের খিল্লি করতে লজ্জা?

দেখাদেখি তড়পে উঠল পাড়ার কাকিমা গোছের এক মহিলা, 'এটা ভদ্রলোকের পাড়া। এখেনে এসব নোংরামি চলবে নি।'

-সে তো তোমাদের ভাষা শুনেই বুঝতে পারছি এ পাড়ায় কী ধরনের ভদ্দরলোক থাকে।

মহিলাটি বিষম খায়। ঢোঁক গিলে আবার তড়পে ওঠে, 'আমরা পঞ্চায়েতে যাব। একটা অবিবাহিত মেয়ে পেটে অবৈধ বাচ্চা লিয়ে ঘুরবে আর আমরা বড়রা সেটা মেনে লিব ভেবেচু?''

মুহূর্তের মধ্যে তপা হাতে কাচের বোতলটাকে ভেঙে ফেলল। ভয়েতে পিছিয়ে গেল সবাই। শ্রীকুমার বলে উঠল, 'তপাদা কী করছ?' যাকে নিয়ে এত কিছু তার কোনও ভ্রুক্ষেপই নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে বাধ্য মেয়ের মতো। নিজের মনে বকে চলেছে। হাসছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছে সবার মুখের দিকে। তপন ভাঙা বোতলের কাচ দিয়ে বাঁহাতের তালুটা এক টানে ফালা করে দিল। ছিটকে বেরিয়ে এল রক্ত। মুহূর্তে মাটি লাল হতে শুরু করল।

-অবিবাহিত মেয়ের পেটে বাচ্চা বলে তোমাদের এত অসুবিধে তাই তো? বেশ। নাও তবে...

তপা হাওয়ার চেয়েও দ্রুত গতিতে এগিয়ে এসে শ্রীদেবীর কপাল থেকে সিঁথি পর্যন্ত হাতের লাল রক্তে রাঙিয়ে দিল। সবাই হতবাক। বিস্ফারিত নেত্র। কারও কারও দমটাই বন্ধ হয়ে এল। সিনেমাতে এমন হিরোগিরি দেখে হাততালি দিয়েছে, পর্দায় পয়সা ছুড়েছে। কিন্তু চোখের সামনে এমন ঘটনা বাপের জন্মে কেউ কল্পনাও করেনি। চিৎকার করে ওঠে তপা, ''আজ থেকে শ্রীদেবী আমার স্ত্রী। শান্তিইইইই? যাও সবাই। চলে যাও।' আর কেউ একটাও কথা বলে না। যে যার মত সরে পড়ে। শ্রীদেবীর কপাল থেকে টাটকা রক্ত নাক বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। সেদিন গোধূলি লগ্নে শ্রীদেবীর জীবনে ঠিক কী ঘটে গেল সেটা ও কতটা বুঝল কে জানে? শুধু অবাক হয়ে তপার দিকেই তাকিয়ে রইল। এক ঝাঁক ঘরে ফেরা পাখির দল কিচিরমিচির করে উলু দিতে দিতে গাঁয়ের আকাশ বাতাস মাতিয়ে তুলল।

আঁচলের আড়ালে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে দীপা। তপন দৃপ্ত কণ্ঠে বলে, 'সেদিন রক্ত বন্ধ করে হাতে সেলাই করতে হয়েছিল আমার। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়েছিল। রাতে ঘুমোতে পারিনি। শুধু এটুকু শান্তি ছিল যে, যাকে ভালোবাসি সকলের সামনে তার সিঁথি রাঙিয়ে দিয়ে পেরেছি। আর সেই চিহ্ন আজীবন আমার শরীরের সঙ্গে থেকে যাবে।' বলতে বলতে নিজের হাতের তালুতে সেলাইয়ের দাগটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর আবারও স্বয়ম্ভুর চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি যা করেছি আমার স্ত্রীয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে করেছি। আমি আমার বিবেকের কাছে কোনও অন্যায় করিনি। আমি শ্রীদেবীকে ভালোবেসে যাব আজীবন। দীপাও আমার স্ত্রী। ওকেও ভালোবাসি আমি। বিচারে হয়তো আমার যাবজ্জীবন বা ফাঁসি হবে। হোক। আর কোনও আফশোষ নেই আমার। শুধু মৃত্তিকা বেঁচে গেল এই একটাই যা...!' স্বয়ম্ভূ তপনের সামনে এগিয়ে আসে। প্রিয়াংশু অবাক চোখে তপনকে দেখে চোখ নামিয়ে নেয়। চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। স্বয়ম্ভুও বেশিক্ষণ জলভরা দৃপ্ত চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না। ওরও চোখটা কড়কড় করে ওঠে। শুধু গলা চেপে বলে, 'আফশোষ তো হবেই। বেড়ালের গোঁফটা যে আঁকা হল না!' পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা শিবাঙ্গীকে হুকুম দেয় স্বয়ম্ভু, 'ওকে নিয়ে এস।' শিবাঙ্গী ওপর নীচে মাথা নেড়ে বাড়িটার বাইরে চলে যায়। দয়াময়ের দিকে

চেয়ে স্বয়ম্ভু বলে, ‘এত গবেষণা করে বুদ্ধি খাটিয়ে ছক সাজালেন অথচ ডায়লগ ডেলিভারিতে যে প্রবলেম রয়ে গেল ঠাকুরমশাই। মেদিনীপুরের লোক মিদনাপুর বলে, সচরাচর। যদিও এক্ষেত্রে মেদিনীপুর বলার যুক্তিটাও আপনার ভালো ছিল। লোকে নাকি ভ্যাঙায়। কিন্তু মুশকিলটা হল পরে। আমাদের সামনেই ফস করে নেপালি ভাষাটা বলে ফেললেন আপনি। তাও আবার লোকেশন সমেত। ফরেস্টের কাছে অত কমে নাকি পাওয়া যাবে না। লাটাগুড়ি ফরেস্টের কাছে আপনার বাড়ি। সেটাই আপনি এখন একটা নেপালি পরিবারকে ভাড়া দিতে চলেছেন। ওখানে থাকতে আপনার অনেক নেপালি বন্ধু ছিল। তাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই আপনার এই ভাষা শিক্ষা। কারণ আপনাকে অনেক সময়েই ঝালং-বিন্দুর দিকে যেতে হত। যদিও ওটা ভুটানের বর্ডার তবুও ওখানে নেপালি মানুষই বেশি।' মিশ্রঠাকুর হাসলেন স্বয়ম্ভুর চোখে চোখ রেখে। এবার গলার স্বর খানিকটা উঁচু করে স্বয়ম্ভু বলে ওঠে, 'কোলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা আমার বাড়িতে এসেছেন এটা ঠিক আমার জন্য আনন্দের না ভয়ের সেটাই বুঝতে পারছি না।' এরপরেই গলাটা নরমাল হয়ে যায়, ‘আমরা যেদিন আপনার বাড়িতে প্রথমবার ঢুঁ মারি সেদিন ঢুকতে ঢুকতে আপনি এই কথাগুলো এইভাবেই বলেছিলেন তাই না ঠাকুরমশাই। মনে পড়ে? ওটা উত্তেজনায় নয়। ভিতরে যিনি লুকিয়ে আছেন তাকে জানান দেওয়া আসলে বাড়িতে কারা এসেছে। যাতে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন। তাই তো?' মিশ্রঠাকুর বলেন, ‘তুমি অনেক দূর যাবে, দেখে নিয়ো।' ঝট করে শিরায় আগুন ছুটে গেল স্বয়ম্ভুর। ‘এটাও কী আপনার ভবিষ্যৎবাণী?’’

আর কোনও কথা বলেন না মিশ্রঠাকুর ওরফে দয়াময় সান্যাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথাটা নিচু করে নেয়। স্বয়ম্ভু বলে, 'পুরনো নামের ভোটার কার্ডটা খুব বুদ্ধি করে ব্যবহার করেছেন দয়াময়বাবু। শুধু আপনার মুখ থেকে নেপালি সংলাপ না বেরোলে আমি হয়তো আপনাকে ওভারলুক করতাম। যদিও গাড়ি ভাড়া নেবার সময়টা দিয়ার খুনের সময়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তার ওপর লাটাগুড়ির ঠিকানা। নেপালি কথা। সেই কথায় জঙ্গলের রেফারেন্স। সবমিলিয়ে কালীরামের ঢোলটা ফেঁসেই গেল। তার ওপর যে গাড়িটা থেকে সুরি-লেনের একটি বাড়িতে রাতে কাপড়ের গাঁঠরি নামানো হচ্ছিল সেই গাড়িটাই সাউথ সিটির সামনে। দুটো গাড়িরই শেষ চারটে সংখ্যা উনিশশো উননব্বই আর পিছনের গ্লাসে বজরংবলীর স্টিকার যার একটা দিক ছেঁড়া। একদিকে আমার জন্মসাল অন্যদিকে বজরংবলীর কৃপা। ভুলি কী করে?' দয়াময় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ঠাকুরমশাইয়ের কাছ থেকে সরে এসে স্বয়ম্ভু বলে, ‘আজ এই যে এতগুলো প্রাণ চলে গেল। অকারণে। তার জন্য আসলে কে দায়ী জানেন, আমাদের লাগামছাড়া উশৃঙ্খল জীবন। যাকে আমরা যৌবনের তেজ, উন্মাদনা বলে আকছার ভুল করে থাকি। যৌবনের মানেটাই আমরা কেউ জানি না।

-স্যার।

শিবাঙ্গী ডাকল। স্বয়ম্ভু সমেত সকলেই দেখল একটি মেয়েকে আনা হয়েছে তাদের মধ্যে। স্বয়ম্ভু মেয়েটিকে ডেকে নিল। সকলের সামনে দাঁড় করাল। তর্পণা আর শ্রীকুমার একে অপরের দিকে চেয়ে নন্দিনীর দিকে তাকাল। স্বয়ম্ভু সেন হঠাৎ নন্দিনীকে কেন আনল?

-এই মেয়েটির নাম নন্দিনী। বয়স তেরো বছর। ওর মায়ের নাম শ্রীদেবী মণ্ডল। আর বাবার নাম...

-প্লিজ স্বয়ম্ভুবাবু। প্লিজ। কাঁদো কাঁদো স্বরে আপত্তি জানাল প্রিয়াংশু।

-'কীসের লজ্জা প্রিয়াংশুবাবু?’’

প্রিয়াংশু পিছন ঘুরে দাঁড়াল। ও সহ্য করতে পারছে না বাচ্চা মেয়েটাকে ।

-জীবনে এমন কাজ করলেন যে একটা নিষ্পাপ বাচ্চার চোখে চোখ রাখতে পারছেন না?

মৃত্তিকা জিজ্ঞেস করল, 'এই মেয়েটি আমাদের প্রিয়াংশু আর শ্রীদেবীর মেয়ে?'

-হ্যাঁ মৃত্তিকা। যার জন্মের কারণ আপনি আর আপনার মৃত বন্ধুরা। যার সারাজীবনের অবহেলার কারণ

আপনি আর আপনার বন্ধুদের বেলেল্লাপনা। মৃত্তিকা নিজের মেয়েটাকে আরও আঁকড়ে ধরল বুকের কাছে। দীপায়নের চোখে বালির মতো কিরকির করছে মৃত্তিকার প্রতি ঘৃণা।

–আমি প্রথমদিন তর্পণার দোকানে গিয়ে মেয়েটাকে ভালো করে লক্ষ্য করি। পরে যখন আপনাকে দেখি প্রিয়াংশুবাবু তখন আমার ভীষণ চেনা চেনা লাগে। বলেওছিলাম বোধহয়। আসলে আপনাকে সেদিন প্রথম দেখলেও আপনার মেয়েটাকে আমি আগেই দেখি। দুজনের মুখের কী আশ্চর্য মিল! শুধু তাই নয়, আপনার ডানকানের পিছনে একটু ওপরদিকে একটা কালো জরুল আছে। সেই একই জায়গায় একইরকম জরুল নন্দিনীরও।

নন্দিনীকে পাশ ফিরিয়ে কানের পিছনটা সবাইকে দেখায় স্বয়ম্ভু।

-সবই নিয়তি প্রিয়াংশুবাবু। এই মিলটা নাও থাকতে পারত। কিন্তু ওপরওয়ালা ঠিক করে রেখেছেন আপনাকে পালাতে দেবে না। তাই খুব যত্ন করে এই জরুলটা এঁকে দিয়েছেন মেয়েটার কানে।

মুহূর্তের মধ্যে নন্দিনীর চুলের গার্ডারটা খুলে দেয় স্বয়ম্ভু। এক মাথা ঠাসা কোঁকড়ানো চুল ছড়িয়ে পড়ে মুখের দুইপাশে। প্রিয়াংশুর সামনে মেয়েটাকে মেলে ধরে। স্বয়ম্ভু বলে, ‘দেখুন তো, চিনতে পারেন কিনা! সেই ঝাঁকড়া চুল। সেই চোখ। শুধু জন্মের আগে প্রাণখোলা হাসিটা আপনি, অরুণা, মৃত্তিকা, সুস্মিতা আর দিয়া নিষ্ঠুরের মত কেড়ে নিয়েছেন ওর থেকে। শেষবেলায় শ্রীদেবীর কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শোকে, যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে। হয়তো মেয়েটাও তাই কথা বলতে পারে না। শ্রীদেবী, রামাইয়া আর ওই বেড়ালছানাটাকে মেরে ফেলেছেন আপনারা। আর এই বাচ্চা মেয়েটাকে একটা জীবন্ত লাশ বানিয়ে দিয়েছেন।'

-চুপ করুন স্বয়ম্ভুবাবু, চুপ করুউউউন। প্লিইইইজ।

দুকানে হাত চাপা দিয়ে কুঁকড়ে ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে। কান্নায় শরীরটা কাঁপতে থাকে প্রিয়াংশুর।

-নন্দিনী বোবা। কথা বলতে পারে না। কিন্তু লিখতে পড়তে পারে। শুনতেও পায়। তর্পণা ম্যাডামের ফোনের কল রেকর্ডিং থেকে শুনে শুনে কাস্টমারদের ঠিকানা লিখে রাখে। তারপর সেই ঠিকানায় অর্ডারের ফুল পাঠায়। আর যদি কোনওভাবে ভুল হয়ে যায় বাচ্চা মেয়েটির তাহলে কপালে জোটে মামির হাতের মার।

শ্রীকুমার তড়িতাহতের মতো তর্পণার দিকে তাকায়। ফাঁদে পড়ে চিৎকার করে প্রতিবাদ করে ওঠে তর্পণা, 'মিথ্যে কথা।

স্বয়ম্ভু শান্তই থাকে। নরম সুরে বলে, ‘নন্দিনী আরেকটু ছোট হলে সবার সামনে ওর পিঠের দিকের জামা নামিয়ে দেখিয়ে দিতে পারতাম। একদিনে মারার সময় আপনার হাতে একটা পেন ছিল। অসাবধানতাবশত সেটা পিঠের মধ্যে গেঁথে যায়। আপনি তার চিকিৎসা করান এটা সত্যি। কিন্তু মারটা মেরেছেন আপনি। এরকম আরও আছে। শ্রাবণ মাসের ভরা বৃষ্টিতে রাত সাড়ে আটটার সময় মেয়েটাকে রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে রুটি আনতে পাঠান। লজ্জা করে না আপনার। ফুলের দোকানের সব কাজ এই মেয়েটিই সামলায়।'

-তর্পণা! তুমি ওর সঙ্গে এরকম করতে?

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে শ্রীকুমার। ‘আমি কত ভরসা করে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম ওকে। ভেবেছিলাম তুমি ওকে মায়ের ভালোবাসা দেব। আদর করে বুকে জড়িয়ে রাখবে।'

‘আপনাকে তর্পণা অস্বস্তিতে ছটফট করতে থাকে। স্বয়ম্ভু আবার বলে, যেদিন প্রথম জিজ্ঞাসা করি তর্পণা, যে নন্দিনীর বাড়ি কোথায়। তখন আপনি ঠিকই বলেন। মেদিনীপুরে। কিন্তু সঙ্গে এও বলেন, ওর মামার কাছে থাকত। মামি অত্যাচার করত। আজ বুঝতে পারছি, আপনি এটাও ঠিক কথা বলেছিলেন। শুধু মামির ঠিকানা মেদিনীপুরের বদলে কোলকাতা হবে। সেদিন যখন আপনি বৃষ্টির মধ্যে নন্দিনীকে রুটি আনতে পাঠান মানে যেদিন প্রিয়াংশু এসেছিল আপনার বাড়িতে, সেদিন আপনার ফ্ল্যাটের নীচে আমি আর শিবাঙ্গী ছিলাম। নন্দিনীকে ফলো করি। কারণ আগেরদিন দোকানে নন্দিনী আমায় জল দিতে এসে আমার

সামনে কায়দা করে ও আরেকটা হাত পাতে। দেখি সেই হাতে লেখা, 'আপনার ফোন নম্বর' বলে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেওয়া। বুঝতে পারি ও কোনও বিপদে আছে। নইলে মালকিনকে লুকিয়ে ফোন নম্বর চাইবে কেন? এদিকে কথাও বলতে পারে না মেয়েটা। তারপর বেশ কিছুদিন কেটে যায় কিন্তু নন্দিনী কিছু জানায় না। কোনও ফোনও আসে না। এদিকে প্রিয়াংশুকে ফলো করতে গিয়ে যেই ওর দেখা পাই অমনি আমরা ওর পিছু নিই। সেদিনই জানতে পারি আপনার গুণকীর্তন। ওর পিঠের ক্ষতচিহ্নটা আড়ালে গিয়ে শিবাঙ্গী দেখে কনফার্ম করে। ও কোনও সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ জানে না। তাই আমাদের বুঝতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। আমি ওকে আমার মোবাইলটা দিই। বলি টাইপ করে দিতে। তখনই জানতে পারি সব। ওকে আমি একটা কাজ দিই। তর্পণার সেকেন্ড মোবাইল নম্বরটা জেনে আমায় বলতে। কিন্তু ওর তো ফোন নেই। কীভাবে আমায় পাঠাবে? আমিই ওকে শিখিয়ে দিই। আগেই ফোনের লক খোলার কায়দা দেখে রেখেছিল নন্দিনী। তর্পণা স্নানে যাবার পর সেকেন্ড মোবাইল থেকে পুরনো মোবাইলে একটা মিসড কল করে। তারপর কল লিস্ট থেকে সেটা ডিলিট করে। এদিকে কল হয়নি তাই কল রেকর্ডিংও নেই। এবার পুরনো মোবাইল থেকে সেকেন্ড মোবাইল নম্বরটা আমায় এস এম এস করে দেয়। তারপর সেই এস এম এস আর কল লিস্ট থেকে মিসড কলটা ডিলিট করে দেয়। ব্যস! এটা নন্দিনী না করলে তর্পণার সেকেন্ড নম্বরটা ট্যাপ করা অসম্ভব ছিল। আর মৃত্তিকাও বাঁচত না।'

শ্রীকুমারের দিকে দাঁতে দাঁত চেপে তর্পণা ফুঁসে ওঠে, 'দেখেছ শ্রীকুমার, কেন আমি ওকে শাসন করতাম? বুঝতে পেরেছ তোমার দিদি কাকে পেটে ধরেছে? শালা বেজন্মার বাচ্চা।' তর্পণা যত না চিৎকার করে বলল তার থেকে বেশি উত্তেজিত হয়ে মাঠের মাঝে তেড়ে আসে প্রিয়াংশু, 'একটাও বাজে কথা বলবে না তর্পণা। মেরে মুখ ভেঙে দেব তোমার। ব্ল্যাকমেইলার ছোট লোক। এইটুকু মেয়েকে এত অত্যাচার করেছ, পড়াশুনো করাওনি, ঠিক মতো খেতে পর্যন্ত দাও কিনা সন্দেহ। আর আমার মেয়েকে দেখতে হচ্ছে বলে প্রতিমাসে পঁচিশ হাজার টাকা করে নিয়ে গেছ তুমি? জানেন স্বয়ম্ভুবাবু এই মহিলা হঠাৎ করে একদিন নন্দিনীকে নিয়ে এসে বলে এই মেয়ের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা করে প্রতিমাসে আমায় দিতে হবে। নইলে ডি এন এ টেস্ট করে প্রমাণ করে দেবে ও আমার মেয়ে। আমার অফিসে গিয়ে সব বলে দেবে। সেই থেকে প্রতি মাসে আমি নন্দিনীর জন্য টাকা ট্রান্সফার করেছি। কোনও মাসে দেরি হলে ঠিক সুস্মিতার বুটিকে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসত। অথচ এখন শুনছি মেয়েটার....।'

-আমি জানি প্রিয়াংশুবাবু। আমরা আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চেক করেছি। পার মান্থ আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে তর্পণার অ্যাকাউন্টে টাকা যায়। তখনই বুঝতে পারি তর্পণার এত লপচপানি, এত বুটিকের দামি-দামি শাড়ি পরা, এসব হয় কীভাবে? ফুলের দোকান থেকে কতই বা রোজগার? ও, আরেকটা কথা তো বলতেই ভুলে গেছি। শ্রীকুমার আরও একটা চালাকি করে অরুণার ব্যাপারে। অরুণাকে খুনের পর তমাল আর তর্পণার প্রেমটাকে এস্ট্যাবলিশ করতে এবং আসল খুনি ও খুনের মোটিভ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দিতে আমার বাড়িতে তর্পণার দোকান থেকে কেনা ফুলের স্তবক পাঠায়। যাতে আমরা তর্পণার পিছনে পড়ে থাকি। এদিকে আসল লোক কেল্লাফতে করে বেরিয়ে যাবেন। আপনাদের কোলাবরেশন ইজ জাস্ট আনবিলিভেল।

স্বয়ম্ভূ একটা লোক দেখানো হাততালি দিয়ে ওঠে। নন্দিনীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, 'লেখাপড়া করবি?' ভোর হওয়ার আগেই নন্দিনীর মুখে আলো। ঘাড় নাড়ে। নেচে ওঠে ঝাঁকড়া চুলগুলো। স্বয়ম্ভু বলে, 'আমি তোকে পড়াব।' নন্দিনী হাসে। শিবাঙ্গী স্বয়ম্ভুর দিকে তাকায়, মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

-স্বয়ম্ভুবাবু...

প্রিয়াংশুর দিকে তাকায় স্বয়ম্ভু। 'এতদিন দূর থেকেই তো আমি ওর জন্য খরচা করে গেলাম। এবার না হয় মেয়েটা কাছেই থাক। কথা দিচ্ছি, কোনও অযত্ন করব না। দরকার হলে

আপনারা খবর নিয়ে যাবেন এসে।' নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে স্বয়ম্ভু আবার জানতে চায়, 'কী রে? বাবার কাছে থাকবি? নন্দিনীর চোখে অদ্ভুত সংশয়। প্রিয়াংশুর দিকে তাকিয়ে দেখে ভালো করে। প্রিয়াংশু এগিয়ে আসে নন্দিনীর কাছে। হাঁটুমুড়ে বসে। দুটো হাত জড়ো করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে। চোখে প্রায়শ্চিত্তের সরোবর। তার থেকে ঝরে পড়ে কয়েকটা ধারা। নন্দিনী তার চারটে আঙুল দিয়ে মুছিয়ে দেয়। প্রিয়াংশু মেয়ের বুকে মাথা রেখে দুহাতে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। শ্রীকুমার কাঁদছে না। হাসছে। কারণ সে একটা অন্য দৃশ্য দেখছে। নন্দিনীর ঝাঁকড়া চুলের আড়ালে বেরিয়ে আছে শ্রীদেবীর মুখ। একদিন তাকে যে অপমান করেছিল, মৃত্যুর অতল সাগরে নিমজ্জিত করেছিল আজ সে তার দিদির কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। শ্রীদেবীও তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ক্ষমা করে দিল। দিদিটা তার সত্যিই পাগল ছিল।

দয়াময়ের আজ বড় কোনও শাস্তি হবে। হয়তো ফাঁসির আদেশ হবে। তা হোক। তবু আজ তার অনেকটাই শান্তি। যে উদ্ধত পাগুলো একদিন অসহায় একটা বেড়ালছানাকে পিষে মেরেছিল, পরোক্ষে তার সন্তানকে নির্মমভাবে দলে দিয়েছিল, ভালোবাসাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল নিকষ কালো মৃত্যুর দমবন্ধ করা ফাঁসে তাদের তিনজনকে অন্তত নিজের হাতে শাস্তি দিতে পেরেছে। নিজের পায়ের তলায় ঠিক একইভাবে পিষে মারতে পেরেছে। তাই যাবার সময় কারও প্রতি আর বিদ্বেষ নেই। তার গ্রহরাজ সত্যিই ন্যায়ের দেবতা।

তপন শুনতে পাচ্ছে একটা গান। দেখতে পাচ্ছে একটা দৃশ্য। স্বপ্ন নয়, একদিন এটাই সত্যি ছিল। সন্ধেবেলা সরযু ঠাকমার দাওয়ায় বসে আমতেল দিয়ে মাখা মুড়ির বাটি হাতে নিয়ে তপা আর শ্রীদেবী এক মনে গান শুনছে। দেয়ালে মাথা হেলিয়ে সরযু ঠাকমা গাইছে, 'ভালোবেসে মরি যদি সেও ভালো, ঘর বেঁধে যদি মরি আরও ভালো। এসো এসো হে বঁধু জ্বলিতে জ্বলিতে মরণ আমার ভালো লাগে। কপালের লিখা সিঁদুরে ঢাকিয়া পথ চাওয়া আজও হল না, হল না। যদিও রজনি পোহালো তবুও দিবস কেন যে এলো না এলো না...!' ঠাকমা আপন মনে গান গেয়ে চলেছে আর তপা আড়চোখে ঠায় চেয়ে আছে শ্রীদেবীর মুখের দিকে। ঝাঁকড়া পাগলিটা দেখেও দেখে না যে। আর দেখলেও বোঝে না কিছু। তর্পণা আর দীপাকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে খুনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য। মোটামুটি আসর যখন ফাঁকা। প্রিয়াংশু দাঁড়িয়ে তার নন্দিনীকে নিয়ে, মৃত্তিকা দাঁড়িয়ে তার দেবীকে কোলে নিয়ে। দীপায়ন দাঁড়িয়ে তার ঘৃণা আর সংশয় বুকে নিয়ে তখন স্বয়ম্ভু বলে ওঠে, 'মৃত্তিকা ম্যাডাম, এবার যে আপনার সুন্দর করে বাঁধা খোঁপাটি খুলতে হবে।' দীপায়ন সবার আগে মৃত্তিকার দিকে তাকায় এক গোছা অবিশ্বাস নিয়ে। খোঁপার মধ্যে মৃত্তিকা কী কিছু লুকিয়ে রেখেছে নাকি? স্বয়ম্ভু হাসতে হাসতে বলে, 'আপনার খোঁপার মধ্যে ছোট্ট একটা যন্ত্র আছে। জিপিআরএস ট্র্যাকার। যেটা আমাদের নিখুঁতভাবে সব সময় জানান দিয়ে গেছে আজকে আপনি পার্লার থেকে বেরিয়ে কখন কোথায় যাচ্ছেন। তবেই না আপনাকে আমরা বাঁচাতে পারলাম।' মৃত্তিকার কেমন যেন ঘোর লাগছে এবার। একসঙ্গে এত রহস্যের উন্মোচন হয়ে চলেছে একটা রাতে যে সে আর আলাদা করে কিছু উপলব্ধি করার অবস্থায় নেই।

-শিবাঙ্গী, যাও।

স্বয়ম্ভুর নির্দেশ পেয়ে শিবাঙ্গী এগিয়ে গেল। এক এক করে চুলের পরত খুলতে থাকে। স্বয়ম্ভু বলে, 'এর ক্রেডিটটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে শিবাঙ্গীর। আমি এই ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। সেদিন এই কারণেই শিবাঙ্গী আপনাকে পার্লারের নাম জিজ্ঞেস করেছিল মৃত্তিকা। যে আপনার চুল বেঁধেছে সে পার্লারের কেউ নয়। আমাদের লোক।'

শিবাঙ্গী চুলের শেষ বাঁধনটা খুলে ছোট্ট মতন যন্ত্রটাকে বের করে আনে। দীপায়ন দুহাত জড়ো করে স্বয়ম্ভুর কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার জানা নেই স্বয়ম্ভুবাবু। আজ থেকে আমরা যতদিন বাঁচব ততদিন জানব এ জীবনটা আপনারই দান।' স্বয়ম্ভূ এক গাল হাসি নিয়ে দীপায়নের জোড় করা হাতের ওপর হাত রাখে৷ বলে, 'এটা আমার

কর্তব্য। আমাদের কর্তব্য। দেখুন মানুষ ভুল করে। আবার মানুষই তা শুধরে নেয়। রাত প্রায় ফুরিয়ে এল। একটু পরেই নতুন ভোর হবে। যান, স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করুন। কথাগুলো মৃত্তিকার কানেও গেল। তার চোখ ভর্তি জল।

-ও হ্যাঁ, আপনি খুব ভালো লেখেন। আপনার বইটার জন্য আগাম শুভেচ্ছা রইল।

-থ্যাংক ইউ সো মাচ

-চলুন, আপনাদের বাড়িতে ড্রপ করে দিই।

মৃত্তিকাদের বাড়িতে ছেড়ে গাড়ি ছুটল শিবাঙ্গীর বাড়ির দিকে। স্বয়ম্ভু শিবাঙ্গীকে নামিয়ে নিজে বাড়ি ফিরবে। এখন স্বয়ম্ভুই ড্রাইভ করছে। বেশ খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর শিবাঙ্গী বলল, ‘গঙ্গার ধারে যাবেন?' গাড়ি চালাতে চালাতে স্বয়ম্ভুর প্রায় বিষম খাবার জোগাড়। ‘মানে? এই শেষ রাতে গঙ্গার ধারে?' শিবাঙ্গী খুব নির্লিপ্ত চিত্তে ভাবের আবেশে বলল, 'হুম। শেষ রাত বলেই তো বলছি। ওই যে বললেন আপনি, একটু পরেই নতুন ভোর হবে। আজকের ভোরটা না হয় আমাদের দুজনের জন্যেও হোক।' শিবাঙ্গীর কথা আঁচ লাগে স্বয়ম্ভুর মনে। শব্দের মারপ্যাঁচে কোন সুপ্ত কুঁড়িটি নব পাপড়িদল মেলে বিকশিত হতে চাইছে সেটা না বোঝার মতো শূন্য স্বয়ম্ভু নয়। একটু ভাবল। মনে মনে হাসল। দুরুদুরু বক্ষে স্বয়ম্ভুর উত্তরের অপেক্ষা করে রইল শিবাঙ্গী। একসময় শিবাঙ্গীর দিকে তাকিয়ে স্বয়ম্ভু হেসে বলল, 'বেশ। তাই হোক।'



সঙ্গে সঙ্গে শিবাঙ্গী আঁতকে উঠে রে রে করে উঠল, 'এই এই দেখে দেখে দেখে।' স্বয়ম্ভু আচমকা হতবুদ্ধি হয়ে কোনওরকমে ব্রেক কষে দাঁড় করাল গাড়িটা। প্রতিবর্তক্রিয়ায় শিবাঙ্গীর ডানহাতটা খামচে ধরল স্টিয়ারিংয়ে রাখা স্বয়ম্ভুর বাঁ হাত। দুজনেই দেখল রাতের অন্ধকারে গুটিগুটি পা ফেলে খাঁ খাঁ করা রাজপথ পেরোচ্ছে একটি সাদা বেড়াল। গাড়িটা হঠাৎ থমকে যাওয়ায় সেও থমকে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে জ্বলজ্বলে দুটো চোখে গাড়ির দিকে তাকিয়ে ডেকে উঠল.....

ম্যাও!

